শারদীয় ১৩৯২

নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

আজ শরতের আকাশে-বাতাসে
আগমনীর সুরের মূর্চ্ছনা....

মারুতি

আপনার সারাজীবনের সাথী

দেবসন্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ● পাটনা ● গৌহাটি ● জামশেদপুর ● কটক ● আসানসোল

An Outstanding Publication From **Subarnarekha**

The Truth Unites

Essays in Tribute to
SAMAR SEN

Edited by Ashok Mitra

Samar Sen is more than the powerful poet of the 1940s whose writing has left an indelible imprint on modern Bengali poetry, more than the combative, iconoclastic editor of *Now* in the 1960s or of *Frontier* since 1963. He is also a symbol of hope in this world of shifting values—hope that personal integrity can survive and overcome social, political or economic vicissitudes. It is this spirit of Samar Sen that draws to him the varied following that is reflected in this felicitation volume.
Some of India's most reputed historians, economists, political scientists, literary critics, journalists have come together to present him this collection of essays. The themes are equally diverse : from studies of political and cultural movements to analyses of legacies of colonial education as well as the nature of creative expression, from explorations of various facets of class struggle to different manifestations of capitalism. Many of the essays are scholarly, a few evocative.
The introductory note by the editor, Dr. Ashok Mitra, an academic and an activist, is as provocative as the man and his milieu it so perceptively sums up.
A volume of thought provoking essays on important issues relevant to the understanding of the current socio political scene.

Contributors :
Ranajit Guha Amalendu Guha Partha Chatterjee
Sabyasachi Bhattacharya Amiya Kumar Bagchi
Sumanta Banerjee Nayan Chanda Paresh Chattopadhyay
Ranjit Sau Amit Bhaduri N. Krishnaji Nirmal K. Chandra
Lawrence Lifschultz G. P. Deshpande Malini Bhattacharya
Asok Mitra M. J. Akbar M. S. Prabhakara.

Dy 8vo Pp 16+316 Hardcover with jacket Rs. 180.00

SUBARNAREKHA
73 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009

ওরা চিরকাল—
ধরে থাকে হাল,
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে
ওরা কাজ করে
দেশ দেশান্তরে ।

বহু মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসেই সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌঁছে দেওয়া। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, নতুন নতুন প্রকল্প আর বিদ্যুৎ পরিবহণে বিশাল প্রয়াসের পিছনে রয়েছে হাজার হাজার কর্মীর রাত্রি দিনের বিনিদ্র, অবিচ্ছিন্ন, নিরলস প্রয়াস।

হাজারো মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আগামী দিনের যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করছেন তার উপরই দাঁড়িয়ে আছে—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

"...REMEMBER THAT I AM PRESENT IN THEE
AND LOSE NOT HOPE ;
EACH EFFORT, EACH GRIEF,
EACH JOY AND EACH PANG,
EACH CALL OF THY HEART,
EACH ASPIRATION OF THY SOUL,...
ALL, ALL WITHOUT EXCEPTION,...
LEAD THEE TOWARDS ME..."

—The Mother

With compliments of

I. T. C. LIMITED

Just out

Suniti Kumar Ghosh

The Indian Big Bourgeoisie

Its Genesis, Growth and Character

Paper Rs. 50.00 H. B. 150.00

R. Mukherji

Compradcr Bourgeoisie in India

Paper Rs. 35.00 H. B. 75.00

Tarapada Poy (Compiled)

Santal Rebellion : Documents

Rs. 40.00

P. T. Nair

Calcutta : Origin of the Name

Rs. 60.00

S. N. Mukherjee (Edited)

India : History and Thought

Essays in Honour of A. L. Basham

Rs. 180·00

P. K. Bhowmick

Some Aspects of Indian Anthropology

Rs. 60.00

SUBARNAREKHA

73 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009

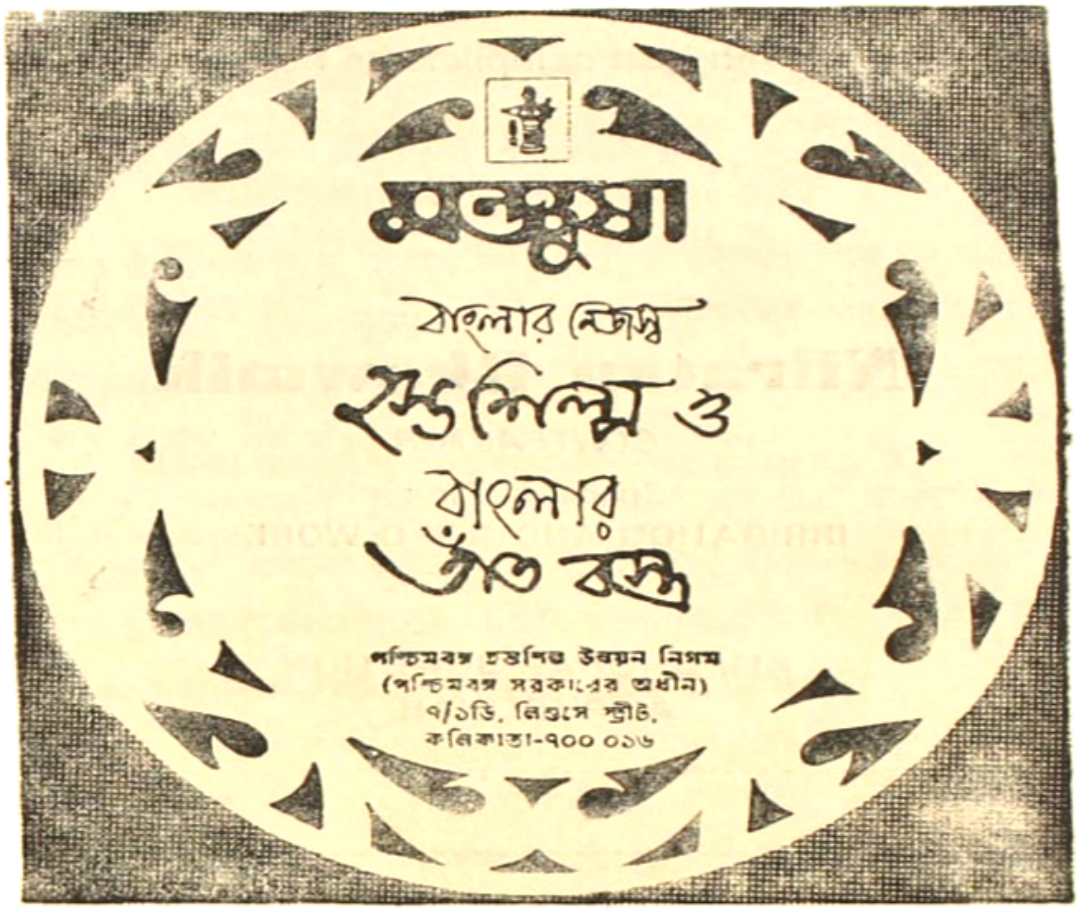

P 29300

শোরুম :

৭/১ ডি লিণ্ডসে ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এয়ার পোর্ট, কলিকাতা লেক মার্কেট, কলিকাতা

এস আই সি বিল্ডিং, সিউড়ি

১৭ নেহেরু রোড, দার্জিলিং

কুলপি রোড, বারুইপুর

দুর্গাচক সুপার মার্কেট, হলদিয়া

সাবওয়ে, হাওড়া

কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান

বনগ্রাম কোর্ট রোড, ২৪ পরগনা

এ-২ স্টেট এম্পোরিয়া বিল্ডিংস, নিউ দিল্লী

৮৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর

এম. আই. রোড এবং সুভাষ মার্গ-এর সংযোগস্থল, জয়পুর

৮৩৪ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ

With best compliments from

Nilratan Bhowmik

CONTRACTOR

Specialised in :
IRRIGATION AND ROAD WORKS

ALIPURDUAR JUNCTION
ALIPURDUAR

With best compliments from

M/s. D. M. Kar Construction Company

NEW TOWN - ALIPURDUAR

Specialised in :
Irrigation & Flood Protective works in North Bengal

আপনার ঐতিহ্য, আপনার গৌরব
আপনার সম্পদ

বাংলার তাঁতের কাপড় অনেকদিন ধরেই রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। কাপড়ের বুনোট, জমি, নক্সা ও উৎকর্ষ বরাবরই খুব উচ্চমানের। আপনার রুচিশীল মনের চাহিদা পূর্ণ করতে এই তাঁতের কাপড় এনেছে এক নতুন ধারা, এক নতুন জোয়ার।

বালুচরী, জামদানী, বিষ্ণুপুর, টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, ধনেখালি ও শান্তিপুর এবং পলিয়েষ্টার, বেডকভার, বেডশীট্ যা আজও ক্রেতা ও সমঝদার, সবরকমের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে অপরিহার্য।

তেমনি বাংলার কুটির ও হস্তশিল্পজাত সামগ্রী শুধু এখানেই নয়, বিদেশেও নজর কেড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পীদের কাজ, যেমন বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ বা ঢোকরা শিল্পীদের কাজ খুব উচ্চমানের শিল্পনিদর্শন। তাছাড়া রয়েছে ছৌ নৃত্যশিল্পীদের মুখোশ এবং শোলার বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় হাতের কাজ। এই ধরনের বিভিন্ন শিল্পবস্তু যা আজ আপনার ও আমার ঘরের শোভা বাড়িয়েছে।

আসুন, দেখুন এবং কিনুন।
যা রয়েছে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান :
তাঁতের কাপড় : 'তন্তুজ' ও 'তন্তুশ্রী'
হস্ত শিল্প সামগ্রী : 'মঞ্জুষা' ও 'গ্রামীণ'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪০৩৫/৮৫

WITH BEST COMPLIMENTS
FROM

KULIK PAPER INDUSTRIES (P) LTD.

RAIGANJ
WEST DINAJPUR

It's PUJA. It's Time to Look your Best...

Puja days are days when you'd like to look your best. And we're here to give you the ease and care free mood you now need to make your days festive and bright. Just for the joy of getting dressed, start with **RAJU'S** undergarments. Let your Puja days be glorious with the magic touch of **RAJU**

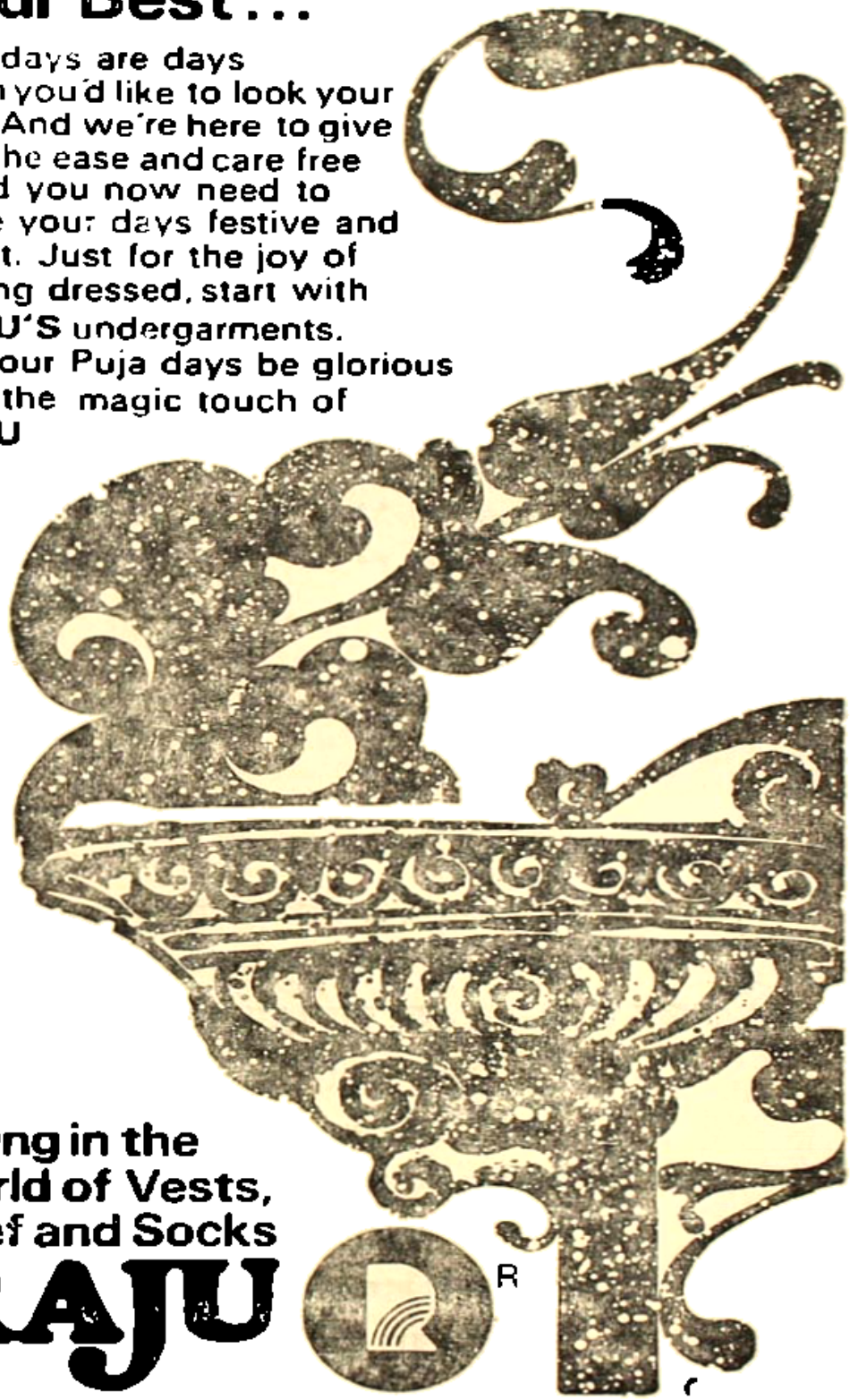

A king in the world of Vests, Brief and Socks

RAJU

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বারে রাজকীয় অভ্যর্থনা

'মৈনাক' ট্যুরিষ্ট লজ, শিলিগুড়ি

একমাত্র আপনারই জন্য

কনভেনশান থেকে বার/রেষ্টুরেণ্ট, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের সবরকম সুবিধাই সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত এই লজটিতে আপনি পাবেন।

	প্রতিদিন একজনের জন্য	প্রতিদিন দু-জনের জন্য
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত	টাকা	টাকা
ডিলাক্স ডবল বেড ঘর—	১৭৫.০০	২৪০ ০০
ডিলাক্স ডবল বেড ঘর—	১৩০ ০০	১৭০ ০০
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্ট্যাণ্ডার্ড ডবল বেড ঘর—	১৩০.০০	১৭০.০০
স্ট্যাণ্ডার্ড ডবল বেড ঘর—	৭৫ ০০	১১০.০০

অগ্রিম বুকিং এবং অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইনফর্মেশন এবং রিজার্ভেশন অফিস

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজ্‌ম ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

৩/২, বি. বা. দী বাগ (পূর্ব) দ্বিতল

কলিকাতা ৭০০ ০০১

টেলিফোন ২৩-৫৯১৭, ২৩-৫১৬৮

অথবা

ম্যানেজার, মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

এক বছরের মননচর্চা

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ॥ ৫৫.০০

শ্রীপান্থ-এর
মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ ॥ ৪০.০০

প্রণব বর্ধনের
রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥ ১২.০০

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের
দিনগুলি মোর ॥ ২৫.০০

ভবতোষ দত্তের
ভারতের আর্থিক উন্নয়ন ॥ ১৫.০০

অশোক রুদ্রের
ভারতের কৃষি অর্থনীতি ॥ ২০.০০

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ॥ ২০.০০

শিবকালী ভট্টাচার্যের
চিরঞ্জীব বনৌষধি ৭ম খণ্ড ॥ ৩০.০০

ডাঃ শিশিরকুমার বসুর
বসুবাড়ি ॥ ৩০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাশিয়া ভ্রমণ ॥ ২০.০০

ক্ষিতিমোহন সেনের
বেদোত্তর সঙ্গীত ॥ ২৫.০০

মানসী দাশগুপ্তের
ছবির নাম সত্যজিৎ ॥ ১০.০০

ডঃ নিমাইসাধন বসুর
আমি : ইন্দিরা গান্ধী ॥ ১৫.০০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের
দ্বাদশ প্রবন্ধ ॥ ২০.০০

অতুলচন্দ্র গুপ্তের
নদীপথে ॥ ৮.০০

অতুল্য ঘোষের
কষ্টকল্পিত নবপর্যায় ॥ ২০.০০

সমরেন রায়ের
অশান্ত ব্রাহ্মণ ॥ ৩০.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
রবির কর ॥ ৮.০০

অরূপরতন ভট্টাচার্যের
কী খাব না খাব ॥ ৮.০০

সদ্য-প্রকাশিত

জগদানন্দ রায়ের
জগদানন্দ রচনা-সংগ্রহ ৭৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন ৩৪-৪৩৬২

With best compliments
from

EVELAND NURSING HOME

6 & 2/3A Southern Avenue
Calcutta 700 026

১৯৮৫-তে পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

আকাশের নীচে মানুষ : প্রফুল্ল রায় ৩০.০০

(বঙ্কিম ও রামকুমার ভূরালকা)

আক্রান্ত : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫.০০

(শিরোমণি পুরস্কার)

অকাদেমী পুরস্কার ১৯৭২

শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে :	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩০.০০

রবীন্দ্র ও অকাদেমী পুরস্কার ১৯৭০

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	আবু সয়ীদ আইয়ুব	২৫.০০

রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৬৯

বাংলার লৌকিক দেবতা	গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২০.০০

রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৭৩

অপরাধ জগতের ভাষা	ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	১৬.০০

অকাদেমী পুরস্কার ১৯৭৭

বাবরের প্রার্থনা	শঙ্খ ঘোষ	৫.০০

রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৮৩

রাম গেছে বনবাসে	দিনেশ দাস	৮.০০

রবীন্দ্র পুরস্কার

ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ	নেপাল মজুমদার	৪০.০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ রচনাবলী ১ম	৭৫.০০
দুর্গাচরণ রায় ॥ দেবগণের মর্ত্যে আগমন	৬০.০০
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ॥ মহাস্থবির জাতক (১ — ৪ খণ্ড) প্রতি খণ্ড	১৬.০০
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ॥ ফাল্গুনী অমনিবাস	২৫.০০
যাযাবর ॥ যাযাবর অমনিবাস	৪০.০০
(দৃষ্টিপাতসহ যাযাবরের সমস্ত রচনা এক খণ্ডে)	
রাম চরিত্র ॥ প্রফুল্ল রায়	১৫.০০

দে'জ পাবলিশিং ॥ ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা৭০০ ০৭৩

ফোন : ৩৪-৫০৩৫

With the compliments of

TATA STEEL

Some Major Books Relating to the History of Calcutta

1	Raja Benoy Krishna Deb **Early History & Growth of Calcutta**	Rs. 45.00
2	Alok Ray ed. **Calcutta Keepsake** (A collection of Essays on Calcutta)	Rs 50.00
3	A. K. Roy **Calcutta Town & Suberbs** A Short History of Calcutta	Rs. 55.00
4	W. H. Carey **The Good Old Days of Honourable John Company Vol I**	Rs. 80.00

RIDDHI-INDIA
28 Beniatola Lane · Calcutta 700 009

বাংলার গৌরব
বালুচরী শাড়ী

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে
নিজস্ব তাঁতে প্রস্তুত
বালুচরী, তসর, গরদ
এবং আপনার পছন্দমত
সিল্কের বিক্রয় কেন্দ্র

বালুচরী

৮/২ ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা ৭০০০৭৩
কলেজ স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগ স্থলে

A Few Essential Titles on Various Aspects of the Social History of India in the 19th Century

1. A F Salahuddin Ahmed
   Social Ideas & Social Changes in Bengal Rs 60.00

2. Alok Ray ed.
   Society in Dilemma : 19th Century India Rs. 60.00

3. Uma Das Gupta
   Rise of the Indian Public Rs. 60.00

4. Rajat Sanyal
   Voluntary Association & The Urban Public Life in Bengal Rs. 60.00

5. S C Belnos
   An Album of Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo & European Manners in Bengal Rs. 200.00

6. Anjali Sen Gupta
   Cameos of Twelve European Women in India Rs. 300.00

7. F C Daly (Ed. Sankar Ghosh)
   First Rebels
   A Strictly Confidential Police Report Rs 65.00

8. Mohinilal Mazumdar
   Postal History of Zemindary Dawk Rs. 50.00

RIDDHI-INDIA

28 Beniatola Lane · Calcutta 700 009

How often do you communicate on Paper ?

Everyday !

You've returned from an important meeting and want to minute it. You put it down on paper. You want to send a personal message to a friend out of town. You put your thoughts down on paper.

Paper. We use it so often and yet taken it for granted. Everyday. Hindustan Paper Corporation has planned to manufacture paper and reach it to consumers directly, in equitable quantities and at a fair price.

Our first projects in Nagaland and Kerala are already in operation, with capacities to produce 33,000 tonnes of writing, printing and packing paper and 80,000 tonnes of newsprint per year.

In a country where the per capita consumption of paper is one of the lowest, we have set before ourselves a challenge. To meet the growing needs, to ensure that paper is available to all sections who need it. At a fair price.

Hindustan Paper Corporation Limited

(A Govt. of India Enterprise)

C

With best compliments from

Metal Engineering & Treatment Co.

235/2 Bipin Behari Ganguly Street
5th Floor
Calcutta 700012

WITH COMPLIMENTS FROM

G. K. COMMERCIAL CO.

2/1A Nanda Mallick Lane
Calcutta 700006

DUCKBACK

MEANS

QUALITY

Bengal Waterproof Ltd.

41 SHAKESPEARE SARANI
CALCUTTA 700017

BOMBAY ☐ CALCUTTA ☐ DELHI ☐ MADRAS

DONATE BLOOD

SAVE LIFE

A WELL-WISHER

With compliments from

R. HOSSAIN

Civil Engineers, Govt. Contractors
& General Order Suppliers

15 Bechulal Road
C. I. T.—C/13
Calcutta 700 014
Telephone : 29-5139

ভারতীয় যোগদর্শনে ঈশ্বরের ধারণা করা হয়েছে 'অখিলাবরণভঙ্গ' রূপে যিনি সব বাধা দূর করে দেন, আবরণ ভেঙ্গে দেন।

বাঙ্গালী মানস দেবী দুর্গার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সমগ্র রূপ কল্পনা করেছে। একদিকে তিনি জগন্মাতা, অন্যদিকে তিনি কন্যা, একদিকে তিনি কল্যাণরূপিণী, অন্যদিকে তাঁর সংহারমূর্তি।

শরতের নির্মল প্রভাতে বাঙ্গালী তাই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁকে আহ্বান জানাতে পেরেছে :

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু—
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে ॥

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক : রসোমালাই এবং ডায়াবিটিকদের জন্য চিনি বর্জিত মিষ্টান্ন

কলিকাতা
১১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট
ফোন ২৩-৫৯২০

ব্যাঙ্গালোর
৪৮, সেন্ট মার্কস রোড
ফোন ৫৫ ০০৩

WITH COMPLIMENTS

FROM

SHIVMONI & CO.

29 STRAND ROAD

CALCUTTA 700 001

OUR RECENT PUBLICATIONS

The Salt Industry of Bengal 1757-1800
by Balai Chandra Barui — Rs. 80.00

Platonic Bearing in Rabindranath
by B. D. Chakraborty — 50.00

Dimensions of Political Communication West Bengal : 1970s
by Srabani Raichaudhuri — 90.00

Soviet Afghan Relations
by Shams Ud Din — 85.00

Conditions of Labour in Indian Agriculture : Apparent and Real
by M. Chattopadhyaya — 90.00

The Political Ideas of Benoy Kumar Sarker
by B. Bandyopadhyay — 80.00

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

ডায়াবিটিস : ডাঃ অমিয়কুমার মজুমদার — ২০.০০

বাংলার আর্থিক ইতিহাস : সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — ৩০.০০

উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : সম্পাদক নরহরি কবিরাজ — ৪০.০০

ইতিহাস চর্চা জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা : সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায় — ৩০.০০

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ : সুধীর চক্রবর্তী — ৪০.০০

মৌনমুখর সেলুলার জেল : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার — ১৫.০০

কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং

২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১২

NEW BOOKS

A PASSION FOR EXCELLENCE
The Leadership Difference
By **Peter and Austin**
Published by Collins, London
£ 8.95 = Rs. 166.63

THE LAST MAHARAJA
A Biography of
Sawai Man Singh II
Maharaja of Jaipur
Foreword by
H. R. H. The Duke of Edinburgh
Published by
Michael Joseph, London
£ 12.95 = Rs. 226.65

WILD INDIA
The Wild Life and Scenery of India and Nepal
Published by Collins, London
£ 25.00—Special Indian Price
Rs. 395/-

THE NEW COLLINS CONCISE ENGLISH DICTIONARY
Over 1.6 Million Words and 96,000 References
Rs. 55/-

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700073

"আমি তোমার সঙ্গে
বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে···"

অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী স্বর্ণোজ্জ্বল
সংগীত-জীবনে বরণীয় শিল্পী
শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের
অনন্যুকরণীয় কণ্ঠের নানা গান
ভারতের কোটি কোটি সংগীত রসিক
মানুষকে মোহিত করে রেখেছে।
তাঁর সংগীত-জীবনের পঞ্চাশ বছর
পূর্তি উপলক্ষে এইচ-এম-ভি-র
অনবদ্য প্রকাশন :

সঞ্চয়ন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের
পাঁচ দশকের গান

রবীন্দ্র-সংগীত, আধুনিক ও বাংলা
ছায়াছবির গানের তিনটি স্বতন্ত্র
এল-পি রেকর্ডে মোট ৩৯টি গান
সম্বলিত একটি বিশেষ সেট বক্স

মূল্য মাত্র ৯৩.০০ টাকা
(কর অতিরিক্ত)

তিনটি ক্যাসেটেও প্রকাশিত

HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস

ALLIED SCHOOL ATLAS

The most uptodate and comprehensive School Atlas ever published.

Thoroughly revised 1985 Edition is now available
Rs 15.00.

Allied Publishers (P) Ltd.

17 CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA 700 072

ল্যামিনেশন

আমরা সমস্ত ধরনের বইয়ের মলাট, কার্টন, লেবেল, ম্যাপ ইত্যাদি সুন্দরভাবে ও সুলভে প্লাস্টিক ল্যামিনেশন করে থাকি। আপনার পণ্যকে ঝকঝকে, ঝলমলে করে পরিবেশন করার জন্য আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন।

Phone 58-2302

POLY-COAT

A/255, ROAD NO-6, H. B. TOWN
SODEPUR, PIN-743178

City Office
SUBARNAREKHA
73 M. G. Road (1st Floor), Calcutta 700 009

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পল্লব মিত্র-সম্পাদিত

সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সুকুমার সেন রমেশচন্দ্র মজুমদার বনফুল প্রমথনাথ বিশী প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্নদাশংকর রায় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অমলেন্দু বসু গোপাল হালদার নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য সত্যজিৎ রায় চারুচন্দ্র সান্যাল অনিলকুমার কাঞ্জিলাল অতুল সুর দীনেশচন্দ্র সরকার নিশীথরঞ্জন রায় সুধীরকুমার মিত্র আশুতোষ ভট্টাচার্য চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মৈত্রেয়ী দেবী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রথীন মৈত্র ক্ষুদিরাম দাস রমাপদ চৌধুরী সুকুমারী ভট্টাচার্য পবিত্র সরকার শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বলকুমার মজুমদার নীলরতন সেন শ্রীপান্থ সুভদ্রকুমার সেন নবনীতা দেব সেন S. R Tikekar M. A. Mehendale H. D. Sankalia R. K. Dasgupta এবং আরো অনেকের রচনা সংকলন। তৎসহ দুষ্প্রাপ্য ছবি, চিঠিপত্র, গ্রন্থপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী। দাম ৪৫ টাকা।

নাথ পাবলিশিং

—পরিবেশক—

নাথ ব্রাদার্স

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ॥ কলকাতা ৭৩

১৯৮৫ রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ ৪০.০০

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চিত্রকর ২২.০০ **চিত্রকথা** ৪০.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ

কবিতার ক্লাস ১২.০০ **ছন্দের বারান্দা** ১২.৫০

বিনয় ঘোষ

বাদশাহী আমল ২২.০০ **নূতন সাহিত্য** ১৫.০০

অশ্রুকুমার সিকদার

আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় ৩০.০০

কার্তিক লাহিড়ী

কলকাতার গ্রাম্যতা ও অন্যান্য ১২.০০

অরুণ সেন

বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায় ১৮.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেনেট **পায়ের নিচে সর্ষে**

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী প্রমথনাথ বিশী-র শেষ উপন্যাস

ধুলোউড়ির কুঠি ৩০.০০

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রাজনগর ৪০.০০ **চাঁদ বেণে**

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন কলকাতা ৬

বাংলা ভাষায় প্রাচীন এবং নবীন সাহিত্যের সম্ভার এবং সংবাদ
সাহিত্য অকাদেমির সাম্প্রতিক প্রকাশনার কয়েকটি :
জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজেতা মালয়ালম সাহিত্যিক
তকষী শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর উপন্যাস : দু কুনকে ধান ১০.০০
চিংড়ি ১৫.০০
মালয়ালম উপন্যাসিক ভৈকম মুহম্মদ বশীর-এর নানার হাতি ৮.০০
হিন্দি থেকে হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর বাণভট্টের আত্মকথা ২০.০০
সংস্কৃত থেকে শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক ১২.০০
বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস ২৫.০০
সুকুমার সেন সম্পাদিত : চৈতন্য চরিতামৃত ৫০.০০
বৈষ্ণব পদাবলী ১২.০০
চৈতন্য ভাগবত ৪০.০০

সাহিত্য অকাদেমি

প্রধান দপ্তর : রবীন্দ্র ভবন, নয়া দিল্লী ১
আঞ্চলিক দপ্তর : রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা ২৯

WITH COMPLIMENTS FROM

- SPECIAL IRON
- STEEL & ALLOY STEEL FOUNDERS

DILIP INDUSTRIAL CORPORATION

L-20 Howrah Industrial Estate
P.O. Baltikuri, Howrah

Lost. And not found.

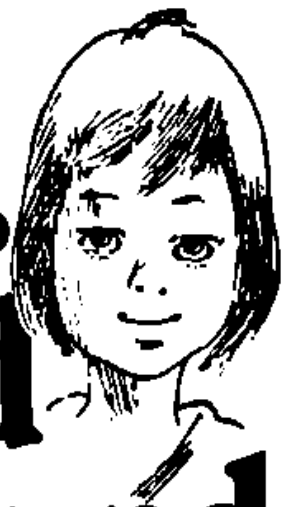

Rita.
Aged 3.
Misty eyed.
Muted cherub.
Lost.
Looking for a bit of warmth.
And love.
There are many like her.
Each one a walking, talking doll.
Yours for Rs. 600 a year.
For sponsoring a child like Rita
and details contact:

India Sponsorship Committee
Post Box No. 6060
Colaba
Bombay 400 005.

Courtesy: SISTA'S PRIVATE LTD. Bombay • Madras • Bangalore • Calcutta • Hyderabad • Delhi

জীবনমুখী শিক্ষার রূপায়ণ, সংস্কৃতিতে নতুন জোয়ার

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আট বছরের ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তোলা এবং সর্বস্তরে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার মহান কর্তব্যে ব্রতী বর্তমান সরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানে একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। এ রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে করা হয়েছে অবৈতনিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র পাঠ্য ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ লক্ষেরও বেশী ব্যক্তিকে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রকল্পেও ১৬ হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেদিনীপুরে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে "বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়"। উচ্চ শিক্ষাকে গবেষণামুখী করার প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যাহত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটেছে নবজাগরণ। পুরাতন ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির পাল্টা নতুন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে গত আট বছরে এই সরকারের নানা উদ্যোগের মাধ্যমে। 'রাজ্য সঙ্গীত একাদেমি', 'লোক-সংস্কৃতি পর্ষদ', 'গিরিশ মঞ্চ', 'মধুসূদন মঞ্চ', আর্ট গ্যালারি, আর্ট ফিল্ম থিয়েটার ও সল্ট লেকে নির্মীয়মাণ কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি—সরকারী প্রচেষ্টার নিদর্শন। এছাড়া নবীন ও প্রবীণ লেখকদের বই প্রকাশের অনুদান, দুঃস্থ নাট্য ও যাত্রা শিল্পী, চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী এবং সঙ্গীত শিল্পীসহ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য—সবই বর্তমান সরকারের বিবেচনা প্রসূত। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে 'অবনীন্দ্র', 'আলাউদ্দীন' ও 'দীনবন্ধু' পুরস্কারের প্রবর্তন—বামফ্রন্ট সরকারের নজিরবিহীন কৃতিত্ব।

সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৭৩৪/৮৫

শারদোৎসবে প্রিয়জনকে বই উপহার দিন

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের—চৈতন্যদেব ১২.০০

সুধীরকুমার মিত্রর—দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী ৩০.০০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর—গল্পে মা আনন্দময়ী-বাণী ২০.০০

শিবনারায়ণ রায়ের—বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর ২০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের—সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ ১৮.০০

সুভাষ ভট্টাচার্যর—আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান ৩০.০০

রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের—রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা ২০.০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের—বাংলায় ধর্ম সাহিত্য ১৮.০০

জগদীশ ভট্টাচার্যর—কবিমানসী ২৮.৫০

পূর্ণেন্দু পত্রীর—সিনেমা সিনেমা ২৫.০০

নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)-এর প্রবন্ধ সংকলন

শ্রীপান্থের নানারকম ৩০.০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের—ক্রান্তদর্শী (৩ খণ্ড) ৯০.০০

বিমল করের—উভয় পক্ষ ১২.০০

রমাপদ চৌধুরীর—এই পৃথিবী পান্থ নিবাস ১৫.০০

অভ্র রায়ের—আর এক জীবনে ১০.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের—হাওয়া ১২.০০

নটরাজনের—বিপ্লবেশ্বর ১৫.০০

সুরজিৎ দাশগুপ্তর—কুরুক্ষেত্র ১৪.০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের—মানুষের হাহাকার ২৫.০০

আনন্দ বাগচীর—প্রথম প্রেম ১২.০০

রশীদ হায়দারের—অন্ধ কথামালা ৮.০০

সুভো ঠাকুরের—নীল-রক্ত লাল হয়ে গেছে ১২.০০

দাউদ হায়দারের সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতার বই

বাসভূমি ছেড়ে ৬.০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২ বিধান সরণী / কলকাতা ৭০০ ০০৬

With the compliments of

LALCHAND ROY & COMPANY PRIVATE LIMITED

7 & 7/1 Grant Lane
Calcutta 700 012
Telephones : 26-7623, 26-1285 & 26-5232

With best compliments of

M/s. A. H. Bilimoria & Company

(Auctioneers & Contractors)

4 Fairlie Place (6th Floor)
Calcutta 700 001
Phone : 23-9641, 22-0600

WITH BEST COMPLIMENTS
FROM

CONTOUR ADVERTISING PVT. LTD.

LEO HOUSE, 1st Floor
88C OLD PRABHADEVI ROAD
BOMBAY 400 025

Phone : 4220769/4220796/4225193
Grams : CONTOADVER, Dadar, Bombay 400 014

যদি চিন্তা করতে আলস্য থাকে প্যাপিরাসের বই পড়বেন না

যে ম ন

সুমিত সরকারের

A Critique of Colonial India

বইয়ের নামটি নিয়ে লেখকের সঙ্কোচ থাকলেও, এই বিশেষণেই ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের সঙ্গত পরিচয়। রামমোহন রায় ও অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ইয়ং বেঙ্গলের স্ববিরোধ, বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীলতা, মহিলাদের সমস্যা, অরণ্য সত্যাগ্রহ, গান্ধিবাদী জাতীয়তার যুক্তিসূত্র বা জনপ্রিয় আন্দোলন ও জাতীয় নেতৃত্বের মতো বিস্ফোরক প্রবন্ধগুলিতে ধরা পড়েছে ইংরেজ শাসনকালের ভারতীয় সমাজের উচ্চ ও নিম্ন উভয় বর্গের আত্মপ্রকাশ ও আত্মখণ্ডনের দ্বন্দ্বমেদুর ধারা-উপধারা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাস-সাহিত্যে এ বই এক নতুন দৃষ্টিকোণের সূচনা করল। দাম : ৬০ টাকা।

তাজুল ইসলাম হাশমীর

ঔপনিবেশিক বাঙলা

বাঙলাদেশের উদীয়মান ঐতিহাসিক তাঁর কৃশায়তন এই বইটিতে অভিকেন্দ্র মনোযোগে বিশ্লেষণ করেছেন পলাশির যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-রূপান্তর, জাতীয়তার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ, এবং রাজনীতির চক্রপেষণে বাঙলার কৃষকের মতো আপাতসরল কিন্তু কূট প্রসঙ্গগুলি। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলি অকুতোভয়, সমালোচনা অকুণ্ঠ। দাম : ১২ টাকা।

প্যাপিরাস ॥ ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৭০০ ০০৪

এক্ষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
সপ্তদশ বর্ষ ॥ ৩–৪ সংখ্যা : শারদীয় ১৩৯২ ॥ সূচিপত্র

প্রবন্ধ

গভীর নির্জন পথে ॥ সুধীর চক্রবর্তী ১
ছবি তোলা : বাঙালির ফোটোগ্রাফি-চর্চা ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ১২১
ঘুমের গন্ধ মেখে : অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র 'কথা' ॥ রুশতী সেন ২৬৭

পুনর্মুদ্রণ
অন্নদা ॥ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৫

স্মৃতিকথা
মনে পড়ে, মনে পড়ে না ॥ সোমনাথ হোর ১৯৭
এক বিস্মৃত শিক্ষক আর কিছু পুরনো কথা ॥ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ২২৩

নাটক
রামনিধি ॥ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৬৩

কবিতা
দু'টি কবিতা ॥ শামসুর রাহমান ১১৩–১৩
কিছু কবিতা ॥ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ২৫৭–৬৬
কবিতাগুচ্ছ ॥ সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ২৮৩–৩১১
প্রাগৈতিহাসিক ॥ মালিনী ভট্টাচার্য ৩৩৫–৪৮

গল্প
নীনা বা অমৃতা ॥ আবুল বাশার ৩১২
জার্মানির গল্প ॥ ভোলফ্‌গাঙ বোর্হার্ট /
মূল জর্মন থেকে তাবাস্তর : সুব্রতকুমারায়ণ চৌধুরী ৩৫৫

চিত্রসূচি
১. ইন্দিরা দেবীর চিঠি ২. দাগেরোটাইপের প্রতিচ্ছবি ৩. ত্রিপুরার বিসর্গ-চিত্র
৪. রবীন্দ্রনাথ ৫. বঙ্কিমচন্দ্র ৬. মিডিয় স্টুডিওর নাম-লিপি ও অটোক্রোম
প্লেট ৭. প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর-গৃহীত পোর্ট্রেট ৮. এইচ বোস ৯. মহারাজা বীরচন্দ্র
১০. নীলমাধব দে ১১. মাইকেল মধুসূদন ১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৩. বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৪. কটকের মহানদী

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা

এক্ষণ পত্রিকার কথা

১৩৯২ সালের শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ প্রকাশিত হল। গত সংখ্যাটি ছিল 'শীত-বসন্ত ১৩৯১' সংখ্যা। অনিয়মিতভাবে এবং বিলম্বিত স্বভাবেই পত্রিকা গত ২৪ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং অনিয়মের কারণে পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশের এটি সবেমাত্র সপ্তদশ বর্ষ।

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও বন্ধুবর্গের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশেষভাবে বিভাস গুপ্ত, ডাঃ সলিলকুমার রায়, সুনীত সেনগুপ্ত, শর্মিলা চন্দ্র, প্রবীর সেন, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, বিমান সিংহ, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সমর দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে প্রচুর সহায়তা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দি বাণী প্রেসের বরুণ চৌধুরী, ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়ার শ্যামল ভট্টাচার্য এবং অরুণা প্রকাশনীর বিকাশ বাগচী এবং আমাদের ছাপাখানার পুরনো কর্মী স্বপন ঘোষের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

। স্বীকৃতি।

মুদ্রণে সহায়তা : জে. ডি. প্রেস, ৫২-এ, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৬
দি বাণী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৬
সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬

ব্লক ও প্রচ্ছদের মুদ্রণ : ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রা. লি., ২৮ বেনেটোলা লেন, কলকাতা ৯

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স, ৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৯

সুধীর চক্রবর্তী

গভীর নির্জন পথে

১

'কাজ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার ক'রে ?'

সব মানুষের বোধহয় ভেতরে ভেতরে চেষ্টা থাকে তার মনের অতলে ডুব দেবার। সকলেই কি তাই ভালোবাসে তার আত্মনিঃসঙ্গতার স্বাদ ? সকলে কি সেই জন্য ভিড়ের কথা বলে, কাজের চাপের কথা বলে ? খুলতে চায় কাজের জট, এড়াতে চায় ভিড়ের জটিলতা। বহুজনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা খুঁজতে চায় নিঃসীম একাকীত্ব। অথচ কতবার এর উল্‌টোটাই দেখেছি। সাধক যারা, যারা দেহাত্মবাদী, চলতি কথায় যাদের বলে আউল-বাউল-দরবেশ, তাদের গভীর নির্জন সাধনায় কেমন ক'রে যেন চিরকালের নিঃসঙ্গতা কায়েম হয়ে যায়। ভিড়ে তাদের ভয় থাকে না নিজেকে হারাবার। বোধহয় সেই জন্যই তাদের সারাবছর ধরে এত মেলা আর মহোৎসব, দিবসী আর পার্বণ। কতবার সোৎসাহ আমন্ত্রণ পেয়েছি এ-সবে। 'আসবেন ১৪ই ফাল্গুন মচ্ছবে, আমার গুরুর আখড়ায়। খুব আনন্দ পাবেন।' আসলে আনন্দ সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণকর্তার। এ তো আমাদের শহরের ক্লিষ্ট কর্তব্যতাড়িত সমাবেশ নয়। কোথায় একটা প্রাপ্তির সানন্দ বিস্তার আছে দেহতত্ত্ববাদীর ডাকে। বহুসময় জিজ্ঞেস করেছি : 'কি আনন্দ পান ? খরচও তো প্রচুর।'

: হিসেবের বাইরে একটা আনন্দ আছে যে ! মানুষ দেখার আনন্দ। অনেক মানুষ আসবে। অনেক মানুষের সেবা দেওয়া যাবে। সব জাত সব বর্ণের মধ্যে সেই মানুষকে সেই আসল মানুষকে দেখা যাবে।

: অত মানুষের ভিড়ে আসল মানুষকে চিনবেন কি ক'রে ?

: সে চেনা যায় আস্তে। চকমকি দেখেছেন ? লোহা আর পাথরের ঘর্ষণে সত্যিকারের আগুন এসে যায়। তেমনই মানুষে মানুষে মেশামিশি থেকে আসল মানুষ ভেসে ওঠে। এ আমরা অনেক স্বাধলাম। ওসব হিমালয়-টিমালয় গেলে কিস্যু পাবেন না। লালন বলে 'মানুষ ধরলে মানুষ পাবি / ওসব তীর্থব্রতের কর্ম নয়'। তাই আপনাকে বলছি, এসব বাউল-ফকিরদের পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করবেন না। মেলায় মিশবেন।

রয়েল ফকিরের কাছ থেকে এসব আমার শোনা, তা বিশ বছর তো হল। রয়েল ফকির। নামটার মতো মানুষটার মধ্যে ছিল মস্ত রাজকীয়তা। লম্বা সুগঠিত চেহারা। আমাকে খুব সহজে বুঝিয়েছিল : 'বাবু, আসল মানুষ কাছে-পিঠেই নড়ে চড়ে, কিন্তু খুঁজলে জনমভর মেলে না। দুই ভুরুর মাঝখানে যে সূক্ষ্ম জায়গা তাকে বলে আরশিনগর। সেইখানে পড়শী বসত করে। পড়শী মানে মনের মানুষ। আরশি ধরলে পড়শী আর পড়শী ধরলে আরশি, কিছু বুঝলেন ?'

: অন্তত এইটুকু বুঝলাম যে আরশিনগরে পৌঁছতে গেলে মানুষকে এড়ালে চলবে না, পড়শী ধরতে হবে।

: বিলক্ষণ। বাবু, আপনার আসল কথাটা বোঝা সারা। এবারে ক্রিয়া আর করণ।

: সেটা কি বস্তু ?

'সেটাই আসল', রয়েল ফকির বলে, 'মনে মনে জানা, ধ্যানে-জ্ঞানে জানা, এবারে তাকে দেহ দিয়ে কায়েম করা, সেটাই আসল। যেমনধারা আপনি শুনলেন গাছে সুন্দর ফল পেকেছে। শুনলেই তো হবে না। দেখতে হবে, খুঁজতে হবে, গাছে উঠতে হবে এবং সবশেষে খেতে হবে। তবে সাঙ্গ হল। তা অত কথার কাজ কি ? আপনি আমাদের বড় বড় ক'টা বিখ্যাত মেলায় যাবেন, আচ্ছা আমার সঙ্গেই যাবেন। আমি সব বুঝিয়ে দেব। তাহলে সেই কথাই রইল। আপনি প্রথমে যাবেন দোলের সময় ঘোষপাড়ায় সতী মা-র মেলায়। দোলের আগের দিন প্রভাতে আমার আখড়া থেকে রওনা। চলে আসবেন তৈরি হয়ে। থাকতে হবে তে-রাত্তির। ব্যাস্ পাকা কথা।'

আমি বললাম : 'কথা পাকা। কিন্তু ঐ মেলা সম্পর্কে আগে বইপত্তর থেকে আমি একটু লেখাপড়া ক'রে নেব। খুব বিখ্যাত মেলা তো। দু'শো বছরের মতো প্রায় বয়েস। মেলাটা সম্পর্কে একটু খুঁটিনাটি জেনে নেব।'

: সে সব জেনে নেবেন বৈকি। আপনারা জ্ঞানের পথের লোক তো। সব বাহ্য বিষয়ে নজর তাই। তবে আমরা হলাম ভাবের পথের লোক। আমাদের চলতে চলতেই সব বোঝা হয়ে যায়।

: তা কতদিন ধরে যাচ্ছেন ঘোষপাড়ার মেলায় ?

'সে কি আজ থেকে গো ?' রয়েল ফকির তার শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'সে আমার জ্ঞান হওয়া ইস্তক। অর্থাৎ আমার দাদু-গোসাঞিয়ের কাল থেকে।'

: দাদু-গোসাঞি মানে ?

: কথাটা ধরতে পারলেন না বুঝি ? আমার যিনি বাবা আবার তাঁর যিনি বাবা তিনি আমার কে ? না, দাদু। তেমনই আমার যিনি গুরু তিনি আমার গোসাঞি। আর আমার গোসাঞিয়ের যিনি গুরু তিনি আমার দাদু-গোসাঞি। এবারে বুঝলেন ?

: বুঝলাম। কিন্তু এইটে বুঝলাম না যে যারা বৈরাগ্যের পথে নেমেছে তারা সব সংসারী লোকের মতো দাদু-নাতি সম্বন্ধ পাতায় কেন ?

: শুধু দাদু-নাতি নয়। গুরু-পিতা শিষ্য-সন্তান। গুরুপত্নীকে শিষ্য বলে মা-গোসাঞি। আমাদের চলতি কথায় শিষ্যসেবক না ব'লে বলে শিষ্যশাবক। সব সম্পর্কে বাঁধা। আমাদের পথ যে রসের পথ বাবা। তালগাছ দেখেছেন ? খেজুর গাছ ? সব খাড়া উঠে গেছে। মাটির দিকে ফেরে না আর। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ধর্ম ঐরকম। মাটি আর মানুষের দিকে নজর নেই। আর আমাদের সতী মা-র ধর্ম হল গৃহীধর্ম। বটগাছের মতন। কেবলই ঝুরি নামছে। ছেলেপুলে নাতিপুতি রস টানছে মাটি আর মানুষের কাছ থেকে। গোসাঞি, মা-গোসাঞি, দাদু-গোসাঞি, সব নিয়ে আমাদের চলা।

: এই সতী মা-র ধর্ম বা কর্তাভজা মতের গুরু কোথা থেকে ?

: কেন ? আউলচাঁদ থেকে ?

: আউলচাঁদ কে ?

: আউলচাঁদ গোরাচাঁদের অবতার। শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথের মন্দিরে গোরাচাঁদ হারিয়ে যান। তারপরে আউলচাঁদের রূপ নিয়ে এই ঘোষপাড়ায় তাঁর উদয়। এবারে তাঁর জন্ম হয়েছে গৃহীদের জন্যে কর্তাভজা ধর্মের পথ তৈরি করার কারণে। তিনিই আদি কর্তা। তাঁর থেকেই এই মত।

: তাহলে সতী মা কে ?

'তাহলে শোনেন সবিস্তারে', রয়েল বেশ ভাবযুক্ত হয়ে বসে ভক্তিমানের মতো বলে, 'আউলচাঁদের ছিল বাইশজন শিষ্য। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন রামশরণ পাল। সাকিন ঘোষপাড়া মুরতীপুর, জাতি সদ্‌গোপ। তাঁর পরিবারের নাম সরস্বতী। সেই সরস্বতী থেকে সতী। বুঝলেন ?'

আমি তর্ক তুললাম : 'তা কি ক'রে হয় ? সরস্বতী থেকে সতী ? কেমন ক'রে ?'

'হয় হয়', রহস্যের হাসি রয়েল ফকিরের মুখে, 'আপনি ধর্মের ভেতরকার সুলুক জানেন না, তাই এমন ধন্দ। আচ্ছা, আপনারে বোঝাই। সরস্বতীর আদ্যক্ষর 'স' আর শেষ অক্ষর 'তী', হল ? এই দুই মিলে সতী। এবারে বুঝলেন ?'

আমতা আমতা ক'রে বলতেই হল, 'ব্যাপারটা বেশ মজার। এরকম আরো নমুনা আছে নাকি ?'

: বিলক্ষণ। এই যেমন ধরুন রামশরণ আর সতী মা-র একমাত্র সন্তান হলেন রাম-দুলাল ওরফে দুলালচাঁদ। তো সেই দুলালের 'লাল' আর চাঁদের বদলে 'শশী' বসিয়ে তিনি নাম নিলেন লালশশী। এই লালশশীকে আমরা বলি 'শ্রীযুত'। তাঁর লেখা প্রায় ৫০০ গান আমাদের ধর্মসংগীত। সে গানের বইয়ের নাম 'ভাবের গীত'। তাকে আমরা বলি আইনপুস্তক। গুরুবারে সন্ধেবেলা আমরা একসঙ্গে বসে শ্রীযুতের আইনপুস্তক থেকে গান করি।

: শুক্রবার কেন ? ওটা তো মুসলমানদের জুমাবার। তবে কি আউলচাঁদের সঙ্গে মুসলমান বা ফকিরি ধর্মের কোনো যোগ ছিল ?

রয়েল ফকির বললে, 'আজ্ঞে সেসব গুহ্যকথা আমার গোঁসাই আমারে বলেন নি কিছু। তবে লালশশীর গানে যা বলেছে তা গাইতে পারি। শুনুন—

তার হুকুম আছে শুক্রবারে সৃষ্টির উৎপত্তি
সেই দিনেতে সবে হাজির হবে
যে দেশেতে আছে যার বসতি।
আছে যে দেশেতে যে মানুষ সবে হাজির হন
পরস্পর সেই অষ্টপ্রহর পরেতে স্ব স্ব স্থানে যান।
এই শুক্রবারে প্রহর রাত্রে লয়ে আশীর্বাদ
যার মনে যা বাঞ্ছা আছে পূর্ণ হয় সে সাধ।

রয়েল ফকিরের সঙ্গে আমার যখন এসব কথা হয় তখনো বিখ্যাত লেখক কমল-কুমার মজুমদার বেঁচে ছিলেন। কে না জানে এ দেশের নানা বিদ্যা ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ছিল দারুণ জ্ঞান। প্রথমবার ঘোষপাড়ার মেলায় যাবার আগে তাই কমলকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'ঘোষপাড়ার মেলা সম্পর্কে কিছু জানেন ? আমি সামনের পূর্ণিমায় সেখানে যাব।'

কমলকুমার প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপরে নাক কুঁচকে বললেন, 'সে তো এক অসভ্য জায়গা মশাই। যাবেন না। শেষকালে কি এক বিপদ আপদে পড়বেন !'

তাঁর কথায় অবাক লেগেছিল। কথা হচ্ছিল এক প্রকাশকের ঘরে বসে। এক গবেষক ফস্ ক'রে তাক্ থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' খুলে কয়েক জায়গা পড়ালেন। দেখা গেল সহজিয়া এই প্রকৃতিভজা ধর্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ নানা বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে গেছেন। আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই থেকে সেকালের বাবুসমাজের বিবরণ পড়ে তিনি শোনালেন। বাবুরা নাকি 'খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।'

যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। গবেষক অনর্গল বলে যান অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে নাকি কর্তাভজাদের সম্পর্কে গালমন্দ আছে। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দু কাস্টস অ্যাণ্ড সেক্টস' বইতে ঘোষপাড়াকে একেবারে রসাতে দিয়েছেন সেই ১৮৯৬-তে। ওয়ার্ড সাহেব বা উইলসন সাহেবও নাকি রেয়াৎ করেন নি। গবেষক ভদ্রলোক শেষমেষ বিনয় ঘোষের বই খুলে একটা জায়গা পড়তে লাগলেন :

এ বৎসর মেলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক ; পুরুষদিগের

সকলেই প্রায় মূর্খ।

দেখিলাম ২০ রোগী আরোগ্যলাভ করিবার আশায় দাড়িহুতলায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অন্ত অন্ত ধর্মাবলম্বিদিগের বুজরুকীও অল্প নয়। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বোবা সাজাইয়া 'বোবার কথা হউক' প্রভৃতি রোগ বলিয়া আরাম করিতেছে।

অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই ধর্মাবলম্বিদিগের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণলীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়।

আমি জানতে চাই এ বিবরণ কবেকার ? জানা যায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্রের 'সংবাদ প্রভাকর' কাগজের ২১ সংখ্যা থেকে প্রতিবেদন খুঁজে পান বিনয় ঘোষ। আশ্চর্য হই। একটা গ্রাম্য লৌকিক ধর্ম সেকালের কলকাতার এত মানুষের বিদ্বেষ সয়েছিল ? কর্তাভজাদের আচরণ সকলের এত খারাপ লেগেছিল ? নীতিবাদী ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার কিংবা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ যোগেন্দ্রনাথ না হয় খানিকটা ধর্মান্ধ হয়ে কর্তা-ভজাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কিন্তু উদার সমন্বয়বাদী শ্রীরামকৃষ্ণ ? তিনি কেন এঁদের ভুল বুঝেছিলেন ? কমলবাবু কি রামকৃষ্ণপন্থী বলেই ওঁদের বিষয়ে অসহিষ্ণু ?

পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা স্বস্তিকর তথ্য মিলল নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' বইয়ের চতুর্থভাগে। ১৮৭৫-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল ঘোষপাড়ার মেলার তত্ত্বাবধান। সরেজমিন সেই মেলা দেখে নবীনচন্দ্র লেখেন :

আমার বোধ হইল 'কর্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরুপূজা' মাত্র। তাহাদের ধর্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে-রামশরণ পাল বেদ-বেদান্ত প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্মপ্রচার করিয়া এত লোকের পূজার্হ হইয়াছিলেন, তিনি কিন্তু সামান্ত মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্তির পূজা না করিয়া এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি ? এখন যে harmony of scripture বা ধর্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কোনও ধর্ম সংস্থাপক প্রচার করেন নাই। রামশরণ পাল, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এতদিনে কর্তাভজা ধর্ম কি বুঝিলাম, এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে আমার শিবিরে ফিরিলাম।

পরিষদ পাঠাগারেই দেখা হয়ে গেল এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ নিয়ে তাঁর কাজ। আমার সমস্যা তাঁর কাছে ব্যক্ত করতেই দিলেন একগাদা বইয়ের ফর্দ। সেসব বই ঘেঁটে দেখা গেল উনিশ শতকের গোড়ায় কর্তাভজাদের নিয়ে কলকাতার ব্রাহ্ম খ্রীস্টান আর হিন্দুধর্মের মানুষদের খুব মাথা-ব্যথা ছিল। প্রথমে 'ইতরলোকদের ধর্ম', 'ওদের জাত পাত নেই', 'ওরা কদর্যভক্ষণ

করে,' 'মেয়েমানুষ নিয়ে ওরা গোপনে রাসলীলা করে' — এসব কথা খুব রটানো হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর জাত-বৈষ্ণবদের মধ্যে থেকে বহুলোক ভেতরে ভেতরে কর্তাভজা ধর্মে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। সেকালের কলকাতার কৈবর্ত তিলি গন্ধবণিক শাঁখারী বেনে তাঁতী এই সব 'নিম্নবর্ণে'র হিন্দুদের কাছে কর্তাভজাদের কাছে 'ঘোষপাড়ার মত' বা সত্যধর্ম খুব সহজ সরল সাদাসিধা বলে মনে হতে লাগল। তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় 'আসন' বানালেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হল সমাবেশ। প্রথমে গোপনে। পরে সগর্বে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অনেকে, এমনকি অনেক বড় মানুষ কর্তাভজাদের ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন। যেমন ভূ-কৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। ১২২১ সালে তিনি বেনারসে 'করুণানিধানবিলাস' নামে যে বিরাট কৃষ্ণলীলার কাব্য লিখেছিলেন তাতে রামশরণ পালকে উল্লেখ করেছিলেন অবতার বলে।

কর্তাভজাদের ভক্তি আর বিশ্বাসের তীব্রতা বিপ্লব এনেছিল সেকালের ব্রাহ্ম সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে। তাঁর জীবনীকার কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখেছেন :

> শশিপদ বাবুর সময়ে বরাহনগরে 'কর্তাভজা' নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনাস্থল ছিল। বনহুগলীতে নিমচাঁদ মৈত্রের বাগান এই সমস্তের মধ্যে অন্যতম। এই স্থানে সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নজাতীয় হিন্দুগণ সম্মিলিত হইত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করিত। শ্রীযুক্ত শশিপদবাবু সময়ে সময়ে এই স্থানে যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশিয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন।

কর্তাভজাদের সত্যধর্মযাজন এবং জাতিপঙ্‌ক্তিহীন উদার সমন্বয়বাদ সেকালে খুব সাধারণ মানুষদেরও কতখানি দ্বিধায় ফেলেছিল তার নমুনা মেলে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১৮ চৈত্র সংবাদপ্রভাকরে ছাপা জনৈক পত্রদাতার বক্তব্যে। ঘোষপাড়ার মেলা স্বচক্ষে দেখে তিনি লেখেন :

> ঐ বহুসংখ্যক কর্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতর জাতি ও শাস্ত্রবিজ্ঞান বর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে তাহাদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব মান্য, বিদ্বান, এবং সূক্ষ্মদর্শিজন দৃষ্ট হইল।...যেহেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্ন বিচার না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধিক্ষণ মাত্র কাহাকেও অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছিল, বোধহয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে, সম্পাদক মহাশয়, ঘোষপাড়ার বিষয়ে নানা মহাশয়ের নানা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু আমরা অল্পবুদ্ধিজীবী মনুষ্য হঠাৎ কোনবিষয়ে কোন মত প্রকাশ

করিতে সাহসিক হই নাই, ঘোষপাড়া ধর্মের নিগূঢ় তথ্য যে পর্য্যন্ত আমরা না জানিতে পারি সে পর্যন্ত তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইব না, যদিও এ ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত নহে ও ইহার বাহুপ্রকরণ সমস্ত অনাচারমুক্ত, কিন্তু যখন বহুলোকের ঐ মতের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এবং ইদানীন্তন বিদ্যার স্রোত প্রবল হইয়া হ্রাস না হইয়া উন্নতি হইতেছে তখন ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্মত নহে।

নবীনচন্দ্র সেন যখন ১৮৯৫-তে ঘোষপাড়ার মেলায় যান তখন সকালবেলা কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁরা 'সকলেই প্রায় গ্র্যাজুয়েট, সুশিক্ষিত ও পদস্থ। সকলেই কর্তাভজা' – এসব বিবরণ পড়ে জানতে ইচ্ছে করে কতসংখ্যক মানুষ না জানি আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে কর্তাভজা ধর্মে যোগ দিয়েছিল যাতে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণরা বার করেছিলেন জেলেপাড়ার সং তাদের গালমন্দ ক'রে কিংবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মদতে দাশু রায় লিখেছিলেন কর্তাভজা পাঁচালী। তার ব্যঙ্গ বড় নির্মম আর অশালীন। যেমন :

কর্তাভজন করতে যাই চলো সকলে।
বজায় করবি যদি দু'কূলে
কেন বাস হয়ে ব্যাকুলে
হারিয়ে দু'কূল কুল তেজে অনন্ত কূলে॥
এতে করতেছে মজা কতজন
করিয়ে পূজা আয়োজন
যাবো নির্জন স্থানে প্রতি শুক্রবার হ'লে।
বৃন্দে উঠি হবেন মুরলীধর
আমরা করে ঢাকিব পয়োধর
হেসে আধা করিব অধর
তখন কত সুখ পাবে।
হবে ব্রজের লীলা শুন বলি
কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা
লেগে যাবে ভারি চটক
কেউ কারে করিবে না আটক
কর্মে দিবে না কেউ বাধা।

এত যে প্রতিরোধ, এমন যে বিদ্রূপ তার মূলে শুধুই ভ্রষ্টাচার আর ধর্মীয় বিরোধ? আমার তো মনে হয়, কর্তাভজাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আর সংঘবদ্ধতা ভাবিয়ে তুলেছিল হিন্দু আর ব্রাহ্মদের। কিন্তু কত শিষ্য ছিল এঁদের? সংগঠিত করলেন কে?

নিঃসন্দেহে দুলালচাঁদ ওরফে লালশশী। উনিশ শতকীয় শিক্ষিত যুবা। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি পার্সি চারটি ভাষাই ভালোমতো জানতেন। ১৭৮৩-তে যখন রামশরণের মৃত্যু ঘটে তখন দুলালচাঁদের বয়স মাত্র সাত। তাঁর মা সরস্বতী দেবী (পরে তিনি বিখ্যাত হন সতী মা নামে) কিছুকাল কর্তাভজাদের নেতৃত্ব দেন। তারপরে দুলালের ষোলো বছর বয়স হতেই তাঁর হাতে নেতৃত্ব আসে। কিন্তু অপরিণত বয়সে দুলাল মারা যান ১৮৩৩-এ। এই ক্ষণজীবী মানুষটি কর্তাভজাদের আচরণবিধি ও সংগঠন চিরকালের মতো সুদৃঢ় ক'রে গেছেন। বয়েল ফকিররা একশো বছর ধরে এঁর লেখা আইনপুস্তক 'ভাবের গীত' গায়, বুকে ভরসা জাগে। সে গানগুলি নাকি মুখে মুখে বলে যেতেন দুলাল আর লিখে নিতেন রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। রামচরণ মূলে ছিলেন বেলুড়ের এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। তিনি ছাড়া দুলালের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ছিলেন বাঁকাচাঁদ, কাশীনাথ বসু, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, রামানন্দ মজুমদার আর নীলকণ্ঠ মজুমদার। ১৮৪৩-এর ক্যালকাটা রিভিয়ুয়ের ষষ্ঠ খণ্ডে দুলাল সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে দেখা যায় ১৮০২-এ মার্শম্যান আর কেরী দুলালের কাছে গিয়েছিলেন সর্বেশ্বরবাদ নিয়ে তর্ক করতে। তাতে দুলালের চেহারার বর্ণনায় বলা হয়েছে 'he was no less plump than Bacchus'। মানুষটি কি উনিশ শতকীয় রীতিমাফিক খুব ভোগীও ছিলেন? একজন লিখেছেন :

> কর্তাভজা সম্প্রদায় সর্ব জাতের মিলনক্ষেত্র রচনায় দুলালচাঁদ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় চারিটি কন্যাকে বিবাহ করেন। চারিটি স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়।

কর্তাভজাদের সম্পর্কে সাহেবদের উৎসাহ ও সতর্কতা লক্ষ করবার মতো। কেরী, মার্শম্যান ও ডাফ সাহেব খুব নজর রাখতেন ঘোষপাড়ার দিকে।* ১৮১১-তে ডব্লু. ওয়ার্ড দুলালের জীবিতকালে যে প্রতিবেদন লিখে গেছেন তাতে বলেছেন :

> Doolatu, the son, pretends that he has now 4000,000 disciples spread over Bengal.

ওয়ার্ড অবশ্য ১৮১৮-তে তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে এই চার লক্ষ শিষ্যসংখ্যা কমিয়ে এনেছেন কুড়ি হাজারে।

* নজর রাখতেন, কারণ তাঁরা জানতেন যারা হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ ক'রে জাতিধর্মহীন কর্তাভজা হয়েছে তাদেরই পরে খ্রীষ্টান বানানো সহজ হবে। ১৮৯৯-তে লণ্ডন থেকে ছাপা Eugene Stock তাঁর The History of the Church Missionary Society, its environment, its men and its work বইয়ের প্রথম খণ্ডে দিয়েছেন কর্তাভজাদের গ্রামকে গ্রাম খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের বৃত্তান্ত। সময় ১৮১৮-এর আশেপাশে। উৎসাহী পাঠক পড়ে নিন 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান', সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৪—বইয়ের ২৬-২৭ পৃষ্ঠা।

রয়েল ফকিরের দলের সঙ্গে আমি যখন ঘোষপাড়ায় যাচ্ছিলাম তখন তার দলবল গাইছিল এক আশ্চর্য কোরাস :

দিলে সতীমায়ের জয় দিলে কর্তামায়ের জয়
আপদ খণ্ডে বিপদ খণ্ডে খণ্ডে কালের ভয়।
দিলে মায়ের দোহাই ঘোচে আপদ বালাই
ছুঁতে পারে না কাল শমনে।

এই সতী মা যে কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে কর্তা-মা হয়ে উঠেছিলেন সেও এক রহস্য। কেন না ১৮১১-তে এবং ১৮২৮-এ ওয়ার্ড সাহেব এবং পরে হোরেশ হেম্যান উইলসন তাঁদের লেখায় রামশরণ ও দুলালচাঁদের সুবিস্তৃত উল্লেখ বারবার করলেও এক জায়গাতও সতী মা-র কথা লেখেন নি। বরং ওয়ার্ড সাহেব ঐশীক্ষমতা ও রোগ আরোগ্যের 'মিথ' তৈরি করেছেন আউলচাঁদ ও রামশরণের নামে। আউলচাঁদ সম্পর্কে বলেছেন, 'It is pretended he communicated his supernatural powers' এবং রামশরণ পাল সম্পর্কে, 'He persuaded multitudes that he could cure laprosy and other diseases.' এই রোগারোগ্যের কৌশলে অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে রামশরণ যে বিপুল অর্থ সম্পত্তি বানিয়েছিলেন ওয়ার্ড সে ইঙ্গিত গোপন রাখেন নি। তাঁর মতে, 'By this means, from a state of deep poverty he became rich, and his son now lives in affluence.'

সমস্যাটা এইখানে। রোগ সারাবার গল্প কিংবা কল্পকাহিনীগুলি সতী মা-র নামে রটল কেমন ক'রে? 'সহজতত্ত্ব প্রকাশ' নামে একটা বইয়ে সমস্যাটার জবাব আছে। মধুলাল মিশ্র নামে এক কর্তাভজা এ বইয়ে লেখেন :

> তাঁহার [অর্থাৎ রামশরণ] তিরোধানের পর মহাত্মা দুলালচাঁদের চেষ্টায় সুচারুভাবে প্রচারিত সতী মায়ের অলৌকিক শক্তির কাহিনী কর্তাভজন ধর্মকে জগতে প্রচারিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল।

রয়েল ফকিরের তো এসব কথা জানা নেই। সে শুধু বিশ্বাস করে। তার পায়ের তলার মাটিতে নেই সংশয়ের ফাটল। সে জানে এবং মানে যে ঘোষপাড়ার ডালিম-তলার মাটি গায়ে মেখে হিমসাগরের জলে স্নান ক'রে সতী মায়ের নাম ভক্তিভাবে নিলে সব রোগ সেরে যায়। ঘোষপাড়ার মেলার আগের দিন সেই ভরদুপুরে অগণিত ভক্ত মানুষদের মাঝখানে আসন পেতে বসে ডালিমতলার দিকে তাকাই। এই মাটিতে সব রোগ সারে? এত হাজার হাজার মানুষ সেই বিশ্বাসের জোরে এখানে এসেছে? রয়েল ফকির আমার সংশয়ী চোখে চোখ রেখে হেসে বলে, 'বাবা বিশ্বাস করো, বিশ্বাসে মুক্তি।' তারপরে তারা দলের দীনুরতন দাসীকে বলে, 'দীনু, সতী মায়ের মাহিত্ম্য তুমি বাবুরে একটু শোনাও দিনি। উনি শান্তি পাবেন।'

দীনুরতন দাসী ঊর্ধ্বকরে অলক্ষ সতী মা-কে প্রণতি জানিয়ে পাঁচালীর সুর ক'রে বলে :

সতী মা উপরে যেবা রাখিবে বিশ্বাস।
সেরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ শূল কাশ॥
কৃপা হলে ভবে তাঁর ঘটে অঘটন।
অন্ধ পায় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ॥
চিত্ত যেবা রাখে পায় বিত্ত পায় ভবে।
বন্ধ্যানারী পুত্র পাবে তাঁহার প্রভাবে॥
সতী মা-র ভোগ দিতে হবে যার মতি
সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি॥

কথাগুলো রয়েল ফকিরের দলের সকলেরই খুব মনোমতো সেকথা বোঝা যায় তাদের মাথার দুলুনিতে। রয়েল ফকির বলেন : 'আমরা এই রকম শুনেচি যে আউলচাঁদ ফকির, রামশরণ আর সরস্বতীর সেবাধর্মে অনেক দিন ধরে খুব তুষ্ট হয়ে শেষে একদিন বললেন 'এবারে আমি চলে যাব।' 'না না', সরস্বতী কেঁদে পড়লেন তাঁর পায়ে। অনেক কান্নাকাটির পরে শেষমেশ রফা হল আউলচাঁদ জন্মাবেন তাঁর গর্ভে সন্তান হয়ে। সেই সন্তানই হলেন আমাদের এই লালশশী। তিনিই নিরঞ্জন। গোকুলে যেমন যশোদার দুলাল কৃষ্ণ, অযোধ্যার যেমন কৌশল্যার দুলাল রামচন্দ্র, নবদ্বীপে যেমন শচীমার দুলাল গোরাচাঁদ, আমাদের এই ঘোষপাড়ায় তেমনই সতী মায়ের দুলালচাঁদ। এই চারেই এক, একেই চার। বুঝলেন ?'

বুঝলাম, কর্তাভজা ধর্মে রয়েছে এক মেধাবী বিন্যাস, যার মূলে দুলালচাঁদের কল্পনাগৌরব আর বুদ্ধির কৌশল। একদিকে অবতারতত্ত্ব আরেকদিকে রোগ আরোগ্যের উপাখ্যান। একদিকে সহজ সাধন আরেকদিকে ভাবের গান। একদিকে আসন-গদী-অর্থাগম আরেকদিকে বিধবা ও পুত্রহীনাদের সান্ত্বনা। শিক্ষিত মানুষদের কাছে যা সমন্বয়বাদের কারণে আকর্ষণীয় অশিক্ষিতদের কাছে তা সতী মা-র মাতৃ-তান্ত্রিকতায় আবিল ও মোহময়। অবশ্য দুলালচাঁদের ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিগত এলেমও কম ছিল না। জানালেন সত্যশিব পাল দেবমহান্ত অর্থাৎ দুলালের উত্তরপুরুষ, এখনকার কর্তা। সুবিনয়ী শিক্ষিত মানুষ সত্যশিববাবু দুলালের প্রশস্তি করতে গিয়ে আমাকে চমকে দিয়ে জানালেন, '১৮৯৩-এ শিকাগোয় রিলিজিয়াস কংগ্রেসে রামদুলাল পাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সে চিঠি আমার কাছে আজও আছে। চিঠির তারিখ ১৭ এপ্রিল ১৮৯৩। কিন্তু তার অনেক আগেই তো দুলালচাঁদ দেহ রেখেছেন। তাই তাঁর নাতি সত্যচরণ দেবমহান্তকে ঐ পদ দেওয়া হয়।'

রয়েল ফকিরের সঙ্গে প্রথম যাওয়ার পর অবশ্য আরো অন্তত দশবার গেছি ঘোষ-পাড়ার মেলায়। শুধুই মনে হয়েছে মেলায় দিনে দিনে যত লোক বাড়ছে ততই

জায়গা কমছে। হঠাৎ কলোনীর পক্ষবিস্তার ? কিন্তু সে কথায় যাবার আগে রয়েল ফকিরের ঘটনাটা শেষ করি। দোলের আগের দিন সকালে ফকির আমাকে নিয়ে বিরাট মেলাচত্বরের নানাদিকে ঘোরালেন আর চেনালেন সবকিছু। 'এই হল হিমসাগর, এখানে কাল চান করবে ভক্তবৃন্দ আর ব্যাধিগ্রস্তরা।' 'ঐ দেখুন ডালিম-তলা। এখানকার মাটি মাখলে আর খেলে সব রোগের মুক্তি।' 'চলুন একটু পুব-দিকে যাই, এখানে অনেক বাউল-ফকির দরবেশ আসেন।' হঠাৎ রয়েল ফকির বলে বলেন, 'এই, এই তো শিবশেখরের আসন। আসুন বাবা, এখানে বসুন।'

শিবশেখর হলেন এক চুল কোঁকড়ানো সুগঠন যুবা। ভক্তিমানের মতো মাথা নিচু করলেন। রয়েল বললে, 'এঁদের এক মস্ত 'মহাশয়' বংশ মুর্শিদাবাদ জেলার কুমীরদহ গ্রামে।' সবাই বসলে আমি বললাম. 'এই 'মহাশয়' ব্যাপারটি কি বলুন তো ?'

শিবশেখর বললেন, 'এখানে ঘোষপাড়ার নিত্যধামে আমাদের মূল 'আসন'। এখানকার যাঁরা প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁদের মধ্যে যারা ভক্তিমান ও অবস্থাপন্ন তাদের বাড়িতে 'আসন' থাকে। তাঁরা দীক্ষা দেন। এঁদের বলে 'মহাশয়'। আর মহাশয়রা যাদের শিষ্য করেন তাদের বলে 'বরাতি'।'

: আপনারা ক'পুরুষের মহাশয় ?

: আমাকে নিয়ে ছয় পুরুষ চলছে। ছ'পুরুষ আগে আমাদের পূর্বপুরুষ নফর বিশ্বাস, ভোলাগ্রামের মহাভারত ঘোষ আর হরিহরপাড়া-মালোপাড়ার তেঁতুল সেখ এই তিনজন ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দীক্ষা নেন। তারিখ ছিল ২৮শে কার্তিক। সেই থেকে ২৮শে কার্তিক আমাদের কুমীরদহ গ্রামে মহোৎসব হয়। আপনি এবারে যাবেন। খুব জাঁক হয়।

: আপনার ছ' পুরুষের নাম বলতে পারেন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। লিখে নিন। আমার নাম শিবশেখর মণ্ডল। আমার বাবা যদুলাল মণ্ডল, তাঁর বাবা ছকড়ি, তাঁর বাবা চাঁদ সিং, তাঁর বাবা ফতে সিং, তাঁর বাবা নফর বিশ্বেস।

জবাব শুনে আমি তো অবাক! বিশ্বাস থেকে মণ্ডল, মাঝখানে আবার সিং! খানিকটা সংকোচ নিয়েই বলি : 'আপনারা কি তবে মাহিষ্য ?'

: আমরা মুসলমান।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। নাম শিবশেখর, পিতা যদুলাল অথচ জাতে মুসলমান! দেখি রয়েল ফকির মিটিমিটি হাসছে। ভাবখানা যেন 'বাবু এই মজা দেখাতেই তো আপনাকে আনা'! 'মানুষের কারবার দেখলি আপনি তাজ্জব হয়ে যাবা!'

শিবশেখর বলে, 'বাবু জন্মে আমরা মুসলমান তবে কর্মে এই সতী মা-র দোর ধরা।'

: মুসলমান ধর্ম পালন কর না ?

: বাড়িতে ঈদগাহ আছে। দুই ঈদ পালন করি। মসজিদে যাই না। বাড়িতে

ছ'পুরুষের পুজো করা আসন আছে। সতী মা য় ঘটে প্রত্যেক শুক্রবার উপাসনা সিন্নিভোগ হয়।

: খাওয়া-দাওয়ার কোনো বিধি আছে নাকি ?

: তেমন আর কি ! শুধু সৎসর নিরামিষ খাই বাড়ির সকলে।

নিরামিষভোজী মুসলমান তার আবার নাম শিবশেখর ! এমন একটা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলানো কঠিন বৈকি। জাতাজাতির সংস্কার এমন বদ্ধমূল এই উচ্চশিক্ষিত মনেও যে অংক মেলে না। আমার বিপন্নতা দেখে রয়েল ফকির শিবশেখরের আখড়ার গায়ককে রহস্যময় হেসে কানে কানে কী একটা গান গাইতে বলে। সে সঙ্গে সঙ্গে একতারা বাজিয়ে গান ধরে :

জাত গেল জাত গেল ব'লে
এ কি আজব কারখানা।
সত্য কথায় কেউ রাজি নয়
সবই দেখি তা না না না ॥

কী আশ্চর্য, রয়েল ফকির কি তবে আমাকে তা না না না-র দলে ফেলে দিল ? ততক্ষণে সেই অজানা গ্রাম্য গায়ক ভ্রুকুটি ক'রে সরাসরি আমাকেই যেন জিজ্ঞেস ক'রে বসে তার গানের অন্তরা-য় :

এই ভবেতে যখন এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে ?
যাবার সময় কি জাত হবে
সে কথা তো কেউ বলে না ॥
ব্রাহ্মণ চাঁড়াল চামার মুচি
এক জলে হয় সবাই শুচি
দেখে কারও হয় না রুচি
শমনে কাউকে খোবে না ॥

এ ভর্ৎসনা কি আমাকেই ? ভাববার আগেই গ্রাম্য গানের দারুণ লজিক আমাকে আঘাত করে এইখানে যে,

গোপনে যদি কেউ বেশ্যার ভাত খায়
তাতে জাতির কি ক্ষতি হয় ?
ফকির লালন বলে জাত কারে কয়
এ ভ্রম তো আমার গেল না ॥

রয়েল বলে উঠল, 'বাবা জাত বলে কিছু নেই। সব কর্তাবাবার সন্তান। তাই লালশশী বলেন : 'ভেদ নাই মানুষে মানুষে / খেদ কেন করো ভাই দেশে দেশে।'

আমি চেয়ে থাকি শিবশেখরের দিকে। তার মুখে লাজুক হাসি। ভাবলাম, খুব শিক্ষা হল যাহোক। সে আমার অবস্থা বুঝে হঠাৎ উঠে হাত দু'টো চেপে ধরে

বললে, 'বাবু মনে কিছু করবেন না। এখানে সতী মা-র থান, শান্তির জায়গা। মনের মধ্যে দুঃখ রাখবেন না। রয়েল, তোমার মনে বড় প্রতিহিংসা।'

রয়েল বলল, 'প্রতিহিংসা নয়। বাবুকে পেরথমেই একটা ঝাপটা মেরে সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ওঁর আর ভ্রম হবে না। তাই না বাবু?'

সঠিক পথ কোথায়, কোনখানে? বছরের পর বছর এই যে আমার ঘোষপাড়ায় আসা তার পিছনে কিসের টান? ঘোষপাড়া জায়গাটাই কি অ-বিতর্কিত? সেই আঠারো শতকে এখানে যে-কর্তাভজা ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা গোড়াতে ছিল আউল-চাঁদের সুফীমত। ওয়ার্ড সাহেব আউলচাঁদের বর্ণনা দিয়েছিলেন এইরকম :

> About a hundred year ago another man rose up, as the leader of a sect, whose cloth, or dress of many colours, which he wore as a Voiragee, was so heavy that two or three people can now scarcely carry it.

বিশাল ভারী এই আলখাল্লাধারী মানুষটি তাঁর সুফীধর্মের ছাঁচে যে সৌধধর্মটির পত্তন করেছিলেন তাতে কালে কালে অনেক প্রতিভার উজ্জ্বলতা মিশেছে। সবশেষে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে উত্থান, বেদবিরোধী মনোভাব আর জাতিবর্ণহীন সমন্বয়বাদ সবই ঢুকে গেছে এ ধর্মে। কিছুটা ইসলামী বিশ্বাস আর কিছুটা খ্রীস্টধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডও জুড়ে গেছে তার মর্মে। সুফীদের ব্যক্তিগত দেবতা যাঁকে তাঁরা বলতেন 'হক' বা সত্য—কর্তাভজারা সেই সত্যকে ভজনা করেন। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল 'কর্তাভজা' শব্দটা বোধ হয় কেউ ব্যঙ্গ ক'রে বানিয়েছিল। কিন্তু ভাবের গীতের একটি পদে দুলালচাঁদের একটি দর্পিত উক্তি থেকে সে ধারণা পালটালো। দুলাল বলেছিলেন :

আমি আপ্ত খোদে মেরে মরদে
কর্তা ভজাবো।
কর্তাভজার কাছে তোদিকে
মূর্খ বানাবো।

বলা বাহুল্য এই 'তোদিকে' বলতে দুলালের লক্ষ্য ব্রাহ্মণ্যবাদ। সেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে খর্ব করতে দুলালের সগর্ব উচ্চারণ :

আছে কর্তাভজা এক মজা
সত্য উপাসনা।
বেদ বিধিতে নাইকো তার ঠিকানা
এ সব চতুরের কারখানা।

কিন্তু চতুর মানুষটি কি শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন?

ঘোষপাড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকবার আমার মনে হয়েছে সর্বধর্মসমন্বয়ের এমন অপরূপ পীঠস্থান কেমন ক'রে সতী মা-র মহিমায় আবিল হয়ে গেল? সে কি দুলালচাঁদের অকালমৃত্যুতে পরবর্তী যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে? ১৮৩৩-এ দুলালচাঁদের প্রয়াণ

ঘটে। সতী মা সম্প্রদায়ের কর্ত্রী হন। তাঁরও দেহাবসান ঘটে ১৮৪০-এ। তারপর গদীতে বসেন দুলালের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৮২-তে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু এবং শরিকদের মধ্যে গদীর লড়াই।

সেই গদীর লড়াই এখনো মেটে নি।

১৮৪৫-তে নবীনচন্দ্র সেন যখন ঘোষপাড়ায় গিয়েছিলেন তখন সতী মা জীবিত নেই, রামদুলালের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রও দেহ রেখেছেন। তাঁদের পরবর্তী দুই বংশধর তখন দুই শরিক হয়ে দুই গদী দখল করেছিলেন। মেলায় তাঁদের দেখে নবীনচন্দ্র লেখেন :

> এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন। দুইটিই মহামূর্খ। তথাপি ইহারা উভয়ই বর্তমান 'কর্তা'…
>
> দেখিয়াছি, মূর্খ কর্তা দুজন দুই 'গদীতে' বসিয়া আছেন এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাঁহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে।

এখন, এই বিশ শতকের শেষ অংশে ঘোষপাড়ার মেলায় গেলে একই দৃশ্য দেখা যাবে। ঠাকুরবাড়ির ভিতরে আর বাইরে হাজার হাজার ভক্ত, পা ফেলার জায়গা নেই। বেশির ভাগ অজ্ঞ মূর্খ গ্রামবাসী। হুগলী নদীয়া মুর্শিদাবাদ বর্ধমানের কৃষিজীবী মানুষ। তাদের মধ্যে বারোআনা স্ত্রীলোক। দুই গদীর বদলে এখন চার গদী। তার মানে চার কর্তা। এঁরা শিক্ষিত তবে প্রণামী নিতে ও পদধূলি দিতে খুবই আগ্রহী। গোমস্তা জাতীয় একজন লোক খেরোর খাতায় মহাশয় আর বরাতিদের খাজনা আদায় করছেন। সামনে আবির মাখানো প্রাক্তন কর্তাদের আলোকচিত্র। একজন গোমস্তাকে আমার সঙ্গী বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'খাজনা আদায় করছেন? কিসের খাজনা?'

আমি তাকে একপাশে সরিয়ে এনে নোটবই খুলে কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' থেকে টোকা একটা অংশ পড়ালাম। তাতে লেখা আছে :

> পালবাবুদের ত্রিবিধ প্রকারে আয় হইয়া থাকে। ১) খাজনা ২) ভোগ ৩) মানসিক। অর্থাৎ উহাদের মতে প্রত্যেকের দেহের মালিক কর্তা, সুতরাং তুমি যে উহাতে বাস করিতেছ তজ্জন্য কর্তাকে তোমাদের খাজনা দিতে হয়।

বন্ধুটি বদমেজাজী। রাগে গজ গজ করতে লাগল।

প্রতিবাদ কোথায়? বছরের পর বছর সতী মার মেলায় একই দৃশ্য দেখে গেছি। হাজার হাজার মানুষ, অশিক্ষিত অসহায় রোগগ্রস্ত, হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। ডালিমতলায় সতী মা-র নামে লালপেড়ে কাপড় শাঁখা লোহা সিঁদুর ছুঁড়ছে, গাছে বাঁধছে ঢিল। ডালিমতলার মাটি মেখে, খেয়ে, হিংসাগর নামে নোংরা একটা ঘুলিয়ে-ওঠা পুকুরের জলে স্নান ক'রে, সেই জল খেয়ে, তারা ভাবছে তাদের রোগ-বালাই সেরে যাবে। বোবা কথা বলবে, খোঁড়া হাঁটবে, বাঁজার ছেলে হবে, অন্ধ পাবে দৃষ্টি। প্রতিবন্ধিতায় ভরা এই দেশে, অজ্ঞতার মোড়া আমাদের গ্রামে ঘুরে

বেড়াচ্ছে গোপনে কত ধর্মব্যবসায়ী দালাল। তারাই এসব অসহায় মানুষদের আনে এখানে ভুজুং ভাজুং দিয়ে। তার ফলে হিমসাগর থেকে ভালিমতলার দীর্ঘ পথ কাদায় কাদা। ভোর থেকে অগণিত অন্ধবিশ্বাসী আর কুসংস্কার ঘেরা পুরুষ আর নারী দণ্ডী খাটছে। চোখে তাদের জল, মুখে তাদের গভীর বিশ্বাসের দ্যুতি, বেসবাস ভিজে, অনাবৃত। আত্মজের রোগ নিরাময়ের আশায়, স্বামীর পক্ষাঘাত সারাতে, সন্তান কামনার অতলান্টানে কত কত লজ্জাশীলা গ্রাম্যবধূ এখানে আত্মজ্ঞান হারিয়ে লজ্জা ভুলে দণ্ডী খাটছে। তাদের স্নানচিক্কণ দেহ সিক্তবসনের বাধা মানছে না। তার ওপর পিছনে যাচ্ছে লম্পট আর লুমপেনের চোখ। সতী মা-র নাম-মাহাত্ম্যে মহিমময় এমন এক জায়গায় মাতৃজাতির এতখানি অবমাননা সওয়া যায় না।

কোথায় প্রতিবাদ ?

হিমসাগরের পাড়ে এসে দাঁড়াই। স্নানের কি উদ্দাম লড়াই। ঐটুকু পুকুর পাঁকে আর কাদায় আবিল হয়ে উঠেছে কয়েক হাজার মানুষের দাপাদাপিতে। ধর্মীয় দালাল কোমর জলে দাঁড়িয়ে বোবা বালককে চুলের ঝুঁটি ধরে জলে চোবাচ্ছে আর গালে মারছে চড়। বলছে, 'বল্, সতীমা বল্!' অক্ষম নির্বাক বালক খাচ্ছে চড়ের পর চড়। তার অনুচ্চার যন্ত্রণার প্রতিরোধ কই ? তার বাঙা চোখের পাড় ভেঙে আসা অশ্রু আর পাড়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা তার অভিশপ্ত গর্ভধারিণীর চোখের জল মিশছে হিমসাগরের ঐশী সলিলে। কে প্রতিবাদ করবে ?

মধ্য দুপুর। রোদ গনগনে। চারিদিকের অগণন আখড়ায় রান্নাবান্না চলছে। চাপ চাপ ধোঁয়া আর সেদ্ধ ভাতের গন্ধ। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও গান হয়েই চলেছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে গুপ্ গুপ্ গুম্ গুম্ আওয়াজ। গানের তালবাদ্য। গুটি গুটি একটা আখড়ার সামনে দাঁড়াই। একজন গ্রামীণ গায়ক গাইছে শব্দগান :

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।

আখড়ার মধ্যে ভালো ক'রে নিরিখ ক'রে দেখা গেল যেন একটা বিস্তৃত তাঁবু। পাটি আর পলিথিন পেতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে। তাঁবুর বাইরে রান্না চলছে। মস্ত বড় একখানা কড়াইতে খিচুড়ি ফুটছে। আখড়ার মধ্যে একটা জলচৌকি আসন। তাতে একখানা সতী মা-র ছবি। তামার ঘটে জল। ফুল পাতা আবির ফাগ মাখানো। আমি বন্ধুকে বললাম : 'একেই বলে আসন। মাঝখানে ঐ যে সাদা আলখাল্লা পরা জটাজুট মানুষ ঘুমোচ্ছেন উনিই হলেন 'মহাশয়'। আর এরা সব 'বয়াতি' বুঝলে ?'

একজন বরাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের মহাশয়ের নাম কি? নিবাস কোথায়?'

: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার নাম শুনেছেন? সেই বেলডাঙ্গার ভেতরে ব্যানাড়া গ্রাম। আমাদের গুরুপাট ওখানেই। আমাদের 'মহাশয়' ত্রৈলোক্য মহান্ত। ঐ যে ঘুমিয়ে আছেন। পাশে আমাদের মা-গোঁসাই। মাটির মানুষ।

বন্ধুকে বললাম: 'ভেতরে ঢুকবে নাকি? এদের ওপর ভর করেই কিন্তু সারা-বছর চলে সতী মা-র সংসার। এরাই মহাশয় আর বরাতি। এরাই দেয় খাজনা আর প্রণামী। নতুন বরাতি এই সব গ্রাম্য মহাশয় রিক্রুট করেন।'

বন্ধু বললেন, 'বুঝেছি এরাই গ্রাসরুট লেভেলের ক্যাডার। আর মহাশয় হলেন ল্যাডার। এদের ডেপুটি কালেক্টারও বলা চলে, কি বল? কিন্তু এরা সব মহা ধাঁধা নয় কি? তোমার নোটবই এঁদের সম্পর্কে কি বলে?'

আপাতত মহান্ত মহাশয় ঘুমোচ্ছেন, তাই তাঁর সামনে বসে সাইড ব্যাগ থেকে নোটবই বার ক'রে বলি, 'এদের সম্পর্কে একটু মতামত আছে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বইতে। ১৮৯৬-তে তিনি লেখেন—**The agents of the Karta are required to pay over their collections to him, at a grand levee held by him at his family residence in the month of March.** তার মানে এই দোলের মেলা। এর পরের অংশটা শোনো—**Each agent of the Karta is generally on very intimate terms with a childless and friendless widow in the village or group of villages entrusted to his charge, and through the instrumentality of this woman he is able to hold secret meetings which are attended by all the female votaries within his jurisdiction and in which he plays the part of Krishna.**'

: এসব তুমি বিশ্বাস কর?

আমি বললাম, 'যোগেন্দ্রনাথের আমলে হয়ত এসব হতো। কে জানে? আমার তো কোনো উল্টোপাল্টা চোখে পড়ে নি কখনো। আসলে গুরুবাদের ব্যাপারটা সবাই ঠিক বোঝেন না। তাছাড়া এখানে তুমি কি দেখছ? শুধুই কি স্ত্রীলোক? কতই তো পুরুষ বরাতি রয়েছে এ আখড়ায়। সবাই বিকৃত হতে পারে? আমি অনেক শুদ্ধ মহাশয় দেখেছি।'

কথার মাঝখানে উঠে বসলেন ত্রৈলোক্য মহান্ত। মাথায় ঝুঁটি, গালে দাড়ি গোঁফ, সিঁথিতে অজস্র আবির। মধ্যবয়সী অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। ভক্তিমান সেবাপরায়ণ। প্রথমেই আমাদের পরিচয় নিয়ে মিষ্টিজল খাওয়ালেন। বোধহয় আমাদের কথা কিছু কানে গিয়েছিল। তাই তাইই রেশ ধরে বলে উঠলেন, 'গুরু আর শিষ্যের সম্পর্ক আসলে পুরুষ আর নারীর মতো। সেইজন্য বলেছে—

প্রকৃতি স্বভাব না নিলে হবে না গুরুভজন।
আগে স্বভাবকে করো প্রকৃতি
গুরুকে পতি স্বীকৃতি।
তবে হবে আসল করণ॥

এ কথার মানে হল নিজের অহং ত্যাগ ক'রে গুরুর পায়ে সব ছেড়ে দিতে হবে। কাজটা কঠিন।'

মহান্ত কথা বলে চলেছেন অনর্গল আর আমি অবাক হয়ে দেখে চলেছি আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত সেবাধর্ম। একজন শিষ্যা প্রথমে পরম মমতায় মহান্তর কপালে জল চাপড়ে ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। তারপরে একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে তেল মাখিয়ে ঝুঁটি বেঁধে দেয়। তার মুখে সে কি আকুতি আর স্নেহের তাপ। যেন মা জননী। তারপরে গুরুর দারা মুখের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছিয়ে পাশে বসে পাখার বাতাস করতে লাগল আর তাঁর প্রত্যেকটা কথা যেন গিলতে লাগল গভীর আগ্রহে। এমন দৃশ্য খুব বেশি তো দেখি নি জীবনে। আমার শিক্ষিত মগজ গুজবে উৎসুক, পর্নোগ্রাফিতে পোক্ত, খবরের কাগজে আইন-আদালতের পাতা-পড়া শহুরে বিকৃত মন। এমন অমলিন সম্পর্ক দেখলে অস্বস্তি হয় কোথায় একটা। দুই আর দুইয়ে অঙ্ক মেলে না।

ফস্ ক'রে বলে বসলাম : 'আমাদের মন চট ক'রে সব জিনিসে খারাপ দেখে কেন বলুন তো? একেই কি পাপী মন বলে?'

সর্বজ্ঞের মতো হেসে মহান্ত বললেন, 'তাহলে একটা গান শুনুন—

পাপ না থাকলে পুণ্যির কি মান্ত হ'ত?
যমের অধিকার উঠে যেত।
যদি দৈত্য দুশমন না থাকত
কামক্রোধ না হ'ত
মারামারি খুনখারাপি জঞ্জাল ঘুচিত।
সবাই যদি সাধু হ'ত
তবে কৌজদারি উঠে যেত॥'

গান থামিয়ে মহান্ত ক্ষণিক আমাদের দিকে চেয়ে নেন। দে কি আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে? কি জানি? তারপরে হঠাৎ একটা গিটকিরি মেরে গেয়ে ওঠেন :

দোষগুণ দুইয়েতে এক রয়
কর্মক্ষেত্রে পৃথক হয়
পৃথক পৃথক না থাকিলে
দোষগুণ কেবা কয়।
যদি অমাবস্যা না থাকিত
পূর্ণিমা কে বলিত?

গ্রাম্য গানের এই বিন্যাস এই স্তরের ক্রম আমার বরাবর খুব ভালো লাগে। যেন বক্তব্যের ব্যাখ্যার মতো গান এগিয়ে চলে। মনের মধ্যেই পাপ-পুণ্য, কাম-প্রেম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি। কর্মক্ষেত্রে কেবল তারা পৃথক। এ পর্যন্ত বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মহান্তর চোখের ইঙ্গিতে তাঁর পাশের সেই সেবা-তৎপর শিষ্যাটি এবার অতি মধুর তারসপ্তকে গেয়ে উঠল :

গুরু মূল গাছের গোড়া
আছে ত্রিজগৎ জোড়া
কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম
কোথাও নেই ছাড়া।
লঘু যদি না থাকিত
গুরু কে বা বলিত ?

গানের এই অংশ যতক্ষণ হল ততক্ষণ গুরু ত্রৈলোক্য মুদিতচোখ। হঠাৎ চোখ খুললেন। সে চোখভরা এক বিশ্ব জল। বললেন, 'কড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবাজী। তার জবাবে গৌর গোঁসাইয়ের এত অকাট্য গানখানা অন্তর থেকে উঠে এল।'

: অকাট্য গান ?

: হ্যাঁ, গান কাটান দেওয়া যায় না। তার মানে এ গানের মধ্যে যে-তত্ত্ব যে-সত্য তা চিরকালের মতো নির্ণয় হয়ে গেছে। মহতের লেখা পদ। এ তো বানানো গান নয়।

আমার বন্ধুর বস্তুবাদী মনেও খানিকটা অভিভব জেগেছিল বুঝি। সে তাই বলে বসল, 'সকাল থেকে অনেক মিথ্যা আর বুজরুকি দেখে দেখে মনটা খুব দমে গিয়েছিল। আপনার এখানে এসে মনটা শান্ত হল। আচ্ছা বলুন তো, এসব হিমসাগর ডালিমতলার ব্যাপারগুলোর মধ্যে কোনো সত্য আছে ?'

মহান্ত মৃদু হেসে বললেন : 'সত্য না থাকলে আপনারা এই ভরদুপুরে এখানে এলেন কেন ? ব্যাধি না থাকলে কি কেউ বৈদ্য ডাকে ? তবে সবচেয়ে বড় শক্তি হল নামের শক্তি। সেইজন্যে লালশশী বলে গেছেন :

চতুর্বর্গ ফলের অধিক ফলে
যদি থাকে বাসনা
নাম রস পানেতে মত্ত
হও রে রসনা।

তার মানে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষেরও ওপরে হল নামের শক্তি। তবে নাম জপলেই কি শুধু হয় ? ব্যাকুলতা চাই। তার ওপরে আবার অধিকারী ভেদ আছে। আমাদের মতে বলে 'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হয় কর্তাভজা'। মানে বুঝলেন ?'

: না, প্রহেলিকার মতো লাগল।

: কিছুই প্রহেলিকা নয়। বৈদিক পথ ছাড়তে হবে। বৈদিক পথ বলতে বোঝায় ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। এর কোনোটাতেই ঈশ্বর মিলবে না। সবকিছুর মধ্যে থাকতে হবে নির্বিকার হয়ে, যেন মেয়ে হয়েও হিজড়ে, পুরুষ হয়েও খোজার মতো। এই অবস্থা এলে তবে মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হবে। সেইজন্যে ভাবের গীতে বলেছে :

মায়ের যোগ্য হলে মায়ের কৃপা হয়।
মা বলা বোল সত্য হলে সকলি মা-ময়॥

সেই জন্যে আমরা সব জায়গায় সতী মা-কে দেখতে পাই। ডালিমতলাতেও তিনি হিমসাগরেও তিনি। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তবে কর্মভেদে কেউ তাঁকে দেখে কেউ দেখতে পায় না।

আমি দেখলাম মহান্তর আলোচনা ক্রমেই ভাববাদী হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বরাতিরা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে তাঁর কাছেপিঠে। তাদের চোখে মুগ্ধতা আর সমর্পণ। এ অবস্থা চলতে দিলে বিপদ। এসব ক্ষেত্রে আমি ঝপ ক'রে একটা উল্‌টো কথার টান মারি। এবারেও তাই সবাইকে সচকিত করে ব'লে বসলাম, 'আচ্ছা অনেকে যে বলে খাদ্যের সঙ্গে শরীরের যোগ আছে তা মানেন? কুমীরদহ গাঁয়ের শিবশেখর বললেন তিনি নিরিমিষ খান। আপনিও তাই! মাছ মাংস খান না?'

মহান্তর ভাবের ঝিম এই এক প্রশ্নেই কেটে গেল। মানুষটি পড়ে গিয়েছিলেন কথার কুম্ভীপাকে। সেখান থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'আঁশ নিরিমিষ বলে কিছু নেই। সবই তাঁর সৃজন। তবে শরীরের মধ্যে খাদ্যের ক্রিয়া আছে বৈকি। তার কাজ তাপ বাড়ানো। তাই সাধক মানুষ তাপ এড়াতে চান। শুধু তো ত্রিতাপ নয়। দেহের তাপও বিঘ্ন ঘটায় জপে তপে। আমি নিরিমিষ আমিষ বাছি না। তবে মাছ খাই কিন্তু মাংস খাই না।'

: কেন? কোনো কারণ আছে! নাকি রুচি হয় না?

: সাধক কখনো কারণ ছাড়া কাজ করে? সে তো অনেক বুঝে, অনেক নেড়ে-চেড়ে, অনেক দেখে শুনে, তবে খাঁটি পথে দাঁড়ায়। মাছ খাই কেন জানো? মাছের মধ্যে কাম নেই। কামে তাদের জন্ম নয়।

দুই বন্ধু কান খাড়া করি। লৌকিক মানুষ অদ্ভুত কতকগুলো লক্ষিকে চলে। তার খানিক মন গড়া, খানিক গুরুর বানানো। মাছের মধ্যে কাম নেই কামে তাদের জন্ম নয়, কথাটার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বেশ। তাই বলি, 'মাছের কাম নেই? তাহলে সৃষ্টি হয় কেমন ক'রে?'

মহান্ত বললেন, 'মাছের যোনি লিঙ্গ নেই। ঘর্ষণে তাদের সৃষ্টির বীজ। যাকে বলে রতি। রতি বা তাপ থেকে ডিমের সৃষ্টি। তাই মাছ খেলে মানুষের কাম প্রবৃত্তি আসে না। কি বলো গো তোমরা?'

সবাই ভাবিক চোখে মাথা নাড়ে। একজন শিষ্য বলে, 'আমরা আর কি বলব?

সৈ সেরামের মুরুব্বি মানুষ। কি জানি বল? তাই তোমারে গুরু মেনেছি।' তুমি যা বলাও তাই বলি। তুমি যা জানাও তাই জানি। তুমি ছাড়া আমাদের তিলার্ধ চলে না।'

মহান্ত বললেন, 'মাছ হল সবচেয়ে সাত্ত্বিক প্রাণী। তার মধ্যে সাধক লক্ষণ। দেখেছেন মাছের চোখে পলক নেই, চোখ স্থির? তার মানে সবাই ধ্যানস্থ। আমি তো তাই কাঁদি সতী মা কেন পলক দিলে? কেন মীনের মতো নয়ন দিলে না? তাহলে অপলক তোমার লীলা দেখতাম।'

কাণ্ড দেখে আমি তো থ। সেবিকা শিষ্যা আঁচল দিয়ে গুরুর চোখ মোছায়, জোরে জোরে পাখার বাতাস করে। মা-গোঁসাই ভেতর থেকে বলে ওঠেন, 'মানুষটার মনে বড় তাপ।'

বন্ধু আমার কানে কানে বলে, 'হেড অফিসে বহৎ গড়বড়। চালিয়ে যা। অনেক নতুন মাল বেরোবে।'

মহান্তর ক্রন্দনপর্ব খানিক ধাতস্থ হলে জিজ্ঞেস করলাম: 'মাংস খেলে কি কাম বৃদ্ধি হয়?'

: শুধু কাম নয়, সব প্রবৃত্তিই বাড়ে। তাস থেকে হিংসা। আবার বিবেচনা নষ্ট হয়। কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

: তাই নাকি? কেন?

: কি বোঝাই আপনাকে বলুন তো দেখি? আপনি শিক্ষিত মানুষ। কোন্ মাংস খাবেন? পাঁঠা? তাদের সঙ্গম দেখেছেন? মা মাসী জ্ঞান আছে তাদের? সে মাংস খেলে মানুষের কি দশা হয় বোঝেন না?

বাপরে কথার কি ঝাপট। বাক্যের কি শক্তি। সংকোচে কারুর দিকে তাকাতে পারি না। লজ্জা এড়াতে বলি, এত সূক্ষ্ম চিন্তা তো করি নি কখনো। তাই আপনাকে নেড়ে বসেছি। মাপ করবেন।'

ততক্ষণে মানুষটা শান্ত, জল। প্রসন্ন হেসে বললেন, 'জানতে চাওয়া ভুল কোথায়? তবে সব জানার জবাব নেই। কেন না সব কিছুর নামভেদ আছে রূপভেদ আছে। রকম আলাদা স্বাদ আলাদা। যেমন ডাব আর নারকেল, যেমন মুড়ির চাল আর ভাতের চাল। যেমন বেণু মুরলী বংশী বাঁশী···'

মহান্তর কথা থামিয়ে বলে বসি, 'কি বললেন? বেণু মুরলী বংশী বাঁশী কি এক নয়? তফাত কীসে?'

: অনেক তফাত। বেণুর পাঁচ ছিদ্র। মুরলীর তিন ছিদ্র। বাঁশী সাত ছিদ্র। বংশী নয় ছিদ্র। তফাত নেই? আকারে তফাৎ প্রকারে তফাত। বুঝলেন না?

বুঝলাম বৈকি মনে মনে। খুব ছিদ্রান্বেষী নই অবশ্য। তবু মহান্তর কথায় কি একটা ধন্দ আছে। সবটাই তার বানানো না বাগ্‌বিভূতি! এই কথার পাকেই লোকটা শিষ্য বানায় নাকি? তবে এলেম আছে। লোকটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া

শক্ত। কিন্তু ততক্ষণে মহান্ত এক রাউণ্ড জিতে আমাকে আবার পেড়ে ফেলে বলেন, 'আধারে ছিদ্র না থাকলে আসা-যাওয়া হবে কোথা দিয়ে? মানুষের দেহে ক'টা ছিদ্র বলুন তো?'

আঃ, খুব কমন কোশ্চেন পেয়ে গেছি এবারে। মৌজ ক'রে বলি, 'মানুষের শরীরে নটা ছিদ্র। যাকে বলে নবদ্বার। দুই চোখ দুই নাক দুই কান আর মুখ পায়ু উপস্থ। ঠিক বলেছি?'

: পুরুষের ক্ষেত্রে ঠিক। নারীর তাছাড়া আছে যোনি। তাকে বলে দশমী দ্বার।

এত সোজা কোশ্চেনেও পুরো নম্বর না পেয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকলাম। তখন মহান্ত বললেন, 'মানুষের সাধন যখন হয় তখন একেক অবস্থার একেক নাম। এই যে বাঁশী বংশী মুরলী আর বেণু, এসব সাধকের এক এক অবস্থাকে বলে। শুনবেন?'

: নিশ্চয়ই। এমন সব কথা কখনো শুনি নি।

: শুনবেন কি ক'রে? ঘরে বসে তো শোনা যায় না। বেরিয়ে পড়তে হয়। মেলা মচ্ছবে মিশতে হয়, মিলতে হয় মানুষের সঙ্গে। মানুষের কাছেই সব জিনিস বাবাজী। মানুষের বাইরে কোনো প্রাপ্তি বস্তু নেই। তাই বলেছে:

চারযুগেতে মানুষ আছে।
সেই মানুষ মানুষের কাছে বহুরূপ ধারণ করেছে
মানুষেরই কারণ।
আবার তার ওপরে মানুষ আছে
মানুষ প্রাপ্তিবস্তুধন।
করো সেই মানুষের অন্বেষণ।

খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে আমি বলি, 'বেণু মুরলী বংশী বাঁশী সম্পর্কে কি যেন বলবেন?'

'হ্যাঁ বলব। সেইটাই সবচেয়ে নিগূঢ় কথা।' ত্রৈলোক্য মহান্ত গলাটা খুব খাদে এনে সোজা চাইলেন আমার দিকে অন্তর্ভেদী চোখে। তারপর বললেন, 'মানুষের চেতনা যখন থাকে নিদ্রিত তখন তিন ছিদ্রে বাঁশী বাজে, তাকে বলে মুরলী অবস্থা। তিনছিদ্র হল সত্ত্ব রজ তম। এর পরে সত্তার ঘটে উত্থান। তাকে বলে বেণু। তার পাঁচ ছিদ্র। মন, দুই নাসিকা আর দুই চোখ – এই পাঁচ। এর পরে বাঁশী অবস্থা যখন মানুষ সচৈতন্য হয়। তখন সাত ছিদ্রে বাজে। তার মানে বেণুর পাঁচ ছিদ্রের সঙ্গে তখন যোগ হয়, দুই কর্ম অর্থাৎ মনকর্ম আর কায়কর্ম। ব্যাস্ সবসুদ্ধ সাত। মানুষের চতুর্থ অবস্থার নাম বংশী। তখন নয় ছিদ্র। অর্থাৎ বাঁশীর সাতের সঙ্গে তখন যোগ হয় পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ। এই হল সাধকের চরম অবস্থা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মহান্তর বাক্যের বিন্যাসে। খানিক পরে কথার ঘোর কাটলে জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনাদের ধর্ম স্বকীয়া না পরকীয়া?'

: স্বকীয়া আর পরকীয়া বলতে কি বোঝেন? নিজের স্ত্রী আর সাধনসঙ্গিনী?

: হ্যাঁ। তাই তো শুনি।

: সবটাই ভুল। আমাদের আইন পুস্তকে বলে :

সতীনারী ব্যভিচারী দুয়ের কর্ম নয়।
সহজ দেশে করণ করা দেশ আলাদা হয়॥

তার মানে নিজের স্ত্রী বা অন্যের নারী কেউই নয়। স্বকীয়া কথার মানে একেবারে আলাদা। আমরা মনে করি, দেহের মধ্যেই নারীপুরুষ—তাই রমণকে বলে স্বকীয়া। তার বাইরে সব সঙ্গমই পরকীয়া। কর্তাভজা ধর্মে এই স্বকীয়া সাধনা। এবারে বলুন এ ধর্মে কি কাম থাকতে পারে? আমাদের মত আলাদা।

আমি ঘম্ মেরে কিছুক্ষণ বসে থেকে মহান্তকে বললাম, 'কিছুই তো বুঝলাম না। এ যে কেবলই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ছি। সব কিছু জানতে চাই ঠিকই, কিন্তু আমার কি অত সামর্থ্য আছে? আপনি কি বলেন?'

মহান্ত বললেন, 'মানুষের সামর্থ্যের কি সীমা আছে? তবে গুরুর কৃপা লাগে। যাই হোক, দুঃখ করবেন না। আপনাকে একটা আস্তানায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে একজন ফকির আছেন। সতী মা-র মেলায় তিনি বরাবর আসেন। বেনোয়ারি ফকির। আমাদের ঘরের মহাশয় নন। তবে আসেন প্রতিবার।'

: মহাশয় নন তবু আসেন কেন?

: এটা একটা সিদ্ধপীঠ তো? তাই অনেকে আসেন। মেলামেশা হয়। ভাবের লেনদেন হয়। চেনাজানা হয় পাঁচজনে। চলুন দেখি যদি পেয়ে যাই।

অনেক ঘুরেও বেনোয়ারি ফকিরের দেখা মিলল না। তবে একজন জানালো ফকির অসুস্থ, তাই আসেন নি এবার। আমি বললাম : 'অসুখ? ফকিরের অসুখ হয় না শুনেছি যে?'

লোকটা নির্বিকারভাবে বলে : আজ্ঞে, গা থাকলেই ঘা হবে।

কি চমৎকার এইসব লৌকিক বুলি। 'গা থাকলেই ঘা হয়'। হঠাৎ মনে পড়ল রয়েল ফকিরের কথা। সেই তো বলেছিল মেলা মচ্ছবে গেলে অনেক মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা হয়। সেই তো প্রথম হাতে ধরে অনেকগুলো মেলা ঘুরিয়েছিল। মানুষটা আজ মাটির তলায় ঘুমোচ্ছে বটে, তার কথাগুলো কিন্তু জেগে আছে। তার কাছ থেকে ঘোষপাড়ার যেসব ফকির ও মহাশয়দের পরিচয় পেয়েছিলাম তা জীবনের অক্ষয় সম্পদ। আজ সেবারের মতো ঘোষপাড়ার মেলা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আউলচাঁদ রামশরণ রামদুলাল সতী মা সবাইয়ের কথা মনে পড়ল। একদল ক্লিষ্ট অবমানিত মানুষকে তাঁরা শাস্ত্রবর্ণ-কলংকিত ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন উদার মানুষভজনের অসীম সম্ভাবনায়। তাঁদের উত্তরপুরুষরা যদি সে ধর্মে এনে থাকেন লোভের কলংক, দ্বেষের কালিমা আর শোষণের নিষ্ঠুরতা তাও তো মূলধর্মের মহিমা অমলিন থেকে যায়। থেকে যায় তার শুদ্ধ বিধান আর ভাবের গীত। গ্রাম থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত

জনপদে কর্তাভজা ধর্মের বিশ্বাসী মানুষগুলির আকুতি আর উৎসর্জন তো সত্যি। নিজের চোখে দেখেছি এই আবেগের টানে এমন কি বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে আসে কত মহাশয় আর বরাতি। আজও।

সারাদিনের সমস্ত ক্রিয়াকরণ সমাপনের পর মেলা তখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। আখড়াগুলোয় আলো হ'চ্ছে সীমিত বাতি। ক্লান্ত দণ্ডী খাটা মানুষগুলো অপরিসীম শ্রমের শেষে নিঃশেষে যেন ঘুমিয়েপড়েছে। প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাগুলি মুখ গুঁজেছে মা-বাবার সন্তপ্ত বুকে। শুধু এক একটা সমাবেশে একটানা চলেছে ভাবের গান। সে গানে আত্মধিক্কারের আর অনুতাপের সুর :

অপরাধ মার্জনা কর প্রভু।
এমন মতিভ্রম জন্মজন্মান্তরে তোমার সংসারে
হয় না যেন কভু…

গভীর নির্জন পথ নয়, অসংখ্য সহস্র মানুষের উদ্বেল উপস্থিতিতে ভরা, কত সংশয় ভরসা আর বিশ্বাস, কত সুগভীর আশাবেরা আত্মনিবেদন এ মেলায় দু'শো বছর আগড়ে পড়েছে। উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই উদ্দীপ্ত প্রান্তর আর চঞ্চল জনস্রোত দেখে লালশশীর মতো আমারো মনে হয় 'রাস্তার ওপর বাসাঘর নাগর দোলনা'। মনে হল, লালশশী বাউলদের মতো মনের মানুষ খুঁজে সারাজীবনের কান্না গেঁথে রাখেন নি তাঁর গানে। মনের মানুষ ছিল তাঁর ভেতরেই। শুধু মনে হয়েছিল তাঁর, 'কাজ কি সেই মনের মানুষ বাইরে বার ক'রে?'

২

'কেন ক'াদ দিলি রে মন, বাধার পুতুরে?'

কলকাতার নামকরা খবর কাগজে খবরগুলো বেরোয় না কিন্তু মফঃস্বলের চার পাতার ছোট কাগজে মাঝে মাঝে হেডলাইন হয় : বাউল নিগ্রহ। আমি এমনতর অনেক খবর কেটে ক্লিপিং ক'রে রাখি। খবরের ধরনটা প্রায় একরকম। অর্থাৎ নদীয়া বা মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে এক বা একদল বাউল কিংবা মারফতী ফকিরের মাথার ঝুঁটি চুল দাড়ি কেটে, একতারা ভে'ঙে দিয়ে, মারধোর করেছে কট্টর মুসলমান মোল্লা আর আলেমরা। কাগজের খবরটা ঐখানেই শেষ হয়। জানতে মন নিশ-পিশ করে যে তারপর কি হল? ভ্রাতা বাউল-ফকিররা কি এ নিগ্রহ বারেবারে মেনে নেয়, না প্রতিরোধ গড়ে? প্রশাসন কি করে? গ্রামের রাজনীতিকরা এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে? জানা যায় না।

কিন্তু আমার নিজস্ব সূত্রে কেবলই খবর আসে বেনোয়ারি নামে একজন ফকির সদাসর্বদা এমন ঘটনা ঘটলেই বাউলদের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মোল্লাদের সঙ্গে

ধর্মের 'বাহাছ' অর্থাৎ বিতর্কে নামেন। প্রায় সব জায়গাতেই শেষপর্যন্ত বেনোয়ারির জিৎ হয়। অনেকবার ভেবেছি যাবো বেনোয়ারির কাছে। হালহদিশ পাই নি তেমন কোনো। মানুষটা কি তবে অরণ্যদেবের মতো নেপথ্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন—এমন পরিহাসভরা চিন্তা ক'রে নিজেই হেসেছি। শেষমেষ এবারের সতী মা-র মেলায় ত্রৈলোক্য মহান্ত মানুষটির ঠিকানা দেন। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বর্ডারে সর্বাঙ্গপুরের কাছে মাঠপুকুর গ্রামে বেনোয়ারি ফকিরের স্থায়ী সাকিন। মানুষটার সম্পর্কে কিছু খবর বাতাসে ওড়ে শিমুল তুলোর মতো। ফকিরের কোঁচা আর হাদিশ নাকি কণ্ঠস্থ। মানুষটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাকি স্টেনগান ধরত। দিগন্তের সমস্ত বাউল-ফকির নাকি বেনোয়ারির গোলাম।

কি দরকার এসব গুজবে ভর ক'রে? মানুষ তো? একদিন দেখে আসলেই হবে। হাড়িরামের একটা গান মনে আসে, 'মানুষ মানুষ সবাই বলে / কে করে তার অন্বেষণ?' তা মানুষের অন্বেষণে আমার তো অন্তত কোনো ক্লান্তি নেই। একদিন চালচিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। মাঠপুকুর খুব একটা তেপান্তর নয়, তবে আমার ডেরা থেকে সেখানে যাবার রাস্তাটা খুব ঘুরপাকের। তবু শেষপর্যন্ত পৌঁছে যাই। বেলা বারোটায়। আগে একটা আন্দাজী পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলাম অবশ্য। ডাকবিভাগের প্রসিদ্ধ তৎপরতায় ফকির তা পান নি। তাতে ক্ষতি নেই। বিশাল লম্বা একবগ্গা চেহারায় শক্ত কাঠামোর মানুষটার মধ্যে একজন নরম লোক বাস করে। হৈ হৈ ক'রে সম্বর্ধনা করলেন: 'আরে আসুন আসুন। চিঠি পাইনি তো কি হয়েছে? আপনার মনের চিঠি এই তো পেলাম, তাতে খোদার খোদ সিলমোহর। ব্যাস্ তাহলেই হল। উঠুন দাওয়ায়। বসুন গরীবের এবাদত-খানায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার নাম শুনেছি বৈকি! শুধু চেহারাটা মেলানো বই তো নয়। চেহারায় তো মানুষের আদলই দেখছি। হাঃ হাঃ। গরীবের কুঁড়েয় দু'টো সেবা হবে তো? ওহে সহিতন বিবি, এ বাবুর জন্যে দু'টো চাল লাও।'

নজর ক'রে দেখি উঠোনে একজন অল্পবয়সী মুসলমান বউ গাঢ় বেগুনফুলি শাড়ি পরে উনুন ধরাচ্ছে কাঠকুটো নারকেল পাতা দিয়ে। বিরাট এক মালি উনুন। তাতে একটা শানকি চাপা দেওয়া থাকে সাধারণত। হঠাৎ অতিথ-পথিক এসে পড়লে চট ক'রে দু'টো রেঁধে দেওয়া যায়। আপাতত জ্যৈষ্ঠের খরতাপে সহিতন বিবির গৌরী তনু ঘামে সারা। ভাবলাম, তার দিকে চেয়ে, বেনোয়ারি ফকির বেশ কম-বয়সী বিবি যোগাড় করেছে! হঠাৎ বেনোয়ারি ঘর থেকে এক মস্ত খেজুরপাতার পাটি এনে দাওয়ায় পাতলেন। দু'টো হাতপাখা যোগাড় হল। সহিতন বিবিকে বেশ হেঁকে তিনি এক প্রস্থ চা আর 'মামলেটে'র হুকুম দিয়ে যেন অন্তর্ধামীর মতো আমার মন পড়ে নিয়ে বললেন, 'যা ভাবছেন তা নয়। সহিতন বিবি আমার মাইনে করা কাজের লোক। একা মানুষ তো আমি। বয়সও হয়েছে। দু'টো দানা-পানি ফুটিয়ে দেয় আর আমার ঐ ঘরের দাওয়ায় পড়ে থাকে একটা বাচ্চা নিয়ে।

বয়ে তালাক দিয়েছে। আশ্চর্য হবেন না। গ্রামদেশের গরীব মুসলমান ঘরে তালাক-খাওয়া মেয়ে দু'টো-একটা সর্বদা মজুত থাকেই।'

কথাটা খুব নির্বিকারভাবে বললেও বেনোয়ারির গলার স্বরে একটা মর্মজ্বালা, একটা গাঢ় বেদনা যেন মেদুর হয়ে ওঠে। আমি অবস্থাটা সামলাতে বলে বসি, 'একেবারে একা থাকেন। সময়কালে বিয়ের বসেন নি কেন? তখন থেকে ফকিরির নেশা?'

'আরে না না', মানুষটা খুব দেলখোলসা ভঙ্গিতে জোরে হেসে বলেন, 'ফকিরি নিই অনেক পরে। আসলে কি জানেন? বাড়ির গাছে কুমড়ো কি লাউ প্রথম যেটা ফলে সেটা হয় ঠাকুর সেবায় লাগে, নয়তো বীজ করে। তো আমি হলাম পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ ছেলে, তাঁরা আমাকে বিয়ে সাদি না দিয়ে বীজ ক'রে গেছেন। হাঃ হাঃ। কারুর ভোগে লাগলাম না। কি বলেন?'

মানুষটা তো ভারি চকচকে। সঙ্গে সঙ্গে বেনোয়ারি ফকিরকে ভালোবেসে ফেললাম। বললাম, 'বীজই তো আসল। তবে সে বীজ কোথায় পড়ছে সেটাই মূল কথা, মাটিতে না পাথারে। মনে হয় আপনার বীজে অরণ্য হয়ে যাবে। ঠিক নয়?'

'বিলকুল ঠিক', দাড়িতে আঙুলের চিরুনি চালিয়ে ফকির বললেন, 'হাঁ।, শিষ্য-শাবক চাড্ডি আছে বটে আমার। এখনই সব আসবে। জলিল, মানউল্লা, আবু বক্কর, অমরেশ, উমিদ। ঐ দেখুন বলতে বলতে আবু বক্কর হাজির। যাক আপনার কপাল ভালো। বক্কর ভালো গায়ক। আজ ক'টা গান শুনতে পাবেন।'

শাদা ধুতি লুঙ্গি ক'রে পরা, শাদা আদ্দির পাঞ্জাবি, একটা শাদা ঘেরাটোপে মোড়া দোতারা। আবু বক্করের শুভ্র মূর্তি দাওয়ায় উঠে নতজানু হল বাবু-হয়ে-বসা বেনোয়ারির সামনে। বক্কর তার মুখখানি একেবারে ডুবিয়ে দিল গুরুর কোলে। গুরু তার ঝুঁটি বাঁধা চুলে বিলি কাটলেন, পিঠে দিলেন হাতের উষ্ণতা। প্রণাম-পর্ব শেষ হ'ল গুরুর পায়ের দু'টো বুড়ো আঙুলে যখন শিষ্য চুম্বন করল।

প্রণামের পদ্ধতিটা ভারী নতুন ধরনের। জিজ্ঞেস করলাম, 'একেই কি আপনারা বলেন 'সেজদা'?'

বেনোয়ারি বললেন, 'সেজদা বা অভিবাদন নিয়ে তর্ক আছে। আমাদের মুসলমান আলেমগণ বলেন একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কাউকে সেজদা হারাম। তাঁরা বলেন, তবে কেন ফকিররা মানুষ হয়ে মনুষকে সেজদা করে? এ ব্যাপারে আমাদের জবাব সাফসুফ। সেজদা করি মানুষে খোদা আছে বলে। এ জবাবে ওরা খুশি হয় না। আমাদের সঙ্গে এই নিয়ে বেধে যায় মাঝে মাঝে। না না দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়। শুধু বাহাছ অর্থাৎ তর্ক।'

আমি বললাম, 'একটা গানে শুনেছিলাম – যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।'

: গান আপনি এখন চোপর দিন শুনবেন কত। আবু বক্কর এসে গেছে। ও হল গানের পাখি। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, পাখি কোথায় গেল বল তো বক্কর ?

বক্কর বলল, 'পাখি ? আবার উড়েছে ? দেখি কমন্‌দিকে গেল, নড়া ধরে ধরে আনি।'

আমি বললাম, 'একি ? আপনি ফকির মানুষ পাখি পুষেছেন ? সে তো বন্ধন ?' বেনোয়ারি আপন মনে হাসেন আর দাড়িতে আঙুল বোলান। হঠাৎ বাড়ির কানাচ থেকে আবু বক্করের গানের টুকরো ভেসে এল :

আমি একটা পাখি ধরেছি।
খুউই করে ঝটর পটর
পোষ মানাবো দিয়ে মটর
শিকলি দিয়ে আটকে রাখার
ফন্দী করেছি।
ধরেছি ধরেছি পাখি ধরেছি॥

কী কাণ্ড ! সত্যিই আবু বক্করের হাতে-ধরা এক কিশোরীর বিনুনি। সবুজ শাড়ি জড়ানো তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে আর আবু বক্করকে ঘুষি মারছে। তার ফরসা মুখখানা রাগে গনগনে। মাথা নীচু ক'রে জেদী ভঙ্গিতে মেয়েটা দাওয়ার সামনে দাঁড়ালো। বক্কর বলল, 'ছাঁচতলায় বসে লুকিয়ে আচার খাচ্ছিল। এই দেখুন আমার আলখাল্লায় আচার মাখিয়েছে, খামচে দিয়েছে. ঘুঁষি মেরেছে। এর প্রতিকার নেই ? আমি বিচার চাই।'

'বিচার স্যাঁচকলা', মেয়েটা বুড়ো আঙুল দেখালো জিভ ভেঙিয়ে।

বেনোয়ারি বললেন, 'বিচার হয়ে গেছে। সে ছাঁড়া আজ তোকে নিতে এলে যেতে দেব না। ব্যাস্ ' মেয়েটি পা দাপাতে দাপাতে মল বাজিয়ে সারা উঠোনে ঘুরে ঘুরে একসা। বেনোয়ারি বললেন. 'আমিও বিয়ে সাদি করি নি আর বক্করও না, স্বাধো একবার ঐহিকের মায়া। হ্যাঁরে, ইয়াকুব তোকে ভালোবাসে ?' মেয়েটি পালালো।

সংসারবিরাগী ফকিরের বাড়ি এমন মধুর জীবনের ছবি দেখে খানিকটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফকির সে অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে বললেন, 'ভাইপোর মা-মরা মেয়ে। নাম পাখি। ওকে এনে পুষেছিলাম পাঁচবছর বয়সে। টিয়ে পাখির মতো ঘুরত ফিরত, দানাপানি খেত। ঠুকরিয়েও দিত খুব। তারপরে সবে পোষ মানছে এমন সময় আমারই এক শিষ্যের জ্যাঠা পাখিকে পছন্দ ক'রে তার ছেলে ইয়াকুবের সঙ্গে সাদী দিয়েছে। ব্যাস্। ভাবলাম মায়া কাটলো। কোথায় কি ? রোজ পালিয়ে আসে। পাখি তো পাখিই।'

ইতিমধ্যে চা ডিমভাজা এল। পাখিই এনেছে। যেন কত মস্ত শাস্ত এখন। লাজুকলতা। খাবার নামিয়ে দিয়েই দৌড়।

খাওয়াদাওয়া চুকলে আমি বললাম, 'তখন যে সেজদার কথা বলছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রে এ বিষয়ে কি বলে?'

: দেখুন অত শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে কি সব কিছু হয়? আমরা তো শাস্ত্রছুট। আমরা ফকির। আমরা বলি 'খদ', মানে ব্যক্তি বা মানুষ। সেই মানুষ না ধরিলে / খোদা কভু না মিলে। আবু, তোমার সেথ আর্জান শাহ ফকিরের গানটায় কি বলে যেন?

খদ আর খোদা উভয়ে একজন।
খদকে ধরে করো ভজন॥

: একেবারে হক্ কথা। তা খদকে যদি মানি তবে তার মধ্যে খোদাকেও মানি। নয় কি? তাহলে খোদাকে যদি সেজদা করি তবে খদকে সেজদা করতে আর বাধা কি? আসলে কি জানেন? সেজদা দু'রকম হয়। 'সেজদা আবুদিয়ত' বা এবাদত আর 'সেজদায়ে তাহিয়া' বা তাজিম। কি আবু বক্কর, বাবুকে বোঝাতে পারবে? বোঝাও দেখি। আমিও বুঝে নিই তোমার এলেম কতটা গভলো!

আবু বক্কর বলল, 'মুর্শেদের কৃপায় যেটুকু বুঝেছি আপনাকে বলছি। বাবা, ভুল হলে শুধরে দিবা কিন্তুক। শুনুন বাবু। সেজদা আবুদিয়ত শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে যে প্রণাম তাকে বলে। তার বহু নিয়ম আছে। আর সেজদায়ে তাহিয়া বা তাজিম আলাদা জিনিস। তাজিম মানে হল গিয়ে সম্মান। তার মানে সম্মান ক'রে সেজদা সকলকেই করা যায়। আমরা ফকিররা সেইজন্য সেজদা করি সব মানুষকে।'

এদিকে জৈষ্ঠের তাপ বাড়ছে। গরম ভাতের গন্ধ উঠেছে। চুপিসাড়ে ফকিরের আর ক'জন শিষ্য কখন সামিল হয়ে গেছে দাওয়ার কথায় কথায় খেয়াল হয় নি। খেয়াল হল যখন পাখির ধমকানি শুরু হল, 'তোমরা ছ্যান করবা না? খাবা না? বেলাত ব'সে ব'সে গজালি করলেই চলবে?'

আবু বক্কর বলল, 'উঠুন বাবাসকল। পেছনে ছাতারে পাখির খ্যাচর ম্যাচর শুরু হয়েছে। এ না ঠুকরে থামবে না।' অচিরে তার ঝুঁটি ধরে টান মারল পাখি। 'বাপরে', বলে খুব মায়াবী হেসে বক্কর উঠল। পেছনে আমরা। তেল গামছা তৈরি। ঝাঁপিয়ে পড়া গেল আখড়াসংলগ্ন ঠাণ্ডা পুকুরে। স্নান ক'রে এসে দেখি দাওয়ায় ভোজন পর্ব সাজানো। তবে শুধু ফকির আর আমার। ভাত, ডাল, ভাজা, পটলের তরকারি আর পাকা আম। সামনে বসে থাকল চার শিষ্য। খেতে খেতে একসময় হঠাৎ দেখি চার শিষ্য মেটে দাওয়ার উটপাখির মতো নাক ডুবিয়ে ডান হাত প্রসারিত ক'রে দিল গুরুর দিকে। গুরু তাদের চারখানি অঞ্জলিতে দিলেন চার-গ্রাস অন্নপ্রসাদ। ভক্তিভরে প্রসাদ খেয়ে তারা মাথায় হাত মুছল।

ফকিরদের আচরণবিধি একটু অন্যরকম। সারাদিনে আরো কত কি দেখব না জানি। খাওয়া শেষ হলে আমরা গুলাম দু'খও খেজুর পাটিতে। কথা চলতে লাগল। ওদিকে হেঁসেলের দাওয়ায় শিষ্যশাবকরা খাচ্ছে। সঙ্গে পাখির কিচির

মিচির। আমি বেনোয়ারিকে বললাম, 'এখন ফকিরি তন্ত্রে কি নতুন নতুন মানুষ আসছে? বেশির ভাগ গৌণ সম্প্রদায় তো পড়তির দিকে।'

: ফকিরির পথে চিরকাল মানুষজন কম। এখন আরো কম। পথটা কঠিন তো। ক্রিয়াকরণের চেয়ে এতে উপলব্ধির দিক বেশি, দমের কাজ আছে। শ্বাসের কাজ। ভুল হলে শরীর ভেঙে যায়। এ পথে দাঁড়ানো কঠিন, ধরে রাখাও কঠিন। আমাদের একটা গানে বলেছে ;

ফকিরিতে ফিকিরি করলে
নরকপুরী যেতে হবে ভাই
সেই নরক ভক্ষক জনার
নরকেতেই ঠাঁই।

গানটা বুঝলেন তো? ফকিরিতে ফিকিরি চলবে না। ফিকিরি মানে ভুয়োতাল, ফাঁকি। মিথ্যে কথা। কাম লোভ হিংসা দ্বেষ একেবারে ত্যাগ করতে হয়।

: আচ্ছা, আপনি তো বিয়ে করেন নি। সব ফকিরই কি তাই?

: না, সংসারী ফকিরও আছে। তবে তারা গৃহীদের মতো কামের বশীভূত নয়। বীর্যরক্ষা আমাদের প্রধান কাজ। আমরা বলি বিন্দু। এই বিন্দু বা বীর্যকে বলে শুক্র। আমরা বলি নক্‌স্‌*। এই নক্‌স্‌ বা কামকে সর্বদা শাসনে রাখতে হয়।

: আপনাদের ফকিরি মতে তাহলে শারীরবিদ্যার স্থান খুব বেশি।

: মারফত কথার একটা মানে তো সেইটাই। একে বলে 'এল্‌মে তশরীহ', মানে শারীরস্থান বিদ্যা। যাকে বলে অ্যানাটমি।

আমার মনে হতে লাগল যেন এই মধ্য দুপুরের মায়ায় কোন একটা অজানা রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। তার দারুণ আকর্ষণ। সামনে আমার যিনি শুয়ে শুয়ে অবহেলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাচ্ছেন তিনি যে বেনোয়ারি নামে কোনো মনুষ্য দেহধারী নন, যেন ফেরেস্তা। স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আর তার ভাস্তরচনায় ওস্তাদ। তার চেয়েও বেশি আত্মজ্ঞানে, যাকে বলে খুব মজবুত ইনটেলেকচুয়াল। সেই কথা মনে রেখে অজ্ঞানতার নিম্নদেশ থেকে আমি জানতে চাইলাম এই এলেমদার ফেরেস্তার কাছে, 'দেহের খবর কিছু বলবেন?'

: বলবার কথা তো অনেক। দেহের একটা অংশ তো ধড়। অনেকটাই দেল্‌। আসল পড়া পড়তে হয় দেল্‌কেতাব থেকে। আর মানুষের এই শরীরের সবচেয়ে বড় জিনিস হল বিন্দু।

একটু থেমে বেনোয়ারি আবার বলে, 'পথে নামলে যেমন পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, আমাদের মারফতী পথেও তেমনই নানা মত এসে মেলে। সে সব জানতে বুঝতে হয়। তবে জ্ঞানের পথে বেশিদূর যায় না ফকিররা। তাদের পথ দেলের। দেল্‌ই আল্লার ঘর।

* নক্‌স্‌ কথাটির মূল অর্থ আত্মা।

বেনোয়ারির কথায় একটা গভীরতার টান আছে। সে টান কেবলই ভেতর দিকে আরো টান দেয়। মনে হয় মানুষটির কাছে যেন আমার সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু তাই কি হয়? হতে পারে? আমার জিজ্ঞাসা তো অসীম নয়। কথার টানে যে কথাটুকু জাগছে, কথার আভা যে প্রশ্নকে আলোকিত করছে আমি শুধু সেটুকুই জানতে চাইতে পারি তাঁর কাছে। কিন্তু জ্ঞানী মানুষটার কাছে আমি একটানা মূর্খের মতো প্রশ্ন করছি না তো? বেনোয়ারির উত্তরে রয়েছে সহন গভীরতা, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর মান নিতান্ত নিগুনলও হচ্ছে কি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি এবারে, 'ফকির সাহেব, আমি নানা আনশান প্রশ্ন করছি না তো? আপনি হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন।'

: মোটেই না। আরে আমার কারবার সব মূর্খ চাষাভুষোদের নিয়ে। তাদের জ্ঞান খুব বেশি হলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত, আপনি তো জ্ঞানের পথ সেরে এসেছেন। আর শুনেছি আপনি বেশ কিছু সাধু সন্ন্যেসী নাড়োচাড়া করেছেন। আপনার কথাতেও তা ধরা পড়ছে। আমরা ফুট দেখলেই বুঝি মিরগেলের ঝিম।

: শেষ কথাটার মানে বুঝলাম না।

: কথাটা বোঝা কঠিন নয়। তবে আপনার পথ আলাদা তো, তাই বুঝলেন না। ব্যাপারটা হল জলের খুব ভেতর দিকে থাকে মিরগেল মাছ। তাদের নিঃশ্বেস থেকে জলের ওপরে যে বুদ্বুদগুড়ি বা ফুট ওঠে তাই দেখে জেলেরা বুঝে নেয় কোথায় মিরগেল আছে, সেইখানে জাল ফেলে। তেমনই আপনার কথাতেও আপনার নিশানা ধরা পড়ছে। আপনি কোথায় আছেন। কত ভেতরে।

এবারে সাহস পেয়ে আমি পুরনো ফেলে-আসা প্রসঙ্গটায় ফিরতে চাই। তাই বলে বসি, 'আপনি বলছিলেন ফকিরি তত্ত্বের মূল কথা বিন্দুধারণ। তো এই বিন্দু বা শুক্রের সূচনা কীভাবে, পরিণতিই বা কি?'

: তাহলে শুনুন। আমাদের মারফতী মতে বলে, দেহের ওপরে হল চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, মাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা আর সেই মজ্জার মধ্যে শুক্র। এখন বুঝুন শরীরের পঞ্চদশ বস্তুর মধ্যে শুক্রই প্রধান। সেই শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণের বীজ। এবারে বুঝে নিন সেই প্রাণের মধ্যে আছে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে প্রেম। আর সেই প্রেমের মধ্যে আছে সহজবস্তু। আমরা শেষ পর্যন্ত সেই সহজবস্তুর সন্ধানী, তাই প্রেম আমাদের অবলম্বন। এসব কিছুর মূলে শুক্র, তাই শুক্র রক্ষা করতে হবে। শুক্রহানি ঘটলেই তাই সহজের পথ টলে যাবে।

চমৎকার যুক্তির বুনোট। প্রায় মেনে নিতে সাধ যায়। বেনোয়ারির বলবার ক্ষমতা যেমন, তেমনি তারিফ করবার মতো স্থিতিশক্তি। আপাতত তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির শাস্ত্রে ধরাশায়ী হতে হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শুক্রই যদি প্রধান

উপাদান তো সেই শুক্রের উৎপত্তি কোথা থেকে? সেও কি রক্ত মাংস মেদ মজ্জার মতো মানুষের জন্মগত অর্জন?'

: জন্মগতই যদি হবে তাহলে যৌবনের আগে বিন্দু আসে না কেন?

পরাজয় মেনে নিয়ে বলি, 'আপনিই বুঝিয়ে দিন।'

বেনোয়ারি হেসে বলেন, 'ভাববেন না আমি পয়গম্বর পীর। অনেকদিন ধরে বহু গুরু মুর্শেদের সঙ্গ তারপর অনেক কামেল ফকিরের বাহাছ শুনে তবে এসব মনের মধ্যে গেঁথেছে। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল বিন্দুর উৎপত্তি যদি জন্মগত নয় তবে আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নের এক কথায় জবাব, পঞ্চভূত হতে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের প্রভাবে জন্মায় খাদ্যশস্য দানাপানি। সেই থেকে তৈরি হয় জীবাহার। মানুষ সেই আহার্য থেকে রস টানে। সেই রস চামড়া থেকে শেষপর্যন্ত বিন্দুতে তৈরি হয়। সেইজন্য বারো-চৌদ্দ বছর লাগে মানুষের দেহে বিন্দু সৃজন হতে।'

মানি আর না মানি লোকধর্মের এই এক সবল দিক। এরা আমাদের মতো কথায় কথায় শাস্ত্র দেখায় না। এদের আছে এক নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৌলানা বা উলেমা সে জগৎ বানায় নি। এরা নিজেরাই দিনে দিনে বানিয়েছে। তাতে আছে জৈবনিক দৃঢ় কাঠামো। কাম আর মদন তাতে এক-ভাবেই স্বীকৃত ও ধিক্কৃত। প্রেম মহিমময়। লোকধর্মের তবে আবেগের চেয়ে লজিক বেশি। তার কারণ এ-ধর্মে যারা আছে তাদের অনবরত যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের মতামত পোক্ত করতে হয়। এ ধর্মে যাদের ছিনিয়ে আনা হয় তাদেরও বোঝাতে হয় যুক্তি তর্ক দিয়ে। গ্রামের লোক ভাবপ্রবণ বড় একটা মজে না, কিন্তু যুক্তিতে ভেজে। তাদের জীবন যে যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা। বীজ পুঁতলে শস্য হয়, বৃষ্টি পড়লে শস্যলতা ভালো ফলে, সার দিলে আবার ফলন পরিমাণে বাড়ে। আবার উল্টো যুক্তিতে বীজ খারাপ থাকলে আর সব কিছু ভালো হলেও ফসল কেঁচে যাবে। সব কিছু ঠিকঠাক হলেও বন্যা বা খরা হলে সে বছর নির্ঘাৎ মরণ। সেই লজিকের জগৎ থেকেই বেনোয়ারিকে খোঁচা মারি, 'বিন্দুরক্ষা করতে গেলে তো দমের কাজ জানতে হয়। সবাই তো জানে না। গৃহীরা কি স্ত্রীসঙ্গ করবে না তবে?'

'কেন করবে না', বেনোয়ারি বোঝান, 'সন্তান চাইলেই সঙ্গম। তবে স্বসুখ বাসনার জন্যে কাম হল পাপ। আমাদের একটা চলতি কথা আছে—মাসে এক বছরে বারো/তার কমে যতটা পারো।—বুঝলেন?'

: বুঝলাম। সেই জন্যেই কি আপনি বিয়েই করলেন না? সকালে যে লাউ-কুমড়োর বীজ রাখার কথা বললেন সে তো নিতান্ত পরিহাস। আসল ব্যাপারটা কী?

'আসল ব্যাপার জন্মধারে ঘৃণা', নরম মানুষটি হঠাৎই কঠিন হয়ে গেলেন। টানটান হয়ে বললেন, 'স্ত্রীজাতিকে যদি মা ভাবি তবে কাউকেই কি কামনা করা যায়? যেখান দিয়ে আমার জন্ম সে স্থান তো আমার বাবার। তাহলে সব নারীতেই

তো রয়েছে আমার জন্মচিহ্ন। আমি কেমন ক'রে নিজের মাকে কামনা করি ? আমি কি পশু ?'

ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল আমার মন। ঝিম ঝিম করতে লাগল সারা শরীর। কি জমাট নীরবতা। কি গুমোট। বেনোয়ারির মুখ ক্ষোভে ধিক্কারে জর্জরিত। দু'চোখে টলমল করছে জল। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে হাঁকলেন, 'আবু বক্কর সেই গানটা শোনাও এঁকে। বুঝেছো ?'

আবু বিনয়ে মাথা নেড়ে বসল। ঘেরাটোপ খুলে দোতারা বাঁধল। তারপর চোখ বুঁজে তীব্র তারসপ্তকে তার ক্ষুব্ধ কণ্ঠকে বাজিয়ে তুলে গাইল :

কেন ঝাঁপ দিলি রে মন
বাবার পুকুরে।
কামে চিত্ত পাগলপ্রায় তোরে ॥

এ সব গানের কি শক্তি ! যেন ঝাপটের মতো আমার কানে এবং সেখান থেকে সোজা মনকে বিদ্ধ করল। কি স্পষ্টতা অথচ কতখানি ব্যঞ্জনা। গান তো নয়, যেন কামী মানুষের পরিতপ্ত আর্তনাদ। আবু বক্কর যত গাইছে তত কাঁদছে। জলিল, মানউল্লা সবাইয়ের চোখে জল। আবু বক্কর অনায়াসে পৌঁছে গেল অন্তরা থেকে আরেক অন্তরা-তে :

কেন রে মন এমন হলি ?
যাতে জন্ম তাতে মলি ?
ও তোর ঘুরতে হবে লক্ষ গলি
হাতে পায়ে বেড়ি সার করে ॥

দীপের আলো দেখে যেমন
উড়ে প'লো পতঙ্গজন
অবশেষে হারায় জীবন
তাই কপালি হা রে ॥

ততক্ষণে বেনোয়ারি অনেকটা আত্মস্থ হয়েছেন। তাই দেখে আমারও খানিকটা স্বস্তি হয়। পরিবেশের গুমোট কাটে। 'আহা', 'বেশ বেশ', এসব তারিফের ধ্বনি ওঠে ফকিরের গলা থেকে। ব্যাপার দেখে পাখিও এমন কি সাহস ক'রে উঁকি মারে ঘরের চৌকাঠ থেকে। আবারও ভাবি, এসব গানের কি শক্তি ! মনের তাপও গানে গলে গলে পড়ে সবদিক শীতল ক'রে। আবু বক্কর এখানে গানের গুণিতায় এসে পড়ে :

দিরাজ শা নববেশে তাই কয়
শক্তিরূপে ত্রিজগৎময়
কেন লালন ঘোরে বৃথাই
আগুতত্ত্ব না সেরে ॥

বেনোয়ারি আমার পাশে উঠে এসে বসেন। আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলেন, 'মন হঠাৎ বড় চঞ্চল হয়ে গেল। শক্তিরূপে ত্রিজগৎময় সেই সহজবস্তু মনের মানুষ তো মনের মধ্যেই রয়েছে। তাহলে তাকে আর কেন নারীর মধ্যে আলাদা ক'রে খোঁজা? কেন বন্ধন? কেন মায়া?'

আবু বক্কর গান থামিয়ে আরক্ত চোখে নেহার করল তার গুরুর দিকে। 'গান চলুক', নির্দেশ এল। হেসে সে আবার দোতারা বাঁধে। সেই সুযোগে মানউল্লা বলে ওঠে, 'বাবুকে হাতীর গানডা শোনাও দিকি বক্কর।' পাখি হাততালি দিয়ে সায় দেয়। হাসিমুখে বক্কর গায় :

বাজারে হাতী দেখা হয়েছে।
চার কানায় দেখে এসে
আপন আপন বলতেছে॥

বাইরে একটু কি হাল্কা হাওয়া উঠেছে দিনশেষে? ঘরে অন্তত মানুষগুলির মনে একটু ঝিরঝিরে বাতাসের ছোঁওয়া লাগে। ফকিরের চোখ নিমীলিত, মুখে হাসি। জলিল বলে আমার কানে, 'বাবার দশা হয়েছে। মনের ব্যথা গলে গিয়েছে।' আবু বক্কর গায় :

একজন বলে 'কই সবার কাছে
হাতী দেখা হয়েছে—
নরম নরম সুপারীর গাছ খাড়া রয়েছে।
তার উপর মোটা নীচে সরু
মাথা কুমড়োর মতো ঝুলতেছে॥'
আর একজন কয় 'তোমার কথা নয়
আমি ঠিক বলি তোমায়—
চারদিকে কাঁথা বোলে কুলোখানির প্রায়।'
যত অজ্ঞানেতে গল্প করে
তা তো সব মেথি মিছে॥
আর একজন কয় 'শোনো বিবরণ
তোমরা যা বলো এখন,
একটি কথা নয়কো সাচ্চা বলো অকারণ।
হাতী পাকা ঘরের থাম্বা যেমন
খাড়া হয়ে রয়েছে॥'
গেল্লা ক'রে আরেকজন কয়,
'বড় অশৈল তো হয়
দেখলাম হাতী আখ একগাছি
নীচে পাতা নয়।'

গোপাল কয় খেদেতে
চার কানাতে আচ্ছা মজা লাগিয়েছে ॥

গান শেষ হতে খুশিতে হাততালি দিল পাখি। মানউল্লা বলল, 'পাখির মনে এখনো বালিকাভাব, তাই এতবড় ভাবের গানখানা শুনেও মজা পেয়েছে।'

'এ গানখানার মধ্যে খুব বড় ভাব আছে নাকি?' আমার মুখ ফসকে কথাটা বার হয়ে গেল।

বেনোয়ারি বললেন, 'আল্লার চেহারা কেমন? ভগবানের রূপ কেউ কি জানে? একেক জন একেক রকম বর্ণনা ক'রে বলে তার আন্দাজী মতে, যেমন ঐ কানার হাতী দেখা। সাধনা অনুযায়ী স্তরে স্তরে তাঁর সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। শেষ-পর্যন্ত ভগবান সম্পর্কে আর রূপের ধারণা থাকে না। একাত্ম হয়ে যেতে হয়। এটাই সুফীমত।'

: সুফীমতের ঐ স্তরগুলোর বিষয়ে আর একটু বলবেন?

ফকির বললেন, 'জলিল বল দেখি সুফীমতের তারিকা। দেখি কেমন শান আছে।'

জলিল বলল, 'বেল গায়েব একিন পেরথমে। তারপর এল্‌মেল্‌ একিন। তার পরে আয়নুল একিন। তারপর হাক্‌কুল একিন। ঐ ঘাঃ, বাবা শেষডা আর স্মরণ নেই যে!'

মানউল্লা বললো, 'তোর খড্ড বিস্মরণ হয়। শুনে নে। সবশেষে হল হুয়াল একিন।'

জলিল লজ্জায় মাথা নিচু করে। বেনোয়ারি বলেন, 'সুফীমতে নিজে না দেখে পরের মুখে শুনে আল্লার অস্তিত্ব বিশ্বাস করাকে বলে বেল গায়েব একিন। তারপরে জ্ঞানের দ্বারা আল্লাকে বিশ্বাস করাকে বলে এল্‌মেল্‌ একিন। চোখে দেখে বিশ্বাস করাকে বলে আয়নুল একিন। এর চেয়ে বড় স্তর আছে। সত্য জেনে পরিচয় ক'রে বিশ্বাস করাকে বলে হাক্‌কুল একিন। আর সব শেষে স্তরে হল হুয়ান একিন। তার মানে আল্লার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এবারে বুঝলেন তো হাতীর গানের মূল্য। আল্লার সামনে আমরা সবাই কানা।'

শেষ জ্যৈষ্ঠের সায়াহ্নে আমি-জ্ঞানী মানুষটার দিকে শ্রদ্ধায় নীরব বিনতিতে নত হয়ে নীরব সেজদা জানাই। অন্তর্যামীর মতো তা বুঝে মানুষটি বলেন, 'সেজদা দিন নিজের ভিতরের খদকে।'

পরদিন ভোর হতেই ফিরে আসি নিজের ডেরায়। কিন্তু অচিরে আবার যাই মাঠপুকুর গ্রামে বেনোয়ারি ফকিরের কাছে। কেন না মাথায় ছিল বাউল ফকির নিগ্রহের প্রসঙ্গ। সে সম্বন্ধে তো কিছুই জানা হয় নি সেদিন। এবার তাই মাঠপুকুর পৌঁছে, চা-জলখাবার খেয়েই কথাটা তুলে বসি। কে জানে বেলা বাড়লে শিষ্যরা এসে পড়বে হয়ত। ফকিরি গান হবে। তারপর পাঁচ তালে আসল কথাটা ভুলে

যাব। সরাসরি বলি, 'মাঝে মাঝে খবর পাই নদীয়া-মুর্শিদাবাদে নাকি বাউল ফকিরদের নিগ্রহ হয়। কি ধরনের নিগ্রহ? কেন হয়? কারা করে বলুন তো?'

: নিগ্রহ মানে প্রথমে শাসানি চোখ রাঙানি, তারপরে মারধোর, একতারা বাঁয়া ভেঙে দেওয়া। সবশেষে ঝুঁটি কেটে দাড়িগোঁফ জোর ক'রে কামিয়ে দেয়, এই আর কি। শেষেরটাই সবচেয়ে অপমান।

: কেন?

: বাউলদের ধর্মই হল সর্বকেশ রক্ষা।

: কিন্তু যারা এ অত্যাচার করে তারা কারা? সাধারণ মানুষ?

: আলেমরা এ কাজ করে। এলেম মানে জ্ঞান। যারা একাজ করে তাদের আমি বলি বেআলেম অর্থাৎ অজ্ঞানী। এ কাজ বহুদিন থেকে হচ্ছে। করেকশো বছর। শুনেছি লালন ফকির বা পাঞ্জুশাহ ফকিরের সময় কুষ্টিয়া যশোর রংপুরে বাউলদের ওপর ধ্বংসের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। বহু লোক মার খায়, পালায়, লুকিয়ে থাকে। এ তো নতুন কিছু নয়।

: হালফিল কোনো ঘটনা এমন ঘটেছে? অন্তত নির্দিষ্ট ঘটনা বলুন নাম ক'রে। জায়গার কথা উল্লেখ ক'রে।

'দাঁড়ান আমি ঘর থেকে তাহলে নোটবইখানা আনি, তাতে সব লেখা আছে', বলে ফকির ঘরে ঢুকলেন। বেরোলেন একখানা ছোট ডাইরি নিয়ে। পাতা খুঁজে নিতে নিতে বললেন, '১৯৭০-৭২ সালে নওদা থানায় মণ্টু খাঁ বলে একজন কট্টর মুসলমান বাউল-ফকিরদের ওপর খুব অত্যাচার করে। শুনেছি কথাটা সরকারের কানে তোলা হয়েছিল। কম্যুনাল রায়টের কথা ভেবে শেষমেষ ব্যাপারটা চাপা পড়ে। মণ্টু খাঁও সামলে নেন। তারপর হাল আমলে আমার ডাইরিতে দেখছি পাঁচ বছর আগে মালুমগাছায় তিনজনকে নিগ্রহ করেছে। তাদের নাম ইমানালি, আবদুল মান্নান আর আবদুল হান্নান।'

: কে অত্যাচার করল?

: চণ্ডীপুর মাদ্রাসার মৌলানা আর তার দলবল।

: আপনি গিয়েছিলেন?

: হ্যাঁ। নদে-মুর্শিদাবাদের কোথাও হাঙ্গামা হলে আমি খবর পাই। আমাকে খবর দেয়। কোনো-না-কোনো ফকির খবর আনে। আমি একা নই। অনেকে যাই।

: কি করেন?

: প্রথমে যাদের ওপর অত্যাচার হয় তাদের সান্ত্বনা দিই, ভরসা দিই। যারা অত্যাচার করেছে তাদের সঙ্গে লোকজন ডেকে 'বাহাছ' মানে শাস্ত্রীয় তর্ক করি। তাতে অনেক সময় কাজ হয়। সেই গ্রামের মুসলমান সমাজকে বোঝাই। তারা বোঝে। মিটে যায়।

: তাতেও যদি না মেটে?

: স্থানীয় খবরের কাগজে খবর পাঠাই। জেলা বা মহকুমা প্রশাসনকে ধরি। তারা অত্যাচারী বা ধর্মান্ধকে কিছুটা ভয় দেখিয়ে অথবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে।

বেনোয়ারির দিকে শ্রদ্ধার চোখে তাকাই। এদের কথা কোনোদিন সভ্যসমাজ জানবে না। মনের মানুষ সন্ধান করতে এরা গভীরে নির্জন পথ বেছে নেয় বটে তবে মাঝে মাঝে সেই পথ ছেড়ে এদের বাধ্য হয়ে সমগ্র অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসেও দাঁড়াতে হয়। সেটাও মনুষ্যত্বের টানে। অনেকদিন আগে 'এক্ষণ' পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৮, ইং ১৯৭১) হেমাঙ্গ বিশ্বাস কাঙাল হরিনাথের ভাইঝির কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন, একবার নাকি কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাঠিয়ালরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করছিল। তাই শুনে লালন ফকির তাঁর আশ্রম থেকে ভক্তদের নিয়ে লাঠিসোটা সহ বেরিয়ে এসে লেঠেলদের ফিরিয়ে দেন। সেই বিবরণ পড়ে লালন ফকিরের ওপর আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই রকম শ্রদ্ধা বেনোয়ারি ফকিরকে দেখে আমার মনে জাগল। লোকধর্ম তাহলে অনেকটা নৈতিক শক্তি আনে মানুষের মনে। প্রতিবাদের প্রতিরোধের। হঠাৎ মনে হল লোকধর্মের জন্মই তো প্রতিবাদ থেকে। এ কথাও মনে হল যে, আমার ধর্ম আমাকে কোনো প্রতিবাদের শক্তি দেয় নি, প্রতিরোধের শস্ত্র দেয় নি।

আমি বেনোয়ারিকে বললাম, 'নিগ্রহের আরো ঘটনা বলুন। জানতে চাই।'

'খুব বেশি নয়', বেনোয়ারি বলেন, 'তবে হয় মাঝে মাঝে। যেমন ধরুন মুর্শিদাবাদের ঘোষপাড়ায় গোলাম মুর্তজা মার খেয়েছে। আমাদের কাছাকাছি পলাশবাড়ায় গত ফাল্গুন মাসে কোরবান ফকির অত্যাচারিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নূতন গ্রামে গতবছর ১৩ই ফাল্গুন জাফর ছড়াদার মার খেয়েছে। এই রকম টুকরো টাকরা ঘটনা। হামেশা ঘটে না, তবে মাঝে মাঝে ঘটে বৈকি।'

: কেন বলুন তো ?

: মূল কারণ ধর্মান্ধতা। বেশির ভাগ মানুষ অসহিষ্ণু অজ্ঞান মূর্খ। শাস্ত্র নিয়ে লড়াই করে কিন্তু শাস্ত্রই পড়ে নি। আসল ব্যাপার হল বাউল-ফকিরদের বেশির ভাগ আমাদের মুসলমান সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে গজিয়ে ওঠে। সেটা কিছু কিছু ধর্মান্ধ ভালো চোখে দেখে না। এই নিয়ে শুরু। আর একটা ব্যাপার হল আমাদের গান-বাজনা করা। সেটা নাকি হারাম, নিষিদ্ধ। সেবার খুব মজা হয়েছিল। চণ্ডীপুরের মোল্লার সঙ্গে আমার বাহাছ হচ্ছে ঐ গান গাওয়া নিয়ে। আশপাশের দশ-পনেরোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। আমি আবু বক্করকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাকে বললাম, 'বক্কর, আমাদের মুসলমান ভাইদের দুদ্দু শা'র গানটা শোনাও তো।' সে গান ধরল :

গান করিলে যদি অপরাধ হয়

কোরাণ মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়।
রাগ রাগিণী সুর
রাহিনী বলিয়া মশহুর
এত আলাপন আছে নিরাপন তাতে কেন হারাম নয়॥
আরবী পারসী সকল ভাষায়
গজল মরাসিয়া সিদ্ধ হয়
নবীজী যখন মদিনায় যায় 'দফ' বাজায়ে মদীনায় নেয়॥
বেহেস্তের সুর নাজায়েজ নয়
দুনিয়ায় কেন হারাম হয়
দ্বন্দ্ব কর, শুনি কোথায় গানের ফতোয়া কোথা পায়॥

ব্যাস্। এক গানে ফৌৎ। গানের দায় কথাটা হল, স্বর্গে যদি গান অবৈধ না হয় তবে মর্ত্যে কেন গান হারাম হবে? অকাট্য গান। আর তার সঙ্গে বক্তব্যের গলা। গোঁড়া ধর্মান্ধের দল পালালো। হাজার হাজার লোক বলে 'গান চলুক চোপর রাত'। সে এক কাণ্ড বটে।

আমি বললাম, 'গান দিয়েই তো আপনাদের সব কথা বলা অভ্যাস। কিন্তু সব জায়গায় তো গান দিয়ে ক্ষেতা যায় না। তখন কি করেন?'

: বেশির ভাগ যাহাছে কোরাণ শরীফ হাদীশ থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক হয়। যেমন ধরুন আমরা মারফতী ফকির, আমরা বিশ্বাস করি আল্লার চেহারা আছে, তাঁকে দেখা যায়। মুসলমান মৌলানারা সেকথা মানেন না। তাঁরা বলেন আল্লার রূপ নেই। আমি তখন বলি, 'হজরত মহম্মদ মোস্তাফা বলেছেন –

ইন্নাকুম সাত্তাকনা রাব্বেকুম কামা
তারা উনা হাজল কামার *

এ কথার অর্থ – পূর্ণিমার চাঁদের মতো আল্লাহ্‌কে স্পষ্ট দেখা যাবে। তাহলে? তবে এখানে কথা আছে।

: কি রকম?

: এই যে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌কে পূর্ণিমার চাঁদের মতো স্পষ্ট দেখা যাবে, তা কি সবাই দেখতে পাবে? না। এ দেখতে গেলে আমাদের মারফতী পথ নিতে হবে। এ পথ অজানা, তাই একজন পথপ্রদর্শক চাই। তিনিই পীর মুর্শিদ। একজন জান্‌নেওয়ালা (জ্ঞানী) কামেল পীরের কাছে বায়েত (শিষ্য) হয়ে তাঁর কাছে গোলামী খৎ লিখে তাঁর মন জয় করতে পারলে তবে সেই পথ দেখা যাবে।

আমি যেন একটা নতুন জগতে ঢুকে পড়েছি। এ জগতের বিষয় যেমন ধূসর

* এ কথার শাব্দীয় অর্থ: নিশ্চয় তোমাদের রোষ শোধনকারী প্রভুকে দেখতে পাবে (কেয়ামতের দিন) যেমন এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। [লেখক]।

ভাষাও তেমনই ধূপছায়া। তবে শেষপর্যন্ত ভাবটা বোঝা যায়। তবু একটু খটকা থাকে। যেমন মুর্শিদ কি শুধুই পথপ্রদর্শক? তিনিই তো অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। যেমন লালন ফকির একটা গানে বলেন—

যেমন মুর্শিদ তেমন খোদা
মনে কেউ করো না দ্বিধা।

তবে? মুর্শিদকে দেওয়া এতখানি বড় আসন? হতেই তো পারে গোলমাল। ঈশ্বর তো সর্বজনীন হতে পারে না। কিন্তু বেনোয়ারি ফকিরকে সে তর্কে না নিয়ে গিয়ে একটা সামাজিক প্রশ্নে টেনে আনলাম এই বলে যে, 'ওই যে আপনি বা জলিল বা মানউল্লা মাঠপুকুর গ্রামে বসে মারফতী সাধনা করছেন তাতে গ্রাম সমাজে গোলমাল হয় না? একদিনও মসজিদে যান না তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয় না?'

বেনোয়ারি হাসেন। বলেন, 'আপনি একেবারে মোক্ষম জায়গাটা ধরেছেন। হয়, মাঝে মাঝে মন কষাকষি হয়। তবে আমরা তো কাউকে ঘেঁচে আনছি না আমাদের পথে। তাছাড়া বাহ্য আচরণে সবাইকে বলি 'নামাজ পড়ো' 'মসজিদ যাও'। আসলে আমরা নিজেদের মতো গ্রামের একটি টেরে পড়ে আছি। কাউকে ঝামেলায় ফেলি না। গান বাজনা করি। দল বেঁধে সবাই শুনতেও আসে।'

: কিন্তু বিয়ে থা? সমাজ?

: অসুবিধে নেই। আমাদের ঘরে অনেক মুসলমানই মেয়ে দিতে চায়। গরজ করেই দেয়। কেন বলুন তো?

: কেন?

: তালাকের ভয় নেই। ফকিরদের সন্তান হয় শান্তিপ্রিয়। তালাক তো ধর্মীয় অত্যাচার। আমরা ঘৃণা করি তালাক প্রথাকে। আমরা মানুষ ভজি। তাহলে মানুষের অপমান কেমন ক'রে করি?

: আর আপনাদের ঘরের মেয়েদের মুসলমান সমাজ বউ করতে চায়?

: ঘেঁচে নেয়। দেখেন নি আমার পাখিকে? ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে? জোর ক'রে মেঙ্গে নিয়ে গেল আমার এক শিষ্যের জ্যাঠা। সে অথচ খানদানী মুসলমান, পঞ্জবেনা মেনে চলে রীতিমতো।

'পঞ্জবেনা আবার কি?' আমি বলি, 'এ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য। আমরা খ্রীস্টান ধর্মের প্রায় সব কিছু জানি, মায় সান্তাক্লজ পর্যন্ত। এমনকি বড়দিনের কেক পর্যন্ত কিনে খাই। অথচ পাঁচ-ছ'শো বছর মুসলমানদের পাশাপাশি বাস করেও তাদের কিছু জানলাম না, শিখলাম না। এমনকি জানতে চাইলামও না। এর কারণ কি?'

: আপনাদের নাক সিঁটকানো আর আমাদের রক্ষণশীলতা দু'টোই দায়ী। যাই হোক, পঞ্জবেনা সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। পঞ্জবেনা হল শরীয়তী মতে খাঁটি মুসলমানের জীবনে পাঁচটি অবশ্য কৃত্য। একেই বলে আরকানে ইসলাম।

: কি কি?

: কল্‌মা, রোজা, হজ, যাকাত আর নামাজ।* এর নানান খুঁটিনাটি আছে অবশ্য।

: যেমন?

যেমন মূলে নামাজ দু'রকম। জাহেরা নামাজ আর বাতুনে নামাজ। বাতুনে নামাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। সর্বদাই সে নামাজ চলে, শয়নে স্বপনে সর্বত্র। আর জাহেরা নামাজ পড়তে হয় পাঁচবার বা পাঁচয়োক্ত। পাঁচবারের নাম আর সময় আলাদা আলাদা। শুনবেন?

: বলুন। কিছুই তো জানি না। শুধু খানিকটা বাজে লেখাপড়া শিখেছি। এখুনি আপনাকে বলে দিতে পারি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কতখানি সাংবিধানিক ক্ষমতা, এ বছরে রুশান্ত আর বিকাশ পাঁজি ইস্টবেঙ্গলে আসতে কত টাকা নিয়েছে, কিংবা বিশ্বব্যাংকের কাছে ভারতের ঋণ কত। অথচ···

'বেশ বলেছেন' ফকির বলেন, 'আমাদের একটা বাউল গানে আছে—

ঘরের কাছে হয় না খবর
ঘুরে বেড়ায় দিল্লী লাহোর।

যাক্‌গে। যে কথা জানতে চাইছিলেন। খুব ভোরবেলা যে-নামাজ তাকে বলে 'ফজর'। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ যে-নামাজ তার নাম 'জোহর'। 'আসের' হল বেলা তিনটে-চারটে নাগাদ যে-নামাজ। সন্ধ্যেবেলার নামাজ 'মগরেব'। আর রাতের নামাজ 'এয়েসা'। কি মনে থাকবে? লিখে নিন। আর সেই সঙ্গে লালনের এই কথাটাও লিখে নিন—

পাঁচয়োক্ত নামাজ পড়ে
শরা ধ'রে কে পায় তারে?

: তার মানে আপনি বলতে চান নামাজ বাজে? তার কোনো মূল্য নেই?

'তা বলি না', বেনোয়ারি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝান, 'আমরা বলতে চাই লোক-দেখানো নামাজ দিয়ে কি হবে? মসজিদে গেলেই কি ধর্ম? আসল নামাজ তো মনে। তার চেয়েও বড় কথা হল কার নামাজ? তাঁকে কি জানি? অন্যায় পাপ চুরি ক'রে তারপরে নামাজ পড়া চলে কি? আল্লা বলছেন, আমি তোমাতে আছি তুমি কই আমাকে দেখছ না? অফি আন ফোসেকুম আফালা তোফসেরুন।'

'বুঝলাম যে আপনাদের ধর্মসাধনা অনেকটা সহজিয়াদের 'বর্তমান' সাধনার মতো', আমি বেনোয়ারিকে বোঝাতে চাইলাম, 'ওরাও বলে অনুমানে ধর্ম হয় না। কোথাকার কৃষ্ণ রাধা মথুরা বৃন্দাবন—চোখেই দেখি নি কোনোদিন। তার চেয়ে অনেক চাক্ষুষ হল মানুষ, তাকে ধর। তার মধ্যেই খুঁজে নাও মথুরা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ। আপনাদেরও তেমনই মনে হচ্ছে।'

* উৎসাহী পাঠক পড়ে নিন 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম' বইয়ের 'বাউল সাধনার পদ্ধতি ও ইসলামী শরিয়ত' অধ্যায়। লেখক এ. এইচ. এম ইমামুদ্দিন। বাংলাদেশ, ১৯৬৯।

: হ্যাঁ অনেকটা তাই। তবে শরীয়তের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে তফাত এইখানে যে ওটা আচরণগত আর আমাদের উপলব্ধি। ওদের বাহ্যধর্ম আমাদের আত্মধর্ম। জলিলকে দেখেছেন তো? সাধারণ মূর্খ কৃষাণ, অবসরে খরামির কাজ করে। ও যখন কুড়ি বছর আগে আমার কাছে দীক্ষা শিক্ষা নেয় তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'শরীয়তী ধর্মে মন ভরল না তোমার?' ও বলল, 'গুরু, ঐ আন্দাজী ধর্মে আমার মন ভরল না, আমি মানুষ ধরে সাধন করতে চাই।' তখন দীক্ষা দিলাম।

: তবে কী শরীয়ত ভুল?

: কে বলল ভুল? শরীয়ত কায়েম না হলে কি মারফত হয়? লালন ফকির একবার বাহাছে কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন—

শরীয়ত ঘরের সিঁড়ি
ঘর মারফত।
চড়িয়া সিঁড়ির পরে
খাড়া থাকি যদি
না হেঁটে কেমনে ঘরে যাই বল দেখি?
শরীয়ত হইলে হাসিল মারফতে যাব।

কি বুঝলেন? আমরা কি শরীয়ত বিরোধী?

: 'না। বুঝলাম মারফত হল শরীয়তকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, পেরিয়ে যাবার ধর্ম। শরীয়ত না হলে মারফত হয় না। কিন্তু মারফত হলে আর শরীয়তে ফেরা যায় না। ঠিক বুঝেছি কি?

: একদম স্পষ্ট বুঝেছেন। শরীয়ত আর মারফত যেন দুধ আর মাখন। দু'টোই মিলেমিশে আছে। কিন্তু মাখন বার ক'রে নিলে ঘোল পড়ে থাকে। তাতে আর কাজ কি? সেই জন্যেই বলা হয়েছে—

মরফতের পথিক যারা
শরার কেতাব নেয় না তারা।

তাহলে আমাদের হজ রোজা যাকাত নামাজ কি হবে আর? আমরা অনেক ভেতরে চলে গেছি। আর তো লোক-দেখানো কাজ করতে পারি না। তাই আমরা দেল্-কেতাব পড়ি। খুঁজি সেই মনের মানুষ। যাকে পেলে আর কিছু চাইতে হয় না। থাকে শুধু হকিকৎ অর্থাৎ হকের পথে চলা। আর তরিকৎ অর্থাৎ বিচার। কিসের বিচার? না আমি কী করেছি, আমি কী করছি। তাকেই বলে দরবেশ যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

ক্ষণিকের বিরতি ঘটল। কেন না জলিল এসেছে আমাদের নিতে। আজ তার বাড়িতে আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া।

জলিলের বাড়ি নিতান্ত গরীব গুরবোর কুঁড়ে। তবে সেবাধর্মের আন্তরিকতার ত্রুটি নেই। এই বলাচ্ছে, এই পাখার বাতাস করছে, এই ঠাণ্ডা জল তালশাঁস

দিচ্ছে, সঙ্গে গুড়।

বেনোয়ারি বলেন, 'গরীবদের বাহ্য চমকটা নেই তো, তাই ভগবান ওখানে আটকে থাকেন। আর ধনীর ঘরে নানা রেল্লা কারদানী আর কেরামতী। তার ফাঁক দিয়ে ভগবান কেটে পড়েন। এ নিয়ে কত বাহাছ হয় আমার সঙ্গে আলেমদের। যেমন ধরুন এই হজ। হজ কি গরীবদের সাধ্য? সেই জন্যে আমাদের একটা গানে বলে—

এখানে না দিদার (দর্শন) হলে
সেখানে পাবে না সেলে।
হজ করিতে মন তুই যাবি কোন কাবায়?
হজের ঠিকানা না জেনে
দৌড়াদৌড়ি যাস কোথায়?

হজ মানে কি জানেন? মনকে বাইরে থেকে টেনে এনে অন্দরে বসানো। জলিল, তুমি বাবুকে সেই প্রকৃত হজের গল্পটা বলো তো?'

জলিল বলল, 'একজন অবিবাহিত সৎ ধর্মভীরু মুসলমান ঠিক করল তার গ্রামের ক'জনের সঙ্গে হজ করতে যাবে মক্কায়। যেতে তো অনেক টাকা লাগে। তা আল্লার কৃপায় সে টাকা যোগাড় হল। যাবার আগে ভাবল শহরে গিয়ে প্রাণের দোস্তকে একবার দেখে আসি। কি জানি হজ ক'রে ফিরতে পারব কিনা। পৃথিবীতে তার মায়ার টান বলতে ছিল সেই বন্ধুর ওপর। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখে বন্ধু ক'মাস আগে মারা গেছে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বন্ধুর বউ অভাবে পড়ে নাকানি চুবানি খাচ্ছে। টাকা পয়সার অভাবে হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির রসুইখানা থেকে মাংস রান্নার গন্ধ লাগল তার নাকে। সে ভাবল, তবে কি অভাবের কথা বানিয়ে বলল? অভাবী মানুষ মাংস রাঁধে কি ক'রে? খোঁজ করতে বন্ধুর বউ বললে কাঁদতে কাঁদতে, তিন দিন ধরে ছেলে-মেয়েদের কিছু খেতে দিতে না পেরে আজ গো-ভাগাড় থেকে মরা গরুর রাং এনে পাক করছে। সে কি? আমার বন্ধুর বউ মরা গরু রেঁধে খাচ্ছে গো-ভাগাড় থেকে এনে? আর আমি যাব অনেক টাকা খরচ ক'রে মক্কা? ছিঃ। মাথায় থাক আমার হজ। বাঁচলে কত হজ হবে! এই ভেবে তার সব টাকা তাদের দিয়ে গ্রামে ফিরে হজ যাত্রীদের বলল এবারে তার কোনো কারণে হজ হল না। ইনসাল্লা আসছে বছর যাব।

'এদিকে তার গ্রামের সেই মানুষগুলো তো হজ গেল। সেখানে গিয়ে সব জায়গাতেই সেই মানুষটাকে ভাবে আর ভাবে, কেমন হল? সে যে আসবে না বলল? তবে কি অন্য দলের সঙ্গে এল? ফিরে এসে খবর নিয়ে জানল লোকটা সত্যি সত্যিই হজে যায় নি। তারা তখন তার কাছে গিয়ে বলল, ভাই তোমারই সত্যিকারের হজ হয়েছে, আমাদের হয় নি।'

বেনোয়ারি বললেন, 'এই হল হজের সত্যিকারের মর্ম। আন্তরিকভাবে খোদার কাজ করলে তবে হজ হাসিল হয়। ঐ যে গরীবের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের দুঃখ ঘোচানো, যে তা করে সেই ন্যায্য হাজী। এই গোলমালটা আমাদের যাকাত নিয়েও হয়। যাকাত মানে দান। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলমান যাকাতে ফাঁক করে বেশি। আরে, আল্লা তোমাকে দিয়েছেন, তাই তো তুমি দিচ্ছ। তাহলে তোমার অত ফাঁক কিসের? নিজেকে দাও তাঁর সেবায়।'

আমি বললাম, 'কট্টর ইসলামী নীতিনির্দেশ আর আপনাদের মারফতী চিন্তা দু'য়ের মূলে কোনো বিরোধ নেই যা বুঝলাম। বিরোধ শুধু ব্যাখ্যায় আর আচরণে, তাই নয়?'

: ঠিক তাই। তবে আমাদের চোখে আগে মানুষ আর তার মনের ময়লা ঘোচানো। এই যাকাতের ব্যাখ্যাই ধরুন। যাকাত * দু'রকম—'বাতুনী' আর 'জাহেরী'। বাতুন মানে প্রিয়বস্তু। নিজের প্রিয়বস্তু আল্লার রাহে যাকত দিতে হবে। নিজের প্রিয়বস্তু কি বলুন তো?

: তার কি কিছু ঠিক আছে? এক-এক জনের এক-এক রকম। সত্যি সত্যি আমাদের প্রিয়বস্তু কি বলুন তো?

: আমাদের স্বসুখ বাসনা। যাকে বলে আত্মসুখ। বিচার ক'রে দেখবেন আমরা যাই করি তার মূলে আত্মসুখ। একজন ভিখিরিকে যদি একটা পয়সা দিই তাতেও আত্মসুখ থাকে। লোভ, ভোগ, কাম, ঐশ্বর্য এসব তো স্বসুখ বাসনা বটেই, এমনকি ত্যাগও একটা সুখ। স্বসুখ ত্যাগ খুব কঠিন। সেইজন্যে বলেছে—

থাকিলে স্বসুখ বাসনা
রাগের উদ্দীপন হবে না।

আবার বলছি সবরকম স্বসুখ বর্জন করা খুব কঠিন। কেননা কেউ কেউ কষ্টভোগ করেও সুখ পায়। এমনকি বৈরাগ্যেও আত্মসুখ থাকতে পারে। অর্থাৎ গাধো, আমি কেমন সব ত্যাগ করেছি। এ নিয়ে একটা গল্প আছে খুব চমৎকার। শুনবেন?

: সব কিছু শুনব বলেই তো আসা।

মৌজ ক'রে বেনোয়ারি বললেন, 'তাহলে শুনুন। জলিদও শোন। এ কিস্তা তোকে আগে বলি নি। একবার হজরত মোহম্মদ ধ্যানে বসেছেন। বহুক্ষণ ধ্যানের শেষে আল্লাতালা তাঁকে তিনটে বস্তু দিলেন—জহর, মধু আর আতর। জহর মানে বিষ, সাংঘাতিক বিষ। তো তিনি শিষ্যদের বললেন, 'এই নাও আল্লাতালা তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন মধু আর আতর। খাও মধু প্রাণ ভরে, আর আতরের খোশবু তোমাদের জীবন মাত ক'রে দিক।' কিন্তু তিনি নিজের জন্যে রাখলেন জহর। সেইটাই তো ঠিক। কিন্তু তাতেও সমস্যা।'

* যাকাত বলতে বোঝায় আত্মার পবিত্রতা সাধনা করা, ঘুরে ঘুরে সাফ করবার ক্রিয়া।

জলিল বলল, 'সমস্যা কিসের ? হজরত মোহম্মদ তো ঠিকই করেছেন। নিজের জন্যে খারাপটা রেখে ভালোটা দান করেছেন।'

: আরে ব্যাপারটা আমি আগে বুঝি নি। আমি যৌবনে যখন মোহম্মদ শাহর কাছে সুফীমতে কল্‌মা সাবেদ (দীক্ষা) নিই তখন এই গল্পটা একদিন ওঠে। গল্পের শেষে মোহম্মদ শাহ বললেন, হজরত মোহম্মদ ঐ যে জহরটা নিজে নিলেন, তাতে পরে শিষ্যরা বলেছিল, তিনি নিজে কষ্টটা নিলেন আর আমাদের দিলেন আনন্দ। সেটা কি ঠিক হল ? কষ্ট করতে যে আমাদেরও ইচ্ছে হয়। হজরত আমাদের কষ্ট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করলেন। কষ্ট না করলে কি আল্লাতালাকে কোনোদিন পাওয়া যায় ? এ ব্যাখ্যা মহম্মদ শাহ-র কাছে শুনে আমি তো অবাক। সেই থেকে বুঝলাম কাকে বলে আত্মসুখ। নিজে কষ্ট পাওয়াও একটা বড় সুখ। আল্লার এ কি তাজ্জব বন্দোবস্ত !

আমি বললাম, 'চমৎকার এই কাহিনী। আত্মসুখের সংজ্ঞাটাও বেশ নতুন। তাহলে বোঝা গেল যাকুনী যাকাতের মানে হল নিজের প্রিয়বস্তু দান করা। কিন্তু জাহেরী যাকাত মানে কি ?'

: জাহেরী মানে আমরা বলি চল্লিশভাগের একভাগ দান। দেখবেন জুম্মার নামাজের পর মসজিদের বাইরে সার-দিয়ে-বসে-থাকা গরীব দুঃখী অনাথ আতুরকে ভক্ত মুসলমানরা দান খয়রাত করছে। সে তো খুব ভালো কাজ। কিন্তু শুধু দান করলেই হবে না। আসলে জাহেরী যাকাতের একটা অন্য মানে আছে। আমরা বলি, আল্লা আমাদের দেহভাণ্ডারে চল্লিশ গজ মালসহ আমাদের পয়দা করেছেন। মুর্শিদ ধরে, মুরিদ ধরে, নিজের খাস মহব্বতের যে মাল আমাদের শরীরে আছে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ আল্লার রাহে যাকাত দাও।

আমি বেনোয়ারি ফকিরের কথা শুনে বুঝলাম ধর্মের ব্যাখ্যায় একটা সমান্তরাল চিন্তা লোকধর্ম সর্বদাই ক'রে চলে। শাস্ত্র আপ্তবাক্য পুরোহিতের নির্দেশের বাইরে একটা স্বাতন্ত্র্য কিন্তু বলিষ্ঠ জীবনভাবনা লোকধর্মের মর্মমূলে প্রাণসঞ্চার করে। আন্দাজী কথাবার্তার অন্তঃসারশূন্যতা তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সঠিক পথটা ধরতে চায়। এ পথে বহু মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় না। কিন্তু যে ক'জন এতে আসে তারা বুঝে শুনে যাচাই ক'রে আসে। আর তারা টলে না। 'আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তরফ খাড়া হলে'-ই যে নামাজ হয় না দুদ্দু শাহ-র এই কথা গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। 'না দেখে রূপ করে সেজদা, অন্ধ তারে কয়' — দুদ্দুর এই কথাটা প্রকাশ্যে বললে লাঠি পড়বে মাথায়। বেনোয়ারিদের গহন পথ তাই কয়েক শতাব্দী ধরে হৃদয়বান মানুষের বোধ আর মুক্তবুদ্ধির দ্বারে মিলতে চায়। প্রতিহত হয় দ্বারে দ্বারে। অপমান নামে। আঘাত আসে। ক্লান্ত তবু ক্লান্তিহীন সেই মানবিক যাত্রা। সত্যিই এ পথ বড় নির্জন। আজকের এই মাঠ-পুকুর গ্রামের দুপুরের মতো। সমস্ত গ্রামটা যেন ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কেবল

একটা দু'টো ঘুঘু ডাকছে।

বিশ্রাম আধোনিদ্রা অনুচিন্তা আর টুকরো ভাবনায় কেটে গেল একটা পুরো দিন। পাশের ঘরে বেনোয়ারি তাঁর বিশ্রামের শেষে আমার দাওয়ায় এসে বসলেন। প্রশান্ত ধ্যানমৌন আনন। চোখ দু'টির দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী। বোঝা যায় কি একটা অন্তঃশীল মনের ক্রিয়া চলছে। ফকিরিতত্ত্বের খুব গূঢ় অন্তঃপুরে নাকি সুফী চিন্তাধারা মিশে আছে। সাতগেছিয়ার জাহান ফকির আমাকে একবার বলেছিল, 'যে আল্লাহ্ আমাদের সৃজন পালন ধ্বংস করেন তার তত্ত্ব বা তৌহিদ অনুসন্ধানই সুফীদের প্রধান কাজ।' এই মুহূর্তে বেনোয়ারি কি সেই চিন্তায় অন্তর্ময়? নইলে দৃষ্টি কেন অত সুদূর!

আমি জলিলকে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার গুরু যেন এ জগতেই নেই। কিসের ধ্যান করছেন?'

জলিল খুব নিচুস্বরে আমাকে বলল, 'বাবা রোজায় রয়েছেন তো! এটা যে রমজান মাস।'

চমকে গেলাম একেবারে। এতসব কথাবার্তা, শরীয়ত নিয়ে বাহাছ আর শেষ কালে রোজা? তাছাড়া এ কেমন রোজা? এই তো দুপুরে আমার সঙ্গে ভাত খেলেন দিব্যি, তাহলে? মনটা খুব সংশয়ী হয়ে ওঠে। খানিক পরে বেনোয়ারি জপ শেষ ক'রে আমার দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন। অর্থাৎ ভাবটা যেন, আপনার কি কোনো বিশেষ জিজ্ঞাসা আছে? জিজ্ঞাসা তো আছেই, তবে আপাতত কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা কাটিয়ে উঠে একটু পরে বললাম, 'আপনি রোজায় বিশ্বাসী?'

প্রসন্ন হেসে বেনোয়ারি বললেন, 'কলমা-রোজা-হজ-যাকাত-নামাজ সবেতেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু তার আচরণ আলাদা। আমাদের কাজ ভেতরে ভেতরে। আমাদের অন্দরের মণিকোঠায় আল্লার বারামখানা। সেখানে যাওয়াই আমার হজ, সেখানে আমার বিশ্বাসই কলমা, সেখানে আমার সর্বদা চলছে বাতেনী নামাজ, সেখানে আমার নফ্সকে যাকাত দিয়েছি, সেখানে আমার রোজার ছিয়াম।'

: ছিয়াম মানে কি উপবাস?

: উপবাসের সঙ্গে সংযম। নফ্সকে শাসনে রাখাই রোজা। দিনে উপোষ রাতে খাওয়া, ও তো বাদুড়ের ধর্ম। মুখে রোজা রেখে অন্তরে কাম সেটা রোজা নয়। কিছু খেলাম না অথচ একজনকে চড় মারলাম তাতে হাতের রোজা নষ্ট। সারাদিন উপোষ দিলাম অথচ মনে রইল হিংসা অসূয়া দ্বেষ তাহলে মনের রোজা নষ্ট। রোজা মানে আমরা বলি আত্মশাসন।

স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। যেন চেতনার প্রজ্ঞার কোনো জটিল উৎস থেকে উঠে আসছে কথাগুলো। যেন আল্লার সেই আর্তি ফকিরের মুখে, যার ভাষ্য হল, 'আমি তোমাতে আছি, তুমি কই আমাকে তো দেখছ না?' মানুষটার

আমারই পাশে বসে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরে। কী আশ্চর্য, এই কি সেই পাখিপোষা মায়ালি মানুষটা? ধ্যানের অন্তর্নিবিষ্টতার এতটা শক্তি? একেই বোধহয় বলে সিদ্ধাবস্থা। জলিল কানে কানে খুব গাঢ়স্বরে বলল, 'বাবু, এনার শরীয়ত হাসিল হয়ে গেছে। উনি এখন মারফতের পাকা রাস্তায় সোজা উহরে উঠে পড়েছেন। ওঁকে সেজদা দিন।'

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াই। অভিবাদন করি।

সূর্য পাটে বসেছে। রাগ রক্তিম মাঠপুকুর গ্রাম থেকে এবার বিদায়লগ্ন। শেষবারের মতো বেনোয়ারি ফকিরকে বিনতি জানিয়ে বলি, 'চলে যাচ্ছি এবার। আবার কবে আসব জানি না। শেষ কথাটা বলুন আপনার। কি পেলেন? কি বুঝলেন? মনের মধ্যে কোন কথাটা ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরব?'

যেন ফেরেস্তার মর্ত্য প্রতিনিধির মতো উঠে দাঁড়িয়ে বেনোয়ারি বললেন, 'তাঁকে জানা যায় না—এইটে জানাই চরম জানা। চিরপবিত্র আল্লাহ্, তাঁর কাছে পৌঁছোবার রাস্তাটাই তাঁর তৈরি মানুষের সামনে খোলা রাখেন নি। একটা রাস্তাই খোলা আছে শুধু—সেটা হচ্ছে তাঁকে জানা যায় না এই কথাটা জানার পথ।'

অনেকটা রাস্তা গিয়ে, প্রায় মাঠপুকুর গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে, একবার ফিরে তাকালাম জলিলের বাড়ির দিকে। দিগন্তবিসারী ধানক্ষেত পেরিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর। তার সামনে দু'টো মানুষের স্পষ্ট সিলুয়েট।

[কৃতজ্ঞতা : ফকির আবু তাহের। হাঁসপুকুরিয়া, নদীয়া ; আবুল বাশার। টেকা, মুর্শিদাবাদ।]

পুনর্মুদ্রণ।

অন্নদা।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

[সাহিত্য-সংহিতা। বৈশাখ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।]

১

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায়, তিনিও অধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, এবং একজন দীর্ঘশিখাযুক্ত, নামাবলি-পরিহিত ভট্টাচার্য্যের বংশধর হইলেও, বিধবা বিবাহটাকে হিন্দুশাস্ত্রের দৃঢ়বদ্ধ সীমার ভিতর আনিবার জন্য, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সহপাঠিগণের সহিত তুমুল বাক্যান্দোলন উপস্থিত করিতেন। এই সকল বাক্যান্দোলন কালে তাঁহার উৎসাহ-অগ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইত যে, তিনি অঙ্গলীলাক্রমে বলিতেন, যদি কোন ধর্ম্মোৎসাহী যুবক তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হ'ন, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি আপন পত্নীকে অবিলম্বে বিধবা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিতরূপ কথোপকথন কলিকাতায় "মেস্"এর বাসাতেই সংঘটিত হইত। পল্লিগ্রামের বাটীতে হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সধবা সহধর্ম্মিণী, সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে এমন এক ঝটিকা উৎপাদন করিতে পারিতেন যে, তাহাতে পত্নীকে বিধবা করিবার উজ্জ্বল আশাটি জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি পত্নীকে কোনক্রমেই বিধবা করিতে পারেন নাই। বরং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও এবংবিধ নানা উৎকণ্ঠ উপসর্গসমাকুল জীবনটা এমন আশ্চর্য্য-ভাবে জীবিত ছিল যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবপুরের স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে পঁয়ত্রিশ টাকা মাসিক দরমাহ পাইতেন, তাহার দ্বারা দুইবার অন্নধ্বংসকারিণী, ইলিস মৎস্যের মুণ্ড ও কাৎলা মৎস্যের পুচ্ছাভিলাষিণী এবং অঙ্গের অলঙ্কার দর্শনে অসূয়াপরতন্ত্রা সধবা পত্নীকে তিনি কোনমতে স্বামিভক্তি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইতেন।

না। হায়! তিনি কেন অলঙ্কারবিরাগিণী, একাহারতা, মৎস্যবিরতা বিধবা বনিতা বিবাহ করেন নাই?

ফলতঃ তাঁহার সংসার প্রথমতঃ কষ্টে, তৎপরে অতি কষ্টে চলিয়া, শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। এই সময়, তাঁহার একটি আত্মীয়, তাঁহাকে সুবুদ্ধি দিবার অভিপ্রায়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতা কিরূপে সংসার চালাইতেন? তিনি ত চাকুরি করিতেন না।"

এই প্রশ্নের পর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েক দিন ক্রমান্বয়ে ভাবিয়াছিলেন, "তাইত, বাবা কি ক'রে সচ্ছলে সংসার চালাইতেন? তিনি ত চাকুরি করিতেন না।" ভাবিয়া, ভাবিয়া, তিনি বিধবা বিবাহের আন্দোলনটি এবং চাকুরিটি জন্মের মত পদ্মার জলে ফেলিয়া দিয়া, গঙ্গা পার হইয়া, বর্দ্ধমান জেলায় আপন পল্লিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তথায়, এক উত্তমর্ণের নিকট পৈতৃক বাস্তবাটী বন্ধক রাখিয়া, তিন শত রজত মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিয়াল্লিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল; ঐ টাকার কতকাংশ ব্যয় করিয়া তিনি তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইল, পৌষ মাসে কৃষিলব্ধ শস্যরাশি, গৃহের পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের শোভা সংবর্দ্ধন করিল। এই কৃষিলব্ধ দ্রব্য হইতে বৎসরের আহারের জন্য পর্য্যাপ্ত ধান্য এবং গৃহসংস্কার ও গাভীর জন্য পর্য্যাপ্ত বিচালী রাখিয়া, তিনি বাকী সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিদধিক তিন শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করিলেন।

(১)	খিড়কীর পুষ্করিণী-সংস্কার	৩০ টাকা
(২)	গাভী খরিদ	৩৫ টাকা
(৩)	ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০ টাকা
(৪)	গৃহসংস্কার জন্য মজুরী	২৫ টাকা
(৫)	বস্ত্রাদি	৪০ টাকা
(৬)	৩০০ টাকার আট মাসের সুদ	১৮ টাকা
(৭)	মসলাদি	৩২ টাকা
(৮)	ঋণ পরিশোধ	১০০ টাকা
		৩১০ টাকা

বাগানের উদ্বৃত্ত তরকারি ও রবিশস্য যাহা বৈশাখ মাসে বিক্রীত হইল, তাহার মূল্যে নূতন বৎসরের কৃষিকার্য্যের ব্যয় ও গৃহস্থালীর অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বিঘ্নে সংকুলিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরের শুভ পৌষ মাসে—আহা! যে গৃহিণী এই শুভ মাসটিকে বিদায় দিবার সময় করুণ কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন, "এস পৌষ যেও না," তাঁহার নখালঙ্কৃত মুখে, ফুল চন্দন বিনা রসগোল্লা পড়ুক। সেই শুভ পৌষে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গণ, পুনরায় সুবর্ণবর্ণ শস্যসম্ভারে, অত্যন্ত সুশোভিত হইয়া

উঠিল। আবার অনাবশ্যক ধান্যাদি বিক্রীত হইল, এবং তিন শত চল্লিশ টাকা সংগৃহীত হইল। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় করিলেন।

(১)	গৃহিণীর জন্য দুই ছড়া মুড়কি মাদুলি ওজন ৩৷৷০ ভরি ২৩ টাকা হিসাবে	৮০৷৷০
(২)	ঐ পাটয়ারের খরচা	৷৷০
(৩)	ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০ টাকা
(৪)	গৃহিণীর জন্য বালুচরের চেলি	১৯ টাকা
(৫)	অন্যান্য বস্ত্রাদি	৩৮ টাকা
(৬)	শুইবার ঘরে বিলাতি মাটীর মেঝে	৫৪ টাকা
(৭)	২০০ টাকার এক বৎসরের সুদ	১৮ টাকা
(৮)	ঋণ পরিশোধ	১০০ টাকা
		৩৪০ টাকা

রবিশস্য, বাগানের তরকারি এবং পুষ্করিণীর মৎস্য বিক্রয় করিয়া, নব বৎসরের প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার উপর, কয়েকটা শ্রাদ্ধের পণ্ডিত বিদায়ে নিমন্ত্রিত হইয়া, চারিটা ঘড়া, দুইটা গাড়ু এবং নগদ প্রায় ৬০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধোপাজ্জিত শেষোক্ত বাটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার সিঁড়িটি ইষ্টকনির্ম্মিত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং প্রথমোক্ত তিন শত টাকা হইতে, চণ্ডীমণ্ডপে বিছাইবার জন্য দুইখানি সপ মাদুর ও একখানি সতরঞ্চ খরিদ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বৎসরের কৃষিজাত দ্রব্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি সংকুলান করিয়াছিলেন।

(১)	গৃহিণীর জন্য সোণার তাবিজ ৪ তোলা মায় মজুরী ২৩ টাকা হিসাবে	৯২ টাকা
(২)	রূপা বাঁধা হুকা ১টি	১২ টাকা
(৩)	ঐ হুকার বৈঠক	২৷৷০
(৪)	ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০ টাকা
(৫)	১০০ টাকার এক বৎসরের সুদ	৯ টাকা
(৬)	বস্ত্রাদি	৪৫ টাকা
(৭)	দ্বিতীয় গাভী খরিদের ঋণ পরিশোধ	৩০ টাকা
(৮)	ঋণ পরিশোধ	১০০ টাকা
		৩২০৷৷০

পূর্ব্বে আমরা এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, যে তিনি ঋণমুক্ত হইলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবেন; এবং গৃহিণীও আশা করিয়াছিলেন যে, তদুপলক্ষ্যে ত্রিবেণীর বাজার হইতে, দুইখানি কাল পাথরের "খোরা" এবং দুগ্ধ রাখিবার জন্য

একটি বড় রকম "ফীস্তুরে" বাটী ক্রয় করিবেন। কিন্তু, কার্য্যতঃ কণমুক্তির পর এ সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। অনুমান করি, অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। না ঘটিলে, সেই চঞ্চলা গৃহিণী চাবিমুখরিত বস্ত্রাঞ্চল মুখে দিয়া কমললোচনের দুই বিন্দু বারির ধারা এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিতেন যে, "বিবাহ বিভ্রাটে"র মিসেস্ কারমর্থা দুই খণ্ড বরফ ঘর্ষণে তেমন অগ্নি উৎপাদনে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ বৎসরে, প্রচুর বৃষ্টিপাত অভাবে বর্দ্ধমান জেলায় 'অজন্মা' হইল। যে সামান্য ধান্য উৎপন্ন হইল, তাহাতে সংসারের খরচ মাত্র অতি কষ্টে চলিল। সে বৎসর আর গৃহিণীর অলঙ্কার হইল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃষিজীবনের পঞ্চম বর্ষে, আবার প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল। তাহার অল্পমাত্র বিক্রয় করিয়া ভৃত্যের বেতন দেওয়া হইল। বাকী সমুদয় দুর্ব্বৎসরের জন্য সঞ্চিত করা হইল। এবারও গৃহিণী নূতন অলঙ্কার পরিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ বৎসরের টাকা নিম্নলিখিতরূপে খরচ হইল।

(১)	গৃহিণীর জন্য কণ্ঠমালা একছড়া তিন তোলা ২২ টাকা হিঃ	৬৬ টাকা
(২)	গৃহিণীর জন্য রূপার সোট (ত্রিশ বৎসর বয়সেও সোট পরিবার সাধ। ছিঃ !)	১৮ টাকা.
(৩)	গৃহিণীর জন্য সোণার নথ	১০ টাকা
(৪)	চাকরের বেতন (মাসিক চারি আনা হিসাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল)	৩৩ টাকা
(৫)	বস্ত্রাদি	৪০ টাকা
(৬)	পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমী খরিদ	১৫০ টাকা
		৩১৭ টাকা

সপ্তম বৎসরে.....

কিন্তু এই সময় আমার এক বন্ধু, আমার হস্ত হইতে লেখনীটি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন "ছি ছি ! তুমি করিতেছ কি ? একটা কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের আয়-ব্যয়ের তালিকা লিখিয়া, তোমার পাঠকের ধৈর্য্যকে যে একবারে প্রপীড়িত করিয়া তুলিলে।" সমাপ্তির ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধুবরের অনুরোধে আমার গল্পের প্রথম অধ্যায়ের অত্যন্ত অযথা উপসংহার এই খানেই করিতে হইল।

২

সালঙ্কৃতা গৃহিণী এবং গৃহ-দুগ্ধ-পুষ্ট পুত্র-কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েক বৎসর পরম সুখে জীবন যাপন করিলেন। সুখনিদ্রা ও সুআহার দাতা সংসারটি তাঁহাকে অত্যন্ত সচ্ছন্দে রাখিয়াছিল। এবং "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" এই কবিবাক্যটা যদি অত্যন্ত সত্য না হইত, তাহা হইলে বোধ করি

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও দুঃখ পাইবার কারণ থাকিত না।

গ্রামের হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ জমীদারের অর্থানুকূল্যে তিনি আপন বাটীতে একটি সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করিলেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পাঠাভিলাষী ছাত্রগণ আসিয়া, অনুস্বরযুক্ত শব্দের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নীরব গৃহটি ঝঙ্কারিত করিয়া তুলিল। জমীদার বাবু প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাদ্দিকে যে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহটি প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ বাস করিতে লাগিল। ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক হইত, জমীদারদিগের এবং গভর্ণমেণ্টের মাসিক বৃত্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংকুলান হইতে লাগিল। অধিকন্তু টোল সংস্থাপনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্যান্য অর্থাগমের পথ বিশেষরূপে সুগম হইল। শ্রাদ্ধাদিতে পণ্ডিত বিদায়ের আয়টা অনেক গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ব্রতনিয়ম ও পূজাপার্ব্বণে, গ্রামের এবং গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিস্মরণ হইতেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চারি পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটি সর্ব্বকনিষ্ঠা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন টোল খুলিয়াছিলেন, সে কন্যার বয়স তিন বৎসর। তখন সে পিতার দিকে আপন ছোট হাত দু'খানি তুলিয়া ধরিলে, গৃহিণী বলিতেন, "দেখ, দেখ, তোমার কাছে হাত তুলে বালা চাচ্ছে।" এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি গৃহিণীর এ সাধ পূর্ণ করিলেন। দুই ভরি টুক্‌টুকে সোণা দিয়া, সেই নধর হাত দু'টিতে দুই গাছি বালা পরাইয়া দিলেন।

অসচ্ছল অবস্থা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সচ্ছল অবস্থায় চারি পুত্রের পর একটি কন্যা হওয়ায়, কন্যাটির বড় বেশী আদর হইল। এবং গৃহিণী ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, সেই আদরিণী কিরূপে গঞ্জনাদায়িনী ননদিনী এবং বউকাঁটকী, চোখখাকী, পোড়ারমুখী শাশুড়ী সমন্বিত শ্বশুরবাটীতে, গৃহানুলেপন করিয়া, বস্ত্রের রন্ধনকার্য্য একাকী সম্পন্ন করিয়া অবস্থিতি করিবে। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ও প্রিয়তমা প্রাজ্ঞীর মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার স্বতঃসিদ্ধ ফল এই হইল যে, কন্যার যাহাতে বিরাগমন না হয়, তিনি তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলেন। টোলের একটি মাতাপিতৃহীন বালকের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, তাহাকে গৃহাধিষ্ঠাতা জামাতা করিয়া রাখিলেন।

যখন এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইল, তখন কন্যার বয়স সাত বৎসর মাত্র। মেজ দাদার মুণ্ডনের সময়, সাময়িক সানাই-ধ্বনি-বিনিন্দিত ক্রন্দনের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া জনক জননী যে মস্তকটি মুণ্ডিত করিয়াছিলেন, তখন তাহা হইতে কেশোদ্গম হইয়া, কন্যার স্কন্ধমাত্র আবৃত করিয়াছিল। মুষিকবিবরবিক্ষিপ্ত দন্তের স্থানটি নবাগত দন্তের দ্বারা তখনও সম্যক্ অধিকৃত হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদরিণী কন্যার নাম অন্নদা। আর যে ছাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমান্ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

শশিভূষণ সুন্দর, পাঠান্তরত এবং জামাতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু তাহার বয়স বার বৎসর মাত্র। গৃহ-জামাতা হইবার সুখটা সেই অল্প বয়সে সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের জামাতা হইয়া, সে যে সুখের প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহা বোধ করি, সে সবটুকু প্রাপ্ত হয় নাই। পুত্রস্থানীয় হইলেও, বুঝি গৃহিণী তাহাকে পুত্রগণের ন্যায় আদর করিতে পারিতেন না। তাহার আহারের ব্যবস্থা বুঝি পুত্রগণের অনুরূপ হইত না। জ্যৈষ্ঠ শ্যালকটি মৎস্যমুণ্ডের উপর যেরূপ নির্ব্বিবাদ অধিকার সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা তাহার সকল সময় পছন্দ হইত না। সে বুঝি মনে করিত, জামাতারও কদাচিৎ তাহাতে অধিকার থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এবং সময় সময় রঘুবংশের টীকার মধ্যে এই "প্রাংশুলভ্য" মৎস্যমুণ্ডটা এমন আশ্চর্য্যভাবে প্রবেশ লাভ করিত যে, মৎস্যমুণ্ডের অস্থি-যুক্ত টীকাটি কণ্ঠস্থ করা একান্ত দুরূহ হইয়া পড়িত। টীকা ও মৎস্যমুণ্ড 'বাগার্থের' ন্যায় 'সম্পৃক্ত' হইয়া, 'বাগার্থ-প্রতিপত্তির' পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত করিত। তাহার 'প্রদীপার্চ্চির' ন্যায় বুদ্ধিটি 'দশান্ত' প্রাপ্ত হইত।

বিবাহের পর, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি শশিভূষণ দুঃখের পারে আসিতে পারিল না। প্রতি দিন নূতন নূতন অবজ্ঞা অনুভব করিতে লাগিল। কেবল শ্বশুর বা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অনাদর পাইলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু শশিভূষণ দেখিল যে, তাহার ষাদশ বর্ষীয়া পত্নীও তাহাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সে বৃথায় পত্নীকে স্বামিভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল। প্রত্যুষে সে পাপীষ্ঠা রন্ধনগৃহের নিরুপদ্রব কোণ্‌টিতে বসিয়া, ভর্ত্তার আহারের বহুপূর্ব্বেই আহার কার্য্য সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে, 'পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র' ইত্যাদি বলিয়া, শশিভূষণ যখন অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত নিজের কবিতাটির ছন্দ-শুদ্ধি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিত, প্রেয়সী অন্নদা তখন নিতান্ত পাপীয়সীর ন্যায়, মাতার অঞ্চলাশ্রয়ে পলায়নের উদ্যোগ করিত। রাত্রে, অনর্গলিত দ্বারগৃহের মধ্যে শয়ন করিয়া, একটি মল-মুখরিত-শ্রীচরণ-ধ্বনি শুনিবার জন্য শশিভূষণ যখন বিশেষরূপে জাগ্রৎ থাকিত, তখন অন্নদা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অভেদ্য দুর্গসম গৃহের অভ্যন্তরে শুইয়া, অত্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত থাকিত।

বয়ঃক্রমে, শশিভূষণ ষোড়ষ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল; এ বয়সে, পিতাও পুত্রকে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে চাণক্যের শাস্ত্রানুযায়ী বাধ্য। এই বয়সে, তাহার আপনার বিবাহিতা স্ত্রী কি না তাহার সহিত মিত্রতা না করিয়া শত্রুতা করিল। এ অবজ্ঞা, তাহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। মেঘদূত-পড়া শশিভূষণ, না জানি বিছানায় শুইয়া কত শ্লোকই আবৃত্তি করিত। সে……।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আবার আমার লেখনীর গতিরোধ করিয়া দিলেন; বলিলেন, "তুমি যদি একটা টোলের ছাত্র ও একটা কাঁদুনে মেয়ের কথা দিয়া

তোমার গল্পটা পূর্ণ করিয়া ফেল, তাহা হইলে, তোমার আর লিখিবার আবশ্যক নাই।" তবে, হে বালক শশিভূষণ! অয়ি দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা অন্নদা! তোমরা চলিয়া যাও। চারি বৎসর পরে, প্রদীপ্ত যৌবন লইয়া আইস; আসিয়া আমার এই অন্ধকার আখ্যায়িকা আলো করিও।

৩

চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বালিকা অন্নদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী হইয়াছে। তাহার দন্ত বিকশিত না থাকিলেও, শশিভূষণ তাহার মুখাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে যে, তাহা তাহার নখ-বিদ্ধ মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল;—মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দন্ত বলিলে, তোমরা যেন বুঝিও না, সেই মুক্তা বর্দ্ধমানের মহারাজের কণ্ঠ-হারের মুক্তার ন্যায়। সেরূপ বিশাল মুক্তাদন্ত নিশাকালে উন্মুক্ত করিলে, আমরা বাঙ্গালী, আমরা ত কম্পিত-কলেবর হইবই; বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গবিজয়ী গুর্খা পল্টনগণও রণবিমুখ হইবে। সে দন্ত মুক্তার ন্যায়; কিন্তু সে মুক্তা আমার বালিকা কন্যার নলকের মুক্তা অপেক্ষা ছোট। আর সেই চুল, একদিন যাহা গ্রীবার সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই, তাহা এক্ষণে কবি ভারতচন্দ্র যাহার সহিত মেদিনীর তুলনা করিয়াছেন তাহার, এবং যুবক শশিভূষণের ধৈর্য্যের সীমা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহা কক্ষের সহস্র সর্পপুত্রগণ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত, ইন্দ্রাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। দাঁত ও চুল ছাড়া যুবতী অন্নদার আর যাহা কিছু বর্ণনীয় ছিল, আমরা তাহার বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম। তোমরা ভাল ভাল উপন্যাস হইতে তাহা দেখিয়া লইও।

পিতৃ-অন্ন-প্রতিপালিত সুলভ স্বামীটিকে যে ভালবাসিত না, এমত নহে। তাহার হৃদয়ে প্রেম ছিল; কিন্তু বিরহে যে আগ্রহের অগ্নি সৃষ্ট হয়, তাহার প্রেমে তাহা ছিল না। বিচ্ছেদব্যথিতারা, প্রণয়াবসরে যে পূজার দ্রব্য সঞ্চিত করিবার সুবিধা পাইত, বেচারা অন্নদার অদৃষ্টে সে সুবিধা ঘটে নাই। দৈনিক ক্ষুদ্র পূজায় সব ব্যয় হইয়া যাইত; একটা মহাপূজায় স্বামীকে সুখী করিতে পারে নাই। শশিভূষণের বন্ধুগণ বৎসরান্তে শরৎকালের মহাপূজার সময় বাটী আসিয়া, সঞ্চিতপ্রেমা শরদিন্দুনিভাননাদিগের নিকট যে মহাপূজা প্রাপ্ত হইত, সে মহাপূজা শশিভূষণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাদের অনিদ্র নিশীথের অসহ্য প্রেমকাহিনী শশিভূষণ নীরবে সহ্য করিত।

কিন্তু সকলেরই সহ্যের একটা সীমা আছে। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট মৎস্যমুণ্ড এবং পত্নির নিকট প্রেম না পাইয়া, হতভাগ্য শশিভূষণ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর একটা তুচ্ছ ঘটনায় শ্বশুর মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া, সে নিভৃতে অন্নদার নিকটও অত্যন্ত তিরস্কৃত হইল। সেই দিন রাত্রের আহারাদির

পর শয়নকক্ষ-প্রবেশোন্মুখ শশিভূষণকে দেখিয়া ক্রোধান্বিতা অন্নদা, অতঃপরক্ষণে, বলিয়া ফেলিল, "আমার বাবাকে যে মন্দ কথা বলিয়াছে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাহি না।" বলিয়া, ভিতর হইতে কক্ষের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

মানুষের মনের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। এমত নহে যে, গৃহজামাতা শশিভূষণ পত্নীর নিকট পূর্ব্বে আর কখন রূঢ় কথা শুনে নাই। পূর্ব্বে এমনই রূঢ় কথা সে বহুবার শুনিয়াছিল। শুনিয়া ক্ষুব্ধমাত্র হইয়া সে তাহা সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু আজ—আমরা ত বলিয়াছি মানুষের মনের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না—আজ শশিভূষণ পত্নীর তিরস্কার সহ্য করিতে পারিল না। বন্যায় জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অশ্রুরাশিতে শশিভূষণের চক্ষু দুইটি ভাসিয়া গেল।

অর্গল বন্ধের সময় অন্নদা চকিত নেত্রে সে অশ্রুপ্লাবন দেখিয়াছিল। কিন্তু অভিমানিনী স্বামীকে গৃহাভ্যন্তরে আসিবার জন্য আহ্বান করে নাই।

শশিভূষণ গৃহদ্বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অশ্রুজলে কপাটগাত্র সিক্ত করিল। বুঝি রুদ্ধকণ্ঠে দুইবার অন্নদাকে ডাকিয়াছিল। কিন্তু অন্নদা সে আহ্বানে উত্তর দেয় নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

তথায় কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুপ্লাবিত এক খণ্ড কাগজের উপর লিখিল,—"অন্নদা, তুমি আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ, তাই তোমায় ছাড়িয়া চলিলাম। ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। ইতি। শশী।"

অর্দ্ধরাত্রে যখন অন্নদার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে অভ্যাসবশতঃ নিদ্রালস বাহুটি স্বামী-অঙ্গ-স্পর্শ লালসায় প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু বিছানায় ত কেহ নাই। স্বামীকে যে সে বিদায় করিয়া দিয়াছে। সে যে আর তাহার মুখ দেখিবে না। মূর্খা! তুমি আপনার মন বুঝিতে পার নাই।

অন্নদা মনে করিল, "বুঝি এখনও কক্ষদ্বারে তাহারই অনুগ্রহ-প্রতীক্ষায় শশী দাঁড়াইয়া আছে।" সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, দরজা খুলিয়া, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। কই? কেহ ত নাই!

অন্নদা বিছানায় আসিয়া শুইল। কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রাসুন্দরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্বামীর ন্যায়, তাহাকেও কি বাহিরে রাখিয়া, অন্নদা কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়াছিল? তা, নিদ্রা যাক্। এত গাত্র জ্বালা কোথা হইতে আসিল? বিছানাটা যেন সহস্র বিছার ন্যায় অন্নদাকে দংশন করিতে লাগিল। বিছানা ত্যাগ করিয়া, সে বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিল। নীল আকাশে নীরবে তারাসকল জ্বলিতেছিল। আর তারাসকলের মধ্যবর্ত্তী ও কি? —বল দেখি অন্নদা, ও কি? শশি? শশি, শশি, শশি! আকাশের শশি! তুমি কি অন্নদার শশীর চেয়ে সুন্দর?

সে রাত্রি প্রভাত হইল। অন্নদা কক্ষের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিল। দুই একটা কাক এবং মাতাকে ছাড়া সে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না,—তখন

অন্য কেহ উঠে নাই। অন্নদার মাতা বলিলেন, "এত সকালে কেন উঠিলে? যাও আবার শোও গে। শশী কি বাহিরে উঠিয়া গিয়াছে?

অন্নদা। সে বাড়িতে ঘুমায় নাই।

মাতা। কেন?

অন্নদা। বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিল ব'লে, আমি রাগ ক'রে, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলাম।

মাতা। বেশ ক'রেছিলি।

মা ত অন্নদাকে গালি দিল না। বলিল "বেশ ক'রেছিলি।" "বেশ ক'রেছিলি"—কথাটা অন্নদার মোটেই ভাল লাগিল না। হায়! তাহাকে কি কেহ নিন্দা করিয়া গালি দিবে না? নিন্দা ও গালি বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহার অঙ্গে বর্ষিত হইলে, বুঝি তাহার অঙ্গ কিছু শীতল হইত।

সূর্য্য উঠিল; তবে কি শশীকে দেখিবার আশা অন্নদা ত্যাগ করিবে? গৃহের যেখানে যত উন্মুক্ত পথ ছিল, তাহার ভিতর দিয়া, দিকে দিকে অন্নদা অনুসন্ধান-দৃষ্টি পাঠাইয়া দিল। তাহা বহির্বাটীর প্রত্যেক নিভৃত কোণটী অনুসন্ধান করিয়া, নিরাশাবনত হইয়া গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা বন্দনার পর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শশী কোথায় গেল? তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন?" গৃহিণী বলিলেন,—"সে কাল রাতে বাহিরে শুইয়াছিল; বোধ হয় বাহিরেই আছে।" "না, তাহাকে ত বাহিরে দেখি নাই।" "তবে বোধ হয় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে।"

গৃহের ভিতর অন্নদা ছিল; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে মাতাপিতার কথা শুনিতেছিল। সহসা তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া গেল; অঞ্চলবস্ত্রে সে জল নিবারিত হইল না। রুদ্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে সে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "না মা, আমি জানালা হইতে দেখিয়াছি সে কোথাও বেড়াইতে যায় নাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, আমি খুঁজিয়া দেখিতেছি, কোথায় গেল।"

এইরূপে শশিভূষণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। প্রথমে একে ওকে সামান্যভাবে জিজ্ঞাসা করা হইল; তাহার পর, সূর্য্যের তাপ যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অনুসন্ধানের তেজও তেমনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু শশিভূষণকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। যাহারা বলিয়াছিল যে, আহারের সময় শশী নিশ্চয়ই প্রত্যাগত হইবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হইয়া গেল।

রাত্রি আসিল। সে কি রাত্রি, তা' অন্নদাই জানে। সে রাত্রি নিদ্রা আনে নাই, বিশ্রাম আনে নাই;—আনিয়াছিল উপাধান-সিক্ত-কারিণী অশ্রুধারা। বুকে, যেখানে বড় জ্বালা, অন্নদা সেই স্থানে প্রলেপস্বরূপ, একখণ্ড কাগজ বিছাইয়া রাখিয়াছিল। অভাগিনীর সেই প্রথম ও সেই শেষ প্রেমপত্র—শশিভূষণের পাঠগৃহে প্রাপ্ত সেই ক্ষুদ্র লিপি।

দুই দিন পরে, ক্রমান্বয় অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারা গেল, তাহা অতি ভয়ানক! অতি লোমহর্ষণ! কয়েকজন আত্মীয়ের পরামর্শে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, থানাগৃহের বাহিরে, কয়েকজন লাল পাগড়ি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া একটি শব পতিত রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতে এই শব উদ্ধৃত করা হইয়াছিল; মৎস্য বা অন্য কোন জীবে ইহার মুখের কিয়দংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, ইহা তাঁহারই জামাতা শ্রীমান্ শশিভূষণের মৃতদেহ।

যথাসময়ে বাটীতে সংবাদ আসিল। অন্নদা মাতার সহিত ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইয়া ক্রন্দন করিল।

৪

তখনকার মেয়েরা, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলার ঘন বৃক্ষলতাদিপরিবেষ্টিত, সভ্য জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি পল্লীগ্রামের মেয়েরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পড়িয়া এই তত্ত্বটি অবগত হইতে পারে নাই যে, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। পণ্ডিত-গণের যুক্তিপূর্ণ তর্ক অপেক্ষা, স্বপ্নের অসংলগ্ন প্রলাপে তাহারা তখন অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিত। অন্নদা কি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে স্বপ্নের কথা আর কাহাকেও সে বলে নাই। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখিয়াই সে বলয় বা রঞ্জিতপ্রাপ্ত বস্ত্র পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ ছিল।

কন্যাকে বৈধব্য-আচারে বিরতা দেখিয়া, কন্যামনবিদিতা মাতা সহজেই মনে করিলেন, বুঝি সে স্বামীর মৃত্যুঘটনাটা সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারে নাই; বুঝি তাহাকে জীবিত মনে করিয়া বৈধব্য আচারে তাহার অকল্যাণ করিতে সে সাহসী হয় নাই। কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে মাতা যাহা ভাবেন, অন্য লোকে তাহা ভাবে না। পল্লীবাসিনী সকলে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অন্নদার বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল।

অন্নদা নিন্দার ভয় রাখিল না। বস্ত্র ও বলয় সম্বন্ধে বৈধব্য আচার পালনে বিরত রহিল।

চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে আর শশিভূষণের কথা মোটেই মনে করিতেন না। ইহার জন্য তোমরা তাঁহার নিন্দা করিও না। সময় প্রতিদিন যে প্রলেপ অনুলেপন করিতেছিল, তাহাতে চারি বৎসর পরে শোকের ক্ষতের চিহ্নমাত্র না থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু শশিভূষণের কথা না ভাবিলেও তিনি প্রিয়তমা একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা অত্যন্ত ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লুপ্ত বাল্যসংস্কারগুলি আবার

আস্তে আস্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। কন্যার দুঃখ দেখিয়া, বিশেষতঃ তাঁহাকে বৈধব্য-আচারে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, তাহাকে পুনরায় বিবাহিত করিবার ইচ্ছাটি এমন প্রবল-ভাবে তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল যে, সমাজের অনুশাসন তাহা কোনক্রমে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দুই এক জন আত্মীয় বন্ধুর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার কন্যার পুনঃ বিবাহ দেন ; এবং পরাশর সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ; এবং কন্যাও বোধ হয় ঐরূপ বিবাহে অমত করিবে না। তাঁহার প্রমাণ বা যুক্তিগুলি সংস্কার-সমাচ্ছন্ন বন্ধু বা আত্মীয়গণ অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাহার গোপনীয় কথাগুলি, তালপুকুরের ইষ্টকময় অবতারণীর সান্ধ্য-সম্মিলনীতে, গাত্রমার্জ্জনকারিণী, ছি-ছি নিনাদিনী, গণ্ডস্যন্তকরতলা অবলাগণ কর্ত্তৃক ভৈরবনাদে পরদিন যে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত—অত্যন্ত নিশ্চিত।

গ্রামের লোকে, বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্যের নিতান্ত আত্মীয় এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অত্যন্ত গোপনে যে সকল শুভ কথার আলোচনা করিলেন, তাহার প্রভাবে টোলের ছাত্রগণ সহসা অধ্যাপকের মূর্খতা অনুভব করিতে পারিল ; গ্রামের মহানুভব জমীদার মহাশয় সহসা অর্থাভাব অনুভব করিলেন। ছাত্রগণ অন্যত্র চলিয়া গেল ; জমীদার মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিলেন। শ্রাদ্ধাদিতে পণ্ডিত বিদায়ের নিমন্ত্রণ রহিত হইয়া গেল। অধিক কি, গ্রামে ব্রত-নিয়ম-উপলক্ষে যে ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, তাহাতেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিমন্ত্রিত হইলেন না। গ্রামবাসিনী কুঞ্চিতনাসা ভামিনী-গণের রোষ-প্রজ্বলিত চক্ষুগুলি, অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের ন্যায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণীর এবং কন্যার বহির্গমন নিষেধ করিয়া দিল।

কিন্তু এরূপ শাসনে পৃথিবীর কেহ কখন শাসিত হয় নাই, শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শাসিত হইলেন না। তিনি যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার সংকল্প ততই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। বিধবা কন্যাকে অতি সত্বর বিবাহিত করিবার জন্য, তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। যে গৃহিণী একদিন তাঁহাকে কটাক্ষে শাসন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সে দিন ছিল না, তথাপি তিনি স্বামীর পদতলে পড়িয়া বার বার মিনতি করিলেন, তাহাতেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিচলিত হইলেন না।

এ সম্বন্ধে গৃহিণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আরও কিছু বলিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্নদা স্বপ্নের কথা ভাবিয়া, তাহাতে বাধা দিল। বলিল, "মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। ভগবান্‌কে ডাক, যাহা ভাল তাহা তিনিই করিবেন।"

অন্নদা, চারি বৎসরকাল ক্রমাগত ভগবান্‌কে ডাকিয়াছে। গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ডাকিয়াছে। বসিয়া ডাকিয়াছে, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ডাকিয়াছে। উঠিতে বসিতে শুইতে করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, "হে ভগবন, হে ঈশ্বর, হে

দীনবন্ধু, দয়া করিয়া, নরকের তীব্র—অনন্ত অগ্নিতে এ স্বামিঘাতিনীকে দগ্ধ কর, তোমার চক্রে এ পাপিনীকে নিষ্পেষিত কর। যে জিহ্বা স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা, হে মধুসূদন! ছিঁড়িয়া ফেল, খণ্ড খণ্ড কর, নরকের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ কর। দাও নাথ! পাঠাইয়া দাও, যমদণ্ডধারী দূতগণকে পাঠাইয়া দাও; তাহারা এ পাপ দেহ দণ্ডপ্রহারে নিপীড়িত করুক।"

মাতা গৃহান্তরে চলিয়া গেলে আজ আবার অন্নদা ভগবান্‌কে ডাকিল। অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া, অনাবৃত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া ডাকিল। তাহার পর গললগ্নীকৃত-বাসা হইয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হইল।

গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া, অন্নদা বিপদোদ্ধারকামিনী হইয়া যখন বার বার মধুসূদনকে ডাকিতেছিল, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে বসিয়া, কন্যাকে পুনঃ বিবাহকামিনী জানিয়া, বিধবা-বিবাহ-কামী, হিন্দু সৎপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। কেহই তাঁহাকে বুঝাইতে পারে নাই যে, তাঁহার কন্যা বাস্তবিক বিবাহকামিনী নহে। কন্যার কাতর ও সজল চক্ষুও তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

তৎকালে, বিধবা-বিবাহকামী পাত্র পাওয়া একবারে অসম্ভব ছিল। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার কতকগুলি বাল্য বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে হইল। তাঁহারা একটি পাত্রের সন্ধান দিল। তিনি ইংরাজি-পোষাকপরা শিখাশূন্য হিন্দু। তাঁহার এক ভগিনীপতি বিলাত গিয়াছিল, এ জন্য, কোনও হিন্দু পরিবার তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সাহসী হয় নাই। এবং তাঁহার মাসিক আয় দুই-শত টাকার কম ছিল, এজন্য কোনও সমাজ-সংস্কারাভিলাষিণী বিদুষীও তাঁহাকে বিবাহ করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই। উপরোক্ত দুইটি কারণে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও পাত্রটির বিবাহ হয় নাই। তিনি একটি "সব ডেপুটী"; তাঁহার নাম শ্রীমান্ ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ "মিষ্টার ডি, মুখার্জি," এই নামে অভিহিত হইতে ভালবাসিতেন।

কি পদমর্য্যাদায়, কি বিদ্যায়, কি রূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে সৎপাত্র বিবেচনা করিলেন। কিন্তু ইহাকে সৎপাত্র বিবেচনা না করিলে, তিনি সে সময়, আর পাত্রান্তর পাইতেন না।

৫

হিমালয় অঞ্চলে গিরিগাত্রের এক স্থান ছায়াসমাকুল। বুক, কটুস, কাপাসীয়া প্রভৃতি বৃহৎ পার্ব্বত্য বৃক্ষসকল সুশীতল ছায়া ঢালিয়া সেই স্থানটিকে বড় মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল, এবং পল্লবপরিপূর্ণ শাখাবাহুর দ্বারা একটি বৃহৎ গুহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

এই গুহামধ্যে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তোমরা তাঁহার নাম বহুবার শুনিয়াছ। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-যোদ্ধা দন্তুপন্থ। ইতিহাসে তিনি নানাসাহেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। তোমরা যদি শুনিয়া থাক যে, ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁহার ইহজীবন শেষ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে কথা বিশ্বাস করিও না। যদি শুনিয়া থাক, দন্তুপন্থ মূর্খ ছিল, তাহা হইলে তাহাও বিশ্বাস করিও না। তিনি বানপ্রস্থ্য অবলম্বন করিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে জ্যোতিষের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতারক ছিলেন না, প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যদি নরহত্যাকারী বল, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রত্যেক বীরপুরুষকে নরহত্যাকারী বলিও। যাঁহার জন্য সহস্র সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারিয়াছিল, যিনি বহু লোকের পূজা পাইয়াছিলেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। আমরা গল্প লিখিতে বসিয়াছি, ইতিহাস লিখিতে বসি নাই; সুতরাং এস্থলে তাঁহার বিচিত্র জীবনকাহিনী বর্ণনীয় নহে।

গুহার বাহিরে এক পুরাতন পিপ্পলি বৃক্ষের ছায়ায় একখণ্ড পরিষ্কৃত শিলাখণ্ডের উপর দন্তুপন্থ বসিয়াছিলেন। শিষ্যগণ আহারীয় আহরণার্থে সপ্ত ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিল! কেবলমাত্র একজন শিষ্য তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতেছিল। তোমরা যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, দন্তুপন্থের নিকট আজ যে শিষ্যটি বসিয়াছিল সে অন্য কেহ নহে, সে আমাদের পরিচিত শশিভূষণ।

চারি বৎসর পূর্ব্বে থানাগৃহের সম্মুখে যে শব দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার জামাতার মৃতদেহ, তাহা প্রকৃতপক্ষে অপর কোনও অপরিচিত, অনুদ্দিষ্ট পথিকের মৃতদেহমাত্র। শশিভূষণ যে মৃত হয় নাই, এক স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা তাহা অন্নদাকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

শশিভূষণ সন্ন্যাসী সাজিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিল। ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানা নবীন স্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষা অত্যন্ত সহজ হইয়াছিল। ভ্রমণ-ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভলালসায় যখন সে কোনও বৃক্ষতলে উপবেশন করিত, তখন কৌতূহলাক্রান্তা গ্রাম্য স্ত্রীরা ভক্তিগদগদচিত্তে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইত। কেহবা শোভনথালীতে, ফলমূল মিষ্টান্নাদি সুশোভিত করিয়া শশিভূষণের আহারার্থ লইয়া আসিত। কেহ বা প্রণামীর স্বরূপ কিছু মুদ্রা আনিয়া দিত। শশিভূষণ শ্বশুরালয়ে যে আদর পায় নাই, শ্বশুরবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, সে আদর বহির্জগতে অত্যন্ত সুলভ;—কেবল মাত্র একখানি গৈরিক বস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে পারিলেই হইল।

এক বৎসরকাল নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে গোরক্ষনাথ-সন্দর্শনাভিলাষী কতকগুলি সন্ন্যাসীর সহিত শশিভূষণ নেপাল রাজ্য পর্য্যটন

করিয়াছিল। অবশেষে দন্ডুপন্থের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তথায় তাঁহার নিকট সে ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় উত্তম রূপ শিক্ষিত হইল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও কতক কতক জ্ঞানলাভ করিল। তথাপি মধুলোলুপ ছিন্নপক্ষ ভ্রমরের ন্যায়, তাহার লাঞ্ছিত মনটি অন্নদার আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। আবার তাহাকে দেখিতে পাইবার জন্য সে বারবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত।

শশিভূষণকে আহ্বান করিয়া দন্ডুপন্থ কহিলেন, "বৎস! তুমি স্বদেশে ফিরিয়া যাও, তোমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ কর, ইহাতে মঙ্গল হইবে।"

শশিভূষণ বলিল, "প্রভো! আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই, আমি তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছি।"

দন্ডুপন্থ। এক্ষণে তুমি পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমার স্ত্রী ক্রোধবশে যাহা করিয়াছে তজ্জন্য সে ক্ষমার যোগ্য। জ্ঞানহীনা অজ্ঞানে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য যদি তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যনামের অযোগ্য।

শশিভূষণ দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিল। পরদিন প্রত্যূষে দন্ডুপন্থ তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ ও পাথেয়স্বরূপ দুই শত আশরফি দিয়া বিদায় দিলেন। শশিভূষণ স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। সংসারবিরাগী আবার সংসারের পথে ফিরিল।

প্রেম তুমি অজেয়; তোমার জয় হউক। শত শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া কাতরা অন্নদা প্রেমের যে কাতর আহ্বান পাঠাইয়াছিল, সে আহ্বান শশিভূষণের সমস্ত হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল; করিয়া, তাহা অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কি মধুর আকর্ষণের বশে শশিভূষণ সংসারের পথে ফিরিয়াছিল? যে শক্তিতে পূর্ণিমার চাঁদ সমুদ্রের বক্ষ বিচলিত করে, চন্দ্রমুখী অন্নদা বুঝি তদপেক্ষা অধিক শক্তিতে শশিভূষণের হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত করিয়াছিল। এ আহ্বান, এ আকর্ষণ উপেক্ষা করা শশিভূষণের সাধ্যাতীত। তবে, যাও শশিভূষণ! তুমি গুরুদেবের আদেশ পাইয়াছ,—আশ্রম মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংসারাশ্রমে ফিরিয়া যাও। তথায় এক প্রেমময়ীর সহায়তায় এক প্রেমের রাজ্য বিস্তার কর। তোমার স্ত্রী যদি তোমায় ভাল না বাসে, তুমি তাহাতে ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি ভালবাসিও, প্রাণ দিয়া ভালবাসিও, তোমার প্রেম দিয়া তাহাকে প্রেমময়ী করিয়া তুলিও।

শশিভূষণ প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে দশক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিত, পরে সমস্ত দিন বিশ্রাম করিত। এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া, সে মোগলসরাই নামক স্থানে আসিয়া বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিল, এবং পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল।

কলিকাতায় দুই দিন অবস্থান করিয়া শশিভূষণ গৈরিকবসন ও দীর্ঘ কেশ ত্যাগ

করিল। এবং উপযুক্ত বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া শ্বশুরালয় উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যে পল্লীগ্রামে শশিভূষণের শ্বশুরালয়, তাহার নাম "চিত্রকোন"।—চলিত ভাষায় লোকে তাহাকে "চেৎকোনা" বলিত। চেৎকোনায় যাইতে হইলে "শক্তিগড়" নামক রেলষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়। শক্তিগড় হইতে চেৎকোনা প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

শক্তিগড় ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া শশিভূষণ একটা ছোট রকম বিপদে পড়িয়া গেল। সে দেখিল, ষ্টেশনের এক স্থানে, তাঁহার শ্বশুরমহাশয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এবং তাঁহার সহিত, সেই গাড়িতেই আগত কয়েকটি ভদ্রলোক কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। যদিও শশিভূষণ শ্বশুরালয়েই যাইতেছিল, তথাপি একটা ঘোর লজ্জা আসিয়া তাহাকে এমন ঘেরিয়া ফেলিল যে, সে তৎকালে এবং তৎস্থানে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া একটা বিপদ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু সে এই বিপদ্ হইতে সহজেই উদ্ধার পাইতে পারিয়াছিল। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত তাহার শ্বশুর মহাশয় বাক্যালাপ করিতেছিলেন,—তাঁহারা কি মায়া জানিতেন, বলিতে পারি না,—কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শত শত লোক তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল; এবং তাহার সহিত শশিভূষণের শ্বশুর মহাশয়কেও প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যদি আত্মগোপন করিবার জন্য শশিভূষণ ব্যস্ত না থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি সেও রহস্যোদ্ভেদের জন্য লোক সমারোহে যোগদান করিত। কিন্তু, সে তাহা করিল না। সে অত্যন্ত দ্রুতপদে চেৎকোনা অভিমুখে ধাবিত হইল। শুভ নিয়তি যেন তাহার পৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া, তাহাকে লইয়া যাইতেছিল।

৬

ক্ষুদ্র পল্লীর হৃদয় যতদূর উদ্বেলিত হইবার তাহা হইয়াছিল। প্রত্যেক বাপীতট অঙ্গনাগণের করকঙ্কণ-সঞ্চালনে, কুঞ্চিত নাসার নথান্দোলনে, ঊল্‌কি ও অলকা শোভিত ললাটের কুঞ্চনে এবং চুপি চুপির কল কল কল্লোলে বিশেষরূপ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপ তাম্রকূটের ধূমে ঘন মেঘ সৃষ্টি করিয়া, তর্কের অশনি-নিনাদে দিক্ সকল নিনাদিত করিয়াছিল। ময়রা মিন্‌সে সন্দেশের বায়না লইয়াছিল বলিয়া, ময়রাণী কর্ত্তৃক "ড্যাক্‌রা" ও "পোড়ারমুখ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। গোপবধূর শাসনে, গোপদল দ্বিগুণ মূল্যেও দধি সরবরাহ জন্য বায়না লইতে সাহসী হয় নাই। বরণাভিলাষিণী ভামিনীগণের স্মিত মুখ সুস্মিত করিয়া যে দীর্ঘ শ্লোকোচ্চারণের সুখ নাপিতপুত্র উপভোগ করিত, এবার সে, সে সুখের আশা, অতি যত্নে প্রশমিত রাখিয়াছিল। জমীদারের শাসনে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর ত্রিসীমানায় গ্রাম্য ধোবাসকল পদার্পণ করিত না। হায়! ভট্টাচার্য্য পরিবারের অন্নবিধা ও দুঃখ অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে।

আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ। এ বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামে না হইয়া, কলিকাতাতেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সুবিধামত বাড়ি না পাওয়ায়, এবং গ্রামে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে না পারায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চেৎকোনাতেই বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, খাদ্যদ্রব্য এবং নাপিত পুরোহিত ইত্যাদি কলিকাতা হইতেই আমদানী করিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, বর এবং বরযাত্রীদিগের পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে শশিভূষণ গোপনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে সন্ধ্যার অন্ধকারে চিরপরিচিত আপন শয়ন-গৃহের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। তথায় সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছিল, এবং দীপালোকে জ্যোতির্ম্ময়ী অন্নদার মুখ জ্বলিতেছিল। অন্নদা তখন চক্ষু মুদিত করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। সে ডাকার মত ডাকা। তোমরা ত জান, ভগবান্ সে ডাক শুনিয়াছিলেন।

স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ অন্নদাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে সে যেন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, গৃহের পশ্চাদ্ভাগের বাতায়নপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তদবধি সে প্রত্যহ ভগবান্‌কে ডাকিয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিত। আজ এই মহাদিনে, যে দিনকে সে জীবনের শেষ দিন বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে কায়মনোবাক্যে ভগবান্‌কে ডাকিয়া, উঠিয়া গবাক্ষপথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। দেখিল, সন্ধ্যার আঁধারে মৃৎপ্রাচীরের পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারি বৎসরকাল সে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিল, একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহা চিনিয়া ফেলিল। চিনিয়া বাক্যহীনা ধীরে ধীরে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষু দু'টি পৃথিবীকে আঁধার করিয়া ফেলিল।

বাহির হইতে শশিভূষণ ডাকিল, "অন্নদা"; আবার চারি বৎসর পরে সেই প্রেমপূর্ণ আহ্বান। অন্নদা কতবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, যেন একবারমাত্র সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া, জন্মজন্মান্তর বধির হইয়া থাকে।

অন্নদা মাতাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া বলিল, "না! সে আসিয়াছে; তুমি ডাকিয়া আন।"

মাতা অন্নদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কন্যা কি উন্মাদিনী হইল?

এই সময়ে, অন্নদার এক ভ্রাতা শশিভূষণকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদা পদপ্রান্তে পড়িয়া, মস্তক দ্বারা শশিভূষণের পদদ্বয় স্পর্শ করিল; অবিরল অশ্রুধারায় তাহা ধৌত করিয়া দিল। মাতা বিস্ময়াবসানে শশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস, বাবা এস।" শ্যালক বলিল, "তুমি আসল শশী না ভূত শশী।" শশিভূষণ কিছু বলিল না, সে ক্রন্দন করিতেছিল।

বহির্ব্বাটিতে আসিয়া শশিভূষণ দেখিল যে, চণ্ডীমণ্ডপটি বিশেষরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার বিবাহের দিনও এইরূপ আসন বিস্তৃত হইয়াছিল। আরও দেখিল যে, গোয়ালবাটীর এক পার্শ্বে, দুইজন অপরিচিত লোক বসিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে। শ্যালক-গণকে জিজ্ঞাসা করিয়া শশিভূষণ ইহার কারণ কিছু অবগত হইতে পারিল না।

রাত্রি এক প্রহরের সময়, কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় গো-শকট হইতে গৃহদ্বারে অবতরণ করিলেন। শশী উঠিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি, তুমি কে?" শশী বলিল, "আমি শশী, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না।" শশী জানিত না যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং থানাগৃহের সম্মুখে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়, দ্বারদেশে আবার একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য মহাশয় জানিতেন যে, গ্রামবাসিগণ এ বিবাহে কেহ যোগদান করিবে না, এজন্য তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করেন নাই। এক্ষণে দেখিলেন যে, তাহারা বিনা আহ্বানেই দলে দলে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের হস্তেই বংশযষ্টি। তবে কি তাহারা একটা মারপিট করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে সমবেত হইয়াছে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত কাতর স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ—আমাকে প্রহার করিবার জন্য যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা পূর্ণ কর। কিন্তু এই সমাগত বিদেশী ভদ্রলোকগণকে তোমরা প্রহার করিও না। তোমাদের গ্রামে ইহারা অতিথি, তোমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দাও,—তোমরা কেমন করিয়া লগুড়প্রহারে অতিথি সৎকার করিবে?"

ইহার পর আর কোনও বিশেষ গোলযোগ হয় নাই। কেবল একজন যুবক চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "ওরে! বরের নাম ধনঞ্জয়, 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' কর।" কিন্তু শশিভূষণকে দেখিয়া, এই উৎসাহান্বিত অগ্নিশর্ম্মার শোণিতও শীতল হইয়াছিল।

বর, কন্যালাভ করিতে না পারিয়া এবং বরযাত্রিগণ প্রহারের ভয়ে সেই রাত্রেই আহারাদির পর প্রস্থান করিল।

সারানিশি জাগিয়া শশিভূষণ আপন পলায়ন-কাহিনী অন্নদার নিকট বিবৃত করিল।

অন্নদা দক্ষুপন্থের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিল।

॥ পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে ॥

বিখ্যাত বাংলা অভিধান-প্রণেতা সুবলচন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত মাসিকপত্র 'সাহিত্য-সংহিতা'র, নবম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (১৩১৫ সাল, বৈশাখ) থেকে 'অন্নদা' কাহিনীটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উপরোক্ত সংখ্যাটি সুবলচন্দ্রের একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (সাধারণভাবে তিনি ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক) এবং পত্রিকাটি কলকাতার '১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত' হতো। সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পেতেন। পত্রিকাটিতে সাহিত্য ছাড়া ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান সব বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হতো। এমনকি, জীবনী-অভিধান, পরিভাষা নির্ণয় ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়েও নানা গবেষণা এতে প্রকাশিত হয়েছে। সেকালের বহু বিশিষ্ট মনস্বী লেখক ও চিন্তাবিদ্ এই পত্রিকা এবং মূল পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য-সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় চেতনা ও স্বদেশ-প্রেমের একটা উল্লেখযোগ্য পরিচয়ও এখানে ফুটে উঠেছিল। তবে গল্প-উপন্যাস জাতীয় সৃজনশীল রচনার স্থান এতে বিশেষ ছিল না। সে যুগের স্বাভাবিক স্ববিরোধিতা-সহ বুদ্ধিবাদের চর্চাই প্রধানত পত্রিকার মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত 'অন্নদা' গল্পটি একটি ব্যতিক্রম। মূলত এটি যেন নীতিগল্প জাতীয় এবং কাহিনীর পরিণতি রক্ষণশীল হিন্দু চিন্তাধারার বাহক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যুগের সামাজিক মূল্যবোধের একটা দিকের বাস্তবতা, কাহিনী-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা, লেখকের উচ্চস্তরের রসবোধ এবং একটি বিলুপ্ত যুগের সমাজচিত্র— এই সব দিক থেকে কাহিনীটিকে বিচার করাই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয়, লেখক মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় আমরা এখনো সন্ধান ক'রে উঠতে পারি নি।

—স. এ.

পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর নাটক

রামনিধি

পিটার শেফারের 'অ্যামাডেউস' পড়ার পর এই নাটকটি লেখার কথা ভাবি। এটা 'অ্যামাডেউস'-এর বঙ্গীকরণ নয়, এমন কি অ্যাডাপ্টেশনও নয়। অধ্যবসায়ে অর্জিত শিল্পজ্ঞান আর জন্মগত প্রতিভা, এই দুই-এর যে সম্পর্ক শেফার তাঁর নাটকে বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে তা আদৌ সন্তোষজনক মনে হয় নি। শেফারের অনুসৃত আঙ্গিক ও বিন্যাসের বহুল পরিবর্তন ঘটেছে এখানে। শেফার সাহেব, মার্জনা করবেন!

এই নাটকটির প্রথম মঞ্চ-প্রযোজনা ও নিয়মিত অভিনয়ের স্বত্ব 'ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার' কর্তৃক সংরক্ষিত আছে। আপাতত অন্য কাউকে এটি মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না।

চ রি ত্র লি পি

কৃপারাম সাউ, কবিরাজ
রামনিধি গুপ্ত, কবি
নদেরচাঁদ মল্লিক, জোড়াসাঁকো নিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি
মুখুজ্যে, নদেরচাঁদের নায়েব
রাম বসু, কবিয়াল
নারায়ণ মিশ্র, পক্ষীয় দলের নেতা
জয়চন্দ্র মিত্র কুমোরটুলি নিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি
মোক্ষদা, কৃপারামের স্ত্রী
শ্রীমতী, রামনিধির রক্ষিতা
গোপীমোহন দেব, শোভাবাজারের রাজা
রাধাকান্ত দেব, তস্য পুত্র
রামমোহন রায়, স্বনামখ্যাত
মোহনচাঁদ বসু, রামনিধির শিষ্য
গোবিন্দ, কৃপারামের পাচক
পচা, কৃপারামের ভৃত্য
ঘটনাকার ১ } সর্বঘটে উপস্থিত
ঘটনাকার ২ }

এবং

নাগরিকবৃন্দ, পক্ষীয় দল, নর্তকী, বাজিকর, সঙের দল, ইংরেজ রাজপুরুষ, ইংরেজ রমণী, পালকিবাহক, দারোয়ান, পুরোহিত, ভৃত্য, বাদক ইত্যাদি।

১

পর্দা খুললেও মঞ্চ প্রায় অন্ধকার। দু-পাশের উইংস থেকে অনেকের গলায় শুধু ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ আসতে থাকে। আওয়াজ জোর হয়। কিন্তু শব্দগুলো বোঝা যায় না। শুধু ডাউনস্টেজ সেন্টার-এ দেখা যায় একজন লোক দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে। সারা গা চাদরে ঢাকা। আপস্টেজ দু-দিকের উইংস থেকে সাত-আটজন লোক মঞ্চে ঢোকে, একে অপরের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলতে বলতে। দু-তিনটে ছোট ছোট জটলা হয়, ক্রমে একটা বড় জটলা তৈরি হয়। এইবার দু'টো শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়—'রামনিধি', 'কৃপারাম', মাঝে মাঝে আরো একটা শব্দ শোনা যায়—'খুন'। এরা সব কলকাতার নাগরিক। সময় ১৮৩৯, নতুন এক কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে সকলে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে দু-জন ঘটনাকার, সংবাদ গুজব কেচ্ছাকাহিনীর সরবরাহক।

ঘটনাকার ১ : মরে গেছে।
ঘটনাকার ২ : মরে গেছে।
নাগরিক ১ : কে মরেছে?
সকলে : রামনিধি।
নাগরিক ২ : কে রামনিধি?
ঘট ১ : আরে রামনিধি, নিধুবাবু।
ঘট ২ : শিমলের নিধুবাবু।
ঘট ১ : ধ্যাৎ, কুমোরটুলির নিধুবাবু।
ঘট ২ : ও হ্যাঁ, কুমোরটুলির নিধুবাবু। কত বড় জমিদার!
ঘট ১ : তোর মাথা, জমিদার। আরে কবি, কবি, কবিয়াল নিধুবাবু।
সকলে : নিধুবাবু, নিধুবাবু।
ঘট ২ : কবিয়াল নিধুবাবু? সে তো কবে মরে গেছে?
ঘট ১ : কবে মরে গেছে! কাল রাতে মরল, বলে কবে মরে গেছে?
নাগ ১ : তার তো শুনেছি একশ বছর বয়স।
ঘট ১ : একশ নয়, সাতানব্বই।
ঘট ২ বাব্বা, কত নামী লোক, নিধুবাবু!
সকলে : নিধুবাবু, নিধুবাবু।
নাগ ২ : কি ক'রে মরল?
ঘট ১ : আরে সেটাই তো খবর, নইলে আর বলছি কি?
ঘট ২ : জোর খবর, জোর খবর।

রট ১ : খুন হয়েছে।
রট ২ : খুন হয়েছে।
সকলে : খুন হয়েছে ?
নাগ ১ : সাতানব্বুই বছর বয়সে খুন হয়েছে ?
রট ২ : বেঁচে গেছে !
নাগ ২ : কে করলে ?
নাগ ১ : কে করলে ?
রট ১ : রুপে শুঁড়ি।
রট ২ : রুপে শুঁড়ি।
সকলে : রুপে শুঁড়ি, রুপে শুঁড়ি !
রট ১ : রুপারাম শুঁড়ি, কবিরাজ।
রট ২ : রুপারাম শুঁড়ি, বাগবাজারের কবিরাজ।
রট ১ : বাগবাজার নয়, জোড়াসাঁকো।
রট ২ : হ্যাঁ হ্যাঁ, জোড়াসাঁকো, জোড়াসাঁকোর কবিরাজ রুপে শুঁড়ি।
সকলে : রুপে শুঁড়ি, রুপে শুঁড়ি !

[ঘটনাকার দু-জন জটলা থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে দর্শকদের দিকে এগোয়।]

রট ১ : বিশ্বাস করি না।
রট ২ : অবিশ্বাস্য !
রট ১ : যত সব বাজে গুজব।
রট ২ : একেবারে বাজে।
রট ১ : তবে, যা রটে —
রট ২ : তার কিছুটা তো বটে !
রট ১ : খুব রেষারেষি ছিল দু-জনের।
রট ২ : রামনিধি আর রুপে শুঁড়ির।
রট ১ : জোর লড়াই, সারা জীবন ধরে।
রট ২ : মুখে মুখে ভাব, তলে তলে কাটাকাটি।
সকলে (পেছনে দাঁড়িয়ে) : রামনিধি ! রুপে শুঁড়ি !
রট ১ : তাছাড়া একটা ইয়ের ব্যাপারও ছিল কি যেন···
রট ২ : এক বাইজিকে নিয়ে।
রট ১ : যাচ্ছেতাই ব্যাপার !
রট ২ : কেচ্ছা, কেচ্ছা !
সকলে : রামনিধি, রুপে শুঁড়ি।
রট ১ : নিধুবাবু মরেছে কাল রাতে —

রট ২ : সেই থেকে সারাদিন ধরে—
রট ১ : রূপে শুঁড়ি পাগলের মতো চিৎকার ক'রে চলেছে—
রট ২ : খুন, খুন, খুন করেছি আমি !
সকলে : খুন, খুন, খুন !
রট ১ : বিশ্বাস করি না।
রট ২ : অবিশ্বাস্য !
রট ১ : কে রটিয়েছে, আমি জানি।
রট ২ : আমিও জানি।

[পিছনে নাগরিকদের দলের ভেতর থেকে দু-জন বেরিয়ে এসে স্টেজের দু-পাশ দিয়ে সামনে চলে আসে। গোবিন্দ আর পচা, রূপারামের রাঁধুনি আর চাকর।]

রট ১ (গোবিন্দের দিকে আঙুল দেখিয়ে) : ঐ যে গোবিন্দ, রূপে শুঁড়ির রাঁধুনি।
রট ২ (পচার দিকে দেখিয়ে) : আর ঐ হল পচা, রূপে শুঁড়ির চাকর।
রট ১ (তাড়াতাড়ি গোবিন্দর দিকে যায়) : কি বলছে বল তো তোমার মনিব, সত্যি নাকি ?
রট ২ (পচার কাছে গিয়ে) : চিৎকার ক'রে পাগলের মতো বলে চলেছে···
রট ১ : কাল রাতে, নন্দরাম সেনের গলিতে···
রট ২ : নিধুবাবুর বাড়ি গিয়ে রূপে শুঁড়ি নাকি···
রট ১ : নিধুবাবুকে খুন করেছে ?
রট ২ : শুনেছ তুমি ?
রট ১ : নিজের কানে শুনেছ ?
রট ২ : বল না কী শুনলে ?
রট ১ : শুনি আমরা আসল খবরটা।
রট ২ : কি বলছে তোমার মনিব ?
রট ১ : কি বলছে ?
রট ২ : কি বলছে ?
রূপারাম (মঞ্চের সামনে মাঝখানে বসে, দর্শকের দিকে পিছন ফিরে চিৎকার) : রামনিধি !
রট ১ : হায় ভগবান !
রট ২ : রাম রাম !
রূপা : বাবু আমায় ক্ষমা করো। এ আমি কি করলাম, বাবু, এ আমি কি করলাম !
রট ১ : তবে সত্যি !
রট ২ : সত্যি খুন করেছে !

ঘট ১ : কিন্তু কেন ?

ঘট ২ : কি উদ্দেশ্যে ?

ঘট ১ : কি অসম্ভব কথা। এ কখনো হয় ?

ঘট ২ : সাতানব্বই বছরের এক ঘাটের মড়া···

ঘট ১ : তাকে খুন !

ঘট ২ : আমি বিশ্বাস করি না।

ঘট ১ : আমিও করি না।

ঘট ২ : কেউ বিশ্বাস করবে না এ কথা।

ঘট ১ : কেউ না।

ঘট ২ : তবে যা ঘটে···

ঘট ১ : তার কিছু তো বটে।

[ঘটনাকার দু-জন বেরিয়ে যায়। সামনে দু-কোণে রাখা দু'টো সেকেলে টেবিল। পচা তার কোণে টেবিল ঝাড়পোঁছ করে, গোবিন্দ টেবিলের ওপর থালা-গেলাস সাজায়। কৃপারাম ধীরে ধীরে দর্শকের দিকে ঘোরে, আলো ছোট হয়ে তাকে ধরে। দেখা যায় এক বৃদ্ধ, চাদর মোড়া, বসে রয়েছে। দূরে কোনো গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন-টা বাজে।]

কৃপা (কিছুক্ষণ দর্শকদের দেখার চেষ্টা করে) : অস্পষ্ট, আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের। সার বেঁধে বসে আছ সকলে। জন্মাবার জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছ, ভবিষ্যতের প্রেতাত্মার দল ! দেখা দাও ! সামনে এসো আমার। তোমরাই বিচারক, নিক্তি দিয়ে ওজন ক'রে দেখবে একদিন আমাদের জীবন-কাহিনী। চুলচেরা বিচার ক'রে বলবে কে সঠিক কে ভ্রান্ত। ইতিহাসের বিচারকর্তা তোমরা। এসো একবার সামনে এসো, দেখি একটু তোমাদের, শোনাই তোমাদের আমার জীবনের কথা. আমাদের জীবনের, আমাদের যুগের কথা। শুনবে না তোমরা ? থাকবে না কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে ? আমন্ত্রণ করছি তোমাদের — আজ ১২৪০ সালের ২২শে চৈত্র, ইংরেজি ১৮৩৯ সাল, এপ্রিলের ৫ তারিখ — সারাদিন কাঠফাটা রোদে তেতে সন্ধের হাওয়ায় কলকাতা শহর এখন একটু জিরোচ্ছে। বেশিক্ষণ সময় নেব না তোমাদের। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি আছে আমার।

[মঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা নাগরিকদের সামনে সেকেণ্ড লাইন কার্টেন পড়ে যায়।]

কৃপা : দেখলে ওদের, কলকাতার বাবুদের ? শুনলে ওদের জল্পনা-কল্পনা ? পরশ্রী-কাতর, নিন্দুক, নিষ্কর্মার দল। কেচ্ছার গন্ধে গন্ধে ঘোরে সারাদিন, আজগুবি সব রসালো গালগল্পো ফেঁদে আমোদ পায়। এমন কি আমার চাকর-বাকরগুলো

পর্যন্ত – চাকর-বাকর বলতে অবশ্য এখন অবশিষ্ট আছে এই দু'টি। গোবিন্দ আর পচা। গোবিন্দটা উড়ে, রেঁধে খাওয়ায় আমায়। আর পচা, কায়েতের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নি, আগে ঢোল বাজাত আমার দলে। তিন-তিনটে পচা ছিল আমার দলে একসময়। এক ছিল পচা মুখুজ্যে, আমার গানের সঙ্গে জিল দিত, তার নাম ছিল বামুন পচা। আর এক পচা নরহরি বসাকের বড় ছেলে, সে হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে পড়ে এডুকেটেড হল– এডুকেটেড – তার নাম হল এডু পচা। আর এ বেচারার আর কি হবে, ছোটবেলা থেকে খুঁড়িয়ে হাঁটে, লোকে নাম দিল ল্যাংড়া পচা। তবে অনেক দিন আছে আমার সঙ্গে, যত্নআত্তি ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে এই প্রাচীন দেহটাকে। (দর্শকের দিকে তাকিয়ে দেখে) হাসছ তো সবাই আমার কথা শুনে, মুখগুলো তো দেখতে পাচ্ছি না। অনেক কথা আছে তোমাদের সঙ্গে, বলতে হবে অনেককিছু সাজিয়ে গুছিয়ে। (ঘুরে ভৃত্যদের দেখে) এই শোন, তোরা যা এখন। আজ রাতে আমি আর শুতে যাব না। (ভৃত্যেরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে) আজ রাতে আমি শোব না। যা তোরা এখন, তোদের ছুটি। কাল আসিস আবার সকালে। অনেক কাজ আছে তোদের কাল। দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা! (গোবিন্দ আর পচা তখনো ইতস্তত করে) কি হল?

পচা : কাল ভোরে স্নান করবেন তো?

কৃপা : হ্যাঁ।

পচা : সৈরি?

কৃপা : হ্যাঁ হ্যাঁ, সব রেখে যা।

[গোবিন্দ আর পচা বেরিয়ে যায়।]

কৃপা (আবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে) : খুব অবাক হয়ে গেল ওরা। এমন শোনে নি কখনো এর আগে। কিন্তু আর প্রয়োজন নেই আমার ওদের। (মৃদু হাসে) কাল সকালে এসে যা দেখবে তাতে তো ওদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেচারা! (আবার দর্শকদের নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করে) আর-একটু কাছে এসো না, ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের। তোমরাই আমার শেষ শ্রোতা। শেষবারের মতো আসর বসাবো আজ। একটা ভবানী-বিষয় শুরু করি? তাহলে কি আসরটা জমবে আর একটু? (উঠে এক কোণে টেবিলের পাশে রাখা তানপুরা নিয়ে বসে) গানের গলা তো নেই আর, বয়স সব কেড়ে নিয়েছে। তবু আসর বসছে যখন, ভবানী-বিষয় দিয়েই শুরু হোক।

[বৃদ্ধের কণ্ঠে গান]

প্রণত জনপালিনী প্রথবাদিপ্রসবিনী পরভীপরা

পতিতপাবনী মা।
ত্রিলোকতারিণী তারা কলুষতিমিরহরা ; ব্রহ্মময়ী
মুক্তিপ্রদায়িনী মা।

[গান চলার সময় একটা স্পট আলো এলোমেলো দর্শকের ওপর পড়তে থাকে। গান শেষ ক'রে বৃদ্ধ সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের দেখার চেষ্টা করে। উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।]

কৃপা : ভবিষ্যতের প্রেতাত্মা! অনাগত দিনের মানুষ! আমার সামনে এসো, আবির্ভূত হও! যারা জন্মাও নি এখনো, যারা ঘৃণা করো নি এখনো, যারা হত্যা করো নি এখনো, যতটুকু সহানুভূতি বিধাতা তোমাদের দিয়েছেন তাই নিয়ে আমার সামনে এসো। ভবিষ্যৎ, আবির্ভূত হও!

[হঠাৎ হাউস-লাইট জ্বলে ওঠে। বিস্মিত দৃষ্টিতে কৃপারাম তাকিয়ে থাকে দর্শকদের দিকে। তারপর মৃদু একটা হাসি ফোটে তার মুখে :]

কৃপা : নমস্কার বাবুমশায়রা! (হঠাৎ থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দর্শকদের দেখতে থাকে) বাব্বাঃ, চমৎকার! নমস্কার বিবিগণ বাবুগণ! আপনারা এসেছেন তাহলে, এই হতভাগ্য বৃদ্ধের নিমন্ত্রণরক্ষা করতে। আমার শেষ আসরের শ্রোতা আপনারা ; শত শত প্রণাম আপনাদের। শুরু করি তাহলে? একটু সবুর করুন। (কোণে টেবিলের দিকে যায়! থালা থেকে একটা মিষ্টি তুলে নেয়) নিখুঁত! বাগবাজারের মদন ময়রার দোকান থেকে আনা। (মুখে দেয়) বাগবাজারে আর-এক ময়রারও দোকান আছে—ভোলা, হরু ঠাকুরের চেলা ছিল। তার মিষ্টি মাছিতেও ছোঁয় না (আর একটা মিষ্টি নেয়) জিভেগজা। আজীবন এই একটাই আসক্তি আমার—একটাই গুণ, আবার একটাই দোষ। রসনার তৃপ্তি। এই জিভটাকে তুষ্ট রাখতে না পারলে সে কিছুতেই বশে থাকে না। (খায়) কিন্তু আর কোনো দোষ নেই আমার। শুঁড়ির ঘরে জন্ম কিন্তু জীবনে একফোঁটা মদ ছুঁই নি। পরস্ত্রী কামনা—একেবারে করি নি বললে মিথ্যে বলা হবে ; কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এ-কথা পরিবার নিজে ছাড়া আর কেউ বলবে না। অনেক উপার্জন করেছি একসময়, কলকাতার বড়মানুষদের গানের আসরে খুব নামডাক ছিল। সেসব দিনের কথাই বলব আজ আপনাদের। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, কিন্তু এরই মধ্যে লোকে আজ আমায় ভুলে গেছে।

[হাউস-লাইট ধীরে ধীরে নিভে যায়।]

আমার নাম কৃপারাম সাউ। লোকে বলত কৃপা শুঁড়ি অথবা কৃপে শুঁড়ি। কেউ কেউ আবার আরো বেঁকিয়ে বলত কিপ্টে শুঁড়ি। কলকাতার লোকে

কোনো কথা সোজা বলে না, তেরছা ক'রে না বললে তাদের শান্তি নেই। আমার আদি বাড়ি ছিল রানাঘাট জাঁতুলিয়া। দরিদ্র শুঁড়ির ঘরে জন্ম। নেশা ছিল একটা—গান। আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম এক বাউলের আখড়ায়। দশদিন বাদে ছোটখুড়ো কান ধরে ফেরত নিয়ে এল। পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেছিলাম কিছু। কিন্তু জাতব্যবসায় ঢুকি নি কোনো-দিন। সতের বছর বয়সে আবার বাড়ি ছাড়লাম—সেই শেষ, আর বাড়ি যাই নি কখনো। ঘুরতে ঘুরতে গেলাম বহু জায়গায়। কালনায় জগদীশ ভট্টাচার্য্যের টোলে ভর্তি হয়েছিলাম জাত ভাঁড়িয়ে। বললাম, কায়েতের ছেলে, কাব্য পড়তে চাই। এক বছর ছিলাম। কলাপ মুগ্ধবোধ শেষ ক'রে কাব্য শুরু হওয়ার আগেই জাতের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে গেল। ভট্টাচার্য্যি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

[থালা-বাটি হাতে গোবিন্দ আবার ঢোকে।]

কৃপা : আবার কি হল ?

গোবিন্দ : আপনার দুধের বাটি ঢাকা দেওয়া রইল।

কৃপা : তোদের বললাম না এখন আসবি না! যা, বেরো! (চিৎকার করে, গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়) হতচ্ছাড়া! যা বলছিলাম—কালনা থেকে চলে গেলাম পশ্চিমে। মুসলমান ওস্তাদের কাছে সংগীত শিক্ষা করব স্থির করলাম। পাটনায় গিয়ে নাড়া বাঁধলাম লড্ডন খাঁ ওস্তাদের কাছে। বুড়ো ওস্তাদের কচি বিবি পেছনে লাগলেন। বিপদ দেখে পিটটান দিলাম। অবশেষে পাণ্ডুয়ায় এসে গুরু পেলাম—অঘোরনাথ পরমহংস, পণ্ডিত, সংগীত-বিশারদ ও বিখ্যাত কালীসাধক। তাঁর দয়াতেই পেলাম আমার জীবনের সম্বল যা কিছু। বিদ্যাচর্চা, সংগীতশিক্ষা আর শক্তিধারিনী দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি। দীর্ঘ নয় বছর সাধনা করলাম, কঠিন সাধনা। তারপর একদিন গুরুদেব দেহ রাখলেন। আমি আবার হলাম আশ্রয়হীন। রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। রামপ্রসাদের ঢঙে কালীকীর্তন রচনা করি আর রাজা-মহারাজা-জমিদারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াই যদি শোনাতে পারি তাঁদের। কিছুই হয় না। একদিন গুপ্তিপাড়ায় কালী মির্জার সন্ধান পেলাম। সাত্বিক ব্রাহ্মণ কিন্তু বেশভূষা রকমসকম যেন পশ্চিমের কোনো রইস আদমি। আমায় বললেন, কবিগান ধরো, তাতেই তুমি নাম করবে। তাঁর চিঠি নিয়ে চলে এলাম সোজা কলকাতায়, শোভাবাজারে হরু ঠাকুরের কাছে। তাঁর দলে তখন দোহার ছিল ভবানী বেনে আর নীলু ঠাকুর। তাদের গানে জিল দিতে লাগলাম। আর হরু ঠাকুর নিজে আমায় গান বাঁধতে শেখালেন। কলকাতার কবিগান—সে বড় মজার জিনিস। দু-দিনেই বুঝে নিলাম, গভীর ভাবের কোনো কারবার নেই

এ-গানে। শুধু কথার কারিকুরি। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে ফরমা ছুঁড়ে যাও। কালী মির্জা কী দেখেছিলেন আমার মধ্যে জানি না, কিন্তু কলকাতায় এসে সত্যিই আমার ভাগ্য খুলে গেল। গারাঘাটের শুঁড়ি ঘরের ছেলে কৃপারাম শহর কলকাতার আকাশে ছুটে চলল ধূমকেতুর মতো। জোড়াসাঁকোর নবেরচাঁদ মল্লিকের সভায় স্থান হল আমার। আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা বলছি। তাঁর সভায় একদিন বড় আসর বসেছে, অনেক সাহেব সুবোর আগমন ঘটবে সেদিন।

[গোবিন্দ আর পচা কোণের টেবিলের ওপর মেক-আপের জিনিসপত্র রাখে। কৃপারাম সেদিকে যায়। ১৮০৯ সাল। গোবিন্দ আর পচা এখন যুবক। তারা কৃপারামকে মেক-আপ দিতে থাকে। উল্টো কোণ দিয়ে মোক্ষদা ঢোকে, কৃপারামের স্ত্রী।]

মোক্ষদা : হ্যাঁ গো ?

কৃপা (দর্শকের দিকে) : আমার পরিবার। সতী, সাধ্বী, মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ মধু ঝরছে।

মোক্ষদা : বলি শুনছ ?

কৃপা : না শুনে উপায় আছে ?

মোক্ষদা : এই সাঁঝের বেলায় অত সেজেগুজে চললে কোথায় ?

কৃপা : কামিনীকাঞ্চনের সন্ধানে।

মোক্ষদা : কি ?

কৃপা : কামিনীকাঞ্চনের সন্ধানে।

মোক্ষদা : আহা-হা-হা, কলকেতার কামিনীরা যেন সব রূপের ডালি সাজিয়ে তোমার অপেক্ষায় হাপিত্যেশ ক'রে বসে রয়েছেন ! চঙ !

কৃপা : তবে শুধু কাঞ্চন ?

মোক্ষদা : হ্যাঁ গো, রতন স্যাকরাকে বলে পাঠিয়েছি, আমার জন্য একজোড়া কানপাশা আর একটা সোনার বাউটি করিয়ে রাখবে। আসছে মাসে বড়দির মেয়ের বিয়ে মনে আছে ?

কৃপা (দর্শকের দিকে) : শুধু কাঞ্চনে আপত্তি নেই !

মোক্ষদা : আর নন্দরানীর জন্যে বিছেহারটা তো নিতেই হবে। বড়দি বার বার বলে পাঠিয়েছে। যাই বলো, অত জ্ঞাতিকুটুমের মধ্যে একটু ঠাটঠমক বজায় না রাখলে মান থাকে না। কি গো, কিছু বলছ না যে ?

কৃপা : জিভেসজা খাবে ? জিভটা একটু মিষ্টি হতো।

মোক্ষদা : আ মরণ ! সারারাত সঙ সেজে ধেই ধেই ক'রে নেত্য করা আর ইয়ার-বকশি নিয়ে আমোদ করা, তার বেলা কিছু নয়, আর আমার বড়দির মেয়ের

বিয়েতে দু-গাছা সোনার কথাতেই যত দোষ! ঘাট হয়েছে আমার, আর কখ্খনো বলব না। সাধে লোকে নাম দিয়েছে কিপ্টে গুঁড়ি! (প্রস্থানোদ্যত) পচা, যাবার আগে জল তুলে দিয়ে যাবি।

[প্রস্থান]

২

সেকেণ্ড লাইন কাটেন খোলে। নবেরচাঁদ মল্লিকের আসর। ফরাস, চেয়ার ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। নায়েব মুখুজ্যেবাবু তদারক করছেন, চাকর-বাকর জিনিসপত্র ঠিকঠাক করছে। পারিষদেরা বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে। যন্ত্রীরা বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধছে। আসর শুরু হবে। এক কোণে পশ্চিমা দারোয়ান দরজা আগলানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সামনে দু-তিন জন লোক উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করছে। ঘটনাকার দু-জনের প্রবেশ। অন্য কোণে কুপারামের মেক-আপ চলছে।

ঘট ১ : মল্লিকবাড়িতে খুব জমকালো আসর আজ। শুনলাম লাটসায়েবের মেজো ভাগনে এসেছে!

ঘট ২ : হুঁ, আর নিকি বাইজির নাচ হবে।

ঘট ১ : আর শোভাবাজার জোড়াসাঁকোর কবির লড়াই।

নাগরিক ১ (দারোয়ানের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখে) : ওঃ ভেতরে যা মালের স্রোত বইছে না, বাড়ির শালগ্রাম শিলাটা পর্যন্ত নেশায় ভোঁ!

[ভেতরের উইংস দিয়ে দু-জন ইংরেজ পুরুষ ও একজন ইংরেজ রমণীকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসে নবেরচাঁদ মল্লিক। সকলে উঠে দাঁড়ায়। ঘটনাকার দু-জন জটলার মধ্যে ঢুকে দারোয়ানের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখে।]

ঘট ২ : উহুঁ ভুল বলেছিস, লাটসায়েবের মেজো ভাগনে তো নয়, এ তো সেজো ভাগনে।

ঘট ১ : বিবিটাকে দেখেছিস, কেমন মোমের মতো শরীর!

[দারোয়ান হুঙ্কার দিয়ে তাদের কিছুটা দূরে সরিয়ে দেয়। ওদিকে নবেরচাঁদ সাহেব-মেমদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে তাদের বসায়। তারপর সামনে এসে ভৃত্যের কাছ থেকে গন্ধাজল নিয়ে হাত ধোয়। পুরুতঠাকুর তার গায়ে

শান্তিজল ছিটোতে ছিটোতে বলে 'ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি'।]

রট ২ : দেখ্ দেখ্,, ঠাকুর্দা ছিল তেলি, ইনি হয়েছেন তিলি, নাতি যাতে কায়েত হয় তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

[নদেরচাঁদ তার নিজের জায়গায় ফিরতে গিয়ে সাহেবদের দিকে অপ্রস্তুত হাসে।]

নদে : ধর্ম !

মুখুজ্যে : রিলিজিয়ন। হিন্দু রিলিজিয়ন।

[নদেরচাঁদ ও মুখুজ্যে নিজেদের জায়গায় বসে। নিকি বাইজির প্রবেশ, বাদ্য ও গীতের সঙ্গে নাচ শুরু হয়। ভৃত্যেরা সকলকে মদের গ্লাস বিতরণ করে। রটনাকার ও অন্যান্যরা দারোয়ানের পাশ দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে থাকে। নাচ শেষ হতেই 'বাহবা বাহবা' ধ্বনি ওঠে। নর্তকীর প্রস্থান। অন্যদিকে দারোয়ান ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরাতে যায়।]

রট ১ : ওকি, ওকি, অমন করছ কেন ?

রট ২ : নিজে তো বেশ তক্কে তক্কে রয়েছ, নিমতলার শকুনের মতো !

নাগরিক ২ : ওঃ চেহারা দেখ্, যেন চালচিত্তিরের অসুর !

রট ২ দারোয়ানের কপালের তিলকটা দেখিয়ে) : কপালে এক ধাবড়া কী লাগিয়েছ ? কাকে হেগে দিয়েছে নাকি ?

[দারোয়ান রেগে তাড়া ক'রে যায়, সেই ফাঁকে রটনাকার ১ আসরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাকিদের দারোয়ান তাড়িয়ে উইংসের বাইরে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে একজন বাজিকর খেলা দেখাতে আরম্ভ করেছে। খেলা শেষ হয়ে গেলে আবার 'বাহবা বাহবা' ওঠে। ইতিমধ্যে কৃপারামের মেক-আপ শেষ হয়ে গেছে। সে, পচা ও গোবিন্দ আসরে ঢুকে নিজেদের জায়গায় বসে। কৃপারাম এখন যুবাপুরুষ। দু-জন সঙ ঢোকে, একজন সাহেব একজন মেমসাহেব সেজে। দু-জনের মুখ খড়ি দিয়ে সাদা করা, সোনালি পরচুলা পরা। দিশি যন্ত্রে বিলিতি সুরের সঙ্গে তারা সাহেবি বল-নাচের ব্যঙ্গ করে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি লেগে যায়। খানিকক্ষণ বিচিত্র নাচের পর হোঁচট খেয়ে দু-জনেই পড়ে যায়। মেমসাহেবের পরচুলা খুলে পড়ে, বোঝা যায় দু-জনেই আসলে পুরুষ। হাসির রোল ওঠে। নদেরচাঁদও খুব হাসতে থাকে, কিন্তু আমন্ত্রিত ইংরেজরা গম্ভীর মুখে বসে থাকে। সেই দেখে নদেরচাঁদ হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়ে।]

নদে : এই এই, কী হচ্ছে এসব ! অসভ্য কোথাকার ! ভাগো হিঁয়াসে। এই, কে এদের ঢুকতে দিয়েছে ? মুখুজ্যে মশায়, পাজি, অশ্লীল, হতচ্ছাড়া (কথা খুঁজে

পায় না) বাজে ! তাড়িয়ে দিন এদের !

[সঙেরা চলে যায় ।]

নদে (সাহেবদের উদ্দেশ্যে) : কিছু মনে করবেন না, সাহেব । এরা সঙ, একেবারেই বাজে লোক । ও মুখুজ্যে মশায়···(হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিতে অনুনয় করে)।

মুখুজ্যে (গলা খাঁকারি) : স্যার, দে স্যার···সঙ···বাজে···ভেরি ভেরি বাজে ···

[সাহেবরা সকলে এতক্ষণ গম্ভীরমুখে বসে ছিল। হঠাৎ মেমসাহেব হাসতে শুরু করে। সঙেরা যেখানে নাচছিল সেদিকে আঙুল দেখিয়ে প্রচণ্ড হাসে। হাসি আর থামেই না। সাহেব দু-জন অপ্রস্তুত হয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করে, মেমসাহেব হেসেই চলে। তাই দেখে নদেরচাঁদও আশ্বস্ত হয়, নিজেই এবার হাসতে থাকে। মুখুজ্যের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে, ভাবটা 'যাক, রাগে নি তাহলে, মজাই পেয়েছে'। সাহেবরা মেমসাহেবকে ধরে তোলে, সে তখনো দমকে দমকে হাসছে। তারা হ্যাণ্ড-শেক ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। বিদায় জানিয়ে নদেরচাঁদ আবার গঙ্গাজলে হাত ধোয়, পুরুত শান্তিজল ছিটোয় ।]

নদে : এঃ, ম্লেচ্ছের পানীয়, মুখটাও অশুচি হয়ে গেল । (গঙ্গাজল দিয়ে কুলকুচি করে । ভৃত্যের হাতে মদের ট্রে দেখিয়ে) হটা ওসব ! দিশি নিয়ে আয় । (ভৃত্য মাটির হাঁড়ি ক'রে দিশি মদ নিয়ে আসে, ভাঁড়ে ক'রে সকলকে দেয়) নাও, গানবাজনা হোক এবার । কই হে রূপারাম, এসেছ তো ? মুখুজ্যেমশায়, আজ কি হবে ?

মুখুজ্যে : আজ্ঞে হুজুর, রাম বসুর দল এসেছে । এই যে, ইনি । (প্রণাম) ইনি পূর্বে ভবানী বেনে নীলু ঠাকুরের দলে বাঁধনদার ছিলেন । এখন স্বয়ং দল খুলেছেন । এই নবীন বয়সেই বেশ নাম করেছেন । ইনি সখীসংবাদ, বিরহ, লহর, খেউড়, সবই খুব উত্তম রচনা করেন ।

নদে : বা বা, খুব ভালো, খুব ভালো । তা খেউড়ই ধরুন একটা । ঐ বিরহ-টিরহ আজ আর ভালো জমবে না । কিংবা খেম্টাই লাগান না ? টক্করাটক্করি হয়ে যাক একটা । কি রূপারাম, তৈরি তো ?

[বাদ্যের সঙ্গে রাম বসুর গান শুরু হয়]

আখড়া জেঁকেছে মাকড়া রূপেরাম বাউল
দিয়ে এড়ুয়া বেঁকি নূপুর পায়ে, ভেড়ুয়া যেন নেচে যায়,
মেড়ুয়াবাদির মতো ওটার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল ।
উড়ে গোবিন্দ ধরে জিল, ন্যাংড়া মারে ঢোলে কিল,
গতিক দেখে—

সাহেবের বুক খরো খরো, বিবি ছোটেন ভয়ে ব্যাকুল।

[গান থামতে না থামতেই 'বাহবা' ওঠে।]

নন্দে : ও কি হে, রূপারাম, একেবারে বসিয়ে দিল যে ?

[বাদ্য শুরু হয়। রূপারামের জবাব—]

আহা, বিবির বিরহে রামার জ্বলিছে অন্তর
হেরে রূপ গৌরাঙ্গিনী, হাস্যে লাস্যে কি রঙ্গিনী,
রামার কলিজা কাঁপে দেহ জরজর।
(ওহে) কও দেখি প্রেম ক'রে প্রেমীর মান থাকে কিসে ?
তুমি তো প্রেমের পণ্ডিত, কত প্রেম করেছ এই বয়সে।
(আহে) সায়ের বিবি গেছে, তাতে কি হয়েছে ?
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধনকে আগুলে বেড়াও ?
নাহি জানো ঘরবাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও।
আমি সতী হয়ে করি পতির মান্যমান,
তুমি অন্য কুলে গিয়ে জীবনে জুড়াও ?

[প্রবল 'বাহবা' পড়ে।]

নন্দে : বা বা বা রূপারাম, জবাব নেই হে, জবাব নেই। দেখলে, খেম্বার জবাবে কেমন বিরহের মহড়া লাগিয়ে দিল, অ্যাঁ ? কি রামবাবু, এবার কী বলবেন ?

রাম : হার হল, রাজাবাহাদুর। বিরহের গানে যে এমন শ্লেষ-ব্যঙ্গ আমদানি করতে পারে, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল।

মুখুজ্যে : সে কি, তুমি কি বলতে চাও রূপারাম অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করল তোমায় ?

রাম : না না না, তা কি কখনো বলতে পারি ? উনি বয়োজ্যেষ্ঠ, উনি যা নিয়ম করবেন তাই চলবে। তবে বিরহের গান হবে জানলে আমিও তাই দিয়েই শুরু করতাম।

গোবিন্দ : আরে হেরেছিস, হেরেছিস। হার স্বীকার কর।

পচা : বাবা, কবিগান শুধু বিদ্যের লড়াই নয়, বুদ্ধিরও লড়াই।

রূপা : আঃ চুপ কর তোরা। হুজুর, রামবাবুর গানের বাঁধুনি কিন্তু অতি চমৎকার। অত আঁটোসাটো বুনট আমার আসে না।

নন্দে : দেখলে, দেখলে, রামবাবু ! আসল গুণী লোক কিন্তু উদারও হতে জানে।

রাম : আমি তো স্বীকার করেছি, রাজাবাহাদুর। রূপে শুঁড়ির মতো কবিওয়ালা কলকাতা শহরে খুঁজে পাওয়া ভার।

নদে : তার কি গো, অসম্ভব বলো ! কি মুখুজ্যে মশায় ?

মুখুজ্যে : খুব সত্যি কথা, হুজুর। রাহু নৃসিংহ দু-জনেই গত হয়েছেন। কালী মির্জা এখন গুপ্তিপাড়াতেই থাকেন। আর হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে সকলেই প্রাচীন হয়ে পড়েছেন। নতুনদের মধ্যে নীলু রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, গৌর কবিরাজ, সাতু রায়—

নদে : আরে ছোঃ ছোঃ, কি সব নাম করছেন ! ওরা কবি ? ওরা যদি কবি হয় তবে....তবে···তবে আমাদের কলিমুদ্দি সহিসও কবি, রোজ সকালে ঘোড়াদের নাওয়াবার সময় গান গায়।

রট ১ (ভিড়ের পেছন থেকে) : কিন্তু নিধুবাবু ?

নদে : কে ?

রট ১ : বলছিলাম, নিধুবাবুর নামটা তো ধরতে হবে।

নদে : নিধুবাবু ? (মুখুজ্যেকে) নাম শুনেছি ?

মুখুজ্যে : আজ্ঞে, শুনেছেন-শুনেছেন মনে হচ্ছে।

নদে : হুঁ, শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে। কে বল তো ?

রট ১ : আজ্ঞে রামনিধি গুপ্ত, কুমোরটুলিতে থাকেন। বটতলায় পক্ষীর দলের আটচালাতেই আখড়া খুলেছেন। বড় তালেবর ওস্তাদ। একেবারে কালোয়াতি।

নদে : পক্ষীর দল। ঐ গেঁজেলদের দলে কালোয়াতি ? কি গো কৃপারাম, শুনেছ নাকি, এই নিধুবাবু না কে ?

কৃপা : আজ্ঞে নাম শুনেছি, গান শুনি নি।

রট ১ : উনি আবার আসরে গিয়ে গান না। শুধু ঐ আটচালাতেই বৈঠকি গান। শুনতে হলে ঐখানে গিয়ে শুনতে হবে।

নদে : ও, সখের কবি ! তা এতকাল ছিল কোথায় ? কার চেলা ?

রট ১ : আজ্ঞে, উনি কারুরই চেলা নন। উনি খুব মানী লোক। পশ্চিমে কোথায় যেন ইংরেজের দেওয়ান ছিলেন।

মুখুজ্যে : দেওয়ান ছিলেন ? বল কি হে ?

রট ১ : আজ্ঞে দেওয়ান মানে···ঐ প্রায় দেওয়ানেরই মতো···মানে দেওয়ানের দপ্তরে···বড়বাবু ছিলেন। এখন চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস করছেন। উনি এই লড়াইকরা কবিওয়ালাদের খুব ঘেন্না করেন। ওদের বলেন, দাঁড়া কবি। উনি বলেন, দাঁড়িয়ে আহার করা, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, আর দাঁড়িয়ে গান গাওয়া, তিনটেই নাকি শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

কৃপা : তা নিধুবাবুর বসা অবস্থায় যে ফল্গুধারা নির্গত হয়, তা কি আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন না স্বকর্ণে শুনেছেন ?

রট ১ : আজ্ঞে স্বকর্ণে শুনেছি। সে এক অনির্বচনীয় সংগীত। তার কোনো তুলনাই হয় না।

নন্দে : বলে কি গো, অ্যাঁ ? তবে তো শুনতে হচ্ছে ? কিন্তু আসরে গাইবে না বলছে যে ? ও মুখুজ্যেমশায় ?

মুখুজ্যে : আজ্ঞে হুজুর আপনি বললে নিশ্চয়···

রট ১ : হুজুর মান্যগণ্য লোকেরা ওঁর আখড়ায় গিয়ে গান শুনে আসছেন। এই তো সেদিন বর্ধমানের মহারাজা স্বয়ং গিয়েছিলেন, ছদ্মবেশে।

নন্দে : ছদ্মবেশে ? কেন ?

রট ১ : মানে পাড়াটা একটু···ইয়ে তো···

কৃপা : তবে লোকে বুঝল কি ক'রে উনিই বর্ধমানের মহারাজা ?

নন্দে : দরকার নেই। কোনো দরকার নেই। ঐ গেঁজেলদের আড্ডায় গিয়ে কালো-রাতি শোনার কোনো দরকার নেই আমার। বর্ধমানের মহারাজা যেতে পারেন, আমি যাব না। তার চেয়ে আমাদের কৃপারামের গানই ভালো।

৩

মঞ্চে আলো নিভে যায়। কিছুক্ষণ অন্ধকার, তারপর দেখা যায় দু-তিনটে কলকের আলো দপদপ করছে। পক্ষীর দলের আটচালা। গাঁজার কলকে হাতে হাতে ঘুরছে। হঠাৎ বিকট কয়েকটা পাখির ডাক। গান শুরু হয়, মঞ্চে আলো জ্বলে।

চুকু মুকু চুকু, চুক্ চুকুন।
কিচি মিচি কিচি, কিচিন কিন।
কুকু, রামশালিকে, কু কু, গঙ্গা বিসং,
ঝুপ ঝুপ ঝুপ, ডুব ডুব ডুব, মাছরাঙা, মাছরাঙা, মাছরাঙা।

[মাছরাঙার গান—]

মিছে কিনেছি বদনাম
সবাই গেল সাধু হয়ে পড়ে রইনু হাম্।
একাজ করে সব শালা,
কারোর হয়নিকো জ্বালা,
প্রেমের ঘোরে অন্ধকারে হলেম বেতালা।
ফেললি একা ঘোর ব্যাধির করে,
বিধি, তোকে দিই সেলাম।

[একজন নতুন সভ্য গাজা খাচ্ছে। অন্যেরা শুনছে।]

সকলে : সাতানব্বুই।

নারায়ণ মিশ্র : ও কিরে, মাছরাঙা? ডুবে ডুবে জল খাবি, বদকাজ করতে গিয়ে প্যাঁচে পড়বি, আবার অন্যদের গালও পাড়বি? তুই শালা পক্ষিকুলে কুলাঙ্গার।

সকলে : আটানব্বুই।

নারায়ণ : তবে গানটা বেঁধেছিস ভালো। কুলাঙ্গার হলেও তোর হবে। কি বলেন, কর্তাবাবু?

নিধু অন্যমনস্ক) : আঁ্যা? কি বললেন?

নারায়ণ : বলছি, আমাদের মাছরাঙার গান কেমন শুনলেন?

নিধু : ভালো ভালো। তোমাদের কৌতুকপ্রিয়তা কারো চেয়ে কম নয়, একথা তো অনেকবার বলেছি তোমায়, নারায়ণ। শুধু এই লঘু আর কদর্য বিষয় ছাড়া কৌতুক করার আর কোনো বিষয় খুঁজে পাও না কেন, বুঝি না।

সকলে : নিরানব্বুই।

নারায়ণ : ও কি রে, কত হল?

পক্ষী ১ : পক্ষিরাজ, নিরানব্বুই, নিরানব্বুই।

নারায়ণ : সে কিরে, বলিস কি? ক'রে ফেলল?

পক্ষী ২ : নতুন পাখি নতুন পাখি, দলে ঢুকছে। নাও বাবা, নাও, শেষ টানটা মারো।

নারায়ণ : দাঁড়িয়ে দম দে, দাঁড়িয়ে দম দে। শেষ টান দাঁড়িয়ে।

পক্ষী ১ : দাঁড়াও বাছাধন। শেষ বারের মতো দাঁড়াও।

[দু-জনে ধরে দাঁড় করায়। নতুন সভ্য কলকে নিয়ে টান দেয়। দম ধরে রাখে, অল্প একটু কাশে, তারপর টলে যায়।]

নারায়ণ : ধরবি না, ধরবি না!

[নতুন সভ্য আবার একটু কাশে, চোখ বন্ধ ক'রে খানিকক্ষণ টাল সামলায়। তারপর সামলে নিয়ে চোখ খুলে বিরাট এক গাল হাসে, তারপর ধেই ধেই ক'রে নাচতে থাকে।]

নতুন সভ্য : পেয়েছি, পেয়েছি, একশ একশ। (এক চক্কর ঘুরে এসে সোজা নারায়ণ মিশ্রের পায়ে পড়ে) আশীর্বাদ করুন, পক্ষিরাজ, আজ আমার পক্ষীজন্ম শুরু হল।

নারায়ণ : কাশলি কেন?

নতুন সভ্য : আজ্ঞে?

নারায়ণ : একশ দম দিলি বটে, কিন্তু শেষে দমে দু-বার কাশলি কেন ? (নতুন সভ্য বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকায়) হল না তোর।

নতুন সভ্য : পক্ষিরাজ !

নারায়ণ : হল না। ভেবেছিলাম কোকিল তৈরি করব। তা এ যা দেখালি, তাতে তো ছ্যাতরার বেশি কিছু দেওয়া যাবে না তোকে।

নতুন সভ্য : পক্ষিরাজ, এটুকু দোষের জন্য আমার কোকিল থেকে ছ্যাতরায় নামিয়ে দিলেন ! আপনি বলুন, আর একবার পরীক্ষা দিচ্ছি। (বলে উঠে গিয়ে কলকে নিতে যায়।)

নারায়ণ : থাক থাক, পরীক্ষা দু-বার হয় না। তুই ছ্যাতরা।

নিধু : নারায়ণ, এটা লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে না কি ?

নারায়ণ : যাচ্ছে ? কিন্তু আর তো কিছু করার নেই। রায় যে দিয়ে দিয়েছি। আপনিই তো বলেছেন কর্তাবাবু, ইংরেজের জমানায় হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না।

নিধু : হুঁ, কিন্তু ইন্টারপ্রিটেশন তো করা যাবে।

নারায়ণ : আজ্ঞে, সেটা আবার কি ?

নিধু : ইন্টারপ্রিটেশন। ব্যাখ্যা। হুকুম নড়বে না বটে, কিন্তু ব্যাখ্যায় তো বাধা নেই। ছ্যাতরা উপাধি যখন দিয়ে ফেলেছ তখন ছ্যাতরাই রাখতে হবে, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু এপাশ-ওপাশ করতে পার। ও বেচারাকে তুমি বরং স্বর্ণ ছ্যাতরা ক'রে দাও, একটু অন্তত জাতে উঠুক।

নারায়ণ : বাবা, এই না হলে সায়েবের বুদ্ধি ! সব ব্যবস্থা আছে। নে ব্যাটা, তুই তবে স্বর্ণ ছ্যাতরা হলি।

[সকলে 'বা বা' 'বেশ বেশ' প্রভৃতি ধ্বনি তোলে, ঢোল করতাল বেজে ওঠে, পাখির বুলিও শোনা যায়। হঠাৎ নারায়ণ মিশ্র দূরে বসে থাকা কৃপারামকে দেখতে পায়।]

নারায়ণ : অ্যাঁ, এ কি গো, আজ কি সূর্য পশ্চিমদিকে উঠল নাকি ? আমি আজ ক-টা টেনেছি রে ? এ কী দেখছি ? কে বসে আছে ওখানে ? জোড়াসাঁকোর সভাকবি যে, স্বনামধন্য কৃপারাম সাউ স্বয়ং !

[কৃপারাম উঠে এসে নারায়ণকে প্রণাম করে।]

কৃপা : প্রণাম, ঠাকুরমশায়।

নারায়ণ : কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক। ওরে, কই তোরা, পক্ষীরা সব ধ্বনি দে, ধ্বনি দে, জোড়াসাঁকোর নেদো তেলি, থুড়ি দেদো মল্লিকের সভাকবি এসেছে, চুপ ক'রে রয়েছিস ? (সকলে জোরে পক্ষীর বুলি দেয়) নে নে, থোরা দে,

ধোঁয়া দে। (একজন কলকে নিয়ে এগিয়ে আসে)।

কৃপা : হাতজোড় ক'রে) মাপ করবেন ঠাকুরমশায়। আপনি তো জানেন, ও সৌরভে আমি বঞ্চিত।

নারায়ণ : তাও তো বটে, তুই তো আবার টানিস না। আমাদের কর্তাবাবুর মতো। তা আমাদের জন্য ব্যবস্থাও আছে, কর্তাবাবুর ব্যবস্থা। (নিধুবাবুর পাশে রাখা বোতল-গেলাস দেখায়।)

কৃপা : আজ্ঞে, রসপানেও যে আমি বঞ্চিত। তাও আপনি জানেন। শুঁড়ির সাক্ষী বামুনঠাকুর।

নারায়ণ : বঞ্চিত! তুই শালা একটা পাবও! আবার কালীসাধক হয়েছিস! গঞ্জিকা নেই, কারণবারি নেই, গন্ধ ছাড়া কালী হুঁশ পাবেন কি ক'রে?

কৃপা : আজ্ঞে, হুঁশ এমনিতেই পান। আমি শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম। আর (নিধুকে দেখিয়ে) এনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে। অনেক শুনেছি…

[হঠাৎ সোরগোল ওঠে। সকলে উঠে দাঁড়ায়। জয়চন্দ্র মিত্র, নবীন যুবক, আটচালার মালিক, ঢোকে।]

নারায়ণ : আরে ছোটবাবু যে, আসুন আসুন! আপনারই জন্য সবাই অপেক্ষা ক'রে ছিলাম। বসুন, বসুন। (বসায়, মদের গ্লাস এগিয়ে দেয়।)

জয় মিত্র : বেশ বেশ। হ্যাঁ, দে। (মদ নেয়) কই, গানবাজনা হচ্ছে না? আজ বুঝলেন, মেজাজটা খুব খুশ্ আছে। ঐ মার্লো কোম্পানির ফেয়ারওয়েদার জাহাজ এসে ভিড়েছে আজ চাঁদপাল ঘাটে। মার্কিনদের এই মার্লো কোম্পানিকে নিয়ে, জানেন তো, ঐ শালা রামদুলাল দে-র সঙ্গে আমাদের নখ্‌রা চলছে অনেক'দিন। আমি তো ফাদারকে কবে থেকে বলে আসছি, দাও শালা রামদুলালকে বসিয়ে। তা শালা ফাদার, ওল্ড ফুল, শোনে না। কিন্তু এই জয় মিত্তির তো ছাড়ার পাত্র নয়। বেনামি চিঠি ছেড়েছিলাম কোম্পানিকে রামদুলালের নামে নালিশ ক'রে। আজ ফেয়ারওয়েদারের কাপ্তেন খোদ বোশ্‌টোন থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে—রামদুলাল খারিজ, মার্লো কোম্পানির বেনিয়ান শুধু রামচন্দ্র আঢ্য জয়চন্দ্র মিত্র। বাবা, ব্যবসা করতে হয়, শালা ছ্যাঁচড়া ইংলিশদের সঙ্গে কভি নেহি, ব্যবসা করো মার্কিনদের সঙ্গে। সাচ্চা আদমি, বিলকুল হনেস্ট। (কথার ফাঁকে ফাঁকে সমানে গান ক'রে যায়।)

নিধু : হনেস্ট, মানে হননীয়। অর্থাৎ সহজে বধ করা যায় এমন মুরগি।

জয় : ফাদার তো আজকে ভ্যাম খুশ্। ও হ্যাঁ, নিধুবাবু, ফাদার বলেছেন আপনি এবার আরো কিছু টাকা লাগাতে পারেন মার্লো কোম্পানির ব্যবসায়। সিওর প্রফিট। হ্যাঁ, ওদিকে আরো একটা কাণ্ড হল একটু আগে। আমার সেই

হীরেবাঈ, হালসিবাগানের বাড়িতে যাকে রেখেছিলাম, সে তো যা-তা ঝঞ্ঝট শুরু করেছিল ক-দিন ধরে। মাগী মহা জঙ্কি। আজ দিয়েছি তাকে বিদেয় ক'রে। একবারে গেট আউট। বাগানবাড়িটা খালি হয়ে গেল।

নারায়ণ : এবার কাকে রাখবেন সেখানে ?

জয় : দেখি, দেখি। এবার বেশ দেখেশুনে রাখব, বুঝলেন ? ঐসব হীরেবাঈ টীরেবাঈয়ের ঝামেলি আর পোষাবে না। তা যাক গে, নিধুবাবু, ধরুন একটা, শুনি। বেশ হালকা, ফুরফুরে কিছু ধরুন। আজ আর ঐ কালোয়াতি টালোয়াতি নয়, বেশ তরতরে ঝিরঝিরে···

নিধু : আজ আপনার যা মেজাজ দেখছি, তাতে তরল ছাড়া বিশেষ কিছু চলবে বলে মনে হচ্ছে না।

জয় : হ্যাঁ, বেশ তরতরে ফুরফুরে···

[নিধুর গান—]

যখন প্রাণ ছিলে প্রাণে, কত মশলা দিতেম পানে।
এখন কাছে গেলে পরে, সদা কর পানে পানে।
আর কি আমার সে দিন আছে, চুণের ভাঁড় শুখায়ে গেছে,
তালপুকুরের নাম রয়েছে, তীর উবু জল নেই মাঝখানে।
সেদিন দিলাম দালচিনি, সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি,
এখন আমি বালি, তুমি চিনি, চেনাচিনি নাই দু-জনে।
যখন আমার ছিল বাহার, দিয়ে থাকতাম কত বাহার,
গুল গুল ক'রে গেয়ে বাহার, উড়ে বসতে মধুপানে ॥

[গান শেষ হতেই জয় মিত্রের নাসিকা গর্জন শোনা যায়। ওদিকে স্টেজের বাইরে থেকে পালকি-বাহকদের ডাক আসে। কোণে একটা পালকি এসে দাঁড়ায়, পর্দা ফাঁক ক'রে এক রমণীর মুখ বেরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখতে থাকে।]

নারায়ণ : কর্তা, আমাদের ছোটবাবু যে দেখি উবুজলেই ডুবে গেলেন।

নিধু : কি আর করবেন, এবার জল থেকে তুলে ডাঙায় নিয়ে যান। (এক ভৃত্য এসে নিধুর কানে কানে কি বলে) আমি উঠি, ওদিকে আমার ডাক পড়ে গেছে।

নারায়ণ : আজ যে বড় সকাল সকাল ?

নিধু : কি জানি, কিছু একটা তিথি-টিথি আছে বোধহয়।

[কৃপারাম অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পালকির মধ্যে বসা মহিলাকে দেখে। পালকি-বাহকরা পালকি উঠিয়ে চলে যায়। নিধু উঠে বেরতে গিয়ে কৃপারামের সামনে পড়ে।]

কৃপা (প্রণাম করে) : আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আপনার গান শুনতে পেলাম। অনেক শুনেছিলাম আপনার কথা। আশীর্বাদ করুন।

নিধু : সে কি কথা, আশীর্বাদ কি হে ? তুমি তো বিখ্যাত কবিওয়ালা।

কৃপা : লজ্জা দেবেন না, বাবু। আপনি কত গুণী লোক, এত বিদ্বান, মানী। আমি অতি সামান্য লোক। কলকাতার বাজারে কলা বেচে খাই।

[নিধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।]

কৃপা : মানে, কলাবিদ্যা···নৃত্য, গীত, বাদ্য···

নিধু (হাসে) : আরে না না। কি যে বল ! আরে তুমিও কবি আমিও কবি। তুমিও রাম আমিও রাম। দু-জনেই সমান।

কৃপা : ছি ছি, আপনি হলেন রামনিধি, রামরূপ গুণের আধার, রত্ন ভাণ্ডার। আপনি কত উঁচা রাম। আর আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী, ধূলোয় মিশে রয়েছি। আমি নেহাতই নাচারাম।

৪

আলো নিভে যায়, আবার জ্বলে। মঞ্চের অন্য অংশে নদেরচাঁদের সভা।

নদে : ব্যাপার কি বল তো ? এই নিধুবাবু-নিধুবাবু হরদম শুনছি। লোকে নাকি হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছে তার গান শোনার জন্য ?

মুখুজ্যে : আজ্ঞে হুজুর, আমাদের কৃপারাম তো শুনে এসেছে তার গান। তেমন কিছুই নয় নাকি।

নদে : কি কৃপারাম ? কেমন শুনলে বল তো ?

কৃপা : হুজুর, উনি অত মানীগুণী লোক। আমার মতো মূর্খের পক্ষে মতামত দেওয়াটা ঠিক শোভা পায় না।

নদে : আরে রাখো তো তোমার বিনয় ! বল, কি শুনলে ?

কৃপা : আজ্ঞে শুনলাম খুবই সামান্য। তা থেকে ঠিক···

নদে : কৃপারাম, ভালো হবে না, ভালো হবে না, আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।

মুখুজ্যে : আঃ কৃপা, বলেই ফেল না।

কৃপা : আজ্ঞে হুজুর, গান খুবই মামুলি। সুরের চমক আছে কিছু। গীত···ঐ একরকম। আহামরি কিছু শুনলাম না।

নদে : তার ? এতেই এত সোরগোল ?

ঘটনাকার ১ : একটা লড়াই হয়ে যাক না তাহলে ? সামনাসামনি পরীক্ষা হয়ে যায়। কত বড় কবি এই নিধুবাবু বোঝা যাবে তখন।

নদে : মুখ্যে মশায়, প্রস্তাব পাঠান।

[ঘটনাকার ১ সভা ছেড়ে মঞ্চের অন্য অংশের দিকে রওনা হয়। সভার অংশে আলো নেভে, অন্য অংশে আলো জ্বলে। আটচালা। ঘটনাকার ২ দাঁড়িয়ে রয়েছে।]

জয় মিত্র : কবির লড়াই ? ঐ দেখো মল্লিকের বাড়ি কবির লড়াই ? হা-হা-হা···

নারায়ণ : আরে কত রাজা-মহারাজা স্বয়ং এখানে এসে গান শুনে যাচ্ছেন আর কর্তা যাবেন জোড়াসাঁকোয় ? ওরে, বলে দিয়ে আয়, আমাদের কর্তাবাবু ঐসব ছোটলোকের বাড়ি গান গাইতে যান না।

[ঘটনাকার ১ আটচালায় ঢোকে। ঘটনাকার ২ বেরিয়ে মল্লিকের সভার দিকে যায়।]

ঘট ১ : নদেরচাঁদ বলেছে নিধুর গান এত মামুলি যে ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানও ওর চেয়ে ভালো গায়।

[ঘটনাকার ১ ঘুরে আবার সভার দিকে যায়।]

জয় মিত্র : কে বলেছে ? নদেরচাঁদ ? ড্যাম ফুল !

[আটচালা অংশে আলো নেভে। সভায় আলো জ্বলে।]

ঘট ২ : জয় মিত্তির বলেছে ওদব শুঁড়ি তেলির আসরে নিধুবাবু গান গাইবে না। (ঘুরে আটচালার দিকে যায়।)

নদে : কে ? ঐ ফচকে ছোঁড়াটা ? রামু মিত্তিরের ছেলে ? এখনো মায়ের দুধ ছাড়ে নি, এই বয়সেই এত কাপ্তেনি !

ঘট ১ (ঢোকে) : জয় মিত্তির আপনাকে বলেছে ড্যাম্প্।

নদে : কি ?

ঘট ১: ড্যাম্প্, ড্যাম্প্।

[আলো নিভে যায়। আটচালায় আলো জ্বলে।]

ঘট ২ : নদেরচাঁদ বলেছে জয় মিত্তিরের বাপমায়ের ঠিক নেই। (ঘুরে সভার দিকে যায়।)

জয় মিত্র : হোয়াট ! শালা তেলি, রাস্কেল।

[অন্যদিকে]

নদে : দু-পাতা ইংরেজি পড়ে খুব বারফট্কা বাবু হয়েছিস, অ্যাঁ ? বাবুয়ানির কি জানিস রে ছুই ?

[দু-দিক থেকে জয় মিত্র আর নদেরচাঁদ গাল পাড়তে থাকে। ঘটনাকার দু-জন এদিক থেকে ওদিক ছোটাছুটি ক'রে তাদের সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা করে, পারে না। দু-দিক থেকে কৃপারাম ও রামনিধি ধীরে ধীরে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়।]

জয় মিত্র : চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আমাকে ? শালা ইতর, ছোটলোক !

নদে : জাহাজিদের কোটনাগিরির পয়সা দু'দিনেই উবে যাবে রে !

জয় মিত্র : ওরে, আগে ভব্যতা শেখ, ভব্যতা শেখ, ব্লাডি নিগার।

নদে : উল্লুক।

জয় মিত্র : ইডিয়ট।

নদে : খচ্চর।

জয় মিত্র : স্কাউণ্ড্রেল।

[দু-জনেই গাল দিতে থাকে। আলো নিভে যায়।]

৫

ধীরে ধীরে আলো জ্বলে ওঠে এক বিরাট কালীপ্রতিমার ওপর। বাকি মঞ্চ অন্ধকার। কৃপারামের গান—

কালো মেঘ ঘনাইছে অন্তর অম্বরে।
তড়িত বিদ্যুৎশিখা হৃদয় বিদরে।
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধরাধরে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে ॥

কৃপা : পরীক্ষা, পরীক্ষা, কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে। শক্তি দাও মা, শক্তি দাও। এ অপমান আমি মাথা পেতে সইতে পারব না। কিসের এত গুমোর তার ? বিদ্যার গুমোর ? কৌলীন্যের গুমোর ? কবিত্বের পরীক্ষা হবে, তাতে কৌলীন্য কি ? মেনে নিতে বোলো না মা, এ অন্যায় মেনে নিতে বোলো না। আমারও দম্ভ আছে, আমারও গর্ব আছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়ে শুধুমাত্র নিজের সাধনা, নিজের পরিশ্রমের জোরে এতদূর এসেছি। আজ আমার মুখের ওপর ওরা সদর দেউড়ির দরজা বন্ধ ক'রে দিল ! কারণ আমার কৌলীন্য নেই, মূর্খ আমি, ইতর ছোটলোক। এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে বোলো না, মা। অত ন্যায়-অন্যায় শাস্ত্র প্রবচন বুঝি না, শুধু এটা বুঝি, এ ন্যায্য নয়, ন্যায্য

হতে পারে না। আমি তোমার অধম দাসানুদাস, ক্ষুদ্র সেবক, জন্মাবধি তোমার সেবায় অবিচল থেকেছি। আজ আমায় শক্তি দাও মা, শক্তি দাও। ঐ দরজা আমি ভাঙব, চূর্ণ করব ওদের দম্ভ! শুধু তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরো না, মা!

[কৃপারাম দেবীমূর্তির সামনে নতজানু হয়। ধীরে ধীরে মূর্তির ওপর আলো নিভে যায়, মঞ্চে আলো জ্বলে। মোক্ষদার প্রবেশ।]

মোক্ষদা : হ্যাঁ গো, কাল সকালে গাড়ি ডেকে আনতে বলে দিয়েছ তো? ভোরে ভোরেই বেরতে হবে। এদিকে আমার সব বাঁধাছাঁদা হয় নি এখনো, কি যে হবে? (কৃপারাম উত্তর দেয় না) হ্যাঁ গো, জবাব দিচ্ছ না কেন? গাড়ি আনতে বলেছ?

কৃপা : আমি যাব না কাল।

মোক্ষদা : কি?

কৃপা : আমি যাব না।

মোক্ষদা : যাবে না? সে কি গো? কবে থেকে যোগাড়যন্তর করছি, নন্দরানীর বিয়ে, এখন যাবে না বললেই হল?

কৃপা : পচাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মোক্ষদা : পচা? পচা পৌঁছে দিয়ে আসবে? তাকে কে পৌঁছে দেয় তার নেই ঠিক, সে আমায় তিন দিনের রাস্তা পার ক'রে পৌঁছে দেবে? কেন, তুমি যাবে না কেন? কি এমন রাজকার্য পড়ে রয়েছে এখানে, শুনি? এবার আবার কোন ইয়ারের দল নিয়ে বেলেল্লাপানা করতে যাবে? পচাকে নিয়ে যাও! (ফোঁপাতে থাকে) আমার যেন মান-অপমান বলে কিছু নেই। অত জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে···

কৃপা : (প্রচণ্ড চিৎকার) যার সঙ্গে খুশি যাও, আমি যেতে পারব না।

[হঠাৎ চিৎকারে মোক্ষদা ভয়ে চমকে যায়। তারপর সন্ত্রস্তভাবে বেরিয়ে যায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধতা।]

কৃপা : (দর্শকের দিকে) সেদিন থেকে প্রতিহিংসার বীজ অংকুরিত হল আমার মনে। প্রতিজ্ঞা করলাম, এ অপমানের যোগ্য জবাব দিতে হবে। দশ বছর কবিগিরি করেছি তখন কলকাতা শহরে। নিতাই বৈরাগী, নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর স্বয়ং – কত বড় বড় কবির সঙ্গে মিশেছি, গান বেঁধেছি, গান গেয়েছি। তাদের স্নেহ, ভালোবাসা, সম্মান পেয়েছি। বাদ-প্রতিবাদ রেষারেষি কলহ – তাও হয়েছে। কিন্তু এমন অহমিকা দেখি নি কখনো। কবি বলে পরিচয় দেয়, অথচ শক্তিপরীক্ষায় রাজি নয় – এ কেমন কবি? সুযোগ খুঁজতে লাগলাম পালটা আঘাত করার। কিন্তু রামনিধির আসল পরিচয় তখনো পাই নি আমি। পেলাম ক-দিন বাদে, নিতান্তই ঘটনাচক্রে।

খবর রাখছিলাম নিধুবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে—সে কোথায় যায়, কী করে, কারা আসে তার গান শুনতে। খবর পাই, আর ক্রোধে, গ্লানিতে, ঈর্ষায় আমার বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যায়। একদিন রাত্রে লুকিয়ে গিয়ে হাজির হলাম এক স্ত্রীলোকের বাড়ি। নিধুবাবুর পরম প্রিয়তমা রক্ষিতা, নাম শ্রীমতী। সন্ধ্যার নিভৃতে নির্মল প্রেমালাপের পর নিধুবাবু তখন প্রেয়সীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর তৃতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে গার্হস্থধর্ম পালন করার জন্য ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।

৬

মঞ্চের অন্য অংশে আলো জ্বলে। রামনিধি আর শ্রীমতী।

নিধু : আজ আসি। ও হ্যাঁ (একটা লাল খেরোর খাতা এগিয়ে দেয়) চারটে নতুন গান আছে এতে। পড়ে দেখো, কাল গেয়ে শোনাব।

[শ্রীমতী খাতা নেয়। তারপর নতজানু হয়ে প্রণাম করে। রামনিধি আশীর্বাদ ক'রে চলে যায়। শ্রীমতী ধীরে ধীরে মঞ্চের অপর দিকে আসে। ফরাসের ওপর বসে, খাতাটা খোলে। হঠাৎ কৃপারামের কণ্ঠ।]

কৃপা : রাবেয়া!

শ্রীমতী (চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে) : কে?

কৃপা : রাবেয়া বানু। (মঞ্চে পুরো আলো জ্বলে ওঠে) পাটনার মুন্নিবাঈয়ের মেয়ে রাবেয়া না তুই? তোর বিশ বছর আগের চেহারা থেকে চিনতে পারার কথা নয় অবশ্য আমার। যদি না তুই অবিকল তোর মায়ের মতো দেখতে হতিস। মুন্নিবাই-এর মেয়ে রাবেয়া তাহলে এখন শ্রীমতী নাম নিয়ে রামনিধি গুপ্তের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন! সাবাশ, সাবাশ! তোর মা বেঁচে থাকলে কত খুশিই না হতো!

শ্রীমতী (এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বলে) : তুমি এখানে এসেছ কেন?

কৃপা : কেন, আসতে নেই? নিধুবাবু গোঁসা করবেন? তুই শালী কি মেবারের রাজকুমারী বেঁদনূরের ছোঁয়া লাগলেও কলঙ্ক হবে? রাখ্, রাখ্, তোর আবার সতীত্ব!

শ্রীমতী : তুমি কি শুধু গাল দেবার জন্যেই আমাকে এতকাল পরে খুঁজে খুঁজে বের করলে ?

কৃপা : যাক তাও ভালো। চিনতে পেরেছিস তাহলে ?

শ্রীমতী : চিনব না কেন ? কলকাতা শহরে কত নামডাক তোমার। কত বড় বড় সব আসরে গান গেয়ে বেড়াও। কলকাতায় এসে থেকেই তো তোমার নাম শুনছি। গানও শুনেছি।

কৃপা : গান শুনেছিস ? কোথায় শুনলি ?

শ্রীমতী : কেন, আমি তো কস্‌বী। হাজার লোকের আসরে গান শুনতে গেলে আমার সতীত্ব নষ্ট হবে নাকি ?

কৃপা : বাবা, কথাও তো কইতে শিখেছিস বেশ ! সাধে নিধুবাবুর নজর পড়েছে। তোর এলেম আছে নিশ্চয়, অত জ্ঞানীগুণী লোকের ঘাঁড় হয়েছিস।

শ্রীমতী : বাবুকে তুমি অত ঈর্ষা কর কেন ?

কৃপা : কি ? কে বললে তোকে ?

শ্রীমতী : বলবে আবার কে ? আমি সব জানি। কিন্তু যত বড় গাইয়েই হও, বাবুর তুমি নখেরও যুগ্যি নও। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাও কেন ?

কৃপা : চ্যাঙা লোকেও চাঁদ ধরতে পেরেছে, এমন কথা শুনেছিস কখনো ?

[হঠাৎ শ্রীমতী চমকায়। বাইরে ঘোড়াগাড়ি থামার শব্দ হয়।]

শ্রীমতী : সে কি ? (ছুটে বাইরের দিকে যায়, তারপর ফিরে আসে) বাবু ফিরে এসেছেন। তুমি শিগ্‌গির যাও।

কৃপা : ফিরে এসেছেন ? আজ কি পরিবারের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা হবে···

শ্রীমতী : আঃ শিগ্‌গির চলে যাও !

[শ্রীমতী ছুটে বেরিয়ে যায়। কৃপারাম দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। তারপর ক্লাসের ওপর থেকে গানের খাতা তুলে নেয়, একবার খুলে দেখে, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। আলো নেভে।]

৭

আবার আলো জ্বলে। একটা আলোর বৃত্তে দেখা যায় মঞ্চের এক কোণে কৃপারাম বসে রয়েছে। হাতে নিধুর গানের খাতা।

কৃপা (পাতা ওলটায়) : 'যে আমার মনবাসী, মন মোর তার হাতেতে / যেমন

দর্পণ হাতেতে আপন, দেখিতে আপন তাতে।' সুর পঞ্চম কালাংড়া। তাল জলদ তেতালা। (পাতা ওলটায়) সুর দিন্ধু কাফি। তাল টিমে তেতালা। 'তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত / মণির কারণে ফণী কাতর কত / তুমি জান না কি জান, যেমন আমার মন / চাতকী কিঙ্কিত জানে, আপন মত।' (ঘন ঘন পাতা ওলটায়) এত···এত গান! সুর ইমন। 'আমি কি জানি প্রাণ অন্তর অন্তরে / কি আর নাহিক জানি তোমার অন্তরে / দিবানিশি আছ তুমি আমার অন্তর / অন্তর অন্তর হলে জানিতে অন্তরে।' (পাতা ওলটায়) সুর গুর্জরী টোড়ি। বাগেশ্বরী টোড়ি। ঝিঁঝিট, পাহাড়ি ঝিঁঝিট, এলাহিয়া ঝিঁঝিট, গারা ঝিঁঝিট. বিলাওল ঝিঁঝিট. ভূপালী ঝিঁঝিট. জায়েদ ঝিঁঝিট, ইমন ঝিঁঝিট, কাফি ঝিঁঝিট, বেহাগ ঝিঁঝিট (বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে দর্শকের দিকে) শুধু ঝিঁঝিট এতরকম হয়! (খাতা দেখে) সুর বেহাগ। 'চঞ্চল চিত্ত কেন লো তোমার চিত্রাণি' (ধীরে গাইতে শুরু করে। এক লাইন গেয়ে পাতা ওলটায় 'বিধুমুখে মৃদু হাসি ভালোবাসি প্রাণ' (গাইতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কৃপার গলা ছাপিয়ে নিধুর গলা ভেসে আসে। পিছনে পর্দায় সিলুয়েটে নিধুর ছায়া দেখা যায়, গাইছে। দু-লাইন গাওয়ার পর গান থামে, সিলুয়েট মিলিয়ে যায়। কৃপা, দর্শকের দিকে) এমন গান ···বেশ কয়েক শত! কি বিচিত্র এর আকার। কোথায় মহড়া, কোথায় চিতেন, কোথায় অন্তরা! কত বিচিত্র সব সুর, তাদের নামই শুনি নি কোনোদিন! এ কেমনতরো কবি!

[ফের পাতা ওলটায়। নিধুর গান আবার শুরু হয়, অল্প রঙের আলোর ওপর সিলুয়েট পড়ে। কালীপ্রতিমার ওপরেও আলো পড়ে। নিধুর গানে মঞ্চ ভরে যায়।]

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কারে দোষ দিব, নিলে কোন জন।
না বলিয়ে কেমনে রব, বলিয়ে বল কি করিব।
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন॥···
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ করেছ ভাল।
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি করহ যতন॥

[গান চলে। কৃপারাম বিস্ফারিত চোখে এদিক ওদিক তাকায়, ওঠে, দিশাহারা হয়ে এদিক ওদিক হাঁটে, হাত থেকে খাতা পড়ে যায়, টলতে থাকে। গান শেষ হবার আগেই মেঝেতে পড়ে যায়, অচৈতন্য। গান শেষ হয়. সিলুয়েট মিলিয়ে যায়, কালীমূর্তির ওপর আলো থাকে। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। হঠাৎ ঘুরে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজে। কৃপা ধীরে ধীরে উঠে বসে।]

কৃপা : (দর্শকের দিকে) আশ্চর্য এক অনুভূতি হল আমার সেদিন। কথা সুর ভাব, সব মিলিয়ে নিধুর গান এক অদ্ভুত মাদকতায় আচ্ছন্ন ক'রে দিল আমার মন। কি এক গভীর বেদনা হৃদয়টাকে নিঙড়ে নিতে লাগল। এমন গান আগে কখনো শুনি নি আমি। সেদিন আরো বুঝলাম, এই গান আমার সাধ্যের অতীত। এমন গান কোনোদিনও বাঁধতে পারব না আমি। রামনিধির দম্ভ অন্যায় দম্ভ নয়, তার অহমিকা মিথ্যে অহমিকা নয়, তার ক্ষমতা সাধারণ লোকের ক্ষমতা নয়। (কালী প্রতিমার দিকে) অন্যায় হয়েছিল আমার, তার শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়ে। রামনিধির বিরুদ্ধে আমার নালিশ আমি তুলে নিলাম, মা। কোনো ক্ষোভ নেই আমার তাকে নিয়ে। আমার নালিশ তোমার বিরুদ্ধে! তুমি আজ্ঞা করেছিলে, পদ বেঁধে জগৎসংসারে তোমার মহিমা প্রচার করতে। আজ জানিয়ে দিলে, আমার ভাষা নেই। তোমার আদেশে স্থির করেছিলাম গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দেব। আজ বুঝিয়ে দিলে আমার সুর নেই। কেন আমার সঙ্গে এই পরিহাস করলে, মা? তোমার সেবায় কখনো কোনো কার্পণ্য করেছি? কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তুমি বলেছিলে। সাধনায় কোনো দিন অবহেলা করেছি? তবে? তবে কেন তোমার করুণার দান উজাড় ক'রে দিলে রামনিধিকে? শুধু জন্মক্ষণে অর্পণ করলে তাকে ভুবনজয়ী প্রতিভা? রামনিধি বিধান, সংগতিপন্ন ভদ্রসন্তান অবসরে খেয়ালবশে সে গান বানায়। আশ্চর্য তার ভাব ভাষা সুর, অগাধ তার সংগীতের জ্ঞান, চরম উৎকৃষ্ট তার রুচি। ক্ষুদ্র দরিদ্র গ্রাম্য কবিওয়ালা আমি, শুধু সাধনার জোরে তার নাগাল আমি কোনোদিনও পাব না। এই তোমার বিধান, মা! এই কথাটাই আজ সার বুঝলাম। ঐ দরজা আমার সামনে বন্ধ হয়ে গেছে তোমারই ইচ্ছায়। আজ থেকে···আজ থেকে তোমার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ শুরু হল। যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছি আজ পর্যন্ত তা দিয়ে আঘাত করব, ধ্বংস ক'রে দেব, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব আমি—কিন্তু এ বিধান তোমার মানব না, মা, এ বিধান কিছুতেই মানব না। (ধীরে ধীরে আলো পরিবর্তিত হয়। কালীমূর্তি মিলিয়ে যায়। কৃপারাম দর্শকের দিকে ঘোরে, কোণে টেবিলের ওপর থেকে চাদর নিয়ে গায়ে জড়ায়, তারপর বৃদ্ধের কণ্ঠে বলে) সেই থেকে নতুন যুদ্ধ শুরু হল আমার। ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, বিধ্বংসী এক যুদ্ধ। কিন্তু সে কথা বলার আগে দু-দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া দরকার। বুড়ো হয়েছি, কলজের জোর কমে গেছে। বাবুমশায়রা, আপনারাও তামুক-টামুক সেবন ক'রে আসুন। বিবিরা কি সেবন করবেন জানি না। আমিও একটু হাঁপ ছেড়ে নিই।

[বিরতি]

৮

বিরতির পর পর্দা খোলে। মঞ্চের দুই কোণে দুই রটনাকার আরাম ক'রে বসে রয়েছে। দু-জনের হাতে দু-টি সংবাদপত্র।

রট ২ : শোন্ শোন্, খবর শোন্। মোকাম কোন্নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্বসুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল, বাইশ স্ত্রী বর্তমানা ছিল। ২১ কার্তিক ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোকপ্রাপ্ত হইলে কলিকাতার এক স্ত্রী, বাঁশবেড়িয়ার এক স্ত্রী ও কোন্নগরস্থিতা দুই স্ত্রী, এই চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। (কাগজ সরিয়ে নিশ্চয় রামমোহন রায় খবর পেয়ে গিয়েছিল। নইলে, নইলে বাকি আঠারোটা বাঁচল কি ক'রে ?

রট ১ : ধুৎ, রামমোহন রায় তো সেদিন বেলগাছিয়ায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। এই দেখ্, এইখানে লিখেছে—মোকাম কলিকাতা ২১শে কার্তিক সন্ধ্যার পর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক অনেক ভাগ্যবান সাহেব ও বিবিদিগকে চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণ অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল।

রট ২ : কি, দ্বারকানাথ ঘাস চর্বণ করল ?

রট ১ : ধ্যাৎ, দ্বারকানাথ নয়, ভাঁড়।

রট ২ : ও। এটা শোন। গত ১৭ কার্তিক এক ভদ্রলোক কোনো বিশেষ কার্যে ভবানীপুর গমন করেন। পথে প্রস্রাবের পীড়া হওয়াতে রাজমার্গের প্রান্তভাগে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া যেমত উঠিবেন তৎক্ষণাৎ জনৈক প্রহরী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া হোঁকা হোঁকা করত তাঁহাকে প্রথম থানায় চালান করিল ও সর্বশেষে উচ্চ হুজুরে হাজির করিল। হুজুর চারি আনা দণ্ড করত অব্যাহতির আজ্ঞা দিলেন। কি আশ্চর্য! আমরা গরিব বাঙ্গালী প্রজা। রাজপুরুষেরা আমারদিগের প্রতি যত পারেন ততই ধুমধামের হুকুম জারি করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বদাই দেখা গিয়া থাকে সাহেবরা পথে যাইতে যাইতে প্রস্রাব ত্যাগ হইবার ইচ্ছা হইলে অমনি তালগাছের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া তৎক্ষণাৎ ভদ্র-লোকের প্রাচীরের গায়ে ফনফনাইয়া মূত্রত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার-

দিগকে প্রহরীরা কিছুই বলিতে পারেন না। ইহা কি কোম্পানি বাহাদুরের সমদর্শিতার নমুনা ?

[হঠাৎ কৃপারামের হুঙ্কার শোনা যায়। প্রবেশ।]

কৃপা : এই, এই, কি হচ্ছে এখানে ?

[ঘটনাকার দু-জন ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে।]

ঘট ২ : আজ্ঞে, সংবাদ পড়ছিলাম।

কৃপা : বেরো, বেরো এখান থেকে। বেদড়া ছোঁড়া কোথাকার ! সংবাদ পড়ছিলাম ! (ঘটনাকারদের প্রস্থান। কৃপা দর্শকদের প্রতি) আপনাদের বিরক্ত করছিল নিশ্চয়। পাজির পা ঝাড়া কতগুলো ! যাক্‌গে, কতদূর বলেছিলাম যেন ? দাঁড়ান, একটু স্মরণ ক'রে নিই। কোণে টেবিলের ওপর থালা থেকে মিষ্টি তুলে মুখে দেয়) হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার যুদ্ধ ঘোষণা। তার পরে তো ক-দিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। দেবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছি, নিশ্চিত জানতাম সংঘাতিক কোনো অকল্যাণ ঘটবে আমার। হয়ত দৈবী অভিশাপে ভস্মই হয়ে যাব। কিছুই হল না। উল্টে বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। নাম ডাক অর্থ প্রতিপত্তি বেড়েই যেতে লাগল। ক-দিনের মধ্যেই কলকাতার কবিগানের আসরে আমার জোড়াসাঁকোর দলের একেবারে একচ্ছত্র আধিপত্য। খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গেলাম আমি। এমন কি কলকাতার বড়মানুষদের আমোদ-আহ্লাদের পীঠস্থান সেই শোভাবাজার রাজবাড়িতেও নিয়মিত ডাক পড়তে লাগল আমার। (মিষ্টিতে কামড় দিয়ে ফেলে দেয়) এঃ, এটা নিশ্চয় ভোলা ময়রার মিষ্টি। থুঃ থুঃ থুঃ। সব মাটি ক'রে দিল ! যা বলছিলাম···ঐ শালা গোবিন্দটাকে বিদেয় করতে হবে এবার। যত রাজ্যের শস্তার জিনিস এনে ঘরে ঢোকাচ্ছে।···হ্যাঁ, ওদিক নিধুবাবুর জীবনেও ঘটন-অঘটন দুই-ই ঘটেছে। তার সুখ্যাতি বেড়েছে। জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞ লোকেরা নিধুর গানের খুব প্রশংসা করেছে মূর্খ বড়লোকেরা ভাবছে, নিধুর টপ্পা, না জানি কি একটা ব্যাপার, শুনে আসি একটু ! কিন্তু পক্ষীর দলের আখড়া সেই বটতলার আটচালা উঠে গেছে। জন মিত্তিরের মার্কিন কোম্পানি খুব বেশিদিন হনেস্ট থাকে নি। তার বেনিয়ানদের ধরনধারণের সন্ধান পেয়ে তারা কলকাতার ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। ছ্যাঁচড়া ইংরেজ ছাড়া গতি নেই বুঝতে পেরে তার বাপ রামচন্দ্র ছেলেকে হেয়ার সায়েবের ইস্কুলে বাবুস্ কেলাশে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। আটচালা তুলে দিয়ে জন মিত্তির এখন ফিরিঙ্গিপাড়ায় আমোদের সন্ধানে ঘোরে। নিধুবাবুর অবশ্য এসবে কিছু এসে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যাচ্ছিল। সেটা বুঝলাম হঠাৎ একদিন সন্ধেয়। সংযমী সচ্চরিত্র এই গৃহস্থের বাড়িতে এসে

হাজির হল শ্রীমতী।

[বলতে বলতে কৃপারাম গায়ের চাদর খুলে ফেলে। তানপুরা সামনে নিয়ে বসে। শ্রীমতীর প্রবেশ। ঝমঝম ক'রে তার পায়ের মল বাজে।]

কৃপা (চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে) : সে কি ? তুই ?

শ্রীমতী : সেদিন আমার ঘরে তোমায় দেখে আমিও ভূত দেখার মতো চমকে-ছিলাম। আজ তোমার পালা।

কৃপা : তুই এখানে এসেছিস কেন ?

শ্রীমতী : কেন, আমি এলে তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে নাকি ? গিন্নি এখন নেই, খবর নিয়েই এসেছি।

কৃপা : কি চাস তুই ?

শ্রীমতী : চাই তো অনেক কিছুই। সব কি আর তুমি দেবে ?

কৃপা : ছেনালি করতে হয় অন্য জায়গায় যা। এখানে সুবিধে হবে না।

শ্রীমতী : বাবুর গানের সাটটা ফেরত দিয়ে দাও।

কৃপা : কি ?

শ্রীমতী : বাবুর গানের খাতা। আমার ঘর থেকে চুরি করেছিলে ! ফেরত দাও।

কৃপা : বদতমিজ, হারামজাদী ! তোর সাহস তো কম নয়। (সজোরে ঠেলে দেয়) বেরো, বেরিয়ে যা এখান থেকে !

শ্রীমতী (ধাক্কা সামলে নেয়) : জানতাম দেবে না ! চোরেরও রকমফের আছে। যাক গে, ওটা চাইতে আমি আসি নি। আমি এসেছি তোমার কাছে সাহায্য চাইতে।

কৃপা : সাহায্য চাইতে ? তা আমার কাছে কেন ? তোর বাবুর কাছে যা না ? নাকি সেখানেও লাথি খেয়েছিস ? বাবু রামনিধি গুপ্ত এই পঁচাত্তর বছর বয়সে নতুন ছুকরি ধরেছেন নাকি ?

শ্রীমতী : খবরদার বাবুর সম্বন্ধে তুমি কোনো খারাপ কথা বলবে না। তিনি দেবতুল্য মানুষ। তোমার মতো ইতর নন।

কৃপা : হ্যাঁ, পঁচাত্তর বছর বয়সে দেবতুল্য হওয়া ছাড়া উপায় কি ? দাঁত পড়ে গেছে, মাংস চিবোতে পারেন না, তাই পাঁঠাবলি বন্ধ ক'রে এখন বৈষ্ণব হয়েছেন।

শ্রীমতী : বাবুকে তুমি এখনো ঈর্ষা করো ? কেন, কি অনিষ্ট করেছেন তিনি তোমার ?

কৃপা : অনিষ্ট ? না, আমার কোনো অনিষ্ট তিনি করেন নি। তিনি হলেন সখের কবি, কত উঁচুতে বসে আছেন। আর আমি অতি অধম, কলকাতার বাজারে কলা বেচে খাই। তিনি আমার অনিষ্ট করতে যাবেন কেন ? অনিষ্ট করেছে

অন্যে। তুই বেটি তো আবার শুধু কলা নয়, শাকটা মূলোটা পেপেটা কাঁঠালটা যা আছে সবই বেচিস।

শ্রীমতী : বাবুর সঙ্গে বেয়ারেষিটা তুমি ছেড়ে দাও। শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ। জন্মেও তুমি ওঁর নাগাল পাবে না।

কৃপা : হ্যাঁ, জন্মেও পাব না। জন্ম! জন্মেই সব স্থির হয়ে যায়। শক্তিধর শিল্পী, ছোটলোকের ঘরে জন্মালে বাবুরা ক-দিন খুব পিঠ চাপড়ায়। বলে, সাবাশ বেটা, বেড়ে গেয়েছিস, চালিয়ে যা। তারপর দু-দিন বাদেই তাকে ভুলে যায়। আর সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরে জন্মালে সে হয়ে যায় যুগান্তকারী প্রতিভা। তুই এখানে এসেছিস কেন বল তো? কে পাঠিয়েছে তোকে?

শ্রীমতী : কেউ পাঠায় নি। কে পাঠাবে? আমি যে তোমায় চিনি, সে কথা এ শহরে আর কেউ জানে নাকি?

কৃপা : তোর বাবু জানে না?

শ্রীমতী : না।

কৃপা : বাবুকে বলিস নি তুই?

শ্রীমতী (তানপুরার পাশে বসে অন্যমনস্ক হয়ে বাজায়) : না। পাটনার কথা মনে আছে তোমার? সেই একবার, মনে আছে, লক্ষ্ণৌ থেকে বালকাঞ্জান এসে-ছিল গান গাইতে? তার তানপুরা দেখে মা বলল মা-রও একটা ঐরকম হাতির দাঁতের কাজকরা তানপুরা চাই। দেখাদেখি আমিও বায়না ধরলাম, আমারও একটা চাই। তুমি তখন গাজিপুর না কোথা থেকে তানপুরা নিয়ে এলে। দু-টো। একটা মা-র জন্য, বড়। আর একটা আমার জন্য, ছোট্ট একটা তানপুরা। মনে আছে তোমার?

কৃপা : ঐসব ছেঁদো কথা রাখ তো! কি চাই তোর তাড়াতাড়ি বল।

শ্রীমতী : বাবুর জন্য তুমি একটা কাজ ক'রে দেবে?

কৃপা : বাবুর জন্য? মানে তোর বাবুর জন্য?

শ্রীমতী : হ্যাঁ। তুমি জান, বাবুর এখন কোনো আখড়া নেই। বৈঠকে গান না। এ ও আসে গান চাইতে, উনি গান লিখে দেন, শিখিয়ে দেন। তারা সেসব গান নিয়ে ইচ্ছেমতো গেয়ে বেড়ায়, অদলবদল ক'রে দেয়। বাবুর ভালো লাগে না। ওঁর খুব ইচ্ছে, দু-একটা সভায়-টভায় উনি আবার গান করেন। বয়েস হয়েছে, বেশিদিন তো আর গাইতে পারবেন না। তুমি একটু চেষ্টা করবে? উনি নিজে তো মুখ ফুটে কাউকে বলবেন না।

কৃপা : নিধুবাবু তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে এই কথা বলতে?

শ্রীমতী : পাগল নাকি? উনি আমাকে এই কথা বলবেন? আমি নিজেই এলাম তোমার কাছে। আমার জন্য তুমি এ-কাজটা ক'রে দেবে? আমার মুখ চেয়ে? তোমার কত জানাশোনা।

কৃপা : যদি ক'রে দিই, তুই কি দিবি আমায় ?

শ্রীমতী : (নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কৃপার দিকে, তারপর বলে) তুমি তো কলার ব্যাপারী. আমার কলা নিয়ে কি করবে তুমি ? আর ঐ শাকটা মুলোটা পেপেটা কাঁঠালটা, সেসব বাজারি জিনিস, তাতে কি তোমার মন উঠবে ?

[আলো নিভে যায়। আবার জ্বলে। কৃপা একা।]

কৃপা : ঘটনার এই অদ্ভুত গতিতে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড ! ভগবানদত্ত প্রতিভা, স্বয়ং বিধাতার বরপুত্র রামনিধি, কলকাতা শহরে তার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আজ এই কৃপারামের কৃপাপ্রার্থী ! আমায় ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে যাতে কোনো বড়মানুষের আসরে তিনি গান গাইতে পারেন। হায় রে, আত্মসম্মানের কি বিড়ম্বনা. মুখ ফুটে বলতে পারবেন না তিনি ! সুতরাং প্রতিভাধরেরও মুরুব্বির দরকার হয়। আর পাকেচক্রে আমিই হয়ে পড়লাম নিধুবাবুর মুরুব্বি। ব্যবস্থা করলাম। হরু ঠাকুরকে বলে বিরাট এক আসরের আয়োজন করা হল শোভাবাজার রাজবাড়িতে। কলকাতার বিশিষ্ট মান্যগণ্য লোকেদের নিমন্ত্রণ হল সেখানে। বাছা বাছা গাইয়েরা সব এলেন। গেঁয়ো কবির লড়াই নয়, খাঁটি আখড়াই গান। নিধুবাবুও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। খোদ শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে ডাক এসেছে, সেখানে গেলে নিশ্চয় আত্মসম্মানের হানি হবে না। আমিও গেলাম। শুধু গেলাম না, এক কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল পাতলাম। সাহেবদের একটা কথা আছে শুনেছি, আপনারা জানবেন, যুদ্ধে আর প্রণয়ে নাকি অন্যায় বলে কিছু নেই।

৯

সেকেণ্ড লাইন কাটেন সরে যায়। শোভাবাজার রাজবাড়িতে আসর বসেছে। বাবু গোপীমোহন ও তাঁর পুত্র রাধাকান্ত দেব উপস্থিত। সোর-গোল ওঠে। বাবু রামমোহন রায়ের প্রবেশ।

অনেকে : আসুন, আসুন।

রাধাকান্ত (পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়) : বাবু রামমোহন রায়।

রামমোহন : মার্জনা করবেন, আমার আসতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল।

গোপীমোহন : না না, তাতে কি হয়েছে ! আপনি শুনেছি খুব ব্যস্ত লোক।

রাধাকান্ত : হ্যাঁ। ধর্মসংস্কারের কাজ, কত জায়গায় যেতে হয়। একটু যাও তো

হবেই।

রামমোহন : তা বটে। ধর্মরক্ষা তো নয়, যে ঘরেই সব বন্দোবস্ত থাকবে!

গোপী : আচ্ছা, আপনাদের ঐ কুটুম্ব সভা না কি যেন একটা আছে?

রাধাকান্ত : আজ্ঞে, ওটার ওঁরা নাম দিয়েছেন আত্মীয় সভা।

গোপী : ঐ হল। তা সেখানে শুনেছি আপনারা সংস্কৃতে গান গাওয়া চালু করেছেন? সত্যি নাকি?

রামমোহন : ঠিক সংস্কৃতে গান নয়, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করা হয়।

গোপী : কেন? আপনাদের পরমেশ্বর কি খোট্টা না মারাঠি বামুন যে বেদভাঙা সংস্কৃতে না ডাকলে বুঝতে পারবেন না?

রাধাকান্ত (বিব্রত) : বাবা ওসব বেদ-উপনিষদ পরে হবে, আপাতত খাঁটি বাংলা গান শোনা যাক। এই যে, এবার জোড়াসাঁকোর কৃপারাম গাইবে। আর এখানে এই ইনিই হলেন বাবু রামনিধি গুপ্ত, আর ঐ উনি ওঁর সুযোগ্য শিষ্য মোহনচাঁদ বসু। মোহনচাঁদ এবার হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

রামমোহন (নমস্কার করে) : তাই নাকি? চমৎকার। নিধুবাবু, আপনার গান শোনার সুযোগ হবে বলেই এলাম এখানে। মানে, বাবু গোপীমোহন নিমন্ত্রণ করেছেন, সে জন্যেও অবশ্য এলাম।

রাধাকান্ত : কই হে কৃপারাম, শুরু করো তাহলে। (রামমোহনকে) এই কৃপারামের কবিগানে খুব নামডাক, শুনেছেন নিশ্চয়। তবে আজ আখড়াই গাইবেন। নিজেরই রচনা। তাই তো?

[কৃপা মাথা নেড়ে সায় দেয়। কৃপার কণ্ঠে গান —]

চঞ্চল চিত্ত কেন লো তোমার চিত্রাণি।
মৃগ অন্বেষণ করিবারে মন, বুঝি লো মৃগনয়নি।
ইহা বিনে প্রাণসখি, আর কিছু নাহি দেখি,
না দেখে সে রূপ, থাকো লো যেরূপ দেখে ভয় হয় ধনি।

[গান চলাকালীন দেখা যায় রামনিধি আর মোহনচাঁদ ভীষণ উত্তেজিত। গান শেষ হতেই মোহনচাঁদ দাঁড়িয়ে উঠে কি যেন বলতে যায়। রামনিধি ধরে বসিয়ে দেয়।]

রাধাকান্ত : বাঃ চমৎকার। একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে যে, কৃপারাম। তুমি এমন গীত রচনা করতে পারো, জানা ছিল না তো?

রামমোহন : অপূর্ব রচনা। ভারি সুন্দর।

গোপীমোহন (তন্দ্রা ভাঙে) : হ্যাঁ, কই, মধুবাবু। আপনি ধরুন একখানা।

রাধাকান্ত : মধুবাবু নয়, নিধুবাবু।

গোপীমোহন : অ্যাঁ, নিধুবাবু ? তা হবে। ধরুন একখানা ?

[নিধুর গান —]

মনেতে উদয় যাহা, না পারি কহিতে।
হৃদয় নিবাসী তুমি হয় হে বুঝিতে।
আমার মনের মতো করিতে উচিত।
অধিক কথন আর না যায় লাজেতে।

[বাহবা ধ্বনি ওঠে।]

রাধাকান্ত : বাবা, কাকে ফেলে কাকে রাখি ! যেমন কৃপারাম, তেমনি নিধুবাবু। দুইই চমৎকার।

রামমোহন : সত্যি নিধুবাবু, আপনি যে এই বাংলা গীতের সঙ্গে হিন্দুস্তানি টপ্পার সুর মিলিয়েছেন, এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাঙালি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

গোপীমোহন (হাই তোলে) : যাই বল বাপু, এই আখড়াই গান···এতে সুর ভাবের খুব উচ্চ ব্যাপার আছে মানছি, কিন্তু ঐ অল্পসল্পই ভালো। সারা রাত ধরে···একটু ক্লান্তিকর। আচ্ছা, ঐ বিদ্যাসুন্দর পালাটা একদিন লাগালে হয় না, অনেকদিন শুনি নি।

[আলো নিভে যায়। সেকেণ্ড লাইন কার্টেন পড়ে।]

১০

মঞ্চের সামনে কোণে কৃপারাম একা।

কৃপা : কার জিত হল ? তার, না আমার ? তার জন্য ডাকা আসরে তার থেকে চুরি করা গান গেয়ে অপদস্থ করতে চেয়েছিলাম নিধুবাবুকে। কে অপদস্থ হল ? সে, না আমি ? নিজের ওপর ঘৃণায়, গ্লানিতে, অনুশোচনায়, শরীরটা কি কি করতে লাগল আমার। এ কি কদর্য শঠতায় নেমেছি আমি ? আমি কি উন্মাদ হয়ে গেলাম ? নির্বোধ শিশুর মতো আচরণ করছি ? ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল শ্রীমতী।

শ্রীমতী (দৌড়ে ঢোকে) : শিগ্‌গির এক্ষুনি তুমি খাতাটা ফেরত দিয়ে দাও। ছি ছি ছি, এত নিচে নামলে তুমি ? ছিঃ। কেন ? কি অন্যায় করেছেন উনি ?

তোমার কি ক্ষতি করেছেন যে তুমি এইভাবে ওঁকে অপমান করতে চাও? উনি যে কতটা আঘাত পেয়েছেন, তোমার মতো ইতর তা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

কৃপা : চুপ কর। যুদ্ধ চলছে আমাদের। যুদ্ধে আবার ন্যায়-অন্যায় কিসের?

শ্রীমতী : যুদ্ধ? তুমি করবে যুদ্ধ ওঁর সঙ্গে? ওঁর মতো মহৎ মানুষের কাছে আসতে পেরেছ, এটাই তোমার সৌভাগ্য। তুমি জান, কাল তুমি যে ঐ কুৎসিত কাণ্ডটা করলে, তারপর থেকে লজ্জায় অপমানে উনি একেবারে পাথরের মতো হয়ে গেছেন। ওঃ ভগবান, ওঁর ঐ মুখটার কথা ভাবলে আমার মনটা শিউরে ওঠে। কিন্তু একটা কথা বলেন নি তিনি তোমার বিরুদ্ধে, একটা অভিযোগ নয়। আর তুমি? খাজারে নাম কেনার জন্য নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য, সত্যি-কারের গুণী লোককে অপদস্থ করার জন্য, তুমি কী না করতে পার? কিসের অত চরিত্রের বড়াই তোমার? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কখনো? ভেবে দেখেছ, তুমি আসলে কী? বাজারের দালাল তুমি। বাজারে যা চলে, তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে চুরি ক'রে এনে বেচো। তোমার সঙ্গে ঐ সোনাগাছির কুটনিদের তফাত কি? (কৃপারাম বিস্ফারিত চোখে শ্রীমতীকে দেখে, জবাব দিতে পারে না। শ্রীমতী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে) পায়ে পড়ি তোমার, বাবুর গানের খাতাটা তুমি ফেরত দিয়ে দাও। মিনতি করছি তোমার। তুমি যা চাও, সব দেব। যা চাও, সব। কিন্তু দোহাই তোমার, ওটা ফেরত দিয়ে দাও। (শ্রীমতী কৃপার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে)।

কৃপা : সর, সরে যা। তোরা সব পারিস। (ঘৃণায় শ্রীমতীকে ঠেলে সরিয়ে দেয়) যা, ঐ তাকিয়ার তলায় আছে, নিয়ে যা। আর কক্ষনো আসিস না এখানে। (শ্রীমতী ওঠে, আঁচলে চোখ মোছে। ধীরে ধীরে অন্য কোণে গিয়ে তাকিয়ার তলা থেকে খাতাটা নেয়। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে—)

শ্রীমতী : আর অত গর্ব কোরো না। তুমিও এখন আমাদেরই জায়গায় নেমে এসেছ।

[শ্রীমতী বেরোতে যায়। হঠাৎ তার সামনে মোক্ষদা ঢোকে। তাকে দেখে শ্রীমতী দু-পা পিছিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে বেরিয়ে যায়।]

মোক্ষদা : ও কে? কি, জবাব দিচ্ছ না যে? কে ঐ মেয়েলোকটা?

কৃপা : এক বেশ্যা।

মোক্ষদা : মানে?

কৃপা : বেশ্যার মানে বোঝো না? গণিকা, বারাঙ্গনা।

মোক্ষদা : এখানে কি করতে এসেছিল?

কৃপা : যা করতে আসে ওরা, তাই।

মোক্ষদা : তার মানে ? তুমি কি মস্করা করছ আমার সঙ্গে ?

কৃপা : মস্করা নয়, মস্করা নয়, এর চেয়ে ভয়ংকর সত্যিকথা আর কিছু হতে পারে না। সবকিছু ভেঙেচুরে যাচ্ছে আমার চারদিকে। এক গভীর দুর্গন্ধ পংকিল আবর্তের মধ্যে আমি তলিয়ে যাচ্ছি।

[মোক্ষদা স্তম্ভিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। আলো নিভে যায়।]

১১

সেকেণ্ড লাইন কার্টেন সরে। নিধুবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে বই পড়ছে। কৃপা ধীরে ধীরে ঢোকে। নতজানু হয়ে প্রণাম করে। নিধু কিছুক্ষণ পর বই থেকে চোখ সরিয়ে কৃপাকে দেখতে পায়।

নিধু : কে ?

কৃপা : আমি মাফ চাইতে এলাম।

নিধু : ও তুমি। বোসো। (বন্ধ বই তুলে নেয়)।

কৃপা : অপরাধ করেছি। জানি এর ক্ষমা নেই। কেন করলাম আমি নিজেই জানি না। তবু আপনি আমায় ক্ষমা ক'রে দিন। (নিধু কোনো উত্তর দেয় না) মিনতি করছি আপনাকে, বাবু।

নিধু (বই সরিয়ে রেখে উঠে বসে) : আচ্ছা, এই রাম বসু ছোকরা কেমন গায় বলো তো ? শুনি নি কখনো। আহা, তুমি বোলো না ঠিক ক'রে।

কৃপা (অবাক হয়ে তাকায়, তারপর মাটিতেই বসে) : আজ্ঞে, ভালো গায়, গানও খুব ভালো বাঁধে। গুণী লোক। তবে স্বভাবচরিত্র···বড় বেশি অনাচার করে···

নিধু : এইটেই দোষ, বুঝলে কৃপারাম। এইটেই আমাদের বিরাট দোষ। এত অশিক্ষা, কুসংস্কার, রুচির অভাব। এতে কোনো ভালো কাজ হয় ?

কৃপা : আজ্ঞে, শিক্ষার তো খুব বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে আজকাল। চতুর্দিকে শুনছি।

নিধু : হচ্ছে, তবে লোকের রুচি পালটাতে যে কতদিন লাগবে কে বলতে পারে। এখনো সেই গীতগোবিন্দ আর বিদ্যেসুন্দর আর খেউড় পাঁচালী, গ্রাম্য কবিগান, এই সবই তো শুনতে চায় লোকে।

কৃপা : কিন্তু আপনার গানের তো কদর হচ্ছে খুব।

নিধু : হচ্ছে ? কে জানে ? যা হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, সন্দেহ হয়

মাঝে মাঝে। পরের গানও নিধুর গান বলে চলছে। আবার নিধুর গানও পরের গান বলে চলছে। (কৃপা মুখ নিচু ক'রে বসে থাকে) আমি আর বাইরে গান গাইব না স্থির করেছি।

কৃপা : বাবু ?

নিধু : না না, সেদিনের ঘটনার জন্য বলছি না। এমনিই স্থির করলাম। বয়েস হয়ে গেছে, গলাও নেই আর সেরকম। ঐ মোহনচাঁদ আছে. ওকে শেখাচ্ছি কিছু কিছু, ওই গাইবে। অন্যেরাও আসে মাঝে মাঝে গান চাইতে। আসলে. হতাশ হয়ে পড়েছি, কৃপারাম। মূল কথা কি জান ? শিক্ষা, শিক্ষার বিস্তার চাই, নইলে কিচ্ছু হবে না।

কৃপা : কিন্তু আমাদের কি হবে, বাবু ?

নিধু : কি ?

কৃপা : আমাদের কি হবে ? এই যে আমরা সব গেঁয়ো মুখ্যু কবিওয়ালার দল, যুগী ধোপা তেলি শুঁড়ি জেলে মেথর, কলকাতা শহরে গান গেয়ে দু-পয়সা উপার্জন করি, বড়লোক ছোটলোক সবাইকে খুশি করি ? সকলে শিক্ষিত হয়ে গেলে আমরা কোথায় যাব ? আমাদের গান কে শুনবে ?

নিধু : কৃপা, এটা মান অভিমানের কথা নয়। যুগ বদলে যাচ্ছে। এই যে ভদ্রঘরের ছেলেরা এখন ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে, হিন্দু কালেজ স্থাপন হল সেখানে পড়তে যাচ্ছে — আমি যখন ইংরেজি পড়েছি তখন কি এত ব্যবস্থা ছিল ? রোজ কুমোর-টুলি থেকে বৌবাজার পায়ে হেঁটে যেতাম পাদরি সাহেবের কাছে ইংরেজি পড়তে। এখন কত সুবিধে হয়েছে। এইসব শিক্ষিত ছেলেরা কি ঐ একঘেয়ে সুরে একঘেয়ে গান, স্থূল আদিরস আর অশ্লীল ভাঁড়ামো, ওতে তাদের মন ভরবে ? তারা নতুন গান চাইবে না ? নতুন ভাব, নতুন সুর ? তুমি ইংরেজি পড়েছ ?

কৃপা : আজ্ঞে না, সাধ্যে কুলোয় নি। একবার যোগাড় করেছিলাম একখণ্ড রয়েল গ্রামার মরাল সাপ। দন্তস্ফুট করতে পারলাম না। শুধু এইটে শিখেছিলাম—

[গান –]

Nigh কাছে, near কাছে, nearest অতি কাছে,
Cut কাট, cot খাট, following পাছে।

[গানের শেষ দিকে নিধুও যোগ দেয়। দু-জনেই হাসে।]

কৃপা : আমি ওটার নাম দিয়েছিলাম বিলায়তি খাম্বাজ।

নিধু : কিন্তু বিলাতি কাব্য খুব সুন্দর, কৃপা। এই যে, এইটে শোনো, আমি এক্ষুণি পড়ছিলাম—O my love is like a red, red rose / That's newly sprung in June / O my love is like the melody / That's

sweetly played in tune.—অর্থাৎ আমার প্রিয়া সদ্যপ্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের মতো, আমার প্রিয়া সুমধুর সংগীতের মতো। কি সরল, অথচ কি সুন্দর!

কৃপা : সুরটা কেমন?

নিধু : কিসের?

কৃপা : এই যেটা বললেন। সুরটা কেমন হবে?

নিধু : এটা পদ্য, গাওয়া যায় না। শিক্ষিত লোকেরা এইরকম গান চাইবে, শুধু নির্মল প্রেমগীতি।

কৃপা : শিক্ষিত হয়ে গেলে দেশের সব লোকে ইংরিজি কাব্য পড়বে?

নিধু : সবাই না পড়ুক, কিছু লোকে তো পড়বে। তাছাড়া ইংরেজি কেন, বাংলাতেও লেখা হবে নতুন কাব্য, নতুন গান।

কৃপা : আর আমাদের দিশি গান? এতকাল ধরে চলে আসছে, এত লোকে গাইছে, শুনছে, আমোদ পাচ্ছে। সেসব মরে যাবে?

নিধু : সংস্কার হবে, মার্জিত হবে, উন্নত হবে। লোককে শেখাতে হবে ভালো গান কাকে বলে।

কৃপা : আর আমরা যে এতদিন ধরে এসব গান বেঁধে এসেছি, গেয়ে এসেছি, আমাদের কাছ থেকে আপনারা কিছু শিখবেন না?

নিধু : আবার অভিমানের কথা বলছ, কৃপা। অভিমান ক'রে কী লাভ?

কৃপা : একটা কথা বলি বাবু, যদি কিছু মনে না করেন। কলকাতার বাজারে ঘুরছি তো অনেককাল। কিছু জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে। আপনি যা ভাবছেন, তা কখনো হবে না। এই কলকাতার বাজার চলে খদ্দেরের মর্জিমতো। পয়সা-ওয়ালা বাবুরা যা চাইবে, তাই চলবে বাজারে। আজ আমার গান চলছে, কাল আপনারটা চলবে, পরশু তাও পুরনো হয়ে যাবে। মাঝে থেকে আপনারা কয়েকজন শিক্ষিত হবেন, সংস্কার করবেন, আমাদের বলবেন গ্রাম্য অশ্লীল। আর আমরা চিরতরে হারিয়ে যাব, ভুলে যাবে লোকে আমাদের গান। আজ নিধুর টপ্পা, নিধুর টপ্পা, খুব চলেছে। নিধুর টপ্পার আসল সমঝদার ক-জন বলতে পারেন? আমার কথা যদি শোনেন তবে বলি, কলকাতার বাজারে আপনার আমার গানের কদর ঐ বেশ্যার যৌবনের মতো। যতদিন চেকনাই আছে, বাজারে খুব কাটতি। যেদিন যৌবন খসে যাবে, বাবুরা নতুন মেয়েমানুষ খুঁজতে শুরু করবে। এ বাজারে আমার গানও টিঁকবে না, আপনার গানও টিঁকবে না।

[আলো নিভে যায়।]

১২

মঞ্চের সামনের অংশে আলো জলে। সঙের দল ঢোকে। গান—

আজব শহর কল্‌কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা।
শহরে এক নূতন হুজুগ উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
এর হিন্দু কলেজ জন্মদাতা,
ব্রাহ্মসমাজ এর নেতা।
এরা মোদের কথায় অশ্লীলতা দেখতে সদা পায়,
কারে বলে অশ্লীলতা লেজ তুলে দেখা না যায়!
যথা কাব্য লিখতে হালিকালি
ফোড়ন দিতে তেজপাতা।

[মঞ্চের সামনে আলো নেভে, নিধুর অংশে আলো জলে। নিধু শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে মোহনচাঁদ, মাটিতে বসে কৃপারাম।]

মোহনচাঁদ (ওষুধের বাটি এগিয়ে দেয়) : এটা খেয়ে নিন।

নিধু : ও খেয়ে কি হবে? আমি অত সহজে মরব না। বুঝলে কৃপা, হাতে এখন অফুরন্ত সময়। রোজ দু'টো-তিনটে নতুন গান লিখছি। আজ একটা বাঁধলাম, মূলতানী বাহার। শুনেছ? মোহনকে বোলো, শুনিয়ে দেবে। (ওষুধ খেয়ে মুখ মোছে) কৃপা, শ্রীমতীর খবর জানো?

কৃপা : আজ্ঞে, জানি।

নিধু : কেমন আছে?

কৃপা : আজ্ঞে, ভালোই।

নিধু : চলে কি ক'রে?

কৃপা : এই···মুজরো নিচ্ছে দু'টো-একটা।

নিধু : মুজরো নিচ্ছে? নাচতে যায়?

কৃপা : ওই যখন যেমন পায়।

নিধু : ও। (কিছুক্ষণ চুপচাপ)।

কৃপা : আচ্ছা বাবু, এই বাহার রাগ কতরকম হয়? (নিধু শূন্যে চেয়ে থাকে, উত্তর

দেয় না) বাবু ?

নিধু : কৃপা, ও কেমন থাকে, মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাবে ?

[নিধুর অংশে আলো নিভে যায়, কৃপার অংশে আলো জ্বলে। বিছানায় ওপর শ্রীমতী ঘুমিয়ে রয়েছে। কৃপা আসে। বিছানার ওপর দু'টো চাদর অগোছালো পড়ে রয়েছে। তার থেকে নিজেরটা তুলে নিয়ে আলগাভাবে গায়ে দিতে দিতে মঞ্চের সামনে আসে।]

কৃপা (দর্শকদের প্রতি) : নিধুবাবু অসুস্থ, গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু গান বাঁধা শেষ হয় নি। নিত্য নতুন সুরে গান বেঁধে চলেছেন রোজ, আর মোহনচাঁদকে শেখাচ্ছেন। যেন সুরের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উজাড় না হলে শান্তিতে মরতে পারবেন না। এদিকে কবিওয়ালাদের যুগও দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

রট ১ (হাতে সংবাদপত্র) : গত ২৬ কার্তিক শিমুলিয়া নিবাসী কবিওয়ালা নীলু ঠাকুরের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

রট ২ (হাতে সংবাদপত্র) : স্বনামধন্য কবিয়াল রাম বসু অকালে জলবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

[ইতিমধ্যে শ্রীমতী ঘুম ভেঙে ওঠে। ধীরে ধীরে কৃপার পাশে এসে দাঁড়ায়।]

কৃপা : তাকিয়ার তলায় আছে। নিয়ে যা।

[শ্রীমতী তাকিয়ার নীচ থেকে কয়েকটা টাকা নেয়, তার শব্দ শোনা যায়। টাকা আঁচলে বেঁধে নিজের চাদরটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। আলো নেভে।]

১৩

নিধুর অংশে আলো জ্বলে।

মোহনচাঁদ (বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছে) : **I see her in the dewy flowers / I see her sweet and fair / I hear her in the tuneful birds / I hear her charm the air.**

[কৃপা ঢোকে, বসে।]

মোহনচাঁদ : কৃপারাম এসেছে।

কৃপা : আজ কেমন বোধ করছেন ?

নিধু : শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছ, না মনের ?

রুপা : আজ্ঞে, দুইই।

নিধু : শরীর তো যন্ত্র। চালু রয়েছে যখন, নিশ্চয় ভালো আছে। আর মনের অবস্থা মনেই স্থির হয়। ভালো মনে করলে ভালো, খারাপ মনে করলে খারাপ। তা তোমার গানবাজনা কেমন চলছে ?

রুপা : সেটা তো আমাদের রাজামশাইয়ের মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। আপাতত তিনি পরকালের চিন্তায় ব্যস্ত। কবিগান বন্ধ রেখে এখন কেত্তন শুনছেন।

নিধু : সে কি ? তাহলে তোমার গান গাওয়া হচ্ছে না ?

রুপা : বিশেষ না। ভাবছি এবার ইংরেজিতে কবিগান ধরব। চলতে পারে।

নিধু : আবার ইংরেজি নিয়ে ঠাট্টা করছ। আচ্ছা, ইংরেজির ওপর এত রাগ কেন বল তো তোমার ?

রুপা : ছি ছি ছি, রাগ হবে কেন ? যা বুঝি না, তার ওপর রাগ করা যায় ?

নিধু : ঠাট্টার কথা নয়, রুপারাম। তোমার অভিমানের কারণটা আমি বুঝি। কিন্তু ওটা মিথ্যে। চারপাশে সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তার খারাপ দিকটাই শুধু চোখে পড়ছে তোমার ? বাঙ্গালিরা ইংরেজের নকল করছে। তাই দেখে সবাই ভাবছে – গেল, গেল, জাতটা একেবারে গোল্লায় গেল। কিন্তু তা কেন ? ইংরেজের মধ্যে ভালো কিছু নেই ? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে তারা এত বড় হয়েছে, তাদের ভালো জিনিসটা আমরা নেব না ?

রুপা : কোন জিনিসটা ভালো, আর কোনটা খারাপ সে বিচার কে করবে ?

নিধু : নিজের বুদ্ধিতে বিচার ক'রে নেবে। আমি যখন পাদরি সাহেবের কাছে পড়তে যেতাম, সবাই বলত, খবরদার যাস্ নে, ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃশ্চান ক'রে দেবে। গোড়ার দিকে আমিও বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কিন্তু ক্রমশ দেখলাম, মোটেই সেরকম নয়। পাদরি সাহেব কত যত্ন নিয়ে শেখাতেন আমায়। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেল আমার সামনে।

রুপা : হ্যাঁ, আর কোম্পানি বাহাদুরের চাকরিটাও জুটে গেল।

নিধু : অত সহজে চটাতে পারবে না আমায় রুপারাম।

রুপা : মাপ করবেন, বেতরিবত হয়ে গেল।

নিধু : চাকরি করতে গিয়েও দেখেছি, ইংরেজের দৃষ্টি কত উঁচু, মন কত উদার। ছোট নজর কাদের জান ? আমাদের বাঙালিদের। পৃথিবীর সবচেয়ে কুচক্রী পরশ্রীকাতর জাত আমরা। ছাপরার কালেক্টরি অফিসে যখন চাকরি করতাম, কে সবচেয়ে বেশি পেছনে লেগেছিল বল তো ? সাহেব নয়, আমারই স্বজাতি এক বাঙালি, আমার সহকর্মী। যে ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছিলাম, মন্টগোমারি সাহেব

নিজে এসে না বাঁচালে আজ হয়ত আমায় জেলখানায় ঘানি টানতে হতো। কাজেই ও দেশী-বিদেশীর কথা আর বোলো না। আমাদের অজ্ঞতা কুসংস্কার গ্রাম্যতা দূর ক'রে ইংরেজের মতো উন্নত হতে বহু যুগ লেগে যাবে।

[আলো নিভে যায়। অন্য অংশে আলো জ্বলে।]

রট ১ : মহামহিম শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর। আপনার হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত···

রট ২ : এবং স্বেচ্ছাপূর্বক স্ত্রীবধ আর আত্মঘাতের দুর্নাম হইতে মোচন করার নিমিত্ত···

রট ১ : মহামহিম যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া···

রট ২ : নিম্নলিখিত অধীনেরা এই প্রার্থনা করিতেছে···

রট ১ : যে শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ এই সামান্য উপহার···

রট ২ : আপনি কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন।

রট ১ : ও যাহারা শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে ··

রট ২ : অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার হেতু···

রট ১ : উপযুক্তরূপে গ্রাহ্য করিলেন না···

রট ২ : তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপাপূর্বক ক্ষমা করুন।

রট ১ : সবিনয় নিবেদন মিতি···

রট ২ : রামমোহন রায়···

রট ১ : দ্বারকানাথ ঠাকুর···

রট ২ : প্রসন্নকুমার ঠাকুর···

রট ১ : ইত্যাদি···

রট ২ : ইত্যাদি···

রট ১ : ইত্যাদি।

[ঘোষণা চলাকালীন একটা ট্যাব্লোয় দেখা যায়, তিনজন ইংরেজ রাজপুরুষ ও রমণী রামমোহন রায়ের কাছে উপহার গ্রহণ ও প্রদান করছে। ঘোষণা শেষ হতেই ট্যাব্লো মিলিয়ে যায়। সঙ্ঘের প্রবেশ।]

[সঙ্ঘের গান—]

সভ্য হবার জিগির তুলে বিষ্ণুরা ভাই,
ইংরেজদের কাছে কেমন দেখাচ্ছে বড়াই.
(মোদের) ঘটি বাটি চাটি হল,
কোথায় তোদের ক্ষমতা ?
(মোরা) জেলে মুচী ধোপা মুচি কবিওয়ালা যত,

নেচে কুঁদে বেড়াই সুখে, দেখে লোকে কত,
এতে গরিব লোকের আমোদ বড়,
সভ্যতায় মাথা ব্যথা।
আজব শহর কলকেতা…

[আলো নেভে।]

১৪

মঞ্চের সামনে কোণে কৃপারাম।

কৃপা : লেখাপড়া শেখা ভদ্রঘরের শখের কবিদের উৎপাতে কলকাতার ছোটলোক কবিওয়ালার দল ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল। খাঁড়া কবির লড়াই উঠে গেল, তার জায়গায় গজিয়ে উঠল শোভাবাজার, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, সিমলে, সর্বত্র বাবুদের শখের আখড়াই দল। আর আমার ব্যক্তিগত যুদ্ধটা? ছেড়ে দিলাম? হার স্বীকার করলাম? তখনো নয়। একদিন সকালে একা ঘরে বসে তানপুরা বাঁধছি। হাজির হল নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য মোহনচাঁদ।

[মোহনচাঁদ ঢোকে।]

কৃপা : কি ব্যাপার? হঠাৎ এই গরিবের ঘরে পদার্পণ?
মোহন : একটা বুদ্ধি চাইতে এলাম।
কৃপা : বলেন কি, সায়েবের কালেক্সে এতগুলো পাশ দিয়ে শেষে এলেন আমার কাছে বুদ্ধি চাইতে? আপনি সত্যি পাশ দিয়েছেন তো?
মোহন : সারাক্ষণ ঠাট্টা কোরো না তো! একটা নতুন কিছু করা দরকার। কি করা যায়?
কৃপা : রোজই তো চতুর্দিকে নতুন কিছু হয়ে চলেছে। দু-দণ্ড অপেক্ষা করুন, দেখবেন আপনার বাপের নামটাও নতুন হয়ে গেছে।
মোহন : নাম নয়, নাম নয়, গান। নতুন গান চাই। নতুন ঢঙের গান।
কৃপা : এ তো গভীর তাজ্জব ব্যাপার! নিধুবাবুর শিষ্য নতুন ঢঙের গান চাইতে এসেছেন কৃপে শুঁড়ির কাছে, যার গান তো কোন ছার, নামটাই তামাদি হয়ে চালান হয়ে গেছে বিদ্যেধরীর ওপারে।
মোহন : বাবুর শিষ্য বলেই তো যত বিপদ আমার। উনি তো খাঁটি আখড়াই ছাড়া আর কোনো সংগীতকে সংগীত বলেই গণ্য করেন না। অথচ আখড়াই

ঠিকমতো গাইতেই বা পারে ক-জন, আর শুনতেই বা চায় ক-জন। শুধু আখড়াইয়ে চলবে না কৃপারাম, নতুন কিছু চাই। এ কথাটা বেশ বুঝেছি। অথচ বাবুকে বললেই তো অগ্নিশর্মা হবেন।

কৃপা : তাহলে বুঝেছেন ?

মোহন : কি ?

কৃপা : আখড়াই সংগীত যে বাজারে চলবে না, এ কথাটা এতদিনে বুঝেছেন ?

মোহন : বেশ বুঝেছি।

কৃপা : তাহলে আসুন, পথে আসুন। এ কথাটা আপনার বাবুকে আমি সহবার বলেছি। তিনি কিছুতেই মানেন নি। যাই হোক, তা এবার নতুনটা কি করবেন ?

মোহন : সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

কৃপা : জল ঢালুন।

মোহন : তার মানে ?

কৃপা : জল, জল। জল জানেন না ? জল ঢালুন।

মোহন। কিসে জল ঢালব ?

কৃপা : দুধে।

মোহন : কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কৃপা : বাঃ এই যে বললেন বুঝতে পেরেছেন ?

মোহন : কি সব হেঁয়ালি করছ বল তো ? সোজা ক'রে বলো।

কৃপা : এই তো, আপনাদের কালেজের পাশ দেয়া বুদ্ধি। হেঁয়ালিতে মজা পান না। সব কিছু ঐ গড়ের মাঠের মনুমেন্টের মতো সোজা ক'রে পুঁতে দিতে চান। তা সোজা করেই বলি। আপনাদের ঐ হিন্দুস্তানি গতের আখড়াই সংগীত আর নিধুর টপ্পা, ওসব পশ্চিমা মোষের দুধ। রোগা বাঙালির পেটে ও হজম হবে কেন ? জল মেশান, তরল ক'রে নিন। দেখবেন সুড়সুড় ক'রে হজম হয়ে যাচ্ছে। এবার বুঝলেন ?

মোহন : না···মানে···ঠিক বুঝলাম না।

কৃপা : আচ্ছা, কালেজের মাস্টাররা কি আপনার মগজটাকে গোলদিঘির জলে চুবিয়ে রেখেছে ? আর কত সোজা ক'রে বলব ? আচ্ছা ধরুন, আপনার আখড়াই গীত—আখড়াই বুঝলেন তো, নাকি সেটাও ভুলে মেরে দিয়েছেন ?

মোহন : না, না, ভুলি নি।

কৃপা : তাও ভালো। আখড়াই বসে গায়, না দাঁড়িয়ে ?

মোহন : বসে।

কৃপা : শুদ্ধ কিংবা মিশ্র রাগে গৎ বাঁধতে হয় ?

মোহন : হয়।

রূপা : কঠিন কঠিন তাল ভাঙতে হয় ?

মোহন : হয়।

রূপা : দুরূহ সব তাল থাকে, সামান্য কেটে গেলে গান নষ্ট হয় ?

মোহন : হয়।

রূপা : উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় ?

মোহন : হয়·· এই, মানে, না, হয় না।

রূপা : লোকে তাহলে মজা পাবে কেন ? আরো সরল করুন, হালকা করুন। ঐ কালো-য়াতির বোঝা ঘাড় থেকে নামান। কবিগানের যে ঢঙটা লোকে চেনে, জানে, তারই মধ্যে নতুন কিছু যোগ করুন। হিন্দুস্তানি সুর রাখুন, হালকা ক'রে। ওটা ভালোই জমবে। চিতেন, পরচিতেন, মেলতা, মহড়া, ফুকা, অন্তরা, সবই রাখুন। না হয় অন্তরাটা বাদ দিন। ফুকার পর আর একটা ফুকা লাগান, তবল ফুকা। বেশ জমজমাট সাজের ওপর গান শেষ হবে। আর ঐ হিন্দুস্তানি সুরের ওপর সবরকম গানই চালান—সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, সব। আর সব থেকে বড় কথা, উত্তর-প্রত্যুত্তর চাই, সরাসরি সংগ্রাম, লড়াই। তাহলে দেখবেন চেনা জিনিস নতুন সাজে পেয়ে লোকে কত বাহবা দিচ্ছে। (মোহনচাঁদ হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে) বুঝলেন ?

[মোহনচাঁদ ঘাড় নেড়ে উঠে চলে যায়।]

রূপা : শুনুন, আসল কথাটাই তো শুনলেন না এখনো। জিনিসটা নতুন বলে লোকে চিনবে কি ক'রে ? নতুন একটা নাম দিতে হবে তো ?

মোহন : নতুন নাম ?

রূপা : বাপের নামের কথাটা আগে বলেছিলাম, না ? যাক গে। এ সংগীতের জনক হল আখড়াই, কিন্তু এ নিজে পুরো আখড়াই নয়। তাই এর নাম দিন হাফ-আখড়াই। এখন তো সবই ঐ হাফের যুগ, ও নামটা ভালোই চলবে।

[মোহনচাঁদ আর রূপার কথাবার্তার শেষ দিকে মঞ্চের অন্য অংশে দেখা যায় নিধু বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। নিধু উঠে বসে, এদিক ওদিক হাতড়ায়, লাল খেরোর মোড়া তার গানের খাতা খুঁজে পায়। কথার শেষে মোহনচাঁদ বেরিয়ে যায়। ওদিকে দেখা যায় নিধু গানের খাতা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। রূপা নিশ্চিন্তে তানপুরার তার বাঁধে। দু-দিকেই আলো নিভে যায়।]

১৫

নটনাকার দু-জনকে দেখা যায়।

নট ১ (হাতে সংবাদপত্র) : আমরা এইমাত্র দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরীতে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান রাজা রামমোহন রায় জীবন ত্যাগ করিয়াছেন।

নট ২ : যাঁহা হইতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের পরস্পর লভ্য উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই অসাধারণ মনুষ্যের জীবন এবার সমাপ্ত হইল।

[নিধুর শয্যা। পাশে কৃপা।]

নিধু : মোহনচাঁদ এরকম করবে কখনো ভাবি নি। তুমি শুনেছ কি করেছে?

কৃপা : আজ্ঞে, শুনেছি।

নিধু : কারো ওপরেই যে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না, কৃপা। অথচ নিজেরও সে শক্তি নেই যে একা লড়ব। কারো ওপর তো নির্ভর করতেই হয়। অথচ, মোহনচাঁদ—সে এমন ক'রে আমার গানকে বিকৃত ক'রে দেবে, শস্তা ক'রে দেবে, কখনো ভাবি নি।

কৃপা : এটাই যুগের হাওয়া। উনি আর কি করবেন, ছেলেমানুষ।

নিধু : আমি আর দম পাচ্ছি না, কৃপা। বয়সও হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্তে মরতে পারব এমন অবস্থা কই? রোজ রাতে, জানো, আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। কারা যেন আমায় তাড়া ক'রে আসছে, আর আমি একা, কেউ নেই আমাকে সাহায্য করার। কেন এমন হয়, কৃপা?

কৃপা : আপনার শরীর সুস্থ নেই, দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাই এমন হয়। অত দুশ্চিন্তা করবেন না।

নিধু : অত সহজে আমি হার মানব না, কৃপা। শেষ চেষ্টা করব একবার।

কৃপা : আজ্ঞে?

নিধু : পাদরি সাহেব একবার আমায় বলছিলেন, বিলেতের বড় বড় ওস্তাদেরা সংগীত রচনা ক'রে ছাপার অক্ষরে সব লিখে রেখে যান। পরবর্তীকালের লোকেরা বই দেখে সে সব সংগীত উদ্ধার ক'রে গায়, বাজায়। গানের মূল রূপটা অবিকল বজায় থাকে ছাপা বই-এর পৃষ্ঠায়।

কৃপা : আশ্চর্য!

নিধু : আমিও তাই করব।

কৃপা : আজ্ঞে ?

নিধু : ঐখানটায় দেখ তো (কৃপা গানের খাতাটা তোলে) ওটা চেন ? (কৃপা মাথা নিচু ক'রে থাকে) আগে ভাবতাম ওটা গোপন রাখাটাই দরকার। তাহলে আমার গান অন্যে চুরি করতে পারবে না। এখন ভেবে দেখছি, তা নয়। ওটা প্রকাশ করতে হবে। সঠিকভাবে, ঠিক যেমনটা আমি চেয়েছি।

কৃপা : আপনার গান বই আকারে ছাপবেন ?

নিধু : কি নাম দেব বল তো ?

কৃপা : আপনি বলুন।

নিধু : তুমি একদিন আমায় ঠাট্টা ক'রে বলেছিলে, রত্নভাণ্ডার। আমি ভুলি নি তোমার কথাটা। কিন্তু রত্ন যদি দু-একটা থেকেই থাকে আমার, সেগুলো সঙ্গে ক'রে পরলোকে গিয়ে তো কোনো লাভ নেই। আমার গানের বই-এর নাম দেব 'গীতরত্ন'। তখন মন্দ লোকে যতই ভেজাল দেওয়ার চেষ্টা করুক, আমার আসল গান চিরকালের মতো বেঁচে থাকবে ঐ বই-এর পাতায়। কেমন বুদ্ধি বের করেছি বল তো ?

কৃপা : আশ্চর্য উপায় বের করেছেন। এমন কেউ করে নি আগে।

নিধু : কৃপা ?

কৃপা : আজ্ঞে, বলুন।

নিধু : শ্রীমতী কেমন আছে, জানো ?

কৃপা : আজ্ঞে, ভালোই আছে।

নিধু : দেখা হয় তোমার সঙ্গে ?

কৃপা : না, কিছুদিন যাবৎ হয় না। মানে ...সে তো···

[মঞ্চের অন্য অংশে শ্রীমতীর পায়ের মলের আওয়াজ হয়। নাটকের গোড়ায় প্রথম যেখানে তার পালকি এসে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গায় দেখা যায় একটা ঘোড়াগাড়ির দরজা। পাশে জয় মিত্র সাহেবি পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীমতী আসে, গাড়িতে উঠতে গিয়ে হোঁচট খায়। জয় মিত্র তাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে। আলো নিভে যায়।]

নিধু : জয় মিত্রের সঙ্গে চলে গেছে ?

কৃপা : ভালোই থাকবে। আপনি চিন্তা করবেন না। জয় মিত্তির খুব দিলদরিয়া লোক।

নিধু (কৃপার হাত জড়িয়ে ধরে) : কৃপা, কৃপা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না কখনো। তুমি ছাড়া আর ভরসা করার মতো কেউ নেই আমার। তুমি আমায় ছেড়ো না কৃপা, তুমি আমায় ছেড়ো না।

[আলো নিভে যায়। মঞ্চের সামনে আসে কৃপা।]

১৬

রূপারাম সামনে এসে দাঁড়ায়।

রূপা : অবশেষে···ক্রোধ, বিদ্বেষ, সংঘাত, বিপর্যয়ের নানা অধ্যায় পার হয়ে অবশেষে রামনিধি আত্মসমর্পণ করল আমার কাছে। চোখের সামনে দেখলাম, বিরাট প্রতিভাধর রামনিধি তার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অনিশ্চিত, ভীত, পরনির্ভর। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে সে। তাহলে কি জিতলাম আমি? কিন্তু আমার যুদ্ধ তো রামনিধির সঙ্গে নয়। আসলে যার সঙ্গে আমার যুদ্ধ, রামনিধি তো তার হাতের পুতুলমাত্র। রামনিধির আত্মসমর্পণ, আসলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি। আমি নিশ্চিত জানতাম, এক গভীর বিপর্যয় অলক্ষে এগিয়ে আসছে। অমোঘ নিয়তির চক্রান্ত চলেছে। তাতে রামনিধি ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে আমিও ধ্বংস হবে। তার প্রথম চিহ্ন দেখতে পেলাম ক-দিন বাদেই। আমার প্রতিপালক রাজা নদেরচাঁদ মল্লিক অহোরাত্র কীর্তন শুনেও বিধির নিয়ম খণ্ডাতে পারলেন না। নয়টি কলহপ্রিয় সন্তান এবং মামলামোকদ্দমায় জর্জরিত সম্পত্তি রেখে তিনি পরলোকগমন করলেন।

[উইংস থেকে হরিধ্বনি ওঠে। সোনার খাটে নদেরচাঁদের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা আসে।]

হরি বলো, হরি বলো, হরি বলো।
সোনার খাটে চড়ে নেদো গঙ্গাস্নানে যায়,
সবাই দেখবি যদি আয়।
সবাই দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা।
হরি বলো, হরি বলো, হরি বলো।

[শোভাযাত্রা চলে যায়। রূপা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। মোক্ষদা ঢোকে।]

মোক্ষদা : নাও ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে দু'টো মুখে দাও। (রূপা উত্তর দেয় না) অমন মাথায় হাত দিয়ে বসে থেকে কি হবে? দু-দিন যেতে দাও। তারপর মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবা যাবে এখন। ওঠো।

রূপা : এরপর অন্ন জুটবে কোথা থেকে?

মোক্ষদা : অন্ন আজই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এতদিনে যা জমেছে তা দিয়ে কিছুকাল বেশ চলে যাবে।

কৃপা : তারপর ?

মোক্ষদা : পরের চিন্তা পরে হবে। এখন ওঠো তো। হাতমুখ ধুয়ে এসো।

কৃপা : আর আমার গান ? গান গাওয়া ছেড়ে দেব ?

মোক্ষদা : কি হবে ওসব ছাইপাঁশ গান গেয়ে ! বড়মানুষের মনযোগানো ফরমায়েসি গান। কি আছে ওতে ? ওগুলো তোমার নিজের গান ? নিজের মনের কথা ? (কৃপা চুপ) আগে, যখন কলকাতায় আসি নি, গাঁয়ের বাড়িতে ছিলাম তখন, কত সুন্দর সব গান নিয়ে আসতে তুমি। দুলালচাঁদ, লালন শা ফকির, ঈসুপ ফকির, কুবির গোঁসাই·· সেই গানটা মনে আছে তোমার, কত গাইতে তুমি একসময়···

[মোক্ষদার গান —]

আমি সুখের নাম শুনেছিলেম দেখি নাই তার রূপ কেমন।
আমার দুখনগরে বাটী পরিবার দুঃখরাজার বেটি
দু-জনায় দুখে করি কালযাপন ॥

[কৃপা যোগ দেয় —]

দুখের বসনভূষণ পরে ঘুরে বেড়াই দুখ শহরে,
দুখের বেলা দুই প্রহরে দুখের অন্ন করি ভোজন।
(দুখের) শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে দুঃখেতে করি শয়ন ॥
দুঃখু আমার মতিগতি দুঃখু আমার সঙ্গের সাথী,
হৃদয়ে জ্বলে দুখের বাতি দগ্ধ করি দিলে জীবন।
আমি তোমায় পেলে তোমার বলে দুঃখের শির করি ছেদন ॥

মোক্ষদা : হ্যাঁ গো, চলো না, দেশের বাড়িতে ফিরে যাই। কি হবে এখানে থেকে ? ওখানে তুমি আবার গান বাঁধবে। এই রকম গান। দেশের লোকে এসব গান এখনো ভোলে নি। তারা কত মান্য করবে তোমায়, কত খুশি হবে তোমার গান শুনে। (কৃপা উত্তর দেয় না) কি গো ? থাক, ওসব ভাবনা পরে হবে। এখন ওঠো তো।

কৃপা : ছেড়ে দেব ? হার স্বীকার করব ? মেনে নেব এ শহরে আমার কোনো জায়গা নেই ? গাঁয়ের কবি কৃপারাম সাউ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে শেষে সেই গাঁয়েই ফিরে যাবে ? কক্ষনো না। এ যুদ্ধের শেষ দেখে যাব আমি। মরতে হয় লড়াই ক'রে মরব, পালিয়ে বাঁচব না।

[আলো নিভে যায়।]

১৭

বিক্ষিপ্ত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসে। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় নিধু বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে।

নিধু : কে ? কে ? কে ওখানে ?

[আবছা আলোয় কয়েকটা ছায়ামূর্তি ঘোরাফেরা করে। একজন মনে হয় পাদরির পোশাকে, একজন ইংরেজ রাজপুরুষ। মাঝে-মাঝে কৃপারামকেও আবছা দেখা যায়।]

নিধু : কে ? পাদরি সাহেব ? আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি রামনিধি। কে ? কে ? মিস্টার মন্টগোমারি, আমি, আমি কোনো দোষ করি নি, আমায় ক্ষমা করুন, সাহেব। আপনি না দেখলে আমি বাঁচব না। সাহেব···তুমি, তুমি কে ? (ভয়ার্ত চিৎকার) কৃপা, কৃপা, তুমি কোথায় ? কাছে এস, কৃপা। । সবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কৃপা··· (চিৎকার ক'রে নিধু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।)

[অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় কৃপারাম কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবহ আওয়াজ থেমে যায়। আলো স্পষ্ট হয়। নিধু নিশ্চল শুয়ে রয়েছে, কৃপা পাশে দাঁড়িয়ে।)

কৃপা : বাবু ? বাবু ? (দু-একবার নাড়াবার চেষ্টা করে। বোঝে, নিধু মৃত। কৃপা দু-হাতে মুখ ঢাকে।)

[আলো নিভে যায়। আবার জ্বলে, মঞ্চের সামনে কৃপা ।]

কৃপা : আমার কাহিনী শেষ। আর আটকে রাখব না আপনাদের। (দূরের ঘড়িতে এগারটা বেজে যেতে থাকে) সব কথা খুলে বললাম। এবার আপনারা বিচার করুন। এটা কোনো মহত্বের কাহিনী নয়। নিয়তির জাদুকরীতে যে বিরাট চক্রজালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, তার তুলনায় আমরা সকলেই অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু তা জেনেও আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। কেউ ক্ষীণ কেউ উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলাম, নিয়তির কোনো অমোঘ বিধান আমরা মানি না। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, নিজের কীর্তিকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে চেয়েছিলাম। পারলাম না কেউই। সম্রাস্ত প্রতিভাধর রামনিধি, সেও পারল না তার সৃষ্টিকে নিজের শুদ্ধতায় রক্ষা করতে। আর আমি, কিংবা আমার

মতো আরো অজস্র অখ্যাত শিল্পী, সকলেই গুণী, পরিশ্রমী, তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল লোকের স্মৃতি থেকে। যদি রামনিধি আর আমার মধ্যে বিভেদ না ঘটত, যদি দু'জনে একত্র হয়ে নামতে পারতাম এই লড়াইয়ে, তাহলে কি আমাদের জীবনটা অন্যরকম হতো, কে জানে? আপনারাই বিচার করবেন। হয়ত তা হবার ছিল না কিছুতেই। আমি তাকে ধ্বংস করব, সে আমাকে ধ্বংস করবে, এই হয়ত ছিল একমাত্র, অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু এটা জানি, যে লাঞ্ছনার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আমি মরণপণ যুদ্ধে নেমেছিলাম, নিধুবাবু যাকে বলতেন আমার অভিমান, সেই অভিমান আজও বুকের ভেতর পুষে রেখেছে আমারই মতো আরো শত শত, হাজার হাজার গরীব, বঞ্চিত, ইতর মানুষ। তারা মার খেয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু ভুলে যায় নি। এই শহরের গলিঘুঁজি অন্ধকারের মধ্যে আজও বেঁচে রয়েছে সেইসব হতভাগ্য বিবর্ণ মানুষেরা। দেখে যাচ্ছে সভ্যতার আজব সব কাণ্ড কারখানা। আর মনে মনে গুমরোচ্ছে, আঘাত হানার সুযোগ খুঁজছে। (মৃদু হাসে) তারাও ভান করতে জানে। নিয়তির নিয়মকে মেনে নেওয়ার ভান করছে তারা, কারণ সেটাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। মেনে তারা কখনোই নেয় নি, নেবেও না। (কৃপা ধীরে ধীরে কোণের টেবিলের কাছে যায়, কি একটা যেন তুলে নেয় হাতে। তারপর সেন্টার স্টেজ-এ আসে) আমার কথা ফুরিয়ে গেল। এবার আসর শেষ করি। (কৃপা হাতের ক্ষুর নিয়ে গলায় লাগায়, হাত নড়ে। রক্তে তার জামা ভিজে যায়। ধীরে ধীরে সে ঢলে পড়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপচাপ। ধীরে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত হয়। পচা প্রবেশ করে। কৃপাকে দেখে আঁতকে ওঠে। ছুটে বেরিয়ে যায়। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে পচা আবার ঢোকে। একে একে আরো অনেকে এসে পড়ে। কৃপার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বাজনা শুরু ক'রে মঞ্চের সামনে আসে। সঙের দল।)

[সঙের গান—]

মোদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দেখ ওরা ভাই,
সভ্যতারি ঢাক বাজিয়ে করতেছে বড়াই।
(মোদের) কৃপারামজী সুখে থাকুন,
ওদের মুখে বিশ জুতা।
আজব শহর কলকেতা…

[গান চলার সময় অন্যেরা খাট নিয়ে আসে। মৃতদেহ প্রস্তুত ক'রে খাটে ওঠায়। গান শেষ হলে সকলে হরিধ্বনি দিয়ে খাট উঠিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘটনাকার দু-জন দু-দিক থেকে ঢোকে। একজন একটা বিরাট

ঝুড়িতে অনেক ছাপা কাগজপত্র নিয়ে, একা সেটা সামলাতে পারছে না।]

রট ১ : কে মরল রে ?

রট ২ : কে জানে, রূপে শুঁড়ি না কে।

রট ১ : রূপে শুঁড়ি ? সে আবার কে ?

রট ২ : কি যেন বলল···কবিরাজ।

রট ১ : রূপে শুঁড়ি, কবিরাজ ? জন্মে নাম শুনি নি।

রট ২ : দূর, ওরকম কত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নে নে, ধর এটা।

রট ১ : ওটা কি ?

রট ২ : আরে, রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা। আজ টাউন হলে বক্তৃতা আছে না ? বিলি করতে হবে সেখানে।

রট ১ : রামগোপাল ঘোষ। বলিস কি ? ওঃ কি ইংরিজি বলে, কিচ্ছু বোঝা যায় না। নে নে, ধর, ধর ঠিক ক'রে। আরো উঁচু ক'রে ধর।

[দু-জন বিরাট ঝুড়িটা সামলানোর চেষ্টা করে। তা থেকে ছাপা কাগজ উপছে পড়তে থাকে। মঞ্চের বাইরে থেকে তখনো মৃদু হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পর্দা পড়ে যায়।]

সমাপ্তি

কবিতা

শামসুর রাহমান

ধন্য সেই পুরুষ

ধন্য সেই পুরুষ, নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।
ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নেমে আসে
প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মতো উপত্যকায়।
ধন্য সেই পুরুষ, হৈমন্তিক বিল থেকে যে উঠে আসে
রঙ বেরঙের পাখি ওড়াতে ওড়াতে।
ধন্য সেই পুরুষ কাহাতের পর মই-দেয়া ক্ষেত থেকে যে ছুটে আসে
ফসলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

ধন্য আমরা, দেখতে পাই দূর দিগন্ত থেকে এখনো তুমি আসো
আর তোমারই প্রতীক্ষায়
ব্যাকুল আমাদের প্রাণ, যেন গ্রীষ্মকাতর হরিণ
জলধারার জন্যে। তোমার বুক ফুঁড়ে অহংকারের মতো
ফুটে আছে রক্তজবা, আর
আমরা সেই পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের
চোখের পলক পড়তে চায় না,
অপরাধে নত হয়ে আসে আমাদের দুঃস্বপ্নময় মাথা।

দেখ, একে একে সকলেই যাচ্ছে বিপথে, অধঃপাত
মোহিনী নর্তকীর মতো
জুড়ে দিয়েছে বিবেক-ভোলানো নাচ মনীষার মিনারে,
বিশ্বস্ততা চোরা গর্ত খুঁড়ছে সুহৃদের জন্যে,
সত্য খান খান হয়ে যাচ্ছে যখন তখন
কুমোরের ভাঙা পাত্রের মতো,
চাটুকারদের ঠোঁটে অষ্টপ্রহর ছোটে কথার তুবড়ি,

দেখ, যে কোন ফলের গাছ
সময়ে-অসময়ে ভরে উঠছে শুধু মাকাল ফলে।

ঝলসে-যাওয়া ঘাসের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা,
দেখ, এখানে আজ
কাক আর কোকিলের কোনো ভেদ নেই।
নানা ছল ছুতোয়
স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে ফেরেববাজের দল।
দেখ, প্রত্যেকটি মানুষের মাথা
তোমার হাঁটুর চেয়ে এক তিল উঁচুতে উঠতে পারছে না কিছুতেই।
তোমাকে হারিয়ে
আমরা সন্ধ্যায় হারিয়ে-যাওয়া ছায়ারই মতো
হয়ে যাচ্ছিলাম,
আমাদের দিনগুলি ঢেকে যাচ্ছিলো শোকের পোশাকে,
তোমার বিচ্ছেদের সংকটের দিনে
আমরা নিজেদের ধ্বংসস্তূপে ব'সে বিলাপে ক্রন্দনে আকাশকে ব্যথিত
ক'রে তুলেছিলাম ক্রমাগত ; তুমি সেই বিলাপকে
রূপান্তরিত করেছো জীবনের স্তুতি গানে। কেন না জেনেছি,
জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি।

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, যাঁর নামের উপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

লেয়ার্টেস

এই ছিল তবে আমার ভাগ্যে মধ্য দুপুরে
বিনা মেঘে এই বিপুল বজ্রপাত ?
পিতা হত আর পিতৃশোকেই ভগ্নী আমার
উন্মাদিনী সে হয়েছে অকস্মাৎ।

কত বাজায় কত যে প্লাবনে কেটেছে আমার
মাতৃস্নেহের ছায়াহীন শৈশব।
বিকৃত শত মুখোশের ঢঙে নাচে অবিরত
অধিবাস্তব নাট্যের কুশীলব।

নাছোড় অবশেষে দাবানল জ্বলে শিরায় শিরায়,
হৃদয়ের শত ঝুলকি দু'চোখে ওড়ে।
তীক্ষ্ণ অসির সূচীমুখ আমি করছি পরখ,
শত্রু কোথায় কোন প্রান্তরে ঘোরে ?

আমার নিরীহ বয়েসী পিতার লাশ ওরা খুব
তাড়াহুড়ো ক'রে মাটিতে রেখেছে ঢেকে।
রক্তের ঋণ শোধার জন্যে মনে হয় তিনি
আর্ত কণ্ঠে আমাকেই যান ডেকে।

আজীবন শুধু রাজসেবা ক'রে জনক আমার
বার্ধক্যেই হলেন অসির বলি।
জঘন্য এই হত্যা আমাকে দেয় ধিক্কার,
আমি নিজস্ব ধোঁয়াটে নরকে জ্বলি।

ভগ্নী আমার কালের বৃন্তে স্বর্গ কুসুম,
মেলেছিল তার প্রতিটি পাপড়ি সুখে।
রাজার কুমার কী জানি কেমন বাজালো বেহাগ,
দুঃখফলানো ঢেউ ওঠে তার বুকে।

চৈতী রাতের স্বপ্নে মগ্ন যুবরাজ তাকে
শোনালো ব্যাকুল মদির গুরুরন।
সোনালি নদীর মতো সেই স্বর শুনে হয়ে গেল
একটি মেলডি তরুণীর তনুমন।

দর্শনঘেঁষা বাক্যবিলাসী বুদ্ধিজীবী সে,
দিশাহারা বেন মননের সংকটে।
তন্বী শোনে নি বারণ আমার, রাখে নি মিনতি—
পড়ল জড়িয়ে উর্নার ক্রুর জটে।

কোন্ ইঙ্গিতে অপাপবিদ্ধ তরুণীর প্রতি
কুমার করেছে নিষ্ঠুর আচরণ?
নিশ্বাসে তার পুষ্পপোড়ানো গ্রীষ্মের দাহ,
ভাষায় প্রাকৃত বৃশ্চিক-দংশন।

সারল্য তার পায়নিকো ক্ষমা, মগজের কোষে
অপ্রকৃতি গায় বড় এলোমেলো গান।
তন্বী শরীরে জলচুম্বন, নিষাদ পৃথ্বী,
তুঁই চাঁপা আর জলবিছুটির ঘ্রাণ।

রাজার বাগানে সাপ তোলে তার চক্কর—বাঁকা
ফুটন্ত মাথা; ঘাতক, গুপ্তচর
আশেপাশে ঘোরে, করে কানাঘুষো। মারী ও মড়কে
কংকাল হয় কত লোক নশ্বর।

দশকে দশকে বাটপাড় আর ঘোড়েল দালাল,
লুটেরার পাল আসে পাল্টিয়ে রূপ।
ইতরজনের বহ্বারম্ভে সাধু সজ্জন
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আজ বড় নিশ্চুপ।

কানকথা শুনে মিত্রকে আমি শত্রু ভেবেছি,
সত্তা আমার হীন দ্বৈরথে মাতে।
যে-জাল নিজেই বিছিয়েছি ষড়যন্ত্রে ব্যাপক—
অসহায় আমি আটকা পড়েছি তাতে।

জোর যার তার মুলুক সত্য, দুর্ভোগ বাড়ে
গণমানুষের ; খরাকবলিত দেশ।
ঘুচাবো দীনতা, এমন সাধ্য নেই এক তিল,
আমি নগণ্য ব্যর্থ লেয়ার্টেস।

রাজার কুমার হয়তো পারতো দুর্গ প্রাকারে
জ্বালাতে সূর্য অমাবস্যার রাতে,
কিন্তু এখানে কেবলি শবের ছড়াছড়ি আর
বীর যুবরাজ নিহত আমারই হাতে।

১

মশাই, চেহারা উঠাইবেন ?

কলকাতার চীনাবাজার রাধাবাজার অঞ্চলের কথা। ছোট একখানা কোট হাতে ফোটগ্রাফারের দালাল ঘুরছে। আর পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক দেখলেই প্রশ্ন করছে, 'মশাই, চেহারা উঠাইবেন ? চারি আনা দিলেই চমৎকার চেহারা হইবে।'— ১৯০৩-এ প্রথম প্রকাশিত আদীশ্বর ঘটকের 'ফটোগ্রাফি শিক্ষা'-র দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিবরণ পাওয়া যায়। নামী-দামী ফোটগ্রাফিক স্টুডিও যখন হাজার দু'হাজারী অয়েল পেইন্টিঙের জায়গায় হাসি মুখে 'মাত্র' একশো টাকায় 'সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে অবিকল প্রতিমূর্তি'-র প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির, রাস্তার ফোটগ্রাফাররা চার আনা,

আট আনাতেই তখন কাচের ছবি বেচছেন। স্বাভাবিকভাবেই আদীশ্বর ঘটক প্রমুখ 'শিক্ষিত'রা এঁদের পেশাগত কারণে কিঞ্চিৎ কৃষ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে দেখতেন। এই নামমাত্র মূল্যে ফোটগ্রাফ বেচে তারা কি ভাবে লাভ করত তার কারিগরী ব্যাখ্যা আদীশ্বর দেন নি।

১৮৫২-র পর থেকেই 'অ্যামব্রোটাইপ', 'টিনটাইপ', 'ফেরোটাইপ' বা 'গ্লাস পজিটিভ' ইত্যাদি বিবিধ নামে পরিচিত খুব সস্তায় ফোট তোলার একটি পদ্ধতি চালু হয়। কাগজের পরিবর্তে এই ফোটগ্রাফের প্রতিবিম্ব উঠত কাচের উপর। ১৮৮০ অবধি এই ধরনের ফোটগ্রাফ খুবই সমাদর পেত আমেরিকার শ্রমজীবী মহলে। কলকাতার রাস্তার ফোটগ্রাফারদের কাজের দু' চারটি নিদর্শনও যদি সংগ্রহ করা যেত তাহলে আমাদের 'বাবু' অধ্যুষিত উনবিংশ শতাব্দীর পোট্রেট রাজ্যে কিছু অপাঙক্তেয়রও ঠাঁই পেত।

আদীশ্বর ঘটকের লেখা থেকেই জানা যায় ১৯১০-এর মধ্যে রাস্তার ফোটগ্রাফারদের ব্যবসা প্রায় উঠে যাবার পর্যায়ে পৌঁছেছিল : 'আমরা স্কুলে পড়িবার সময় বই কিনিতে চীনাবাজারে গিয়া, ঐ প্রকার একখানি গ্লাস পজিটিভ তুলিয়া আনিয়াছিলাম। যে ফটোগ্রাফার তাহা তুলিয়াছিল, সে তখন যুবাপুরুষ ছিল। তখন তাহার পোষাক পরিচ্ছদে একটু চাকচিক্যও দেখিয়া ছিলাম। তাহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে দৈবাৎ এক দিন রাধাবাজারের কোণে একটি সিঁড়ির ধারে দেখিলাম যে, এক জন শীর্ণকায় পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানি গ্লাস পজিটিভ হাতে করিয়া 'ফটোগ্রাফ' 'ফটোগ্রাফ' করিয়া চেঁচাইতেছে।...আগে ছিল আট আনা ও চারি আনা, এখন হইয়াছে, চারি আনা ও দুই আনা। আমি তাহার কর্মস্থলের ছাতের উপর গিয়া নিজেরাই কয়েকখানা গ্লাস পজিটিভ উঠাইলাম। বৃদ্ধ ফটোগ্রাফারকে কোনও মতেই বুঝিতে দিলাম না যে, আমি ফটোগ্রাফি কিছু জানি, অথবা ইহার ব্যবসা করি।' (দ্র. ফটোগ্রাফি শিক্ষা, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৪-৪৫)।

দক্ষিণ আমেরিকার গহন জঙ্গল কেটে মাকান্দো নামে একটি গ্রামের পত্তন করল যারা তাদের নেতা বুয়েন্দিয়া। মার্কেসের নোবেল-পুরস্কারজয়ী উপন্যাসের কথা বলছি। 'দাগেরোটাইপ' নামে পরিচিত রুপোর গিল্‌টি-করা ধাতব পাতের উপর ফোটগ্রাফ তোলা দেখার সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল বুয়েন্দিয়া। জীবনে এই প্রথম সে ফোটগ্রাফ বস্তুটির সঙ্গে পরিচিত হল। তার মনে হচ্ছিল, ধাতব ফলকটির উপর চিরস্থায়ী প্রতিবিম্ব রেখে যাদের ছবি তোলা হচ্ছে তারা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই বুয়েন্দিয়াই কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দাগেরোটাইপ-ছবি তোলায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল। শুরু করেছিল ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা বলার জন্য অভিনব এক পরীক্ষা। 'তিনি' যদি থাকেনই তবে বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জটিল এক 'সুপারইম্পোজড এক্সপোজার' মারফত গৃহীত বুয়েন্দিয়া-র দাগেরো-টাইপ-এ ধরা না দিয়ে রেহাই পাবেন না।

বুরেন্দিয়া ভগবানের ছবি তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু সেটা দক্ষিণ আমেরিকা। ভারতে ভগবানরা স্বয়ং হাজির হয়েছিলেন ফোটোগ্রাফারদের সামনে! দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বইটিতে তার বিবরণ আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ ও ইন্দ্র প্রমুখরা এসেছিলেন ভারত দর্শনে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬-তে, রচনা তারও আগে। কলকাতার পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন একটি 'ফটোগ্রাফিকেল এষ্টাবলিসমেন্ট'-এর সামনে। মাত্র দু'টাকা মূল্যে চেহারা তুলে দেয় শুনে ইন্দ্রের লোভ হল, 'মর্ত্যে কি বেশে ভ্রমণ করিতেছি স্বর্গে দেখাইবার জন্য কয়েকখানি চেহারা তুলে নিলে হয়।' ব্রহ্মা সম্মত হয়ে বললেন, 'হানি কি!' চেহারা তোলা সেরে সদলবলে প্রস্থান করার মুখে এক দর্পণের প্রবেশ। ব্রহ্মা শিহরিত হয়ে তারা যাতে একত্রে চেহারা না তোলে তার জন্য নারায়ণকে একান্তে বললেন, 'মাগী চেহারা তোলে তুলুক, মিন্সে যেন ও চেহারা আর তোলে না।···একে ঐ চেহারা, তাহাতে আবার তুল্‌তে যদি খারাপ ক'রে ফেলে। মাগী হয়তো চেহারা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে ইংরাজী ধরনের পরিত্যাগ ক'রে ফেলবে।'

ব্রহ্মা ফোটোগ্রাফি বিষয়ে নেহাৎ অজ্ঞ বলেই নিশ্চয় এরকম আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চেহারা তোলবার কৌশল বাঙালি ফোটোগ্রাফাররাও সম্পূর্ণ রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। বাংলায় ফোটোগ্রাফি বিষয়ে গ্রন্থ রচনার অগ্রণীর দাবিদার আদীশ্বর ঘটকের পূর্বোক্ত বইটি থেকে 'ফটোগ্রাফীতে চেহারা উঠান' অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করার মতো।

প্রথমেই তিনি বলেছেন, ছবি তুললেই যে তাকে 'চেহারা' বলা যাবে তা নয়। ছবি শিল্পসম্মত হলে তবেই তা চেহারা বলে গণ্য হবে। এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে হলে নিয়মিত যশস্বী শিল্পীদের কাজ দেখা দরকার। চেহারার মধ্যে মুখই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুখটি চেহারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফোকাসে রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এরপর আলো। সে-যুগে সূর্যের আলোতেই ছবি তোলা হতো। ভালো স্টুডিওতে থাকত কাচের ঘর। বিশেষ ক'রে নর্থ-লাইটের কদর ছিল। এক পাশ থেকে মুখে একটু বেশি আলো ফেলে 'আলো-ছায়ার সজ্জা'। স্লো-স্পীড ফিল্মের যুগে চোখের পাতা না ফেলে বেশ কিছুটা স্থির হয়ে বসে থাকতে হতে ছবির 'আসামী'কে! মুখ যাতে নড়ে না যায় তাই মাথায় ঠেস রাখার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল 'হেড-রেস্ট' যন্ত্র। দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে হলে তো কথাই নেই। হেড-রেস্ট অপরিহার্য। তারপরেই 'ব্যাকগ্রাউণ্ড' ও 'ফোরগ্রাউণ্ড' সজ্জা নির্বাচন। থিয়েটারের সিনের মতো কিন্তু একরঙা ছবিওয়ালা পর্দা খাটাতে হবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে। কিংবা লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে রাখারও রেওয়াজ ছিল। লাটাই ঘুরিয়ে সিন্ পাল্টানো হতো। ফোরগ্রাউণ্ডে 'কোথাও ফুলগাছ, কোথাও প্রস্তর খণ্ড, কোথাও কাষ্ঠের বেড়া, কোথাও অস্ত্রাদি, কোনও স্থলে পুস্তকাদি সাজাইয়া ছবি লইতে পারিলে, ফটোগ্রাফ ভাল দেখায়। এই সকল উপায় অসংখ্য।'

কিন্তু এই সবই গৌণ. আদীশ্বর ঘটকের সেরা উপদেশ—সাধারণ চেয়ারের বদলে ঘোরবর্ণের রেশমের গদিযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে ফোট তুললে ভালো দেখায় ঠিকই কিন্তু 'যে জাতি যেভাবে উপবেশনাদি করেন, তত্তৎ জাতীয় লোককে সেই ভাবে বসাইয়া ফটোগ্রাফ লইবে। সাহেবদের আসনে বসাইয়া এবং একটা ধাঙ্গড়কে চেয়ারে বসাইয়া ফটো লইলে, তাহা কেহ ভাল বলিবে না। সেই মত অন্তঃপুরবাসিনী বাঙ্গালী মেয়েকে চেয়ারে বসাইয়া ফটো লইলেও তাহা অস্বাভাবিক দেখাইবে।'

মনে হয় না, কোনো ধাঙ্গড় পয়সা দিয়ে ফোট তুলতে চেয়ে আদীশ্বর ঘটকের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু বহু পুরনো পারিবারিক অ্যালবাম দেখে মনে হয়েছে. ব্রাহ্ম সমাজের কথা বাদ দিলেও গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও অনেক সময়ে স্বামীকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসেছেন সিংহাসনে। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও দুর্লভ নয়। বৃদ্ধ স্থবির স্বামীর পায়ের কাছে সসংকোচে স্থান নিয়েছে বালিকা বধূ। স্বামী-স্ত্রীর যুগল ফোটগ্রাফে নারীর অবস্থান দেখে তাঁর সামাজিক মর্যাদা আবিষ্কারের চেষ্টা করা বৃথা। তার চেয়ে শাড়ির নক্শা, গায়ে আঁচল জড়াবার রীতি, মাথার ঘোমটা, অলংকার ও দৃষ্টির ব্রীড়া—অনেক বাস্তব।

ইয়োরোপীয় ফোটগ্রাফাররা বিখ্যাত ভারতীয়দের চেহারা তুলেছেন অর্ডার-মাফিক, কিন্তু স্বদেশবাসীদের কাছে বিক্রি করার জন্য যত কুখ্যাত, বিপজ্জনক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদঘুটে নেটিভরা ও ওরিয়েন্টাল রাজা-মহারাজারাই ছিল তাঁদের প্রিয় সাবজেক্ট।

ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠান জন. ব্রীজ-এর কলকাতার ম্যানেজার ভিনসেন্ট ব্রাউন ২ হেস্টার স্ট্রিটের ঠিকানায় ১৮৮৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, মাত্র এক টাকায় বিখ্যাত ডাকাত, ভারতীয় রোবিন হুড তাঁতিয়া ভিলের ছবি বিক্রি হচ্ছে :

Tantia ! Tantia !! Tantia !!!
Photograph of this famous Dacoit
(The Indian 'Robin Hood')

CAN NOW BE HAD AT RE. I PER COPY

Tantia Bhil has been photographed —
1. In jail clothing, handcuffed to two policemen.
2. In the attire in which he was captured, in company with a member of his gang.
3. In the attire in which he was captured, 3/4 length, alone.

এই বিজ্ঞাপনের সেজুড় হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'হোম'-এর বন্ধুদের উপহার পাঠাবার উপযোগী ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার কার্ড হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রায় সত্তরটি দুর্লভ 'INDIAN CHARACTERS' তাঁদের সংগ্রহে আছে।

অতি-আলোচিত বর্তমানে ভারতের প্রাচীনতম ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠান বোর্ন-অ্যাণ্ড শেফার্ড-এর দু'টি পুরনো ক্যাটালগ থেকেও প্রায় একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাটালগ দু'টিতে প্রকাশকালের কোনো উল্লেখ নেই। একটিতে শুধু ১৮৪০ থেকে শুরু ক'রে শতাধিক বর্ষের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। ১৮৪০-এ প্রতিষ্ঠিত হবার দাবিটির আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। এদের কলকাতা শাখা ১৮৬৬-তে খোলা হয়। এমন কি সিমলার ভিন্ন নামে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের কথা ধরলেও সেটা ১৮৪০-এর বাইশ বছর পরের ঘটনা। যা হোক, একটি ক্যাটালগ ১৯৪০ নাগাদ ও অন্যটি তারও কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল অনুমান করা যায়। দু'টি মিলিয়ে প্রায় ১৬৭ পাতায় হাজার হাজার ফোটগ্রাফের তালিকা। প্রতিকৃতি-চিত্রের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাইসরয়, মোগল বাদশা, লেফটেনাণ্ট গভর্নর, গভর্নর অফ বেঙ্গল, কমাণ্ডার-ইন-চীফ ও তাঁর সাগরেদরা। 'নেটিভ ক্যারেক-টার' বিভাগে আছে অ্যাক্রোব্যাট, গোলা (সল্ট-মেকার), গোল্ড-লেস্ মেকার, গদ্দি (হ্যাকারি ড্রাইভার), লোদা (কাণ্টিভেটর) স্নেক-চার্মার, এমব্রয়ডারার ও গোল্ডস্মিথ ইত্যাদি। 'প্রমিনেণ্ট-পার্সোনালিটি' বিভাগে রয়েছে শুধু পাঁচজন রাজা-মহারাজা – গোবিন্দলাল রায়, আর. বি. কৃষ্ণ, পদ্ম বাহাদুর, সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও সৈদ আসান রিজা।

অথচ বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডে রবীন্দ্রনাথ বার বার এসেছেন। এসেছেন ঠাকুর পরিবারের অনেকেই স-পরিবারে। রামকৃষ্ণের ছবি তুলেছেন তাঁরা। এসেছেন উপেন্দ্রকিশোর। অনেক পরে শরৎচন্দ্র। এগুলি অবিসংবাদিত তথ্য। আর জানা নেই এমনি কত বাঙালি মনীষীর এখানে আগমন ঘটেছিল তার ইয়ত্তা নেই। সব বাদ দিলেও শুধু রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি বেচলেও বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড-এর ইংরেজ মালিককে পাততাড়ি গোটাতে হতো না। অন্যান্য বিদেশী ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। তাঁরা বাঙালিদের জন্য বাঙালিদের প্রতিকৃতি তোলেন নি। 'চেহারা' – 'likeness'-গ্রহণে পারদর্শী হলেও বাঙালি-মনের হদিশ রাখেন নি। এঁদেরই তোলা ফোটগ্রাফের প্রিণ্ট কপি ক'রে ও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম-চন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ছবি বাঁধিয়ে এখনো বহু বাঙালির দোকান টিকে আছে।

বাঙালির ঘরে ছবি একটা জ্যান্ত জিনিস। শুভ উৎসবে পিতৃপুরুষদের ছবিতে মালা পরানো হয়, সামনে জ্বালানো হয় ধূপ। দোলের দিন লোকান্তরিতের ছবির পায়ে আবির দিয়ে আমরা প্রণাম জানাই। স্বামী ও সন্তানদের রেখে যে ভাগ্যবতী বিদায় নিয়েছেন ছবিতে তাঁর সিঁথি সিঁদুর-রাঙা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। ফোটগ্রাফ-বিনা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গহানি ঘটে।

বাঙালির লৌকিক ও ধর্মীয় জীবনে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হতে ফোটগ্রাফের বেশি সময় লাগে নি। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফের আগমন ঘিরে যদি বা কিছু প্রশ্ন

উঠেছিল, ফোটোগ্রাফকে আমরা বিদেশী জ্ঞানে বর্জন করার কথা ভাবি নি। ছবি-তোলা বলতেই আমরা এখন ফোটগ্রাফ গ্রহণের কথাই বুঝি। অথচ এমন এক দিন ছিল যখন প্রতিকৃতি আঁকার কাজটাকেই ছবি-তোলা বলা হতো। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনীতে লিখেছেন, 'পিতামাতাকে কলিকাতায় আনাইয়া [বিদ্যাসাগর] জননীকে বলিলেন :—"মা। পাইকপাড়া রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল প'টো এসেছে [হগসন্], তাঁহার দ্বারা তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই"।'

ফোটগ্রাফির আগমনে পোট্রেটপেইন্টারদের জীবিকাচ্যুত হওয়া নিঃসন্দেহে দুঃখ-জনক, কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা দরকার, যাঁরা এতদিন চিত্রশিল্পীদের দ্বারস্থ হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারতেন না, সেই মধ্যবিত্তরা এবার ছবি তোলার সুযোগ পেলেন।

অবশ্য ১৮৪০-এ কলকাতায় প্রথম ক্যামেরা এসে পৌঁছবার তথ্য জানা থাকলেও ১৮৪৯-এর আগে তোলা কোনো প্রখ্যাত বাঙালিরও ফোটগ্রাফের নিদর্শন মেলে না। ১৮৮০-৯০ নাগাদ ফোটগ্রাফ সাধারণ মানুষের নাগালে আসে এবং বিংশ শতাব্দীর দরজায় পা রেখেও অবস্থাপন্ন বাঙালি ঘরে ক্যামেরা তার অভিনবত্ব হারায় নি।

মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রথম ঘনিষ্ঠতাও এই সুবাদে। ছবি তোলাকে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথ নবদম্পতি আশা ও মহেন্দ্রের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের আগমন ঘটিয়েছিলেন— 'হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

'আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

'...মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আর্টের খাতিরে অতি সন্তর্পণে পিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল—পছন্দ না হওয়ায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল।...

' অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।'

এর পরেও ছবি তোলা হয়েছিল, কিন্তু প্রথমবার তা ভালো হয় নি। আবার ছবি তোলা হল। তারপরে দুই সখীর গ্রুপ। 'এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।'

প্রায় একই সময়ে ফোটগ্রাফি-চর্চার প্রসার অনুপ্রাণিত একটি কৌতুক-কাহিনী

ফেলেছিলেন ডমরু-স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ : 'হৃষীকেশ বার কলকাতায় আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ের বালকেরা ছবি আঁকিতে শিক্ষা করে। ছবি আঁকা ভিন্ন হৃষীকেশ ফটোগ্রাফ অর্থাৎ আলোক-যন্ত্রের সহায়তায় মানুষের চেহারা তুলিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।...

'নিকটস্থ কোন গ্রামের এক জন লোক তাঁহার শিশুপুত্রের ছবি তুলিবার নিমিত্ত হৃষীকেশকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চাকরের দ্বারা প্রথম চেহারা তুলিবার যন্ত্র ও ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদি পূর্ণ বাক্স প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর বৈকাল বেলা নিজে বাই সাইকেলে অর্থাৎ চাকায় চড়িয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন।

'যথারীতি বালককে বসাইয়া যন্ত্রনিহিত কাচের উপর হৃষীকেশ বালকের ছায়া গ্রহণ করিলেন। কিরূপ ছবি উঠিল দেখিবার নিমিত্ত যন্ত্র হইতে কাচখানি তিনি অতি সাবধানে বাহির করিলেন। আশ্চর্য্য! কাচের উপর বালকের মুখশ্রী অঙ্কিত হয় নাই। কাচের উপর এক পরমা সুন্দরী বালিকার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।'

এই বালিকাকে নিয়ে হৃষীকেশের দুর্ভোগের কাহিনী 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি'।

ইংরেজ আমলে নব্য শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায় আচারে আচরণে সাগর পারের অনেক কেতা রপ্ত করেছিলেন এবং তার জন্য গর্বিত বোধ করতেন। বাইরের জীবনের এই সাহেবিয়ানা কিন্তু অন্দরমহলের দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কদাচিৎ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নীর কাহিনী তো সুবিদিত। ফোটগ্রাফ ম্লেচ্ছদের আনা শুটি কতক জিনিসের অন্যতম যা ছাড়পত্র পেয়েছিল। কিন্তু কেন?

বাঙালির ছবি তোলার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শুধু হিন্দুদের কথাই বলা হয়েছে এ অবধি। এবং এই হিন্দুয়ানাই বাংলার ঘরে ঘরে ফোটগ্রাফের প্রবেশের পথ ক'রে দিয়েছিল। মৃত্যুর পরেও দ্বিতীয় জীবনের অস্তিত্ব বা আত্মার অবিনশ্বরতা—হিন্দুরা এসব কথা বিশ্বাস করে। তাই ফোটগ্রাফি যখন স্বল্পমূল্যে মানুষের প্রতিকৃতিকে স্থায়ী করার সুযোগ এনে দিল, সেটা তারা অগ্রাহ্য করতে পারল না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে মানুষের মূর্তি স্থাপন করাটা যেমন অশুভ চোখে দেখা হতো, মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারে মনে করা হতো—ফোটগ্রাফিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফোট তোলা হলে মানুষের প্রাণটা শুষে নেওয়া হবে—এই ধরনের কিছু অস্বচ্ছ কিন্তু ভীতিপ্রদ ধারণা ছিল। একদিকে মৃত্যুর পরেও প্রিয়জনদের স্মরণ করার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ফোট তোলালে জীবিতের প্রাণহানির ভয়—এই বিরোধের একটা মীমাংসা করা হল অভিনব কায়দায়। বেছে নেওয়া হল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। মৃত্যু যার অবধারিত সেই গঙ্গাযাত্রীর ফোট তুলতে আর বাধা কি? সে সুযোগও যদি না মেলে, তবে নশ্বর দেহটা চিতার আগুনে মিলিয়ে যাবার আগে অন্তত একটা ফোট তো তোলা যেতে পারে। সবান্ধবে, সপরিবারে কিংবা একক ভাবেও

মৃত্যুর হাত ধরে ফোটগ্রাফ প্রবেশাধিকার পেল বাঙালি ঘরে—হিন্দু ঘরে। আজও শ্মশানে শ্মশানে কাঠের তৈরি অতিকায় সব আদিম প্লেট ক্যামেরা নিয়ে বাঙালিরা কয়েক পুরুষের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভালো ঘোমটার মুখ ঢেকে, লেন্সের ক্যাপটা হাতে ক'রে খুলে নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলিয়ে আবার ঢেকে দিচ্ছেন লেন্স। উঠে যাচ্ছে ছবি। সারা জীবনেও যার একটি মাত্র ফোটো তোলানোর সম্বল জোটে নি, মৃত্যুর পরে অন্তত তাঁর প্রিয়জনরা এই গ্লানি থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়ার শেষ সুযোগ হারাতে চান না।

নিকট জনের জীবনমৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে যে-কোনো দেশের যে কোনো ধর্মাবলম্বীই ফোটগ্রাফির শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুর কাছে ছবির একটা অন্য ব্যঞ্জনা আছে। মূর্তিরই বিকল্প ছবি। হিন্দুঘরের অবিনশ্বর দেবদেবীর ছবির পাশে টাঙানো আত্মীয়ের ছবিও তাই দেবত্ব লাভ করে। 'দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটো'গ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে।' (চোখের বালি)।

শুরু হয় আত্মীয় প্রিয়জনকে ঘিরে তারপরে ঘরের দেওয়ালে ঠাঁই নিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ও পূজনীয় সমাজ-সংস্কারক, ধর্মগুরু ও মনীষীরা।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদন—এঁদের নাম শুনলে কচিৎ একাধিক চেহারা ভেসে ওঠে আমাদের চোখে। সাধারণ স্কুলপাঠ্য বই থেকে গম্ভীর প্রবন্ধ—সর্বত্রই প্রায় হাতে গোণা ক'টি ছবির দেখা মেলে। বলতে গেলে এই ক'টি প্রতিচ্ছবি সম্বল করেই আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁদের স্মরণ ক'রে চলেছি। কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টি পেইন্টিং, কোনটি ফোটগ্রাফ বা কোনটি ফোটগ্রাফ অবলম্বনে রচিত লিথো-চিত্র বা স্কেচ—এ খবর আমরা সচরাচর রাখি না। পোর্ট্রেট চিত্রশিল্পীদের নাম যদি বা জানা যায় ফোটগ্রাফাররা কিন্তু পুরোপুরি অজ্ঞাতকুলশীল। ফোটগ্রাফ গ্রহণের স্থান-কালও থেকে গেছে অনালোচিত।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ফোটগ্রাফ আছে। তাঁর জীবনের মধ্য ও অন্ত পর্বের বিখ্যাত কয়েকজন আলোকচিত্রীর কথাও সুবিদিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কথা চিন্তা করলে যতই আমরা পিছোতে থাকব, দুর্লভ হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র। ততই দুর্জ্ঞেয় হবে তাদের স্রষ্টার পরিচয়।

এ-কথাটাও খেয়াল রাখা দরকার যে অনেক বিষয়ের মতো ফোটগ্রাফারদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। চলচ্চিত্র জগতের কথা বাদ দিলে উদয়শংকর ছাড়া আজ অবধি আর কোনো বাঙালির বিভিন্ন বয়সের ও মেজাজের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ফোটগ্রাফিক সম্ভার আর রচিত হয় নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য ফোটগ্রাফির স্বর্ণযুগের বাসিন্দা, কিন্তু তাঁদের ক'টি প্রতিচ্ছবি

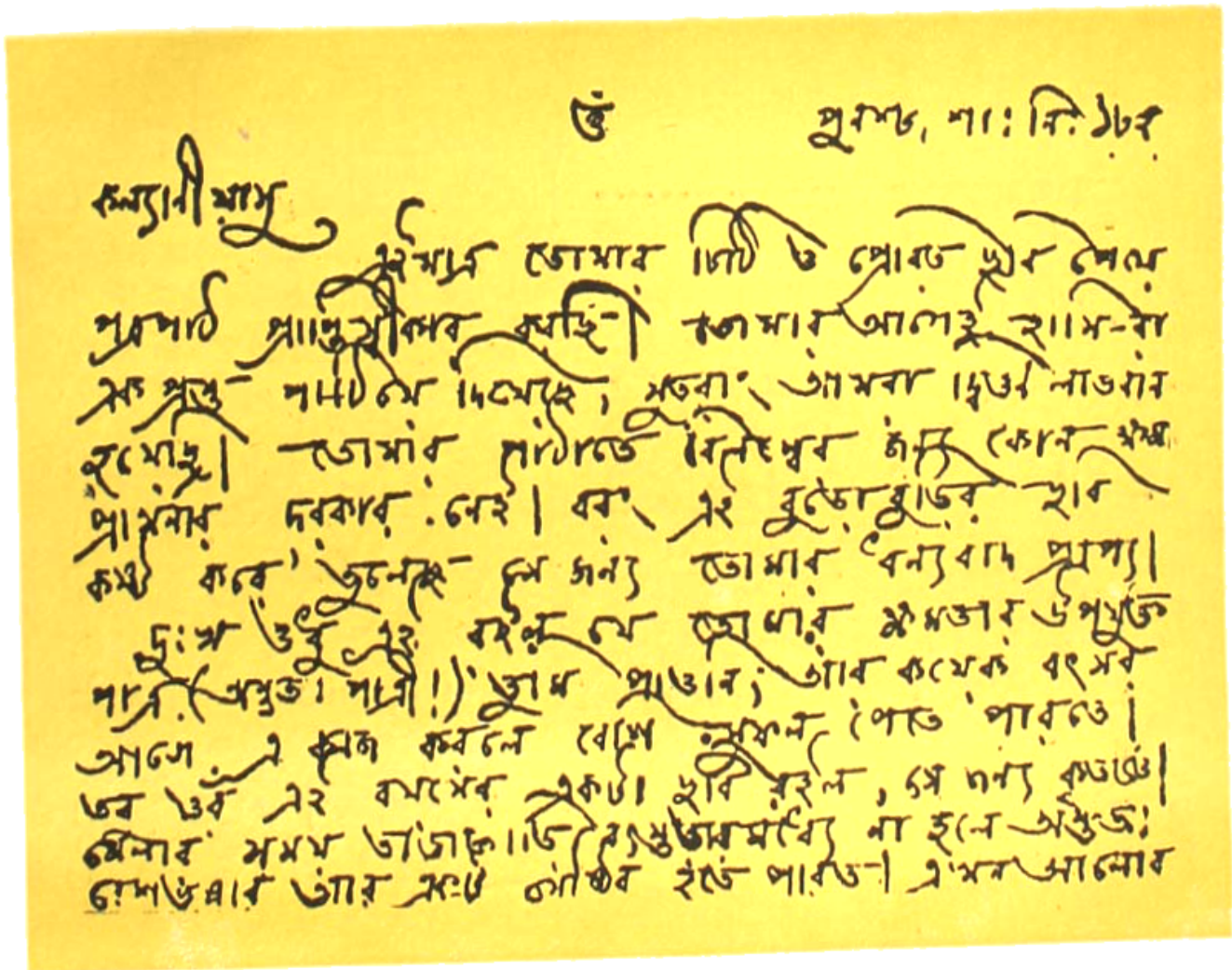

ওঁ

পুরুলিয়া, শা: নি: ১৮৮

কল্যাণীয়াসু

এইমাত্র তোমার চিঠি ও প্রোডাক্ট হাতে পেলাম। প্রথমেই স্বীকার করছি। তোমার আলোচ্য হাসি-বা সে প্রস্তুত সাধনের দেখেছি, সুতরাং, আমরা দ্বিতীয় লাভের সুযোগ। তোমার লাইনে বিশেষজ্ঞ জন্য কোন মন্তব্য প্রকাশের দরকার নেই। বরং এই বুড়োবুড়ির হাত কষ্ট করে' তুলেছ সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রাপ্য। দুঃখ শুধু এই রইল যে তোমার ক্ষমতার উপযুক্ত পাত্রে (অর্থাৎ পাত্রী!) তুমি পাওনি; তার কয়েক বৎসর আগে এ কাজ করলে বেশি সুফল পেতে পারতে। তবু ওই এর কারণের একটা হদিস রইল, সে জন্য কৃতজ্ঞ। মেলার সময় তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার মধ্যে না হলে অন্তত বোলপুরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারত। এখন আলোর

জ্ঞানদানন্দিনীর ফোটোগ্রাফি-চর্চার প্রমাণ : ইন্দিরা দেবীর চিঠি (১৮.১০.৩৬)

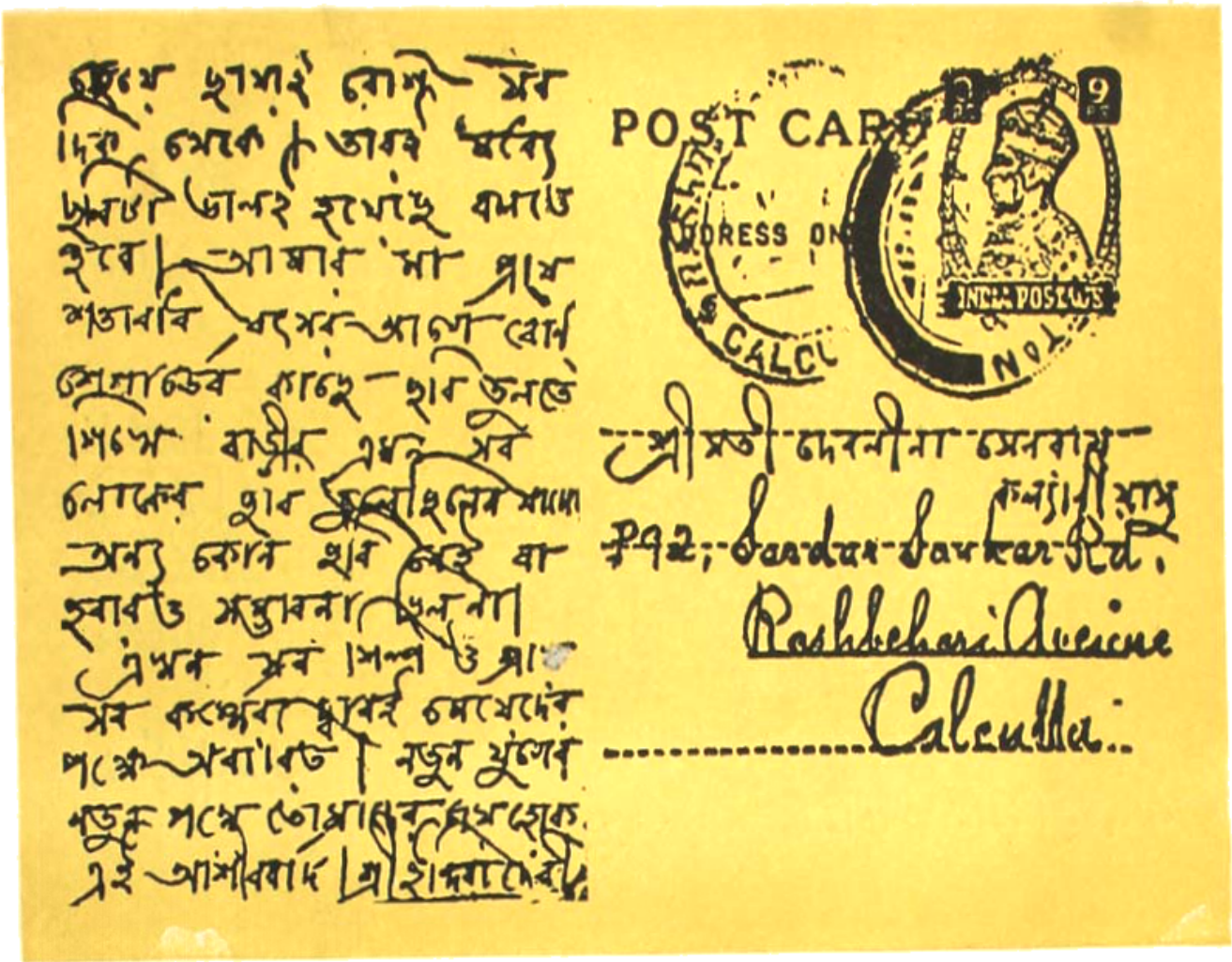

পোস্টকার্ডের অপর পিঠ

সৌজন্য : মেহলীনা মজুমদার (দেব রায়)

আমরা দেখেছি ? সুনীল জানার তোলা চশমা চোখে মধ্যবয়স্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি (একই সিটিঙের) ফোটগ্রাফ, আর পৈতে হবার ঠিক আগে অজ্ঞাত স্টুডিওতে গৃহীত গালে হাত রেখে উদাসদৃষ্টি কিশোর-কবির বাস্ট।

আলোকচিত্রীর প্রতি এই অবহেলা কেন ? ফোটগ্রাফকে কি আমরা শুধু যন্ত্রের মাধ্যমিক হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম ? পুরো কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল যন্ত্রের পারদর্শিতাকে, আর যন্ত্রের পিছনে মানুষটিকে মনে করা হয়েছিল কলকব্জার নিছক অনুবর্তী ? কিন্তু আমরা যে-যুগের কথা বলছি তখনো কোডাক কোম্পানি 'আপনি শুধু বোতাম টিপুন, বাকী দায়িত্ব আমাদের'-জাতীয় বিজ্ঞাপন সমেত হাজির হয় নি। ফোটগ্রাফির কাজ ছিল রীতিমতো দক্ষতা সাপেক্ষ। ছবি তোলার অব্যবহিত আগে তৈরি করতে হতো কাঁচের নেগেটিভ (ওয়েট কলোডিয়ন পদ্ধতি)। ছবি তুলেই নেগেটিভ নিয়ে ঢুকে পড়তে হতো ডার্করুমে। বাইরে ছবি তুলতে বেরলে তাই বয়ে বেড়াতে হতো তাঁবুবন্দী ডার্করুম। ফোটগ্রাফিক কাগজও আরক মাখিয়ে তৈরি ক'রে নিতে হতো। স্থূলদেহ, ক্ষীণদৃষ্টি ত্রিপদ-আশ্রিত ক্যামেরা কম বিপর্যয় সৃষ্টি করত না। তাই যত পিছন দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় ততই কমে আসে আলোকচিত্রীর সংখ্যা। তা সত্ত্বেও কি ক'রে ফোটগ্রাফ স্বীকৃত হল অথচ ফোটগ্রাফাররা রইলেন অজ্ঞাতপরিচয় ?

অন্য একটা দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। কালীঘাটের পট আজ আমাদের গর্ব। কিন্তু ক'জন পটুয়ার নাম বা পরিচয় জানি আমরা ! কাঠখোদাই শিল্পীদের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের পোড়ামাটির অনবদ্য সৃষ্টির স্রষ্টা কারা ? জনপ্রিয় অসংখ্য লোকগীতির রচয়িতারা চিরতরে আশ্রয় নিয়েছেন বিস্মৃতিতে। লৌকিক শিল্পকর্মের কদর দিতে আমরা কসুর না করলেও ব্যক্তি হিসাবে শিল্পীকে স্মরণ রাখার কথা তেমন গুরুত্ব পায় নি। আলোকচিত্রীদের ভাগ্যেও একই বিচার জুটেছে। ফোটগ্রাফের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের সুবাদে ফোটগ্রাফাররাও হয়ে গেছেন কারুশিল্পীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠিভুক্ত। তাঁদের ব্যক্তিপরিচয় জানার জন্য কেউ উৎসুক হন নি।

কিন্তু আজ আমরা কালীঘাটের পটুয়াদের, গয়নাহাটার কাঠখোদাইকারীদের পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করছি। একই কারণে পথিকৃৎ বাঙালি আলোকচিত্রীরাও কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

কাজটা এখন আরোই জরুরি, কারণ 'ভারতবর্ষে ফোটগ্রাফির প্রচলন' নিয়ে পশ্চিমী দেশে গবেষণার আগ্রহ ও বহর ক্রমেই বাড়ছে। যেমন, রে ডেনমণ্ড-এর 'ফোটগ্রাফি ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি' ও 'ভিক্টোরিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ফোকাস', প্যাট বার্ ও রে ডেনমণ্ড প্রণীত 'সিমলা—এ হিল স্টেশন ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' এবং ক্লার্ক ওয়ার্সউইক ও এইন্সলি এম্ব্রি-র 'দা লাস্ট এম্পায়ার—ফোটগ্রাফি ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৮৫৫-১৯১১'।

আলোকচিত্র শিল্পের জন্ম ও বিবর্তন অনস্বীকার্যভাবেই ইয়োরোপে। এবং আমাদের দেশে তার প্রবর্তনও ঘটিয়েছিল সাহেবরা। বিদেশীরা তাদের এই ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত। তাদের লেখাও তাই তাদের কথা, তাদের সাফল্য-কাহিনী। কিন্তু এ-কথা ভুলে গেলে হবে না যে কাহিনীটি অসম্পূর্ণ। তাকে পূর্ণতা দিতে পারে একমাত্র ভারতীয় লেখনী। এই তাগিদ থেকেই বাঙ্গালোরে বর্ষীয়ান ফোটগ্রাফার জি. টমাস রচনা করেছেন 'হিস্ট্রি অফ ফোটগ্রাফি ইন ইণ্ডিয়া ১৮৮০-১৯৮০'। কিন্তু এ-বইটিতে প্রাধান্য পেয়েছে বোম্বাই ও মাদ্রাজের ভারতীয় আলোকচিত্রীরা।

ভারতে ফোটগ্রাফি প্রচলন বিষয়ক পূর্বোক্ত বিদেশী বইগুলি থেকে শুধু এইটুকুই আমরা জানতে পারি যে ক্যামেরা হাতে পেয়েই বিদেশীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'মানুষ ও পশুর, স্থাপত্য ও নিসর্গের' দিকে। তাঁদের কল্পনায় ভারত অতি প্রাচীন সংস্কৃতির আত্মবিস্মৃত উত্তরাধিকারী কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত, অসভ্য বহু উপজাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত একটি দেশ। এই 'মিস্টিক' 'পিকচারেস্ক' ওরিয়েণ্টকেই ফোট-গ্রাফে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন উনিশ শতকের শ্বেতাঙ্গরা। এই সংকীর্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও তাঁরা ঐতিহাসিকদের জন্যে রেখে গেছেন অমূল্য দৃশ্য-উপাদানের সম্ভার।

উনিশ শতকের ভারতে তোলা বহু ফোটর প্রতিচ্ছবি সংবলিত একটি গ্রন্থ 'ভিক্টোরিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ফোকাস'। সেখানে মাত্র একজন ভারতীয়র তোলা ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছে। যদিও বিনা স্বীকৃতিতে। ইনি হলেন আলি আহমেদ খান।

হোসেনাবাদের দারোগা, ছোট মীর নামেও পরিচিত আলি আহমেদ খান-এর ফোটগ্রাফি-চর্চার কেন্দ্র ছিল সিপাহি অভ্যুত্থানের ঠিক পূর্ববর্তী কালের লখনৌ। ১৮৫৩-তে স্থাপিত ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর প্রথম বছরের ২৯ অক্টোবরের একটি বৈঠকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় : '...লখনৌ শহরে এক ভারতীয় কাচের উপর সুন্দর ফোটগ্রাফিক প্রতিবিম্ব গ্রহণ করছেন। অবশ্য কাগজে স্থানান্তরিত করার পর সেগুলি খুব স্পষ্ট হয় নি। এই লোকটির নাম আহমদ আলি খান এবং তাঁর কাছ থেকে সোসাইটি কিছু ভালো ছবি সংগ্রহ করতে পারে। লখনৌ-এ তিনি বিলিতি কলোডিয়ন কাজে লাগাতে পারেন নি এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে তার বদবদল ঘটাতে হয়েছিল।'

অর্থাৎ, শুধু ছবি তোলাই নয়, তিনি রাসায়নিক গবেষণাতেও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

১৮৫৬ থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে লখনৌ-র চ্যাপলেইন রেভারেণ্ড হেনরি পোলে-হ্যাম্পটন তাঁর মা-কে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার থেকে জানা যায় যে খান লখনৌ শহরে ফোটগ্রাফার হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং একা তিনিই তখন সেখানে 'দাগেরোটাইপ' ছবি তুলতেন। শুধু তাই নয়, খান ছিলেন পুরোদস্তুর

সৌখিন ফোটগ্রাফার। ছবি তুলে দিতেন বিনা পারিশ্রমিকে এবং কারো অনুরোধই অগ্রাহ্য হতো না।

লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি অ্যাণ্ড রেকর্ডস'-এর মহাফেজখানায় সযত্নে রয়েছে খানের তোলা কয়েক শ' ফোটগ্রাফ (সল্ট প্রিণ্ট)। অবশ্য তার মধ্যে কোনো দাগেরোটাইপ নেই। এই সংস্থার প্রিণ্টস ও ড্রইংস বিভাগের মিসেস পি. ক্যাটেনহর্নের সৌজন্যে খানের তোলা ফোটগ্রাফের একটি তালিকা ও কিছু জেরক্স কপি দেখার সুযোগ পেয়েছি। জেরক্স কপিতেও ফোটগ্রাফগুলি জীবন্ত। সিপাহি অভ্যুত্থানের ঠিক আগে লখনৌ-র বাসিন্দাদের ছবিগুলি এক ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি-সম্ভার।

খানের তোলা কয়েকটি ফোটগ্রাফের উল্লেখ করছি : ভারতে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের প্রবর্তক উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসির দুই কন্যা, লা মার্টিনেয়ার-এর অধ্যক্ষ ও কয়েকজন শিক্ষক, ওয়াজেদ আলি শা'র পুলিশ-প্রধান মীর মহম্মদ আব্বাস, কন্সটান্টিনোপলের আল-অ:-তাহির ও রাজার এ-ডি-কং, অযোধ্যারাজ আমজাদ আলি শা-র প্রধান মন্ত্রী মুনায়ার-উদ-দৌলা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীফ-অফ-পুলিশ পুরান চাঁদ, রেসিডেন্সির হেড ওয়েটার মুহম্মদ খান, অযোধ্যারাজের প্রিয় কোচম্যান বান্দা আলি খান, রাজা আসফ আলি খান ইত্যাদি। লখনৌ-র 'দীল্ আরাম গৃহ' ও ক্যাপ্টেন হেয়েস-এর বাড়ি ইত্যাদিরও ছবি তুলেছিলেন খান।

খান আমাদের আরো গর্ব, কারণ তিনি ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানে এক বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

লালাদীনদয়ালই একমাত্র ভারতীয় যাঁর প্রতি সাগরপারের ফোটগ্রাফির ইতিহাস-প্রণেতারা সদয়। ক্লার্ক ওয়ার্সউইক-এর 'Princely India' বইটিতে আলোচিত হয়েছে দীনদয়ালের জীবন ও কর্ম, সংগৃহীত হয়েছে বিরল বহু ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি।

জুডিথ গাটম্যান-এর 'Through Indian Eyes' বইটি কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গাটম্যান আসলে শিল্পসমালোচক। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয়দের ফোটগ্রাফের শিল্পবিচার পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে করা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় ফোটগ্রাফকে। মিনিয়েচার পেইন্টিঙের দ্বিমাত্রিকতা এবং বিভিন্ন স্তরভেদের সাহায্যে একই ছবিতে একাধিক ও বহুদেশিক ঘটনাকে সন্নিবদ্ধ করা—এই ধরনের লক্ষণ দেখেছেন তিনি ভারতীয় ফোটগ্রাফিতেও। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই তাঁর মনে হয়েছে, আমাদের দেশের পেইন্টেড ফোটগ্রাফ—রঙ-করা ফোটগ্রাফগুলি এতই ভারতীয় যে তার শিল্পগত ও সামাজিক মর্ম অনুধাবন করা অধিকাংশ বিদেশীর পক্ষেই দুঃসাধ্য।

ভারতে ফোটগ্রাফির প্রবর্তন ও প্রচলনে উল্লিখিত বিদেশী ভূমিকার ও অবাঙালি-দের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে তার পরিপূরক একটি অধ্যায় রূপেই প্রবন্ধটিকে

কল্পনা করা হয়েছে. যার মূল লক্ষ্য ফোটগ্রাফি-চর্চার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ।

প্রথমত. বিদেশী পেশাদার ফোটগ্রাফারদের স্টুডিও-র ঢোকার সুযোগ নিশ্চয় কয়েক জনের জুটেছিল। আজও বেভাবে ফাইফরমাশ খাটতে খাটতেই অনেকে কাজটা রপ্ত ক'রে ফেলেন, দক্ষ হয়ে ওঠেন — সে-যুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

দ্বিতীয়ত. মুষ্টিমেয় বিদ্যোৎসাহী, কলানুরাগী ও ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী সাহেব ও তাঁদের এদেশী বন্ধুরা ফোটগ্রাফির প্রচলন ঘটাতে কয়েকটি সংস্থা গঠন করেন। দু-একটি কারিগরি বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত হয় ফোটগ্রাফি। ১৮৫৫-র বোম্বের এলফিনস্টোন ইন্সটিটিউশনে ফোটগ্রাফি শিক্ষার ক্লাশ নেওয়া শুরু হয়। শিক্ষক ছিলেন ডব্লুউ. এইচ. এস. ক্রফোর্ড। ১৮৬৩-র ১ জুলাই তারিখের British Journal of Photography-তে প্রকাশিত 'Photography in the East' প্রবন্ধের লেখক স্যামুয়েল বোর্ন জানিয়েছিলেন, কলকাতায় 'নেটিভদের' ফোটগ্রাফিক সংস্থার সংখ্যা খুব কম নয় এবং মাদ্রাজে একটি 'school of arts' আছে যেখানে নেটিভদের ফোটগ্রাফি শিক্ষা দেওয়া হয়। বোর্নের মতে এখানকার ছাত্রদের তোলা ছবির মান ছিল বেশ ভালো, লণ্ডনের বেশ কিছু পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে তিনি তুলনামূলকভাবে এর চেয়ে অনেক খারাপ নমুনাও দেখেছিলেন। উল্লিখিত স্কুলটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৫০-এর দশকে। অধ্যক্ষ ডঃ এ. হাণ্টারের উৎসাহে ভারতীয় ছাত্ররা মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ক'রে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের যে আলোকচিত্রগুলি গ্রহণ করেন তার উন্নত মানের কথা স্বীকার করেছিলেন স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহাসিক ও ভারতীয় শিল্প-বিশেষজ্ঞ জেমস ফার্গুসন। রুরকির থমাসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ফোটগ্রাফি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮৬৪-তে একজন বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত হন। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ত বিভাগের কাজের অগ্রগতির রেকর্ড রাখার জন্য ছাত্রদের দিয়ে ছবি তোলানো। ভারতীয় আলোকচিত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পরিচিত ও বিখ্যাত লালা দীনদয়াল রুরকির এই কলেজেই (ভারতের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে) শিক্ষালাভ ক'রে ১৮৬৬-তে ইন্দোরের ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ার্কস-এর সেক্রেটারিয়াল অফিসে এস্টিমেটার ও ড্রাফটসম্যান পদে চাকরি নেন। সম্ভবত ফোটগ্রাফির আদি পাঠ রুরকির কলেজেই তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতীয়দের ফোটগ্রাফি শিক্ষার তৃতীয় সুযোগটি যুগিয়েছিলেন দেশীয় রাজা-মহারাজারা। ফোটগ্রাফি তাঁদের অলস জীবনে অনেক শৌখিন বিলাসিতার অন্যতম হলেও তাঁদের দুর্মূল্য স্টুডিও ও তার উপকরণ নিয়েই হাত পাকিয়েছিলেন অনেক ভাগ্যবান। বিদেশে ফোটগ্রাফির প্রচলন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজন্যবর্গের একাংশ বহু অর্থব্যয়ে বিদেশী ফোটগ্রাফারদের নিয়ে আসেন নিজেদের সভাসদ রূপে। অবশ্য ত্রিপুরার মহারাজারা যে এর ব্যতিক্রম সেটা মহারাজা বীরচন্দ্রের ফোটগ্রাফি-চর্চার অধ্যায়েও স্পষ্ট হবে।

১৯৭৮-এ কর্নেল ভবানী সিং তাঁর ঠাকুর্দা জয়পুরের মহারাজার তোলা প্রায় দু' হাজার গ্লাস প্লেট নেগেটিভ খুঁজে পান। মহারাজা সোয়াই রাম সিং (দ্বিতীয়) মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ও রক্ষক অশোককুমার দাস ও বজুবেন্দ্র সহাইয়ের আগ্রহে পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের একটি ভারতীয় স্টুডিওর প্রায় সমস্ত উপকরণ – ক্যামেরা, লেন্স, রাসায়নিক দ্রব্য, অ্যালবাম ইত্যাদি। ফোটগ্রাফিতে দক্ষ এই মহারাজা ১৮৬৪-তে নৈনিতালের টি. মারে-কে তাঁর দরবারের ফোটগ্রাফার হিসাবে নিযুক্ত করেন। ক্যাপ্টেন ই. সি. ইম্পে (১৮৬০), Louis Rouselet (১৮৬৪), দিল্লীর পি. সেন (১৮৬৫), Dr. De Feback (১৮৬৫) ও ইন্দোরের লালা দীনদয়াল (১৮৭৬) প্রমুখ ফোটগ্রাফাররা রাম সিং-এর কালে জয়পুর পরিদর্শন করেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি 'তসবীর খানা' নামে একটি ফোটগ্রাফি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছিলেন উৎসাহীদের সুবিধার কথা ভেবে।

কলকাতায় ফোটগ্রাফির আগমন

ভারতে ক্যামেরা বিক্রির সবচেয়ে প্রাচীন বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪০-এ 'ক্রেও অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে ২৮ জানুয়ারিতে। বিজ্ঞাপনদাতা কলকাতার থ্যাকার অ্যাণ্ড কোম্পানি 'দাগেরোটাইপ' ক্যামেরা আমদানির কথা ঘোষণা করেছিলেন।

ভারতে প্রথম যে আলোকচিত্রীর প্রমাণযোগ্য অস্তিত্বের কথা জানা যায় তিনি Mons F. M. Montairo। 'ইংলিশম্যান' কাগজে ১৮৪৪-এর ৬ জুলাই কলকাতার এই বাসিন্দা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন :

> **Mons. F. M. Montairo, No 7, Wellington Square begs to inform the public that he is prepared to take likeness by the daguerreotype process. He calls at private residences when required.**

Mons. Montairo-কে সম্ভবত ভারতের প্রথম পেশাদার আলোকচিত্রীর গৌরব দিতে কোনো বাধা নেই। Montairo সম্বন্ধে কিন্তু এর বেশি আর কিছুই জানা যায় নি।

ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর প্রথম সভাপতি Dr. F. J. Mouat কলকাতার এক জরিপবিদ Josiah Rowe-কে 'ভারতে ফোটগ্রাফির জনক' বলে অভিহিত করেন, কিন্তু রো-র তোলা কোনো আলোকচিত্রের হদিশ মেলে না।

দাগেরোটাইপের প্রচলনের পর ফোটগ্রাফির কারিগরি উন্নতিসাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান ইংলণ্ডের ফক্স ট্যালবটের। 'নেগেটিভ-পজিটিভ' মারফত ফোটগ্রাফিক প্রিন্ট সৃষ্টির এই প্রথম সফল পদ্ধতিটি 'ক্যালোটাইপ' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪৮-

এর ২ নভেম্বর 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে উদ্ধৃত 'ইংলিশম্যান' কাগজের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় : '…A Mr. Schranzhofer has arrived in Calcutta and intends practising photography upon the system invented by Mr. Talbot, and to which he gave the name calotype. The portraits are in many particulars superior to those taken by daguerreotypes…'

কলকাতায় ২ কিড স্ট্রিটে তিনি স্টুডিও স্থাপন করেন। অনুমান, পেশাদারী ভিত্তিতে এটিই ভারতের প্রথম ফোটগ্রাফিক স্টুডিও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বেঙ্গল ডাইরেক্টরি (অ্যান্থুয়েল) রেজিস্টার এবং নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি নামে দু'টি বর্ষপঞ্জির 'বাণিজ্য' অধ্যায়ে 'Artists' শিরোনামে একটি তালিকা থাকত। আলোক-চিত্রীদের প্রথম সংকোচ আবির্ভাব এই তালিকার মধ্যেই ঘটে। নামের পাশে একটি বন্ধনীর মধ্যে দু-চার শব্দের বিশেষণ শুধু তাঁদের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করত। ক্রমে তাঁরাই কিন্তু চিত্রকরদের জীবিকাচ্যুত করেন। চিত্রকরদের মধ্যেও কয়েকজন যন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেন। ১৮৫৬-র একটি বর্ষপঞ্জিতে ন'জন পোর্ট্রেট পেইন্টারের নাম দেখতে পাওয়া যায় (তার মধ্যে একমাত্র বাঙালি চিত্রকর, ২৭ কাশিটোলা স্ট্রিটের দীননাথ দে-র নাম স্মরণযোগ্য)। কিন্তু একই বর্ষপঞ্জির ১৮৫৮-এর খণ্ডে মাত্র দু'জন চিত্রকরের নাম আছে।

তালিকার উপর চোখ বোলালেই লক্ষ করা যায় আলোকচিত্রীরা দু'টি গোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথমে আবির্ভাব দাগেরোটাইপ আর্টিস্ট বা দাগেরিয়ান আর্টিস্ট-দের, তারপরে এলেন ফোটগ্রাফার বা ফোটগ্রাফিক আর্টিস্ট-রা। আলোকচিত্রের ইতিহাসে এল. জে. এম. দাগারে-ই প্রথম 'প্র্যাকটিক্যাল' আলোকচিত্রীর সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত দাগেরোটাইপ পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৯-এর ৭ জানুয়ারি। তার মাত্র এক বছরের মধ্যেই কলকাতায় দাগেরোটাইপ ক্যামেরা বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু আদৌ এ-ক্যামেরা কেউ কিনে-ছিলেন কিনা বা কিনলেও ছবি তুলতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ তখন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের কমে ছবি তোলা যেত না। ১৮৪১-এ ক্যামেরার উন্নততর লেন্স ও রাসায়নিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তবে ছবি তোলার কাজ তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সাঙ্গ করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া ফোটগ্রাফ বলতেই আমরা এখন ধরে নিই তার একটি নেগেটিভ থাকবেই যার থেকে একাধিক পজিটিভ বা কপি-প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব। দাগেরোটাইপ ছবি কিন্তু ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম। একটি পালিশ-করা তামার পাতে প্রথমে রুপোর গিল্‌টি করা হতো। তার পরে পাতটিকে আইওডিন ও ব্রোমিন বাষ্পের উপর রাখলে রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাতটির উপর তৈরি হতো 'সিলভার আইওডাইড' লবণ।

এই অবস্থায় পাতটিকে ক্যামেরায় ভরে ছবি তুললে আলোর প্রভাবে সেখানে দৃশ্যবস্তুর একটি সুপ্ত প্রতিবিম্ব গঠিত হতো। এই সুপ্ত প্রতিবিম্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পাতটিকে আবার ধরতে হতো উষ্ণ পারদের বাষ্পের সামনে। তখন পাতটিতে দৃশ্যবস্তুর আলোকিত অংশগুলি সাদা হয়ে ধরা দিত রুপো ও পারদের amalgam মারফত, আর কালো অংশগুলির প্রতিনিধিত্ব করত পালিশ-করা রুপোর তল। আলোর সামনে একটি বিশেষ কোণে কাৎ ক'রে দাগেরোটাইপ পর্যবেক্ষণ করতে হয়, না হলে প্রতিফলিত আলো ছবির কালো অংশগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। ধাতব পাতের উপর এই আলোকচিত্রের তাই কোনো কপি বা নকল নেওয়া যেত না।

একটি নেগেটিভ ও তার সাহায্যে একাধিক ছাপ বা প্রিন্ট বা পজিটিভ গ্রহণের প্রথম সুযোগ এল উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট উদ্ভাবিত 'ক্যালোটাইপ' পদ্ধতি প্রচলিত হলে। 'ক্যালোটাইপ' পদ্ধতিতে 'সল্ট প্রিন্ট' ছবি তুলতে অনেক সময় লাগত, তাই প্রতিকৃতি গ্রহণের জন্য দাগেরোটাইপের চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যায়। দাগেরোটাইপ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করল ১৮৫১-তে 'ওয়েট প্লেট'-এর প্রবর্তনের পর। অর্থাৎ কাঁচের পাতকে নেগেটিভ হিসাবে ব্যবহার শুরু হলে।

'ক্যালোটাইপ' ও 'ওয়েট প্লেট' ব্যবহারকারীরা প্রথম নিজেদের ফোটগ্রাফার আখ্যা দেন। বিশেষত 'দাগেরোটাইপ' গ্রহণকারীদের সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য।

দাগেরোটাইপ ও ফোটগ্রাফির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন রয়েছে উল্লিখিত বর্ষপঞ্জির বিভিন্ন খণ্ডে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দাগেরিয়ান-আর্টিস্টদের নতি স্বীকার করতে হয়। প্রথমে অনেকে 'দাগেরিয়ান গ্যালারি'-র সঙ্গে সঙ্গে ফোটগ্রাফারদের দলেও যোগ দেন, তারপর পুরোপুরি সরে আসেন। যদিও ১৮৬৭-তেও কলকাতায় এফ. ডব্লু. বেকার পরিচালিত একটি দাগেরোটাইপ স্টুডিও ছিল।

কলকাতার প্রথম দিকের ফোটগ্রাফিক স্টুডিওগুলির অবস্থানও অনুধাবন-যোগ্য। ১৮৪৪-এ Montairo ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ১৮৪৮-এ Schranzhofer কিড স্ট্রিটে দোকান খুললেও ডালহাউসি স্কোয়ার ও এসপ্লানেড বা তার সন্নিহিত কাশীটোলা স্ট্রিট (বেন্টিঙ্ক)ও জানবাজার (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) ছিল স্টুডিও পাড়া। এই বৈশিষ্ট্য বাঙালি আলোকচিত্রীদের আবির্ভাবের আগে অবধি বজায় ছিল। আলোচ্য পর্বের একমাত্র ব্যতিক্রম, ১৮৪৮-এর তালিকার Charles Jose, যিনি কুলিবাজারে স্টুডিও খুলেছিলেন। বর্তমান খিদিরপুর ব্রিজের উত্তরে ও রেসকোর্সের পশ্চিমে এই 'হেস্টিংস' অঞ্চল একদিকে যেমন বন্দরের নিকটবর্তী তেমনি ফোর্ট উইলিয়ামেরও সংলগ্ন। সম্ভবত নাবিক ও ফৌজীদের আকর্ষণ করার জন্যই স্থানটি নির্বাচিত হয়েছিল।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে এই তালিকার বাইরে আর কোনো ফোট-

গ্রাফিক স্টুডিও থাকা সম্ভব নয়। এমন কি বাঙালি সংস্থাও যে ছিল তার প্রমাণ আগেই পেশ করা হয়েছে ১৮৬৩-তে স্যামুয়েল বোর্নের একটি চিঠি উদ্ধৃত ক'রে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, জে. এস. নিউল্যাণ্ড ও দাগেরোটাইপ

প্রমথ চৌধুরীর চার-ইয়ারের অন্যতম সীতেশ বলেছিল, 'জানই তো, জলই হোক ঝড়ই হোক লণ্ডনের রাস্তায় লোকচলাচল কখনো বন্ধ হয় না, সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি শুধু মানুষের স্রোত চলেছে — সকলেরই পরনে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য দাগেরোটাইপের ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে।'

প্রমথ চৌধুরী অকারণে দাগেরোটাইপ ছবির উপমা দেন নি। রুপোর গিল্‌টি-করা তামার পাতের উপর দাগেরোটাইপ প্রতিবিম্বের উপর তির্যক আলোকপাত ঘটালে তবেই তার কালো রঙ ধরা দিত বৃষ্টি-ভেজা কালো রাস্তার মতো উজ্জ্বল রূপে।

কলকাতায় দাগেরোটাইপ-চর্চায় সবচেয়ে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন জে. এস. নিউল্যাণ্ড। ১৮৫২ থেকে ১৮৬১ অবধি ৬নং লাউডন বিল্ডিং-এ অবস্থিত নিউল্যাণ্ডের 'দাগেরিয়ান গ্যালারি'-র উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন বর্ষপঞ্জিতে। শুধু তাই নয়, তাঁরই এক সহকারী এফ. ডব্লু. বেকার ১৮৫৬-র ১-২ ওয়েলেসলি প্লেসে স্টুডিও স্থাপন করেছিলেন এবং ১৮৬৭ অবধি ১-২ বীচারস বিল্ডিং-এ বেকারের স্টুডিওতে দাগেরোটাইপ তোলা হয়েছে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একমাত্র ছবিটির জন্য আমরা নিউল্যাণ্ড সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ। ১৮৫৯-এর ২৩ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে 'ঈশ্বরচন্দ্র যখন অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত সেই সময় নিউল্যাণ্ড সাহেবকে যন্ত্রালয়ে [৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে সংবাদ প্রভাকরের মুদ্রালয়ে] আনিয়ে ডাগ্রেোটাইপ যন্ত্র দ্বারা তাঁর একটি চিত্র প্রস্তুত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর আশুতোষ কর নামে জনৈক ব্যক্তি সেই ছবি নিয়ে যান। অনেক কষ্টে সেই ছবি তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হল বটে, কিন্তু সংবাদ ভাস্করের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় আশুতোষ ফটোগ্রাফি করে সেই ছবির এক হাজার কপি প্রস্তুত করেছেন এবং এক টাকা করে বিক্রি করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের যে একটি মাত্র ছবি পাওয়া যায়, তা শাস্তিত অবস্থায়। এটিই সেই নিউল্যাণ্ড সাহেবের তোলা ছবি।' (ব্র. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, পৃ ১৭১-৭২, সংবাদ প্রভাকর, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত হেমচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ) এই ছবিটি থেকে প্রস্তুত একটি ব্লক ছাপা হয়েছিল। ১৮৫৯-এর আগে তোলা কোনো বাঙালি মনীষীর ফোটগ্রাফ বোধহয় রক্ষা পায় নি। এই বক্তব্যের গুরুত্ব আরো ধরা

পড়ে, কথাটিকে অন্যভাবে পেশ করলে – ১৮৫৯-এর আগে প্রয়াত কোনো বাঙালির ফোটগ্রাফ নেই।

নিউল্যাণ্ড সাহেব শুধু গুটিকয়েক স্বদেশবাসীকেই দাগেরোটাইপ-শিক্ষা দেন নি, পাইকপাড়ার ছোটরাজা বেলগাছিয়া নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রযোজক ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও তাঁর কাছে এই বিদ্যা লাভ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ফোটগ্রাফ আলোচনার সময়ে তার বিবরণ দেওয়া হবে।

নিউল্যাণ্ডের তোলা দাগেরোটাইপের একটি মাত্র মূল চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে লণ্ডনের সায়েন্স মিউজিয়মে। ১৯৬৫-তে এই ছবিটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মিউজিয়ামে দান করেন ২০৬ অ্যাবট্‌স রোডের জে. হার্ডি। ছবিটি কলকাতায় তোলা বলেই অনুমান করা হয়। কারণ ছবিটির ফোটগ্রাফারকে 'নিউল্যাণ্ড অফ ক্যালকাটা' বলা হয়েছে। কিন্তু ছবির বালিকাটির পরিচয় জানা যায় নি।

দাগেরোটাইপ ছবি যে-কোনো দেশেই আজ অতি দুর্লভ সংগ্রহণীয় বস্তু। ভারতের ক্ষেত্রে ত০। বটেই। বিশেষ ক'রে আমাদের আবহাওয়া দাগেরোটাইপের সবচেয়ে বড় শত্রু। কাচের আবরণ দেওয়া খাপ-ওলা বাক্সে গয়নার মতো রাখা হলেও দাগেরোটাইপ ছবির প্রতিবিম্ব অতি ভঙ্গুর, বাতাসের সামান্য সংস্পর্শেই তা অক্সিডাইজড হয়ে যায়।

বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম দাগেরোটাইপ ছবি তুলে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। ১৮৯৫ এ ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার পত্রিকার মে সংখ্যায় 'ইণ্ডিয়ান ফোটগ্রাফার অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়ার্ক : হিজ হাইনেস দা বড়-ঠাকুর বাহাদুর অফ ত্রিপুরা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই রচনা অনুসারে ১৮৬০ থেকেই বীরচন্দ্র দাগেরোটাইপ-চর্চা করছেন।

আগরতলায় বর্তমান বিধায়ক সভা ভবন ও প্রাক্তন রাজভবনের পশ্চিমে এখন বাস করেন রাজপরিবারভুক্ত সহদেবচন্দ্র দেব বর্মন। সহদেব কর্তা নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মহারাজা বীরচন্দ্রের তোলা অতি বিবর্ণ তিনটি দাগেরোটাইপের নমুনা দেখার সুযোগ ঘটেছিল আমার এই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে। কাচের আবরণহীন এই ছবিগুলি বাতাসের সংস্পর্শে আসায় তার থেকে রুপোর সিল্‌টি প্রায় সম্পূর্ণ উঠে গেছে। প্রথম নজরে তাই শুধু একফালি তামার পাত বলেই মনে হয়। কিন্তু আলোর সামনে কাত ক'রে ধরলে এখনো অতি অস্পষ্ট হলেও রাজঅন্তঃপুরের দু'টি পরিচারিকা ও রাজার কোনো আত্মীয়া এখনো অতি জীবন্ত। তাদের বসনভূষণ, দৃষ্টি এখনো মহারাজার দক্ষতার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। এই দাগেরোটাইপ ছবি তিনটির উল্টো পিঠে তামার পাত প্রস্তুত-কারীদের নাম ইংরাজিতে খোদাই করা আছে। দু'টি তৈরি করেছিলেন কলকাতার Thacker & Co এবং তৃতীয়টি কলকাতারই গাঙ্গুলি অ্যাণ্ড কোং।

দাগেরোটাইপ আরেকজন কৃতী বাঙালিকে চিরস্থায়ী ক'রে গেছে। মন্মথনাথ ঘোষ সম্পাদিত The Life of Grishchunder Ghosh গ্রন্থে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'দা বেঙ্গলি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, সিপাই অভ্যুত্থানে ইংরাজ-ভূমিকার সমালোচক ও নীলবিদ্রোহের সম্পাদক এই তেজস্বী মানুষটির তরুণ বয়সের একটি ছবি আছে। এই গ্রন্থ-প্রণেতা গিরিশচন্দ্রের পৌত্র একথাও লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন যে ছবিটি একটি 'দাগেরোটাইপ'-এর ব্লক থেকে ছাপা। ১৮২৯-এ গিরিশচন্দ্রের জন্ম এবং ছবিটি দেখে অনুমান করা যায় তাঁর বয়স তখন তিরিশের কোঠায়। কাজেই ছবিটি ১৮৬০ নাগাদ গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রাঙ্গণেই ছিল সেকালের বিখ্যাত 'সাঁ-সুসি' থিয়েটার। এই 'সাঁ সুসি'র একমাত্র প্রামাণ্য চিত্রটি 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট'-এর প্রথম খণ্ডের মুখপাতে ছাপা হয়েছিল। ছবির তলায়-ছাপা আছে এটি একটি 'দাগেরোটাইপ' অবলম্বনে প্রস্তুত। মূল চিত্রটির জন্য সৌজন্যমূলক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ব্যারাকপুর নিবাসী জনৈকা মিস্ পেরী-কে।

বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দাদের মূল দাগেরোটাইপ দেখার আগ্রহ মিটতে পারে একমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। অজানা আলোকচিত্রী গৃহীত কলকাতার দু'টি পথদৃশ্যের দাগেরোটাইপ এখানে অপ্রদর্শিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

রঙীন দাগেরোটাইপ : ১৮৩৯-এ দাগেরোটাইপ পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকেই রঙীন ছবি তোলার জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এ বিষয়ে একজন পথিকৃৎ ছিলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের সার্জেন, রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ও ভারতের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার জনক স্বরূপ উইলিয়াম ব্রুক ও' শনেসি। ও'-শনেসি দাগেরোটাইপের প্রতিবিম্বে রঙীন 'টোন্' আনার জন্য মূল পদ্ধতির পারদ বাষ্পের পরিবর্তে সোনা, প্ল্যাটিনাম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম ও ইরিডিয়াম ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা চালান। লাল, পার্পল ও সবুজ ইত্যাদি 'টোন্'-বিশিষ্ট দাগেরো-টাইপ ছবি সৃষ্টির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৩৯-এর শেষ ভাগে তিনি এ-বিষয়ে এক বা একাধিক নিবন্ধও রচনা করেন। এই লেখাগুলি গোটিঙ্গেনের অগাস্ট ফ্রেডারিক কার্ল হিম্‌লির (August Frederich Karl Himly) নজরে আসে এবং এ-বিষয়ে তাঁর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৪০-এর ২৮ফেব্রুয়ারির 'হান্নোভারিশে ৎসাইটুঙ'-এর ৫১ নং সংখ্যায়। ও'শনেসির মূল রচনাগুলির সন্ধান মেলে নি আজও। ডক্টর জি. টমাস প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।

মহিলা ফোটোগ্রাফার—'জেনানা ষ্টুডিও', সরোজিনী ঘোষ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

পাল্কি পাঠানো হয়েছিল আগেই। ঘোড়ার গাড়ি এসে থামতেই বেয়ারারা পাল্কি কাঁধে তুলে নিল। ঘোড়ার গাড়ির দরজার মুখের সামনে নিয়ে আসা হল

পাল্কি। দু'ধারে মোটা কাপড়ের পর্দা ধরে কয়েকজন আড়াল করল। বধূমাতা সবার অলক্ষে গাড়ি বদল করলেন। দেউড়ি পেরিয়ে পাল্কি বেয়ারারা তাঁকে নিয়ে এল ভিতর বাড়িতে। অন্দর মহলে। এবার সহচরীরা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল স্টুডিও-য়। সুদৃশ্য 'সিন'-এর সামনে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন তিনি। ক্যামেরা তৈরি করাই ছিল। ফোটগ্রাফারের নির্দেশ অনুসারে তাঁর কিশোরী কন্যা ক্যামেরার লেন্স খুলল, ছবি ওঠার সময়টুকু হাত নাড়িয়ে কাটিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ ক'রে দিল। সহচরীরা আবার পর্দা তুলে সম্ভ্রান্ত-বংশীয়কে আড়াল করলেন। ফোটগ্রাফার এসে প্লেট বদল ক'রে দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয়বার ছবি তোলা হল।

বোঝা যায় পর্দানশীন অন্তঃপুরিকাদের ছবি তোলার এই অসুবিধা দূর করতেই মহিলা ফোটগ্রাফারদের প্রয়োজন হয়েছিল।

ভারতের পেশাদার মহিলা ফোটগ্রাফারদের মধ্যে সম্ভবত মিসেস ই. মায়ার-ই (Mayer) প্রাচীনতমা। ভারতীয় মহিলাদের নিঃসংকোচে ছবি তোলার সুবিধা দিতে ৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে একটি স্টুডিও খুলেছিলেন। তবে তিনি রক্ষণশীলাদের কতটা আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন জানা যায় না। সম্ভবত খুব একটা নয়, কারণ সেটা ১৮৩৮। তবে ফোটগ্রাফার হিসাবে মায়ার-এর কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে ১৮৬৪-র 'জার্নাল অফ বেঙ্গল ফোটগ্রাফিক সোসাইটি'-র ডিসেম্বর সংখ্যায়। এই বছরের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর একটি পোর্ট্রেট ফোটগ্রাফ স্থান পেয়েছিল।

সোসাইটি-র এই জার্নালেই মিসেস মায়ার-এর আগেই আরেক বিদেশিনীর নাম পাওয়া যায়। ১৮৬৩-র এপ্রিল সংখ্যায় সদস্যদের তালিকার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম – মিসেস ইম্পে। তবে মনে রাখা দরকার ফোটগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য বলেই তিনি ফোটগ্রাফি চর্চা করতেন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

মিসেস মায়ার-এর পরেই যাঁর কথা জানা যায় তিনি সম্ভবত চিত্রকর, ফোটগ্রাফার ডি. গ্যারিকের পত্নী। গ্যারিকের কথা মধুসূদনের ফোটগ্রাফ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। ১৮৭৭-এ মিসেস গ্যারিক তাঁর 'জেনানা' স্টুডিও খোলেন ওয়াটারলু স্ট্রিটে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরেই মিসেস উইন্স-এর আগমন। তিনি কিন্তু ভারতীয় মহিলাদের প্রত্যাশায় দোকান খুলেই নিশ্চিন্ত হন নি। সরাসরি হানা দিয়েছিলেন অন্তঃপুরে। শুধু ছবি তোলাই নয়, বাঙালি মেয়েদের ছবি তোলা শেখাবার জন্যেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করেছিল।

১৮৮৫-র এপ্রিল সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁর পরিচয় দিয়ে লেখা হচ্ছে : 'বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ফটোগ্রাফী অর্থাৎ ছবি তোলা শিক্ষা দিবার একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে। বিবী উইন্‌স অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার

করিয়া অতি সুন্দর নূতন প্রণালীতে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অন্তঃপুরে গিয়া অথবা কলিকাতা বা মফঃস্বলের স্থান বিশেষে শ্রেণী খুলিয়া ইহা মহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। শিক্ষার্থে ব্যয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত কথা হইলে ঠিক হইতে পারিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে এ বিদ্যার অত্যন্ত আদর, আমাদিগের মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিস এক জন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। এ দেশে শিখাইবার উপায় না থাকাতে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে বঞ্চিত। যে সকল মহিলার সময়, অর্থ ও শিখিবার ইচ্ছা আছে, আমরা আশা করি, তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন না।' (পৃ ৩৬৬)।

উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটিও এখানে উদ্ধৃত করছি :

PHOTOGRAPHY

Mrs. Wince, practical photographer is prepared to give lessons in the art of photography to ladies and gentlemen at their own houses, or to conduct classes either in town or mofussils. Portraits taken at ladies' own houses. Terms on application to Mrs. Wince, care of Messrs W. Newman & Co. 4 Dalhousie Square.

১৮৮৬ অবধি নিয়মিত ব্যবধানে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার পরের খবর সংগ্রহ করা বা উইন্স এর একটি ছাত্রীরও নাম জানা যায় নি।

১৮৮৭-তে ওয়াটারলু স্ট্রিটের ওয়েস্টফিল্ড অ্যাণ্ড কোম্পানিতে মিসেস অ্যালান নামে এক ফোটগ্রাফার কাজ করতেন বলে জানা যায়।

'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফোটগ্রাফি'-র ১৮৮৬-র জুন সংখ্যায় দেখা যায় এই পত্রিকার গ্রাহক মাত্র ছাব্বিশ জন। তার মধ্যে চার জন মহিলা—C. Von Bibra, Mrs. Seramore, Mrs. Lord ও Mrs. Mitchell. ১৯১০-এর থ্যাকার্স ডাইরেক্টরিতে মিসেস ভন বিব্‌রা-র উল্লেখ রয়েছে। তিনি তখন ২-৫ চৌরঙ্গী রোডের হপ সিং অ্যাণ্ড কোম্পানিতে ফোটগ্রাফার। আরো একজন মহিলা ফোটগ্রাফার ছিল হপ সিং-এর দোকানে—মিস নিকেল্‌স।

১৭ রাধাবাজার স্ট্রিটের Mitter & Co-ই প্রথম বাঙালি প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৮৯৭-তে মহিলা ফোটগ্রাফার নিযুক্ত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম পেশাদারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং স্বয়ং স্টুডিও খুলেছিলেন সরোজিনী ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের একই নামধারী বোন ও ইনি অভিন্ন কি না জানতে পারি নি।

১৮৯৯-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকায় সরোজিনী ঘোষের 'মহিলা আর্ট

স্টুডিও'-র এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :

THE MAHILA ART STUDIO
AND
PHOTOGRAPHIC STORE
32 Cornwallis Street, Calcutta

A thoroughly secluded studio for ladies under Sreemuttee Sarojini Ghosh. She is, says the Patrika, a Hindu lady artist of great admire, she has executed for us some orders, and the way these have been finished leave no doubt as to her efficiency and ability as a photographer. One's interest is the more enhanced when her excellent work is taken into consideration. Sreemutee Sarojini deserves encouragement and patronage at the hands of her countymen....

Bromide enlargements, platinotypes, photographs on silks, etc are executed in effective style and at moderate rates.

Photographic chemicals whoesale and retail. Best quality guaranteed. Best value warranted.

উনবিংশ শতাব্দীতে ঠাকুর বাড়ির মহিলাদের মধ্যে একজনই ফোটগ্রাফি-চর্চা করেছিলেন বলে জানা যায়। এইটুকু বললেই পাঠকের পক্ষে অনুমান করতে নিশ্চয় অসুবিধা হবে না যে তিনি জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্জনে স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের স্বপ্নের রূপকার তিনি। কিন্তু ছোট একটি চিঠির দু'টি ছত্র বিনা ফোটগ্রাফার জ্ঞানদানন্দিনী পুরোপুরি হারিয়েই যেতেন। চিঠিটি লিখেছিলেন ইন্দিরা দেবী আরেক মহিলা ফোটগ্রাফারকে। জীবন-সায়াহ্নে ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর একটি ফোটো তুলেছিলেন দেবলীনা সেনরায়। তাঁর পরিচয় পরে আলোচিত হবে। দেবলীনা দেবীর তোলা ছবি পেয়ে খুশি হয়ে চিঠি লিখেছিলেন তিনি, আধুনিকার কৃতিত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল বহুকাল পূর্বে তাঁর মায়ের অনুরূপ ভূমিকার কথা। স্মৃতির এমনই লীলা, জ্ঞানদানন্দিনীর ফোটগ্রাফি-চর্চার কথা ইন্দিরা দেবীরও অন্য কোনো রচনাতেই উল্লিখিত হয় নি। ১৯৪৬-এর ১৮ মার্চ দিনাংকিত ইন্দিরা দেবীর চিঠিটি উদ্ধৃত করছি :

কল্যাণীয়াসু, পুনশ্চ, পাঃ নি : ১৮ই

এই মাত্র তোমার চিঠি ও প্রেরিত ছবি পেয়ে পত্রপাঠ প্রাপ্তি স্বীকার করছি। তোমার আগেই হাসি-রা এক প্রস্থ পাঠিয়ে দিয়েছে, সুতরাং আমরা দ্বিগুণ

লাভবান হয়েছি। তোমার পাঠাতে বিলম্বের জন্য কোন ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। বরং এই বুড়োবুড়ির ছবি কষ্ট করে তুলেছ সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রাপ্য। দুঃখ শুধু এই রইল যে তোমার ক্ষমতার উপযুক্ত পাত্র (অন্ততঃ পাত্রী!) তুমি পাও নি; আর কয়েক বৎসর আগে এ কাজ করলে বেশি সুফল পেতে পারতে। তবু ওঁর এই বয়সের একটা ছবি রইল, সে জন্য কৃতজ্ঞ। মেলার সময় তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার মধ্যে না হলে অন্ততঃ বেশভূষার আর একটু সৌষ্ঠব হতে পারত। এখন আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি সব দিক থেকে। তারই মধ্যে ছবিটা ভালই হয়েছে বলতে হবে।

আমার মা প্রায় শতাবধি বৎসর আগে বোর্ন শেপার্ডের কাছে ছবি তুলতে শিখে বাড়ির এমন সব লোকের ছবি তুলেছিলেন যাদের অন্য কোন ছবি নেই বা হবারও সম্ভাবনা ছিল না।

এখন সব শিল্প ও প্রায় সব কর্ম্মের দ্বারই মেয়েদের পক্ষে অবারিত। নতুন যুগের নতুন পথে তোমাদের জয় হোক্ এই আশীর্ব্বাদ।

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

ইন্দিরা দেবীর চিঠি পড়ে মনে হয় জ্ঞানদানন্দিনী নিশ্চয় ঠাকুরবাড়ির প্রাচীনাদের ফোটগ্রাফ তুলেছিলেন। সারদা দেবী ও প্রফুল্লময়ী দেবীর ছবি দু'টি তাঁর তোলা হতে পারে। বিষয়টি আরো অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

বাঙালি দোকানে কর্মরতা আরেক জন মহিলা ফোটগ্রাফার Miss S. Ballah। ৩৩৭ নং আপার চিৎপুর রোডের বি. দত্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স-এ তিনি কাজ করতেন। পদবী দেখে অনুমান করা যায় ইনি ভারতীয়। (ড্র. থ্যাকার্স ডাইরেক্টরি, ১৯০৬)।

মিসেস উইল্স-এর পরে বাঙালি মেয়েদের ফোটগ্রাফি শিক্ষাদানে উদ্যোগী হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'নারী শিল্প শিক্ষালয়'। ৮৩ মানিকতলা ষ্ট্রিটে ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসেই এটি স্থাপিত হয় ১৯১৬-তে। সদ্য জাপান প্রত্যাগত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁর পত্নী মনোরমা দেবী ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক, সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ধনরক্ষক সত্যসুন্দর দেব (বেঙ্গল পটারির প্রতিষ্ঠাতা)। ১৮৩৭ শকাব্দের ১৬ই আষাঢ় সংখ্যা 'বামাবোধিনী' অনুসারে এখানে টাইপরাইটিং, ঘড়ি মেরামতি, ক্রেট ওয়ার্কস ও ফোটগ্রাফি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

কলকাতার মহিলা ফোটগ্রাফারদের মধ্যে সবচেয়ে সুখ্যাত এডনা লয়েড। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সুদীর্ঘকাল তিনি এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৮-র ডাইরেক্টরি অনুসারে তাঁর স্টুডিও ছিল ৫৪ নং ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটে। পরে এটি ৪০ নম্বর পার্ক ষ্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

আলোচ্য সময়-সীমার বাইরে হলেও দ্বিতীয় বাঙালি পেশাদার মহিলা ফোটগ্রাফার হিসাবে স্মরণীয়া, ১৯৩২-এর থ্যাকারের ডাইরেক্টরির ফোটগ্রাফারদের

তালিকায় এতজন সরেজের একমাত্র মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী ৫ নম্বর বিবি রোজিও লেনের চঞ্চলাবালা দাসী। বৌবাজার সন্নিহিত কলেজ স্ট্রিটের ছানাপটির গা ঘিঁষে এই ছোট্ট গলিটি পশ্চিম মুখে প্রসারিত হয়ে তারপর বাঁক নিয়েছে উত্তর দিকে। গোটা দশেক বাড়ি—তাও সব ক'টি ঠিক বাড়িও নয়, একটি ক'রে প্রাঙ্গণে একাধিক কোঠার সমষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে এখানে আংশিক ভাবে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। নেই শুধু শীলেদের বিরাট একটি আস্তাবল। 'হাড়কাটা'র (প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের) বিপরীতে এই রাস্তাটি এখনো তথাকথিত নিষিদ্ধ পল্লীরূপে পরিচিত। এই পরিবেশে চঞ্চলাবালার স্টুডিও-য় তাই গৃহস্থবাড়ির মেয়ে-বৌয়েদের কতটা পদার্পণ ঘটেছিল বলা শক্ত। কিংবা চঞ্চলাবালা তাঁদের প্রত্যাশী ছিলেন কিনা তাও জানা নেই। জীবিকার প্রয়োজনে এই পল্লীর বাসিন্দাদের ছবি তোলাতে হয়। কিন্তু নিজেদের উপভোগের জন্যও তাঁরা নিশ্চয় ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সম্ভবত সামাজিক শাসনের বাইরে এই বাঙালি মহিলারাই প্রথম ফোটগ্রাফে ধরা দেন। অনেকের মুখেই শুনেছি, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও সিনেমার প্রাচীন অভিনেত্রীদের অনেকের বাড়ির দেওয়ালে ঝুলত বিরাট ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্টে 'বাবু'র সঙ্গে তাঁদের ছবি। সম্ভবত 'সিগাল ডকুমেণ্ট' হিসাবেও এই ফোটগ্রাফের মূল্য ছিল। সে-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করা গেলে সামাজিক ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় লেখা হতে পারে।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে ফোটগ্রাফার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন দুইবোন—মনোবীণা ও দেবলীনা সেনরায়। তাঁদের তোলা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হতো ইলাসট্রেটেড উইকলি-তে। ১৯৫১-তে প্রকাশিত 'টোয়েন্টি ফাইভ পোর্ট্রেটস অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর'-এ অন্তর্ভুক্ত একমাত্র মহিলা ফোটগ্রাফার মনোবীণা দেবী। তাঁর আর এক পরিচয়, তিনি প্রয়াত চিত্র-পরিচালক বিমল রায়ের স্ত্রী। ১৯৩৯-এ পুরীতে তিনি এই ছবিটি তুলেছিলেন। দেবলীনা দেবী (মজুমদার) বর্তমানে ফোটগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর সভানেত্রী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। শৈশব থেকেই পিতার কাছে তাঁদের ফোটগ্রাফিতে হাতেখড়ি। পিতা বিনোদ (বিহারী) বাবুও অ্যামেচার ফোটগ্রাফার রূপে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

২

সোসাইটি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল : বোম্বাইয়ে ভারতের প্রথম ফোটগ্রাফিক সোসাইটি স্থাপিত হবার দু'বছর পরে ১৮৫৬-র ৭ জানুয়ারি কলকাতায় স্থাপিত হয় 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'। তখন প্রত্যেক মাসে বুধবার সমিতির বৈঠক বসত এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে। নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি (১৮৫৬)-তে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল, ফোটগ্রাফির প্রচলন ঘটাবার জন্য ১. প্রতি বছর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা, ২. একটি ফোটগ্রাফিক গ্যালারি স্থাপন ক'রে সদস্যদের তাঁদের ছবি বিক্রি করার সুযোগ দেওয়া, ৩. সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে ও উৎসাহীদের জন্য নামমাত্র মূল্যে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা ও ৪. অপেশাদার পুরুষ ও মহিলা আলোকচিত্রীদের উৎসাহ দান করার জন্য বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে তাঁদের বিনামূল্যে কয়েকটি ক'রে স্বনির্বাচিত ফোটগ্রাফ উপহার দেওয়া।

সমিতির প্রথম বছরের কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন : প্রেসিডেন্ট – ডক্টর মৌয়ট ; ভাইস প্রেসিডেন্ট – ক্যাপ্টেন সি. বি. ইয়ং ও ক্যাপ্টেন এইচ. জেম্‌স ; মেম্বার – কর্নেল গুডউইন, টি. রাইনেকে. ডক্টর এইচ. হ্যালেউর (Halleur), রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিং ; সেক্রেটারি ও ট্রেজারার – রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

দ্বিতীয় বছরে সামান্য রদবদল দেখা যায়, ডক্টর লাইবেগ (Leibeg) তৃতীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন, কর্নেল গুডউইন-এর নাম বাদ পড়ে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র শুধু কোষাধ্যক্ষ পদে আসীন হন। সেক্রেটারি হিসাবে কারো নাম দেখা যায় না।

শুরুতে সমিতির প্রায় একশো সদস্যের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছিলেন বাঙালি। কিন্তু ১৮৫৭-তে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যাতে প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞান ও কারিগরী চর্চা স্বনির্ভর নয়—রাজনীতির স্থান ও প্রভাব সবার উপরে। ভারতীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার দান নিয়ে সে সময়ে একটি বিল পেশ করা হয়। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' নাম দিয়ে শ্বেতাঙ্গরা তার তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ব্ল্যাক-অ্যাক্ট'-এর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এই 'অপরাধে' একটি 'পার্লামেন্টারি ট্রিক্' ক'রে তাঁকে 'আইনানুগ' ভাবে সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা হয়। বাঙালি সদস্যরা এবং ন্যায়ের পক্ষাবলম্বী কয়েকজন ইংরেজ প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করেন রাজেন্দ্রলালকে পুনর্বহালের জন্য। সে আবেদন খারিজ হয়ে যায়, কারণ সময়মতো আবেদনপত্র টেবিলে রাখা হয় নি। আবেদনকারীরা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' দৈনিক পত্রে তখন খোলা

কলকাতায় জে. এস মিউলাড-গৃহীত ডাগেরোটাইপ-এর প্রতিচ্ছবি

Courtesy : Science Museum, London

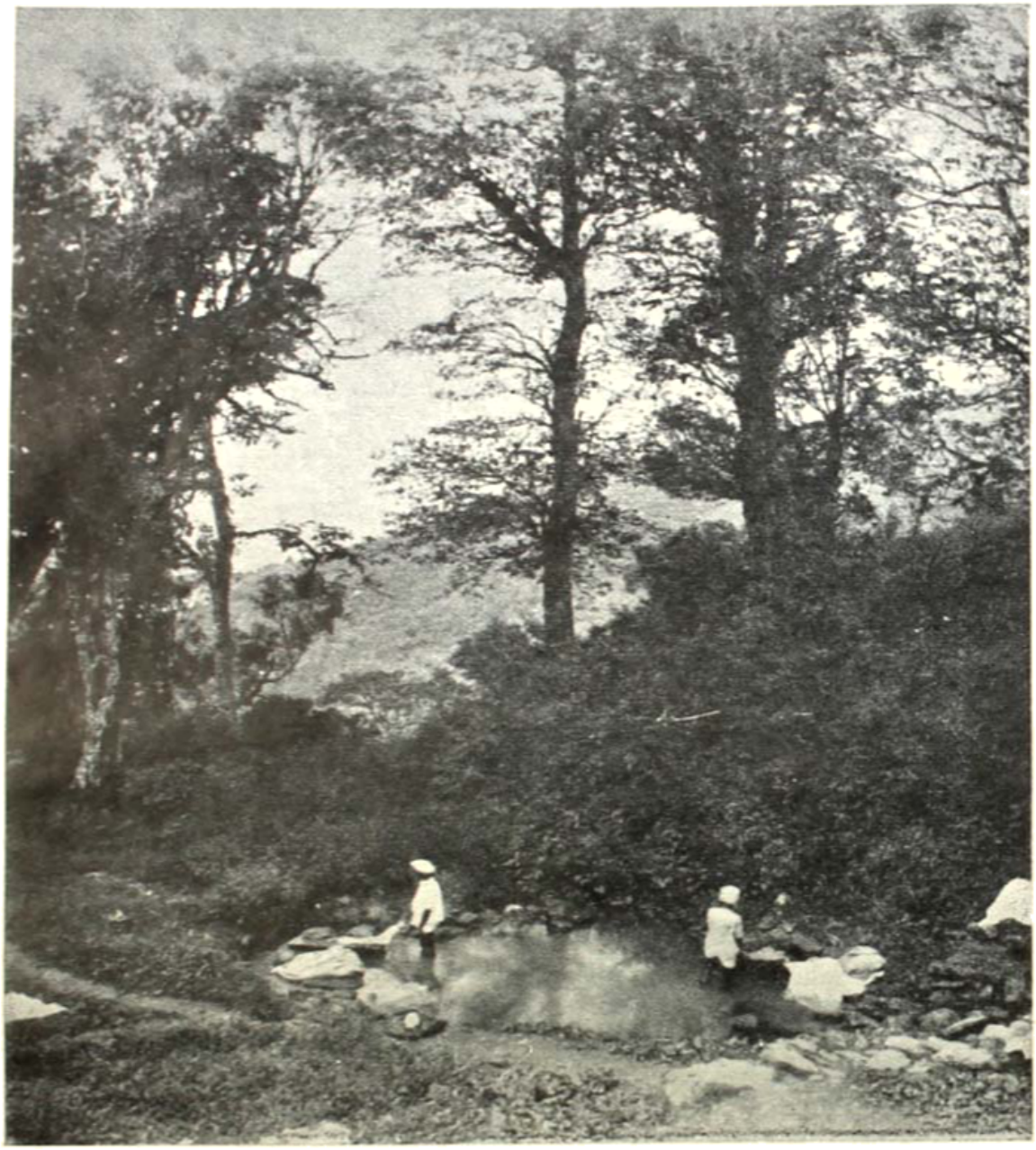

মহারাজা বীরচন্দ্র অথবা সমরেন্দ্রচন্দ্র-গৃহীত ত্রিপুরার নিদর্শ-চিত্র

চিঠি পাঠান (১৮৫৭-র ২৪ সেপ্টেম্বর)। কিন্তু কোনো লাভ হল না। ১৮৬১-র মধ্যে বাঙালি সদস্যরা প্রায় সবাই পদত্যাগ করলেন এবং কয়েকজন ইংরেজও। ১৮৫৭ তে কলকাতার শ'খানেক আলোকচিত্রীর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ জন। ১৮৬০-এ বাঙালি ফোটগ্রাফারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৩০ জনে। কিন্তু ইংরেজ ফোটগ্রাফারের সংখ্যা (শ'ছয়েক) সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি (দ্র. জুডিথ গাটম্যান, পূর্বোক্ত)। কাজেই ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল হয়ে দাঁড়ালো বাঙালিদের সংস্রবহীন।

১৮৫৮-তে এই সমিতি এশিয়াটিক সোসাইটি-কে ত্যাগ ক'রে উঠে আসে ১৫-১৭ নং টাংক স্কোয়ারে (ড্যালহাউসি স্কোয়ারে) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' রাজেন্দ্রলালকে বিতাড়িত করলেও 'এশিয়াটিক সোসাইটি' তার প্রাণপুরুষের সম্মান রক্ষা করেছিলেন, এই স্থানান্তরণ তারই আভাস দেয়। তাছাড়া সমিতির নামটিও পাল্টে 'বেঙ্গল ফোটগ্রাফিক সোসাইটি' করা হয়। অবশ্য ১৮৫৮-তেও সদস্যদের তালিকায় দু'জন বাঙালির নাম পাওয়া যায়। পরানহাটার ডক্টর কানাইলাল (Kunhyeloll Dey) ও পাইকপাড়ার রাজা। প্রথম নাম লেখাবার সময় সদস্যদের ১০ টাকা ও বার্ষিক চাঁদা হিসাবেও ১০ টাকা ক'রে ধার্য হয়। লাইফ মেম্বারদের একশো টাকা। ১৮৬০ থেকে সমিতির অধিবেশন বসত ড্যালহাউসি ইন্সটিটিউট গৃহে। তারপর ১৮৬৩-তে আবার এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হয় সমিতি।

১৮৬০ অবধি সোসাইটির সদস্য-তালিকায় নিম্নলিখিত ভারতীয়দের উল্লেখ দেখেছি —রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ছোটা মিঞা, প্রিয়নাথ শেঠ, কানাইলাল দে, মানোকজী রুস্তমজী, বর্ধমানের মহারাজা, কৃষ্ণনগরের মহারাজা, প্যারীমোহন মুখার্জি, তুলসীদাস দত্ত, কান্‌হাইয়া লাল, জয়পুরের মহারাজা, আবদুল রহমান (রাওয়ালপিণ্ডি) ও মুন্‌শী শিও নারায়ণ (আগ্রা)।

জুডিথ গাটম্যান পূর্বোক্ত বইটিতে ১৮৫০-এর দশকের কলকাতার আরো কয়েকজন ফোটগ্রাফারের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই নামগুলিও সংগৃহীত হয়েছে সোসাইটির জার্নাল থেকে—যার সব ক'টি সংখ্যা দেখার সুযোগ আমার হয় নি—গৌরদাস বসাক, গিরিশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর মিত্র, হরি ওম দত্ত, মাধবচন্দ্র বসাক, পাইকপাড়ার বড় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং, এস্. এন. চৌধুরী, শ্যামাচরণ লাহা ও শ্যামাচরণ মল্লিক।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সোসাইটির সদস্য মাত্রেই ফোটগ্রাফার ছিলেন, এ-ধারণা করলে ভুল হবে। ১৮৬৩-র এপ্রিল সংখ্যা 'জার্নাল অফ বেঙ্গল ফোটগ্রাফিক সোসাইটি'র ২৬ পাতায় স্পষ্ট ঘোষণা করা হচ্ছে : 'of the members of not more than a half have ever taken photographs in their lives.'

কান্‌হাইয়া লাল ও জয়পুরের মহারাজা ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ১৮৬৭-র মধ্যে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না।

ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া : ১৮৭৪ নাগাদ 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' উঠে যায়। তার পর প্রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বভারতীয় চরিত্রের এই সংস্থাটি স্থাপিত হয় ১৮৮১-তে। ১৮৮০-তে এই সংস্থা প্রথম আন্তর্জাতিক ফোটগ্রাফ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং এই বছর থেকেই সংস্থার 'জার্নাল' প্রকাশ শুরু হয়। প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক ফোটগ্রাফ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু মুষ্টিমেয় বাঙালি বা ভারতীয় এই সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

নিউম্যান অ্যাণ্ড কোম্পানির ১৮৯২-এর 'হ্যাণ্ডবুক অফ ক্যালকাটা' অনুসারে সোসাইটির অফিস ছিল ৫৭ নং পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটি গৃহে। বিচারপতি স্যার কুমার পেথেরাম ছিলেন সে বছর সভাপতি।

সোসাইটির পুরনো জার্নালের কপিগুলি নিতান্তই দুর্লভ। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সংগ্রহ থেকে দু'টি বছরের ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আরো দু'টি বছরের পত্রিকা অবলম্বনে সামান্য কিছু ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

১৮৯৮-এর ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রকাশিত ২৭ জানুয়ারির ও ২৬ ফেব্রুয়ারির খবর থেকে জানা যায় সোসাইটি আয়োজিত দশম আন্তর্জাতিক ফোটগ্রাফিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ২৬ জানুয়ারি, ২৮ নম্বর চৌরঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে। প্রবেশমূল্য ছিল খুবই চড়া, মাথা পিছু এক টাকা। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত সাতটা অবধি খোলা থাকত (রবিবার আরো এক ঘণ্টা)। সংবাদে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল জনৈক বাবু তুলসীচরণ দাসের ফোটগ্রাফ 'A Village Scene at Sunset'-এর রৌপ্যপদক লাভ। মহারাজ কুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই পদকটি দান করেছিলেন।

১৯০০-তে সোসাইটির জার্নালের জানুয়ারি সংখ্যা থেকে জানা যায় কার্যকরী সমিতির একমাত্র বাঙালি তথা ভারতীয় সদস্য ছিলেন প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। সোসাইটির তরফ থেকে সদস্যদের জন্য তিন মাস অন্তর একটি ক'রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হতো। ১৮৯৯-তে যৌথ তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন ভারতীয়—H. H. V. K. Ranga Row ও Kumar Raja of Bobbili।

১৯০৯-এর জার্নাল থেকে দেখা যায় সে-বছরের 'স্থাপন'-এ পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন বোবিলির রাজা। প্রদর্শনীতে তাঁর আটটি ছবি স্থান পেয়েছিল। আর মাত্র একজন ভারতীয়ের, এস্. এ. রশিদের 'হিন্দু সেণ্ট লাইফ ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক একটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। জে. ম্যাকেঞ্জি ও ডব্লুই. জে. সাইমন্স-এর ফোটগ্রাফগুলির অধিকাংশই ছিল কলকাতার তোলা। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোবোক্তের 'এ ভ্যানিশ্‌ড ল্যাণ্ডমার্ক—গর্ডন্‌স ফলি'। শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র

এই বাগানবাড়িটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেশ করেছেন তাঁর 'কলিকাতা দর্পণ'-এ। কিন্তু সেটি কবে বিলুপ্ত হয় জানা ছিল না। ১৯০৯-এ প্রদর্শিত এই ফোটোগ্রাফটিতেও বাগানবাড়িটিকে অবলুপ্ত বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু নিশ্চয় তা ফোটগ্রাফির প্রচলনের আগে নয়। কাজেই 'গর্ডন্‌স ফলি' উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকেও বোধহয় টিকে ছিল।

১৯১৪-র জার্নাল থেকে জানা যায় ফোটগ্রাফিক সোসাইটি তখন এশিয়াটিক সোসাইটি গৃহ ছেড়ে ৪০ নম্বর চৌরঙ্গী রোডে স্থানান্তরিত। এই বছরের স্যালন-এ, কি প্রদর্শিত ফোটগ্রাফের সংখ্যায়, কি প্রাপ্ত পুরস্কারের বিচারে একটি নাম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—এ. কে. চৌধুরী। আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র আর্যকুমার চৌধুরী। তিনি 'ফিগার স্টাডি' বিভাগে (A-বিভাগ) 'দা ক্যাপটিভ' (ক্রমিক-সংখ্যা ৯৩-ডি) স্বর্ণপদক ও 'Genre' বিভাগে (সিরিজ B) 'দা সিতার প্লেয়িং' (ক্রমিক-সংখ্যা ৬৮) ফোটগ্রাফটির জন্য ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। তাছাড়া চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৬টি ক'রে চব্বিশটি, অটোক্রোম (কাচের উপর স্বচ্ছ রঙীন ফোটগ্রাফ —কালার ট্যান্সপেরেন্সি) বিভাগে আরো ১২টি এবং চারটি মাল্‌টিপ্‌ল টোন্‌ড ব্রোমাইড প্রিন্টও প্রদর্শিত হয়। আর্যকুমারের কৃতিত্ব অন্যত্র আলোচিত হবে। আর্যকুমার ছাড়া দু'জন ভারতীয়ের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। সিকিমের মহারাজার তোলা দু'টি নিসর্গ-চিত্র, একটি গ্রুপ-চিত্র ও দু'টি অরণ্য-চিত্র এবং এ. এন. মুখার্জির তোলা 'দা রেন ক্লাউড্‌স' ও 'এ নিওকাইট্‌'।

১৯২৪-এ সোসাইটির সদস্য-সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশো, কিন্তু তার তিন বছর পরে অজানা কারণে সোসাইটি আকস্মিকভাবেই বিলুপ্ত হয়েছিল।

দা ক্যালকাটা স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস : বাঙালিদের শিল্প-শিক্ষা দানের জন্য ১৮৫৪-তে স্থাপিত হয় 'সোসাইটি ফর দা প্রোমোশন অফ ইনডাসট্রিয়াল আর্টস'। প্রথম অধিবেশন বসে হজসন প্রাটের বাড়িতে। সিসিল বীডনের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। (দ্র. কলিকাতার ইতিহাস, শরচ্চন্দ্র দেব, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি ১ম খণ্ড, ১২৯৩, পৃ ২৫৫)। এই বছরেরই ৬ এপ্রিল আরেকটি সভার কথা জানিয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' গ্রন্থে। সেদিন সভাপতি ছিলেন কর্নেল গুডউইন আর যুগ্ম-সম্পাদক হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাঙালি সদস্যদের মধ্যে ডঃ সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

এই সমিতির উদ্যোগেই স্থাপিত হয় The Calcutta School of Industial Arts এবং এই বিদ্যালয় থেকেই কালক্রমে জন্ম নেয় বর্তমান গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ। প্রথমে এখানে চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিষয়ক ড্রয়িং, ধাতু তক্ষণ, কাঠ-খোদাই, লিথোগ্রাফি, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপর ১৮৫৮-তে

শুরু হয় 'মুসে ম্যালিয়েট সাহেবের (Malliette Oscar) তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১০টা – ৪টা পর্যন্ত ফোটগ্রাফি শিক্ষা। মাসিক বেতন ১৷৷০ দেড় টাকা।' এই সময়ে 'মেডিকেল কলেজের কাছে পটলডাঙায় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত' (দ্র. শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, পূর্বোক্ত)। তারপর এই স্কুল উঠে আসে বৌবাজার স্ট্রিটে, এখন যেখানে 'বসুমতী'-র কার্যালয়।

১৮৬২-৬৩-র ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ফোটগ্রাফি শিক্ষায় ক্লাসে মাত্র পাঁচজন ছাত্র। অতিরিক্ত বিষয় হিসাবেই তখন ফোটগ্রাফি শিক্ষা দেওয়া হতো।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল: স্কুলের মাধ্যমে নিয়মিতও কার্যকরভাবে বাঙালিরা ফোটগ্রাফি শিক্ষার সুযোগ পায় ১৮৯১-তে। 'আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফী শিক্ষা' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের (১৩২৫) ভূমিকায় মন্মথনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন: '১৮৯১-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্বর্গীয় গঙ্গাধরবাবুর সাহায্যে কলিকাতায় আর্য্য মিশন ইনিষ্টিটিউসনের সংস্রবে একটি শিল্প শিক্ষার বিভাগ খোলা হয়, তাহাতে আলোকচিত্রণ শিক্ষার নিমিত্তও একটী বিশেষ শ্রেণী ছিল। স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, এম. ডি. প্রভৃতি ব্যক্তি সখ করিয়া তাহাতে আলোক চিত্রণ শিক্ষা করিতেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার তখন গ্রন্থের গঙ্গাধরবাবুর সহকারীরূপে তথায় শিক্ষা প্রদান করিত। স্বর্গীয় হেমবাবু, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির উৎসাহে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ [১৩০১] সেই সময়েই প্রচারিত হয়। অনন্তর আর্য্য মিশনের সেই শিল্পবিভাগের লোপ হইলে, ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা হইলে, অন্যান্য চিত্রশিল্পের সহিত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় আলোকচিত্রণ-বিদ্যা প্রচার ও শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম উক্ত বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ শ্রেণী খোলা হয়। স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ফটো শিল্পে সুপণ্ডিত (তখন মহারাজকুমার একণে স্বয়ং মহারাজ) স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন অন্য কোথাও ফটোগ্রাফি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ক্রমে পঞ্জাব পর্যন্ত অধিকাংশ আলোকচিত্রকরই যে এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র বা উপছাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ (১৮৯৩-১৯১৮), চিত্রকর, এনগ্রেভার ও ফোটগ্রাফার 'শিল্প ও সাহিত্য'-পত্রিকার সম্পাদক, মন্মথনাথ চক্রবর্তীর পরিচয় পরে পেশ করা হবে। এখানে তাঁর 'ছায়া-বিজ্ঞান' নামে ফোটগ্রাফি শিক্ষার বইটির শেষাংশে প্রকাশিত ভারতীয় শিল্প-সমিতির একটি বিজ্ঞাপন থেকে কার্য-নির্বাহক সভ্যদের তালিকায় দু'জন ফোটগ্রাফারের নাম পাওয়া যায় – রাজেন্দ্রনাথ সেন ও নগেন্দ্রনাথ সে। এই সমিতির উদ্যোগেই ১৮৯৪-তে ৯২ বৌবাজার স্ট্রিটে স্থাপিত হয়

'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল'।

অ্যালবার্ট টেম্পল অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড স্কুল অফ টেকনিক্যাল আর্টস : প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের সময় স্থাপিত এই শিক্ষালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হাটখোলার বাসিন্দা শিল্পী ও ঔপন্যাসিক গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (চৌধুরী) (১৮৪১-১৯০৯)। গিরীন্দ্রকুমারের আর একটি পরিচয়, বাংলাভাষার প্রথম সচিত্র ব্যঙ্গ পত্রিকা 'বসন্তক'-এর তিনি মুখ্য ইলাস্ট্রেটর। তিনি শিক্ষালয়ের চারুকলা বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। এখানে ফোটগ্রাফি শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু কবে থেকে তা শুরু হয় বা অন্য কোনো বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নি। শিক্ষালয়টির নাম থেকে পরবর্তীকালে 'টেকনিক্যাল' শব্দটি বর্জিত হয়।

জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি : রণদাপ্রসাদ (দাশ) গুপ্ত এই শিল্প শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। ১৮৯৭-তে ৯২-২ বৈঠকখানা রোডে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়ে পালিত হচ্ছিল ভিক্টোরিয়ার ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উৎসব। 'জুবিলি' শব্দটি সেই কারণেই। রণদাপ্রসাদ ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর শশীকুমার হেস-এর বন্ধু। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অতুল বসু, বসন্তকুমার গাঙ্গুলি প্রমুখ সুখ্যাত। ১৯১৮-র থ্যাকার্স ডাইরেক্টরির ফোটগ্রাফারদের তালিকা থেকে জানা যায় জুবিলি অ্যাকাডেমিতে ফোটগ্রাফি ছাড়া পেইন্টিং, মডেলিং, স্কাল্পচারিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হতো। সভাপতি ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, সহ-সভাপতি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ, বি. এল ও সেক্রেটারি ই. এ. স্যাণ্ডার্স এ. আর. এ (ভিয়েনা)। ১৯২৭-এ রণদা-প্রসাদের মৃত্যুর পূর্বে স্কুলটি উঠে যায়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্ট : চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে ফোটগ্রাফকে এক পাতে পরিবেশন করার প্রথম সার্থক উদ্যোগ নিয়েছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্ট। ১৯১৯-এ সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছিল ২৪ বিডন স্ট্রিটে। সংস্থার ত্রৈমাসিক মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২০-র জানুয়ারি মাসে। যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার, অতুল বসু, সতীশ সিংহ, উপেন্দ্রকিশোর রায় ও যোগেশ শীল প্রমুখের চিত্রকলার নিদর্শনের পাশাপাশি আর্যকুমার চৌধুরী, আতা-উল-রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (ডি জি.), পি. জোশি, ধনী রাম, এ. রহমান চুগতাই, অজিত সেন, কে. পালিত, এস. ঘোষাল ও ফোট টেম্পল কোম্পানির তোলা বহু 'শিল্প-গুণান্বিত' ফোটগ্রাফের প্রতিচিত্র ছাপা হয়েছিল এই ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম দু'বছরের ছ'টি সংখ্যায়।

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আর্যকুমার চৌধুরীর 'How to make prints in Bromoil' নিবন্ধে ক্যামেরাকে চারুকলা শিল্পীর বশীভূত করার প্রয়াস অনুধাবন করা যায়। এই রচনার সঙ্গে মুদ্রিত লেখকের ব্রোমঅয়েল চিত্র 'ভিখারি' সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য : '[it] resembles the brush work of an artist.'

বোঝা যায় স্বতন্ত্র একটি শিল্পমাধ্যম রূপে ফোটগ্রাফি তখনো স্বীকৃতি পায় নি, ফোটগ্রাফ হিসাবেই ফোটগ্রাফের শিল্প-সুষমা যাচাই করার সময় আসে নি।

এ-কথা অনেকেরই অজানা যে যামিনী রায় ফোটগ্রাফি-চর্চা করেছিলেন। সম্ভবত তিনি চিত্ররচনার সহায়ক হিসাবেই ক্যামেরা ব্যবহার করতেন। তাঁর তোলা কিছু গ্লাস প্লেট নেগেটিভ রয়েছে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্ট'-এর যুগেই বোধহয় তিনি ফোটগ্রাফের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বাংলায় ফোটগ্রাফি শিক্ষা

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় ১২৯৩ ও ১২৯৪-এ (১৮৮৬-৮৭) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় শরচ্চন্দ্র দেব রচিত প্রবন্ধ 'আলোক-চিত্র অথবা সূর্য্য-রশ্মি সহকারে পদার্থের অনুরূপ চিত্র গ্রহণ প্রকরণ। (বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমন্বিত)—Theory and Practice of THE PHOTOGRAPHIC ART'। বাংলা ভাষায় ফোটগ্রাফি বিদ্যাশিক্ষার এই প্রথম প্রয়াস। লেখক জানিয়েছিলেন: 'এই প্রবন্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে ফটোগ্রাফির বিজ্ঞানাংশ বা হেতু বিজ্ঞান হইতে ইহার শিল্পভাগ বা প্রক্রিয়া প্রণালী নির্দ্দেশ করিব।'

সম্ভবত এর পরে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র 'ফটোগ্রাফি'। ১৩০০ সালে 'জন্মভূমি' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনায় লেখক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ফোটগ্রাফের ভূমিকা আলোচনা করেন। ফোটগ্রাফ শুধু 'দূরকে নিকটবর্ত্তী করে, অতীতকে ভবিষ্যৎ অবধি ধরিয়া রাখে', তাই নয়, চোখের অদেখা অনেক রূপও ফোটগ্রাফে ধরা পড়ে।

বাংলা ভাষায় ফোটগ্রাফি বিষয়ে এই দু'টি আলোচনাই প্রধানত করণ-কৌশল সংক্রান্ত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধের শেষাংশে ফোটগ্রাফির ইতিহাস নিয়ে দ্বিতীয় একটি রচনা প্রকাশের বাসনা ব্যক্ত করলেও সেটি সম্ভবত প্রকাশিত হয় নি।

ফোটগ্রাফি শেখাবার জন্য প্রথম বাংলা বই লেখার কৃতিত্বের দু'জন দাবিদার। আদীশ্বর ঘটকের 'ফটোগ্রাফী শিক্ষা' ও মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর 'আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা'। দু'টি গ্রন্থই ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়।

আদীশ্বর ঘটক: চেতলার ৪নং কালীঘাট তৃতীয় লেনের বাসিন্দা আদীশ্বর ঘটকের (১৮৬৪-১৯২৬) পিতা উকিল কাশীশ্বর ঘটকও কারিগরী চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। ১৮৮৫ নাগাদ তিনি 'ওয়াটার সাইকেল বোট' নামে একটি জলচর সাইকেল উদ্ভাবন করেন। এই জলযানে চড়ে তিনি পদ্মাতেও বিচরণ করেছিলেন। জ্যোতির্ময় ঠাকুর, সাজাহানপুরের রাজা ও বর্ধমানের মহারাজা প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে এই অদ্ভুত কলের নৌকা কিনেছিলেন। (দ্র. ওয়াটার সাইকেল বোট, ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৩)।

আদীশ্বর ঘটকের 'ফটোগ্রাফি শিক্ষা (Elements of Dry Plate Photography in Bengali)' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় লেখকের কাছে ফোটগ্রাফি বিষয়ে শিক্ষালাভে উৎসাহী অনেকেরই আগমন হতো। তাঁদের জন্যই প্রথম তিনি কলম ধরেন। 'তাঁহারা' ইংরাজী জানিতেন না, তথাপি হাতের লেখা বই দেখিয়া সকলে যন্ত্রাদি কিনিতে সাহসী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে এক্ষণে সেই কয়েকজনেই ফটোগ্রাফার হইয়াছেন, এবং ফটোগ্রাফীর ব্যবসা করিতেছেন।' বইটি মেরিয়ান কোম্পানি সংকলিত একটি বই ও ক্যাপ্টেন এব্‌নি, প্রোফেসার বরটন, এইচ. পি. রবিনসন প্রমুখের ফোটগ্রাফি বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন : 'বইখানির ভাষা বড় সাহেবী বাঙ্গলা হইয়াছে। ঔষধ ও যন্ত্রাদির নামগুলি বাঙ্গলা ভাষায় করিতে গেলে ইংরাজী অপেক্ষা দুরূহ হইবে, এই ভয়ে ইংরাজী নামই দিয়াছি···কিনিবার সময় "ড্রাইপ্লেট" বলিলে বিক্রেতাগণ যেরূপ বুঝিবেন, "শুষ্ক পত্র" বলিলে তাহা বুঝিবেন কি না, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ।'

বইটির উৎসর্গপত্র থেকে বোঝা যায় ডাক্তার ক্ষীরোদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোককে ফোটগ্রাফি-চর্চায় ও শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

'টেক্সট বুক' জাতীয় এই গ্রন্থে লেখকের বাঙালিয়ানার পরিচয় বহন করে এইরকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অংশই শুধু আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে, ফোটগ্রাফির অতীত চর্চার আগ্রহীদের তা এখনো আকৃষ্ট করবে। শুধু ফোটগ্রাফি শিক্ষা নয়, বাঙালিদের ক্যামেরা তৈরির কাজেও উৎসাহিত করেছিলেন তিনি।

মন্মথনাথ চক্রবর্তী : ১৩০১ সালে মন্মথনাথের 'আলোক চিত্রণ বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা' প্রকাশের কয়েক মাস পরে ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ফটোগ্রাফি শিক্ষার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছায়া-বিজ্ঞান'। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষরূপে মন্মথনাথ চক্রবর্তীর (১৮৬৬-১৯৩২) নামের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি। মন্মথনাথ প্রণীত ফোটগ্রাফি শিক্ষার বই দু'টি ছিল ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের পাঠ্য। ১৩০৭ বঙ্গাব্দ থেকে মন্মথনাথের সম্পাদনায় 'শিল্প ও সাহিত্য' নামে মাসিকপত্রের প্রকাশ শুরু হয় এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের পুস্তক বিভাগেরও নামকরণ হয় এই পত্রিকার নামে। ফোটগ্রাফি শিক্ষার এই বই দু'টির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল ১৩২৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে। অবশ্য এই সাফল্য গ্রন্থকারের লিপি-কুশলতার প্রমাণ, না ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ফোটগ্রাফি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিচায়ক বলা শক্ত। তবে 'আলোক চিত্রন' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের জন্য অন্তত মন্মথনাথ অগ্রণীর সম্মান লাভ করবেন। তিনিই প্রথম ফোটগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে আমাদের দেশের কথাও ছিল। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' অধ্যায়ে তার একটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সেকালের প্রথামতো মন্মথনাথ ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও ফোটগ্রাফার। ৮ নম্বর শ্রীনাথ দাস লেনে নিজের বাসভবনেই ছিল তাঁর স্টুডিও। ১৩০২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ছায়াবিজ্ঞান'-এর শেষাংশে মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় ক্ষুদ্রতম আকারের (গিনি পোর্ট্রে´ট – ১২" × ১০") একটি অয়েল পেইন্টিঙের জন্য খরিদ্দারকে দিতে হতো কুড়ি টাকা আর, ৮½" × ৬½" মাপের ফোটগ্রাফের দাম পড়ত মাত্র দু'টাকা। অবশ্য স্টুডিওর বাইরে 'আউটডোর' কাজের দর একটু বেশি ছিল। কিন্তু যেখানে ফোটর বেশি কপি অর্ডার হতো – যেমন অফিস ও ক্লাবের অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে গৃহীত চিত্র কিংবা ফুটবল, ক্রিকেট বা বোটিং-এর গ্রুপ ফোটা – দর কমিয়ে দেওয়া হতো।

অবসর গ্রহণের পরে মন্মথনাথ ১৯১৮-তে সংসার ত্যাগ করেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ ক'রে তিনি চুনারে 'আনন্দ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

আনন্দকিশোর ঘোষ : মন্মথনাথ চক্রবর্তীর ও আদীশ্বর ঘটকের ফোটগ্রাফি-শিক্ষার বই দু'টি প্রকাশের কয়েক মাস পরেই ঢাকা থেকে ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয় আনন্দকিশোর ঘোষের 'প্রভাচিত্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা'। ইংরাজি সাব-টাইটেলে লেখক বইটিকে 'হ্যাণ্ড-বুক' আখ্যা দিয়েছিলেন। পূর্ব্বদী, থানা কেরাণী-গঞ্জের (ঢাকা) বাসিন্দা আলোকচিত্রী আনন্দকিশোর ভূমিকায় জানিয়েছিলেন তিনি ফোটগ্রাফির শিক্ষা নিয়েছিলেন রঘুনাথ দাস ও গৌরচন্দ্র রায়ের কাছে। তারপরে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কাছে পাঁচ বছর চাকুরি করেন। ফোটগ্রাফির করণ-কৌশল ছাড়া বইটি থেকে অন্য কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

সৌন্দর্য-চর্চায় ফোটগ্রাফি

চারুশিল্পের রাজ্যে ফোটগ্রাফির স্থান নিয়ে বিতর্কের শুরু ফোটগ্রাফির জন্মলগ্ন থেকে। আলোকচিত্রের আগমনে চিত্রকররা বস্তুজগতের বাহ্যিকরূপের নকলকারীর ভূমিকা ত্যাগ ক'রে 'ইনার বিউটি'-র সন্ধানে নতুন শৈলীর আশ্রয় নিতে বিশেষ মনোযোগী হলেন। আর ফোটগ্রাফাররা যন্ত্রের সীমা স্বীকার করেও 'পিকটোরিয়াল এফেক্ট' আনার প্রয়াস শুরু করলেন। একটি পেইন্টিঙের গুণাগুণ বিচারের রীতিনীতি অনুসারেই আলোকচিত্রের মান নির্ণয় করার ভ্রান্ত চিন্তা অপসারিত হবার পরে তবেই ফোটগ্রাফ স্বতন্ত্র একটি শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পেইন্টিঙের মতো ফোটগ্রাফ তোলার অপার চেষ্টা ত্যাগ করার পরেই আলোকচিত্রকর তাঁর ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন পথ খুঁজে পেয়েছেন।

চিত্রশিল্প বনাম ফোটগ্রাফির প্রাচীন দ্বন্দ্বের কথা বাংলা ভাষায় প্রথম আলোচিত হয় আদীশ্বর ঘটকের 'ফোটগ্রাফি শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই (১৮৯৪):

'চিত্রকর সম্প্রদায় এই শিল্পটীকে আন্তরিক ঘৃণা করেন। তাহার মূল কারণ ফটো-গ্রাফী ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের গৌরব ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। মনুষ্যশিল্প যখন বিশ্ব-নিয়ন্তার সৃষ্ট কোন পদার্থের চিত্র নির্ভুল রূপে করিতে পারে নাই, ফটোগ্রাফী তাহা ধরাইয়া দিয়াছে। এই কারণে রয়াল একোডেমিসিয়ানরা ফটোগ্রাফীকে "স্বাভাবিক" (naturalistic) বলেন, আর আপনাদের শিল্পকে (idealistic) আনুমানিক বলিয়া গৌরব করিতেছেন।'

আলোকচিত্রে সৌন্দর্যচর্চার কোনো অবকাশ আছে মনে করেন নি। অনেক বিষয়ের মতো এখানেও বিজ্ঞানী কারিগর, শিল্পী ও সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরকেই আমাদের পথিকৃতের সম্মান দিতে হবে। ১৩১২ সালের 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর 'ফটোগ্রাফীর চর্চা' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'চিত্রবিদ্যায় যেমন কবিত্ব ও সৌন্দর্যচর্চ্চার অবকাশ থাকে, ইহাতেও সেইরূপ। অবশ্য এ বিষয়টি অতিশয় কঠিন; অনেক যত্ন আর পরিশ্রমে ইহার কিঞ্চিত ফললাভ হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আজকাল অনেককে চেষ্টা করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে এই চেষ্টার ফল তেমন শ্লাঘার বিষয় না হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে অনেক উপকার হইতে পারে। শ্রাবণের "প্রবাসীতে" শ্রীমান সুকুমার রায় চৌধুরী কৃত "প্রবাসী"র ছবি এবং বর্ত্তমান সংখ্যায় অধ্যাপক শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "হর্ষবিষাদ", এই দুটি ছবি দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুদ্রিত হইল। "প্রবাসী"র ছবিখানি প্রবাসীর আবরণের জন্য বিশেষভাবে তোলা হইয়াছিল।'

শুধু সুফলের আশা নয়, দৃঢ় প্রত্যয়ে সাফল্যবার্তা ঘোষণা ও সাফল্যের পথ নির্দেশ করলেন উপেন্দ্রকিশোরেরই পুত্র সুকুমার। তিনিই প্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন সৌন্দর্য-চয়নে আগ্রহী কি ভাবে তাঁর ক্যামেরা যন্ত্রকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। (১৩১৮-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসী-র 'ফোটোগ্রাফি' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

তরুণ সুকুমারের রচনা পড়ে উদ্বুদ্ধ হন প্রবীণ ফোটগ্রাফার ত্রিপুরারাজ্যের এ-ডি-সি কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর। ১৩১৮-র শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তাঁর রচনা 'ফটোগ্রাফি'। দু'মাস আগে সুকুমারের রচনার সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর তোলা ফোটগ্রাফের ব্লক 'প্রভাতের আলো'। মহিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে ছাপা হল 'জল-পথে'। আলোছায়ার রহস্যমাখা বনের গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আঁকাবাঁকা নদীপথে লগি ঠেলে নৌকা চলেছে। সুন্দর কম্পোজিশন।

বাঙালিদের মধ্যে আলোকচিত্রের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে চিন্তার সুবাদে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের সঙ্গে প্রায় এক নিশ্বাসে নাম করার মতো কৃতিত্বের অধিকারী শুধু আর্যকুমার চৌধুরী।

ভারতী পত্রিকার ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ও ১৩২১ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় আর্যকুমারের রচনা 'ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার' ও 'ক্যামেরার দ্বারা বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ'। নিজের অভিজ্ঞতা

থেকে মনের ভাবকে ফোটগ্রাফে ব্যক্ত করার সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'ক্যামেরার দ্বারা এ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা, বড় সহজ নয়, কেন না যন্ত্রটিকে স্বাধীনতা দিলে, স্থূল যাহা সে সহজে ধরিতে পারে, তাহাই প্রচার করে—সূক্ষ্ম ভাব সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না।···যে ফোটোগ্রাফারের সৌন্দর্য্যবোধ আছে, সে কেবল সেই নিরুপম মুহূর্ত্তের জন্য, উৎসুক চিত্তে সচেতনভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—সেই অপূর্ব্ব অবসর, যখন বহুর সমাবেশে বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য—জনতার মধ্য হইতে, একটি নিরতিশয় সুন্দর নিমেষ, আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর মধুর হাস্যের মত, তাঁহার নেত্রের সকরুণ দৃষ্টির মত, আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে। আলোকের লীলায়, মেঘের ছায়ায়, কুহেলিকার হাস্যে, দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত, ক্ষণিকের মধ্যে অনন্তকে প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়।'

রচনাটির সঙ্গে আর্যকুমার গৃহীত ফোটগ্রাফ থেকে তিনটি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল—'তুষার অমল বক্ষ যেথা কমল নীরবে খোলে', 'চিত্র-সাধনা' ও 'মালা গাঁথা'। এই বছরেরই মাঘ সংখ্যা ভারতীতে ছাপা হয়েছিল তাঁর ফোট থেকে আরেকটি ছবি—'সন্ধ্যাপ্রদীপ'।

ভারতীতে প্রকাশিত দ্বিতীয় রচনায় আর্যকুমার প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলম্বনে মনের ভাবকে ব্যক্ত করার কাজে ক্যামেরার ভূমিকা আলোচনা করেছেন। 'কবির লেখনী, চিত্রকরের তুলিকার সহিত, আলোকচিত্রকরের ক্ষুদ্র যন্ত্রটি ও তাহার ক্রিয়াকলাপের তুলনা করিতে সাহস হয় না; তবুও বলিব, যাহাদের মনে বিচিত্র ভাব সকার হইয়া থাকে, অথচ কবির মত তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহাদের এ অভাব দূর করিতে ক্যামেরার মত বন্ধু ও সহায় বড় দুর্লভ।···'

এই লেখাটির সঙ্গেও লেখকের তোলা চারটি ফোট-চিত্রের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছিল।

৩

পথিকৃৎ বাঙালি ফোটগ্রাফার ও ষ্টুডিও

দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স ও নীলমাধব দে : একটি বিশাল আকারের ট্রাইসাইকেলে চড়ে এক বৃদ্ধ চলেছেন বৌবাজার স্ট্রিটে। ১৯২০-র কলকাতায় এ-দৃশ্য নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ভালো ক'রে নজর করলেই বোঝা যেত বৃদ্ধের একটি চোখ অন্ধ। পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে এই ভদ্রলোক তিন-চাকার সাইকেল ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য প্রথম দিকে ব্যাপারটা খুব অভিনব কিছু ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক কালে গায়ে খবরের কাগজ কেটে তৈরি করা জামা গলিয়ে ট্রাইসাইকেল বিহার করতেন। নীলমাধব দে-র ট্রাইসাইকেলে চড়ে তাঁর দোকানে আসার কাহিনী প্রথম শুনি ডি. রতন অ্যাণ্ড কোম্পানির চারুচন্দ্র দে-র কাছে। ডি. রতন অর্থাৎ রতনকৃষ্ণ দে র পুত্র অশীতিপর চারুচন্দ্রের জন্ম ১৯০১ নাগাদ। মাত্র আঠার বছর বয়সেই তিনি পিতার হাত ধরে নীলমাধবের 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'-এ পা দিয়েছিলেন শিক্ষানবিশ হিসাবে। রতনকৃষ্ণের ফোটগ্রাফিতে হাতেখড়ি নীলমাধবের কাছে এবং ১৯২০ অবধি তিনি সেখানে কাজ করেন। নিজের বসতবাটি সংলগ্ন ১১ নম্বর হুকিয়া স্ট্রিটে তিনি যখন নিজের দোকান খোলেন, বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্সের তখন অন্তিম লগ্ন। ডি. রতন বর্তমানে প্রাচীনতম বাঙালি ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, যা এখনো টিকে রয়েছে।

নীলমাধব বাবুর কথা বলার মতো মানুষ একজনই এখন জীবিত। নীলমাধবের দৌহিত্র হরিপ্রিয় পাল। মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহগুলির মালিক হরিপ্রিয়-বাবু এখন অবসরজীবন যাপন করছেন আলমবাজারে তাঁর গঙ্গা-সংলগ্ন আশ্রমে।

হরিপ্রিয় বাবুর কাছ থেকেই প্রধানত সংগ্রহ করেছি নীলমাধবের পারিবারিক ও ব্যবসায়িক পরিচয়।

জেলিয়াটোলা স্ট্রিটে আদি বাড়ি ছিল নীলমাধবের। সেখান থেকে উঠে আসেন ১৩/১ সীতানাথ রোডে। কি ক'রে ফোটগ্রাফি বিদ্যা শিক্ষা করলেন সে-কথা জানা যায় না। তিনি বছর দেড়েক নেপালে কাটিয়েছিলেন। নেপালের রাণারা তাঁকে ফোটগ্রাফার নিযুক্ত করেছিলেন। নেপাল থেকে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন ক'রে ফেরার পর তিনি ১৮৬২-তে পত্তন করেন 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'। পরিণত বয়সে তাঁকে ব্যবসায়ে সাহায্য করতেন তাঁর বড় মেয়ে গিরিবালার ছ' পুত্রের মধ্যে সত্যপ্রিয় ও হরিপ্রিয়। গিরিবালার স্বামী ডাক্তার ও প্রখ্যাত সাঁতারু সুরেশচন্দ্র পালের পৈতৃক ভিটে ছিল সিমলা স্ট্রিটে। সত্যপ্রিয়ের দুই সন্তান বিখ্যাত ভাস্কর অনিল পাল ও সুনীল পাল। সত্যপ্রিয় বাবুও ফোটগ্রাফার ছিলেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিহারে (ধানবাদ) ও ওড়িশায়। অনিল বাবুর সৌজন্যে পুরনো গ্লাস প্লেট নেগেটিভ থেকে বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স-এর স্টুডিও-র তোলা নীলমাধব দে-র ছবি সংগ্রহ করা গেছে।

এই প্রথম বাঙালি ফোটগ্রাফিক স্টুডিও প্রতিষ্ঠাতার তোলা অমূল্য ফোটগ্রাফিক নেগেটিভের সম্ভারের কিছুই প্রায় রক্ষা পায় নি। তার একটা কারণ নিশ্চয় নীলমাধবের পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি। রাম-বাগানে ভাড়াবাড়িতে কলেরায় আক্রান্ত নীলমাধব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯২০ নাগাদ। তখন তাঁর বয়স প্রায় বিরাশি। তাঁর মৃত্যুর পরেও কিছুদিন সত্যপ্রিয় ও হরিপ্রিয় ব্যবসার হাল ধরেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি হরিপ্রিয়

চলে এলেন নবাগত সিনেমা ব্যবসায়ের আহ্বানে। সত্যপ্রিয়ও জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশ ছাড়লেন। সেই সময়ে বৌ-বাজার স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিট মোড়ে বর্তমান রূপম সিনেমা সংলগ্ন মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানীর বাড়ির দোতলায় ছিল বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্সের স্টুডিও। ১৯২৮-এ স্টুডিওটি মহেন্দ্র শ্রীমানীর কাছ থেকে কিনে নেন বি. কে. সিন্‌হা। বর্তমানে বাঙালি ফোটগ্রাফারদের সকলেরই তিনি ব্রজদা। ব্রজবাবু দু' তিন বছর বাদে ব্যবসা গুটিয়ে নেবার পর বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্সের অস্তিত্ব পুরো-পুরি লোপ পায়।

By Appointment
to His Highness
The Maharaja of
Hatiswa.

The Bengal Photographers.

No. 19-3, BOW BAZAR STREET
Calcutta.

মাউন্ট বোর্ডের পশ্চাদ্‌পটের প্রতিচ্ছবি

'১০৭নং রাধাবাজার'—এই ঠিকানায় পত্তন হয় 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'-এর। এই স্টুডিওতেই ১৮৮১-র ১০ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণের আগমন হয়। রামকৃষ্ণের ফোট-গ্রাফ প্রসঙ্গে তার স্বতন্ত্র বিবরণ দেওয়া হবে। রাবার-স্ট্যাম্প দিয়ে '১০৭নং রাধা-বাজার' ছাপ মারা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্সের কয়েকটি প্রাচীন মাউন্টেড ফোটগ্রাফ রয়েছে শ্রীমতী পারমিতা বিশ্বনাথনের ও রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়ির পারিবারিক অ্যালবামে ও 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' প্রণেতা রমাপতি দত্ত ওরফে হরীন্দ্রনাথ বাবুর সংগ্রহে। 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' বইটিতে ছাপা ছবিগুলির সঙ্গে হরীন্দ্র-নাথের সংগ্রহের মূল ব্রোমাইডগুলি মিলিয়ে দেখা গেছে নিম্নোক্ত তিনটি 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স-এর তোলা: " 'দুটি প্রাণ' গীতিনাট্যে পক্ষীহন্তে সুন্দরের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ", " 'হরিরাজ' নাটকে অসিনিকাসনোদ্যত হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ" ও " 'হরিরাজ নাটকে' হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ"।

হরীন্দ্রনাথের সংগ্রহের বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স-এর ছবি তিনটির মধ্যে একটিতে শুধু ১০৭ রাধাবাজার—এই ঠিকানা রয়েছে। বাকি দু'টির ঠিকানা ১৯-৩ বৌবাজার

স্ট্রিট। আর. কে. ঘোষ, অপ্টিসিয়ানের দোকানের কাছে পার্শী স্কুলের উল্টোদিকে স্টুডিওটি কবে স্থানান্তরিত হয় জানা যায় নি, তবে থ্যাকার্স-এর ১৯১০-এর গাইড বুকে এই ঠিকানা রয়েছে। ১৯১৮-র গাইড বুকে দেখা যায় স্টুডিওটির ঠিকানা ৭৩-১ বেন্টিংক স্ট্রিট, ওয়েস্টন রোডের মোড়ে। হরিপ্রিয় বাবু জানিয়েছেন, বৌ-বাজারের বাড়িটি ভাঙা হবার সময়ে কিছুদিন বেন্টিংক স্ট্রিট থেকে কাজ চালানো হয়েছিল। স্টুডিওটি শেষবারের মতো স্থানান্তরিত হয় বৌবাজার স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজদের স্টুডিও পরিহারের পক্ষপাতী বাঙালিদের অনেকেই নিশ্চয়ই বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স-এ ছবি তুলিয়েছিলেন। হরিপ্রিয় বাবু বলেছেন, তিনি কাচের নেগেটিভে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটি ফোট অন্তত বেঙ্গল ফোটগ্রাফারে তোলা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের একটি ফোটগ্রাফ (বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্সের মাউন্ট বোর্ড সমেত) সযত্নে রক্ষা করছেন অধ্যাপক অলোক রায়। অমল হোম সম্পাদিত দা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 'টেগোর মেমোরিয়াল স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট'-এর (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) vii- সংখ্যক পাতায় এই ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছিল। চিত্র-পরিচয় থেকে জানা যায় ছবিটি সম্ভবত 'প্রভাত সঙ্গীত' রচনাকালে ১৮৮৩-৮৪ নাগাদ গৃহীত।

মন্মথনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'দা লাইফ অফ গিরিশচন্দ্র ঘোষ' গ্রন্থটিতে শিবচন্দ্র দেব-এর একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। চিত্র পরিচয়ে গ্রন্থকার জানিয়েছেন—'From a photo by The Bengal Photographers'। ডিরোজিও-র ছাত্র, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা, সমাজ-সংস্কারক শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯০-এ। কাজেই ছবিটি বৃদ্ধ বয়সের হলেও ১৮৯০-এর আগেই নিশ্চয় তোলা হয়েছিল।

ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র দেব বর্মন মাণিক্য

বীরচন্দ্রকে ত্রিপুরার বিক্রমাদিত্য আখ্যা দিলেও সত্য গোপন হয়। আধুনিক ত্রিপুরার জন্ম তাঁর হাতে। সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মের সংস্কার সাধনেই তিনি ব্রতী হন নি, তাঁরই উৎসাহে মূল বাংলা ভূখণ্ড থেকে দূরে দুর্গম একটি অঞ্চলে বাংলা ভাষা প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হবার গৌরব লাভ করল। ১৮৬২-তে অগ্রজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি রাজত্ব লাভ করেন। এই সময়েই পুরনো আগরতলা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় বর্তমান আগরতলায়। তখন রাজপ্রাসাদ ছিল বর্তমান উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের সামান্য পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর নামে দিঘিটির উত্তর তীরে। এই রাজপ্রাসাদেই ছিল বীরচন্দ্রের চিত্র, সংগীত ও ফোটগ্রাফি-চর্চার কেন্দ্র।

দাগেরোটাইপ সম্বন্ধে আলোচনাসূত্রে বীরচন্দ্রের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৯৫-এ বীরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই 'প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার'-এর নিবন্ধটি থেকে জানা যায় তৈলচিত্র রচনার কাজের সুবিধার জন্যই মহারাজা প্রথম আকৃষ্ট হন ফোটগ্রাফির দিকে। শোনা যায় মহারাজা নিজে ইংরেজি জানতেন না, তাঁর সচিব হরকান্ত গাঙ্গুলি তাঁকে বিদেশী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ক'রে শোনাতেন। কিন্তু রসায়নবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে তাঁর অসুবিধা হয় নি, এবং তারই দরুণ 'photography though taken up originally as a hand maid, soon took the first place, and though the Raja has not altogether forsaken his first love he is more attached to the later — camera.'

বীরচন্দ্রের আলোকচিত্র-চর্চার অনুরাগের বিবরণ রয়েছে কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা প্রণীত 'দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা' বইটিতে (ভূমিকা : দীনেশচন্দ্র সেন)। মহিম কর্নেলের সঙ্গে রাজপরিবারের সম্বন্ধ দীর্ঘকালের। তাঁর পিতা ছিলেন মহারাজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মী, 'আশ হাজারী' নামক পদধারী। মহারাজা বাহার বছর বয়সে ২২ বছরের তরুণ মহিমচন্দ্রকে তাঁর এ-ডি-সি নিযুক্ত করেন। মহিমচন্দ্রও রাজ-সান্নিধ্যে ফোটগ্রাফি-চর্চায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মহারাজার ফোটগ্রাফিক অ্যাসিস্টেন্ট রূপেও কাজ করতেন তিনি।

মহিমচন্দ্র লিখেছেন : 'রাজভবনে বাগানবাড়ীর কক্ষ যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সুখের আলয় ছিল তাহাতে উপস্থিত হইলাম, ইহাকে ঠিক বৈঠকখানা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বীরচন্দ্রের সর্ববিদ্যার আগার অর্থাৎ এটা ছিল ইংরাজিতে যাহাকে বলে studio — চিত্রবিদ্যা, রাসায়নিক এবং শিল্প-শিক্ষার ও আলোচনার একটি মন্দির।'

মহিমচন্দ্রের স্মৃতিকথায় পলিটিক্যাল এজেন্ট মিস্টার গ্রীয়ারের ছবি তোলার বর্ণনা রয়েছে। স্টুডিও ঘরে মহিমচন্দ্রের ফোকাসিং শেষ হলে রাজা নিজে 'shot' নেন। দু'টি ভঙ্গিমায় ছবি তোলা হয়। তারপর মহারাজার উপস্থিতিতেই ডেভালা-পিং। নেগেটিভ তৈরি হলে মহারাজা '(সেগুলি) দেখিয়া দোষ ও গুণের বিচার করিতে লাগিলেন।'

এই স্টুডিও রাজমহলে 'মানা ঘর' নামেও পরিচিত ছিল। মহিমচন্দ্র লিখছেন : 'এই সময়ে সেক্কার জরুরী কাগজপত্রে মহারাজার নাম স্বাক্ষর করাইয়া বিদায় হইতেন। মহারাজা হয় তখন কোন নূতন ফটো তুলিবার জন্য-স্টুডিও গৃহে প্রবেশ করিতেন বা কোন "অয়েল পেইন্টিং" লইয়া বসিতেন। কোন বিবসনা রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলে দু'চারিটী বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য লোকের গৃহে প্রবেশ নিষেধ হইত। দরবারের ভাষায় বলা হইত, "সাক্ষাৎ মানায় ছবিতে" আছেন অর্থাৎ নিষিদ্ধ ছবি লইয়া আছেন।'

মহিমচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় মহারাজ পরিচারিকা মহিলাদেরও ফোটো তুলতেন।

বীরচন্দ্রের কিছুকালের সভাসদ শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 'প্রদীপ' পত্রিকায় (১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত মহারাজার জীবনকথাতেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে : 'তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি সাধারণ লোকের রুচির হিসাবে অশ্লীলতা-পূর্ণ।...উদার আকাশের ক্রোড়ে শুভ্র সূর্য্যালোকে রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য-শোভনা রমণীর নগ্নসৌন্দর্য্য শিল্প হিসাবে কিরূপ মনোহর ও মহামূল্য, তাহা এ দেশের লোকের এখনো শিখিবার বিষয়।'

বীরচন্দ্রের দরবারে বহু সংগীতজ্ঞের সমাবেশ ঘটেছিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন বসু, ইমামী বাঈজী, চাঁদা বাঈজী ও ভোলানাথ চক্রবর্তী, রবাব-বাদক কাসেমালী খাঁ, পাখোয়াজ ও তবলা-বাদক পঞ্চানন্দ মিত্র (পাঁচু বাবু), পাখোয়াজ-বাদক রাজকুমার বসাক, সেতার ও সুরবীণ বাদক নিশাদ হোসেন, পাখোয়াজ-বাদক কেশবচন্দ্র মিত্র (স্যার রমেশচন্দ্রের ভাই), সেতার-বাদক নবীনচাঁদ গোস্বামী, এসরাজ-বাদক হাইদর খাঁ ও বেহালা-বাদক হরিশচন্দ্র পাগ্‌লা প্রমুখ।

মহিমচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় বীরচন্দ্র গৃহীত পাখোয়াজী পঞ্চানন্দ মিত্রের একটি ফোটগ্রাফ তাঁর সংগ্রহে ছিল। এর থেকে অনুমান করা নিশ্চয় অসংগত নয় যে, অন্যান্য গায়ক বাদকদের ছবি নিশ্চয় তুলেছিলেন বীরচন্দ্র, আজ আর যার সন্ধান পাওয়া যায় না।

মহারাজা শুধু ইনডোর ফোটগ্রাফিতেই উৎসাহী ছিলেন না, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে তাঁর ল্যাণ্ড্‌স্কেপ ফোটো তোলার মজার বিবরণ উদ্ধৃত করছি : 'যখন তিনি পদব্রজে বাহির হইয়া কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তুলিতে যাইতেন, এবং কেমেরা সুসংস্থাপিত ও লক্ষ্য সংযুক্ত করিবার জন্য চঞ্চল চরণে দক্ষিণে বামে বিচরণ করিতেন, তখনো "হুকা-বরদার"কে কৌশলপূর্ণ ক্ষিপ্রগতিতে এমন ভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিদরী হস্তে ঘুরিতে ফিরিতে হইত, যেন উহার নল তাঁহার মুখভ্রষ্ট হইয়া না যায়।'

ভারতীয় আলোকচিত্রের ইতিহাসে বীরচন্দ্রের অবদানের কাহিনী শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ হবে না। ফোটগ্রাফি শিক্ষার বিস্তারেও তিনি অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে তিনি প্রতি বছর একটি ফোটগ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। শুধু রাজকুমাররা ও রাজ-পরিবারের আত্মীয় ও স্বজনরাই তাতে অংশগ্রহণ করতেন না, 'স্বল্প সংখ্যক বিদেশী ও বাঙ্গালীরা ফটো প্রদর্শন করিতেন।' শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আরো জানা যায়, 'যাহাতে রাজকুমারগণ সকলেই ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। একবার মহারাজের একটী কুমার প্রদর্শনীতে ফটো পাঠান

নাই। তাহাতে মহারাজ বিরক্তির সহিত নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন – অনেকে হয়ত মনে করে যে, এই এগ্‌জিবিশানটা আমার ফটো ম্যানিয়া (photo mania) রোগেরই একটা লক্ষণ বিশেষ।'

বীরচন্দ্রের লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু তিনি যে আর্ট ও ফোটগ্রাফ সম্বন্ধে কয়েকটি 'মোনোগ্রাম'-ও রচনা করেছিলেন তার কথা জানা যায় এন. কে. দেববর্মা রচিত 'Birchandra Public Library : Then & Now' প্রবন্ধে (গ্রন্থালোক, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০)। বর্তমানে কিন্তু বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি-তে তার কোনো কপি নেই। ত্রিপুরার রাজপরিবারেই হয়ত এখনো তার সন্ধান মেলার একমাত্র সম্ভাবনা।

মহারাজা বীরচন্দ্র 'অ্যাপোলোনিয়াস' নামেএক ফরাসি ফোটগ্রাফারকে চাকুরিতে নিযুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত এটি তাঁর ছদ্মনাম। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-খ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে লিখছেন : 'a French Artist who gave himself the classic name of Apollonius or Apollonair (or was it the whole hog, Appelles ?) – the same whom the present Mrs * * * had occompanied as wife, though she now flies in the face of the suggestion, protesting she never had been in Tipperah or, for that matter, in East Bengal at all !'

সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র কর্নেল ওয়াটারহাউস, বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড, এফ. ক্যাপ্‌ প্রমুখ ফোটগ্রাফি-চর্চার অনুরাগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও বীরচন্দ্রের পরিচয় ছিল। পরবর্তী কালে এই পরিচয়ের সুবাদেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ক্যাপ্‌ ঢাকা থেকে তাঁর স্টুডিও তুলে দিয়ে কিছুদিন ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। তারপরে স্থাপিত হয় তাঁর কলকাতার স্টুডিও। বীরচন্দ্রের আরেকটি কীর্তি এ-দেশে 'কলোটাইপ' পদ্ধতিতে ছবি ছাপার উদ্যোগ। এ-দেশে হাফটোন ব্লকের তখন সদ্য প্রচলন ঘটছে। কিন্তু হাফটোন ব্লকের সাহায্যে ছাপা ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবির মান বীরচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ত্রিপুরার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা'র একটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশের জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের সঙ্গে ফোটগ্রাফের 'ফুল টোন' প্রতিচ্ছবি ছাপার জন্য তিনি ম্যাকেঞ্জি নামে এক ভদ্রলোককে 'নিজের ব্যয়ে বিলাত পাঠাইয়া তাঁহাকে "কলোটাইপ-প্রসেস্‌" (collotype process) শিখাইয়া তাঁহার দ্বারা বহুমূল্যের কলোটাইপ-মেশিন প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন।' (দ্র. শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)। বীরচন্দ্রের এ-ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। সৌভাগ্যের কথা, বীরচন্দ্রের একটি ফোটগ্রাফের 'কলোটাইপ' প্রিন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে, (সেটির প্রতিচ্ছবি এই রচনার সঙ্গে মুদ্রিত হল)।

শেষবার কলকাতা ভ্রমণের সময়েও তাঁর বিদ্যাচর্চার অনুরাগে ভাঁটা পড়ে নি। তিনি সার্ভে জেনারেল অফিসের প্রসিদ্ধ টার্নার সাহেবের সাহায্যে হাফটোন ব্লক

কার্শিয়াং-এ মহারাজা বীরচন্দ্র-গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ

তরুণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র

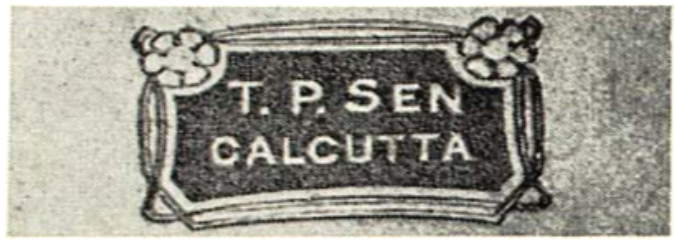

[উপরে] বিভিন্ন ষ্টুডিও-র মাউন্ট বোর্ড থেকে সংগৃহীত নাম-লিপি

[নীচে] এইচ বসুর "অটোক্রোম" প্লেটের বাক্স : ১৯১৩

তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন।' (দ্র· শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)।

বীরচন্দ্রের তোলা ফোটগ্রাফ বর্তমানে নেহাতই দুর্লভ। বীরচন্দ্রের উৎসাহে ত্রিপুরা রাজপরিবারে কৃতী ফোটগ্রাফারের সংখ্যা অল্প নয়। তাই ত্রিপুরার রাজ-পরিবারে বা প্রাচীন বাসিন্দাদের কাছে এখনো বেশ কিছু পুরনো ফোটগ্রাফের মূল প্রিন্ট দেখার সুযোগ মিললেও তার মধ্যে কোনটি কার তোলা জানা যায় না। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু কার্শিয়াং বাস কালে তোলা রবীন্দ্রনাথের দু'টি অতুলনীয় ফোটগ্রাফ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বীরচন্দ্রের মধুর সম্পর্কের কথা সুবিদিত। ১৩০১ ও ১৩০৩ সালে বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ দু'বার কার্শিয়াঙে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে আলোকচিত্র দু'টির প্রতিচ্ছবি রয়েছে। কিন্তু হাফটোন ব্লক থেকে ছাপা এই ছবি মূল আলোকচিত্রের সৌন্দর্য পুরোপুরি হরণ করেছে। এই আলোক-চিত্র দু'টির মূল প্রিন্ট দেখতে হলে আগরতলার প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নির্মাল্য দত্তের শরণ নিতে হবে। শ্রীদত্তের বাবা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এই ছবি দু'টি সংগ্রহ করেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় : 'পুরনো বিশেষ করিয়া মহারাজা বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের সময়ে তোলা কয়েকখানা দুর্লভ ছবি – রাজমাতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর বিশেষ আদেশে কয়েক হাজার ছবির মধ্যে কারিক শ্রমে বাছাই করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।'

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সংগৃহীত আরো কয়েকটি ফোটগ্রাফের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল। নির্মাল্য দত্তের সৌজন্যে ছবিগুলি দেখার সুযোগ হয়েছিল।

১৩০৩ সালে কার্শিয়াং থেকে প্রত্যাগমনের মাস কয়েকের মধ্যেই বীরচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ত্রিপুরার বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মন

ত্রিপুরার মহারাজার বড় ছেলে যুবরাজ অভিষিক্ত হন। তাঁর পরেই সিংহাসনের দাবিদার মহারাণীর মেজ পুত্র – যাঁকে 'বড় ঠাকুর' বলা হয়। বীরচন্দ্রের পরে ত্রিপুরার সিংহাসনে যাঁরা বসেছেন – রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, বীরবিক্রম-কিশোর – এমন কি বর্তমান শ্রীযুক্ত কিরীটবিক্রম – সকলেই দক্ষ ফোটগ্রাফার। কিন্তু সমরেন্দ্রচন্দ্র একেবারেই স্বতন্ত্র। ফোটগ্রাফি-চর্চায় তাঁর মতো নিষ্ঠার, সাফল্যের ও মৌলিকতার পরিচয় বাঙালিকুলে দুর্লভ। ত্রিপুরার দেব-বর্মন বংশীয়দের বাঙালি বললে অনেকে এখনো বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু জাতিগত বংশ-পরিচয়কে যদি অর্জিত সংস্কৃতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে রবীন্দ্রনাথকেও বাঙালিকুল ছাড়তে হবে।

বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা রাধাকিশোরের বৈমাত্রেয় ভাই সমরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম

১৮৬২-তে। পিতার সাহচর্যে ছ'বছর বয়স থেকেই তাঁর ফোটগ্রাফি-চর্চার শুরু। 'প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'প্লেট কলোডিয়নাইজ করার এবং লেন্সের ক্যাপ খোলার শারীরিক ক্ষমতা লাভ করার দিন থেকেই তিনি ফোটগ্রাফ তুলতে শুরু করেন এবং বর্তমানে বত্রিশ বছর বয়সে তিনি ভারতীয় ফোটগ্রাফারকুলে facile princeps.'

ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত ১৮৯৪-এর 'প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার'-এ সমরেন্দ্রচন্দ্র ছাড়া আর মাত্র একজন ভারতীয় ফোটগ্রাফারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হয়েছিল। তিনি ত্রিভাঙ্কুরের মহারাজা।

'প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার'-এর নিবন্ধ থেকে সমরেন্দ্রনাথের ফোটগ্রাফি-চর্চার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আলোকচিত্রী হিসাবে সমরেন্দ্রনাথ সেকালের বিখ্যাত ভক্টর এমারসন ও এইচ. পি. রোবিনসনকে অনুসরণ করতেন।

'ওয়েট প্লেট' নিয়েই কাজ শুরু করেন সমরেন্দ্রচন্দ্র এবং প্রথম পুরস্কৃতও হন 'ওয়েট প্লেট' ফোটগ্রাফের দৌলতে। ফোটগ্রাফিক দুনিয়ার প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের উপর সতর্কদৃষ্টি সমরেন্দ্রনাথ ড্রাই প্লেটের আগমনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেন নি। সেকালের বহু আলোকচিত্রীই কিন্তু প্রথমে ড্রাই প্লেটের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ড্রাই প্লেটের 'হাই স্পিড'-এর কথা স্বীকার করলেও তাঁরা ভ্রান্ত ধারণাবশত মনে করতেন ওয়েট প্লেট ফোটর গুণগত মান বেশি। প্রথমে কলোডিয়ানের ও তার পরে জিলাটিনের ড্রাই প্লেটের আবির্ভাবের কাল থেকেই সমরেন্দ্রনাথ সেগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ফোটগ্রাফ ছাপার কাজেও তিনি সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথমে অ্যালবুমেন-পেপার ও তারপর 'কার্বন' নিয়ে পরীক্ষা সেরে তিনি শেষ অবধি 'প্ল্যাটিনোটাইপ'-কেই বেছে নিয়েছিলেন। 'কার্বন প্রিন্ট' সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, কিন্তু ত্রিপুরার মতো তপ্ত আর্দ্র পরিবেশ 'কার্বন প্রিন্ট'-এর সহায়ক ছিল না।

প্রায় কার্বন প্রিন্টের মতোই দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর ফল পাওয়া যেত 'প্ল্যাটিনো-টাইপ'-এ। কিন্তু সরাসরি ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা সামগ্রী ব্যবহার করেও সমরেন্দ্র দেখলেন ত্রিপুরার আবহাওয়া 'হট্, বাথ প্ল্যাটিনোটাইপ' নিয়ে কাজ করার উপযোগী নয়। তখন তিনি 'Pizzighelli paper' কিনে পরীক্ষা শুরু করলেন। তাতেও আশানুরূপ ফল পেলেন না। ভারতীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে 'কাগজ' কেনা বন্ধ ক'রে নিজের হাতে 'কাগজ' তৈরি শুরু করলেন। 'কাগজ' তৈরি মানে রাসায়নিক প্রলেপ দিয়ে কাগজ-কে আলোকসংবেদী ক'রে নেওয়া। 'প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফার' লিখেছিল : 'To an accomplished chemist like the Prince this of course was not difficult, but it will show the English public what difficulties workers in the far east labour under in preparing their own materials. The Bara Thakoor prepares

his own materials according to Captain Pizzighelli's published formulae, and the prints are infinitely superior to anything that can be produced on imported paper.'

এই নিবন্ধটিতেই বলা হয়েছিল, সমরেন্দ্রচন্দ্র নিজের তৈরি 'কাগজে'-র ফোট প্রদর্শন ক'রে কলকাতায় পাঁচটি ও ইংলণ্ডে চারটি মেডেল লাভ করেন। ইংলণ্ডে তিনি একবার মাত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েই মেডেলগুলি পেয়েছিলেন। ১৮৯০-তে মিউন্যাও ক্যামেরা ক্লাবে তিনি একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক পান। 'স্ট্যানলি সাইক্লিং ক্লাব'-ও তাঁকে অনুরূপ সম্মান দেয়। তারপর থেকে প্র্যাকটিক্যাল ফোটগ্রাফারের উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রকাশকাল অবধি তিনি আর ইংলণ্ডে কোনো ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন নি কিন্তু 'he is preparing a host of good things for the future, and he purposes visiting personally these shores when he intends to carry by storm all awards that may be before him.'

এই নিবন্ধটি থেকেই জানা যায় সমরেন্দ্রচন্দ্র 'ফোটগ্র্যাভিওর' বিদ্যাচর্চাতেও মনোনিবেশ করেছিলেন, যাতে 'রাজমালা' গ্রন্থে ফোটগ্রাফ ও তৈলচিত্রের প্রতিচ্ছবি ছাপা সম্ভব হয়। পিতার মতো সংগীতেও অনুরাগ ছিল তাঁর। আসবাবপত্রের ডিজাইন ও নির্মাণেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ও কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ত্রিপুরার রাজপরিবারের আত্মীয়। তাঁর বাসভবনে সমরেন্দ্রচন্দ্রের একটি প্রায় পূর্ণাবয়ব ফোটগ্রাফে একটি চেয়ার দেখা যায় যেটি গাছের রুক্ষ অমসৃণ ডাল ব্যবহার ক'রে তৈরি। কোনো র‍্যাদার আঁচড় পড়ে নি সেখানে। সম্ভবত এটি সমরেন্দ্রনাথের তৈরি তাঁর স্টুডিওর আসবাব।

সমরেন্দ্রচন্দ্রের জীবনীর সঙ্গে পূর্বোক্ত পত্রিকার তিনপাতা জোড়া তাঁর আলোক-চিত্র কর্মের তিনটি সুন্দর উদাহরণ ছিল। তার মধ্যে প্রথম পাতার পরিচারিকা মহিলাদের দু'টি 'স্টাডি', দ্বিতীয়টি একটি নিসর্গ-দৃশ্য এবং তৃতীয়টি এক কিশোরীর 'পোর্ট্রেট'।

জুডিথ গাটম্যান প্রণীত 'Through Indian Eyes' গ্রন্থে দু'পাতা জুড়ে সমরেন্দ্র-চন্দ্রের একটি সায়ানোটাইপ' (ব্লু-প্রিন্ট) ফোটগ্রাফ ছাপা হয়েছে। রহস্যময় বিশাল এক প্রাসাদ। চিত্র-পরিচয়ে কিন্তু ভুল ক'রে এটিকে ত্রিপুরার নিকটবর্তী পান্না-র রাজ-প্রাসাদ অভিহিত করা হয়েছে। 'পান্না' ছিল মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছোট্ট একটি দেশীয় রাজ্য। পান্নার অধীশ্বর যাদবেন্দ্র সিং বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাঞ্চন-প্রভার সঙ্গে ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমকিশোরের বিবাহ হয়েছিল ১৯৩১-এ। ফোটগ্রাফটি সম্ভবত সেই সময়েই তোলা।

পরিণত বয়সে সমরেন্দ্রচন্দ্রের ফোটগ্রাফি-চর্চা একটি নতুন পথ অবলম্বন করে।

তিনি ক্যামেরার সাহায্যে ত্রিপুরা সমেত ভারতের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক কীর্তির সাক্ষ্যবাহী মন্দির সৌধ ইত্যাদির দৃশ্য-উপাদান সংগ্রহ শুরু করেন। ১৩৩৩ সালে তিনি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন 'ভারতীয় স্মৃতি : কথা ও চিত্র'। তার পরে প্রকাশিত হয়, ত্রিপুরার স্মৃতি (১৩৩৪) ও আগ্রার চিঠি (১৩৩৫)। 'ত্রিপুরার স্মৃতি'-তে বর্ণিত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ লুপ্ত।

এ-ছাড়াও তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সমরেন্দ্রচন্দ্র — 'জেবুন্নিসা বেগম'(১৯২৯), 'বাহাদুর শাহ্, আবু জাফরের কবিতা' (১৯৩০) ও 'ওয়াকয়াতে ত্রিপুরা' (১৯৩২)। তৈলচিত্র রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

কলকাতার ৫৯-১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৫-এর ১৫ আগস্ট।

ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও

হাফটোন ব্লকের পূর্ববর্তী লিথোগ্রাফি-র যুগে গ্রন্থ-চিত্রণে সবচেয়ে যশস্বী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী-র উদ্যোগেই ১৮৫ বউবাজার স্ট্রিটে স্থাপিত হয় এই প্রতিষ্ঠান।

'খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দের এপ্রেল মাসে বাগচী মহাশয় স্বাধীনভাবে দেশীয় চিত্র-বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন করিবার জন্য আর্ট-স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া সুরুচি সম্পন্ন চিত্র প্রচার কার্য্যের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য — একটি আর্ট স্টুডিও স্থাপন।··· খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দে, বাবু ফণিভূষণ সেন প্রভৃতি কয়েকটি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি কলিকাতা-আর্ট-স্টুডিও স্থাপন করিলেন। স্বাধীন ভাবে দেশীয় জনগণের চিত্র বিষয়ক রুচির সংশোধন ঐ উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ স্টুডিও সে সময় হইতে এ পর্যন্ত বাঙ্গালীর গৃহসহায় উপযোগী বহু চিত্র প্রকাশিত করিয়াছে।' এবং ঐ স্টুডিওর অনুকরণে বঙ্গদেশে বহু চিত্রশিল্পশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' (অন্নদা জীবনী, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ১৩১৪, পৃ ৪৯-৫০)।

এই স্টুডিও-র শতবার্ষিক উৎসবে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রদত্ত কমল সরকারের ভাষণের টাইপ-কপি থেকে আরো জানা যায়, নিরক্ষরদের সাক্ষর করতে বাংলা ও ইংরেজি অ্যালফাবেট বোর্ড, হস্তলিপি অনুশীলনের উপযোগী কপিবুক, ক্যালেণ্ডার এবং দেবদেবীর অজস্র রঙীন লিথোগ্রাফ প্রকাশের সঙ্গে এই স্টুডিওতে গ্রন্থ চিত্রিত করার ব্যবস্থাও ছিল।

অন্নদাপ্রসাদের সহযোগী রূপে ফণিভূষণ সেন ছাড়াও নবকুমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচরণ পাল-এর নাম জানা যায়। এঁরা সকলেই ছিলেন সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র।

'অন্নদা-জীবনী' অনুসারে অন্নদাপ্রসাদ 'খ্রী ১৮৮০ অব্দের ২০এ জানুয়ারি, আর্ট স্টুডিওর সমস্ত স্বত্ব সঙ্গীগণকে প্রদান পূর্ব্বক স্থায়ীভাবে কলিকাতা রাজকীয় শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন।' (পৃ ৫১-৫২)।

১৮৮৯-তে নবকুমার তাঁর তিন সহযোগীর কাছ থেকে 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'-র স্বত্ব কিনে নেন। ১৯৩১-এর ২৯ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বনাথ বিশ্বাসের নেতৃত্বে আজ অবধি তাঁর বংশধররা এই স্টুডিওকে সগৌরবে পরিচালিত করে যাচ্ছেন।

১০৭ বছর ধরে ১৮৫ বউবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত এই সৌরবময় স্টুডিও সম্বন্ধে একটি তথ্য কিন্তু 'অন্নদা-জীবনী'-তে নেই। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এখানে ফোটগ্রাফ তোলার ব্যবস্থা ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তোলা সুদৃশ্য নকশাওলা বিদেশী মাউন্ট বোর্ডে সাঁটা এমবস্ ক'রে এই স্টুডিওর নাম লেখা 'ক্যাবিনেট' মাপের বেশ কিছু ফোটগ্রাফ দেখার সুযোগ হয়েছে কলকাতার অনেক প্রাচীন পরিবারের 'স্লিপ-ইন' অ্যালবামে। ১৮৮২-র ৫ আগস্ট 'বেঙ্গলি'-তে প্রকাশিত এই স্টুডিওর বিজ্ঞাপনেও ঘোষিত হয়েছিল : 'Portraits in oil and water colours taken from life or photo.' কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, অন্নদাপ্রসাদ সমেত তাঁর চার সহযোগীর মধ্যে এক বা একাধিক ছিলেন ফোটগ্রাফ-বিদ্যায় পারদর্শী। এই অনুমান আরো সমর্থিত হয়, যখন জানা যায় সরকারী আর্ট স্কুল ও তার পূর্বসূরী 'স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস'-এর ছাত্র রূপে তাঁদের পক্ষে ফোটগ্রাফি-বিদ্যায় শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল।

বর্তমানে অবশ্য ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও আধুনিক একটি অফসেট মুদ্রণালয়, এবং বর্তমান পরিচালকবর্গ স্মরণও করতে পারেন না, ছাপার কাজের অতিরিক্ত ফোটগ্রাফিক স্টুডিওটি কখন লুপ্ত হয়েছিল।

মতিলাল নাগ : ডক্টর কালিদাস নাগের পিতা মতিলালের ফোটগ্রাফি-চর্চার কথা প্রথম জানতে পারি কালিদাস নাগের কন্যা শ্রীমতী পারমিতা বিশ্বনাথনের কাছে। ১৮৯৩-এ কালিদাস নাগের জন্মের বছর চার-পাঁচের মধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। সৌখিন অভিনেতা, ক্ল্যারিওনেট বাদক মতিলালের ফোটগ্রাফিতে দক্ষতার একমাত্র সাক্ষী এখন পারমিতা দেবীর সংগ্রহের কিছু অতি প্রাচীন বিবর্ণ হয়ে আসা 'carte-de-visit' ফোটগ্রাফ গোঁজা অ্যালবামের কয়েকটি পাতা। এগুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে জানা যায়, মতিলালের নিজস্ব কোনো স্টুডিও ছিল না, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্টুডিওর কাজ করেছিলেন তিনি—যেমন, শোয়াৎজচিল্ড অ্যাণ্ড কোং, জে. এইচ. ক্লার্ক, ২১ বৌবাজার স্ট্রিটের এন এন দাস অ্যাণ্ড কোং ইত্যাদি। এই ফোটগ্রাফগুলি মতিলালের তোলা বলে দাবি করার পিছনে প্রধান কারণ, ছবির পাত্র-পাত্রীরা কেউই তাঁদের পরিবারের মানুষ নন। এবং বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য জয়পুরের মহারাজা বিখ্যাত ফোটগ্রাফার সোয়াই রাম সিং-এর দু'টি ফোটগ্রাফ। এগুলি প্রথমোক্ত স্টুডিও দু'টিতে তোলা এবং প্রতিটিই মহারাজা স্বাক্ষরিত। কেশবচন্দ্র সেনের উদাসভাবের যে আবক্ষ ফোটগ্রাফটি সর্বাধিক পরিচিত সেটিও মতিলালের তোলা অনুমান করা যায়। এটি তোলা হয়েছিল এন এন দাস অ্যাণ্ড কোম্পানিতে। মতিলাল নিজের হাতে ফোটগ্রাফটির পিছনে ছবি তোলার তারিখটিও লিখে রেখেছিলেন — ১৫. ৭. ৮৬।

ফোটগ্রাফ থেকে বায়স্কোপ : হীরালাল সেন

মাণিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরী গ্রামে ১৮৬৬-তে হীরালাল সেনের জন্ম। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত প্রথম পেশাদারী ভিত্তিতে ১৮৯৮ থেকে সিনেমা দেখানো শুরু করেন। প্রথমে ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে 'কল্ শো' হতো, তারপর কলকাতার 'মিনার্ভা' ও 'ক্লাসিক' রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সঙ্গেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের দৃশ্য দেখানো শুরু হয় এইচ. এল. সেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স-এর রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানির উদ্যোগে।

১৯০১-এর ৯ ফেব্রুয়ারি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উৎসাহে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত হয় হীরালাল সেনের তোলা ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনীত ভ্রমর, আলিবাবা, হরিরাজ, দোল লীলা, বুদ্ধ, সীতারাম, সরলা প্রভৃতি নাটকের খণ্ডদৃশ্য।

তিনি প্রথম ঐতিহাসিক মূল্যের তথ্যচিত্র, স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় একটি ঘটনার চলচ্চিত্র গ্রহণ করেন। ১৯০৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতের ফেস্টুন হাতে শোভাযাত্রার ও টাউন হলের জনসভার দৃশ্য সংবলিত এই চলচ্চিত্রের কথা জানা যায় এ বছরেরই 'দা বেঙ্গলি' কাগজে ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন থেকে—

JUST READY

GENUINE SWADESHI FILM OF OUR OWN MAKE

THE

ROYAL BIOSCOPE CO.

Props : H. L. Sen & Bros.

PIONEERS AND SPECIALISTS IN THE FIELD OF ANIMATOGRAPHY. EXHIBITORS BEFORE H. E. THE VICEROY AND LIEUTENANT GOVERNORS OF BENGAL. PATRONISED BY THE NOBILITY AND ARISTOCRACY OF THE COUNTRY. AWARDED 4 GOLD MEDALS. SENSATION OF THE DAY.

GRAND PATRIOTIC FILM :
The Anti-Partition Demonstration
and
SWADESHI MOVEMENT
At the Town Hall, Calcutta on the 22nd Sept., 1905.

The great International gathering at the College Square, the mammoth procession of students carrying black flags with patrotic mottos, the magnificent view of the TOWN HALL, the vast concourse of people on the stairs of the great Historic Hall, closing with some of the leaders of the memorable crusade against the dismemberment of Bengal and a series of current appeals to Indians to support the SWADESHI movement BANDE-MATARAM !

Faithfully animatographed by H.L. Sen & Bros.
The only Makers of Bioscope Film Subjects in India.
H. L. Sen & Bros.
Masjid Baree St. Calcutta,
off 151, Cornwallis Street

চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও নির্মাণের আগে থেকেই হীরালাল সেনের ফোটগ্রাফি-চর্চার শুরু। বগজুরীতে দেশের বাড়িতেই তিনি এইচ. এল. সেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স নামে ফোটগ্রাফিক স্টুডিও খুলেছিলেন ১৮৯০ নাগাদ বা তারো আগে। এই স্টুডিওতে তোলা ফোটগ্রাফের বিদেশী মাউন্ট বোর্ডের পিছনে ফুল ও পাখির ছবির সঙ্গে ছাপা থাকত—'Photographed by HIRALAL SEN & BROTHERS, Amarabaty Fine Art Association, Bogjury, Manikganj. 'Blest be the Art that can immortalize the Art that baffles time's tyrannic aim to quench it.'

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে তাঁর মাসতুতো ভাই হীরালালের ফোটগ্রাফি ও সিনেমা-চর্চার প্রসঙ্গে লিখেছেন : '...H. L. Sen & Bros (এইচ. এল. সেন এণ্ড ব্রস) নাম দিয়ে হীরালাল কলিকাতায় ফটোগ্রাফের কারবার খোলে এবং সর্বপ্রথম সে-ই কলিকাতায় বায়স্কোপ আনাইয়া দেখায়।... হীরালালের মত ফটোগ্রাফ তুলিতে খুব অল্প ব্যক্তিই পারিতেন। সে নিজে ফিলিম আনাইয়া বায়স্কোপের দেশীয় কয়েকখানি ছবি উঠাইয়াছিল।...হীরালালের প্রতিভা অনন্য-সাধারণ ছিল, সে ইংলণ্ড ও এমেরিকার ফটোগ্রাফ ও বায়স্কোপ সাহিত্যের যেরূপ চর্চা করিয়াছিল, সেইরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিরল। সে শুধু ফটোগ্রাফি

শিখিবার জন্য ১৪।১৫০০০ টাকা খরচ করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার যে স্টুডিও ছিল তাহা এতদ্দেশে যে কোনো শিল্পীর গৌরবের কারণ হইতে পারিত।'

১৯১৭-তে ক্যান্সার রোগে ইয়ালালের মৃত্যু হয়। শেষ জীবনে ভ্রাতৃবিরোধ ও ব্যবসায়িক বিপত্তির পূর্ণ বিবরণ আছে কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' বইটিতে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আলোকচিত্র

কানাইলাল দত্তের শ্মশানের ছবি। মূল্য দুই পয়সা
Published by Upendra Chandra Bhattacharyya
Printed by K. V. Seynne & Bros.,
Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

—

কানাইলালের ফাঁসি হয় ১৯০৮-এর ১০ নভেম্বর ভোর পাঁচটায়। তার পরের দিনই এই ছবির বিক্রি শুরু হয়। 'যুগান্তর', 'কর্মযোগিন' প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালক বিপ্লবী উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 'আমার এলো-মেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়' বইটিতে লিখেছেন: 'ছবি বাজারে বাহির হইবামাত্র সেইদিনই রাত্রি ১০ টার মধ্যে ৩০০০ কপি বিক্রয় হইয়া গেল। পরদিন ভোর হইতেই ছবি-ছাপা পুনঃ আরম্ভ হইল। হকারদের এত ভীড় হইল যে আমাকে আর ছবি বিক্রয় করিতে হইল না। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ২ ০০০ কপি ছাপা হইল এবং তখনই সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল।··· ছবিখানির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদায়, কলিকাতার বুকে আর একটি আন্দোলনের সূচনা হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া পরদিন বৈকাল হইতেই পুলিশ হকারদের নিকট হইতে ছবি কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের প্রেসে হানা দিয়া যে ৫০০০ কপি ছবি ছাপা ছিল তাহা সমস্তই লইয়া গেল। ছবিগুলির সহিত ফটো ও ব্লকটি লইতে ভুলিল না।'

উপেন্দ্রনাথের লেখা থেকে এই ঐতিহাসিক চিত্রটির ফোটগ্রাফ গ্রহণের বৃত্তান্তও জানা যায়। উপেন্দ্রনাথের দাদা বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন মুদ্রক ক্ষিরোদ-বিহারী সেন। প্রথমে কর্পোরেশন স্ট্রিটে K. V. Seynne & Bros. নামে তাঁর দোকান ছিল। উপেন্দ্রনাথের উৎসাহেই তিনি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে উঠে এসে ফোট-গ্রাফি, হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণের কাজ শুরু করেন। ক্ষিরোদবিহারীর ভাই ফোট-গ্রাফার ধীরেন সেন কেওড়তলা শ্মশানে কানাইলালের এই ফোটগ্রাফটি তুলেছিলেন: '১ই নভেম্বর রাত্রে আমার একেবারেই ঘুম হইল না। সেদিন রাত্রে আমরা রাণী শঙ্করীর লেনে কমলালয়ের মালিকদের বাড়ীতেই ছিলাম। সারারাত্রি জাগিয়া আমরা কানাইয়ের গল্প করিলাম। রাত্রি ৪ ঘটিকার সময়ে আমি রাণী শঙ্করীর লেনের

বিজয় ভট্টাচার্য্য, কমলালয়ের নগেন চক্রবর্ত্তী এবং ফটোগ্রাফার ধীরেন সেন এই চারিজন মিলিয়া আলিপুর জেলের উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়িলাম। ভোর ৪ টার একটু পূর্ব্বে সেখানে পৌছাইলাম। তখন কলকাতায় ফটোগ্রাফারের সংখ্যা খুব কম ছিল, কোন কাগজের তরফ হইতেও কোন ফটোগ্রাফার যায় নাই। কেবল আমরাই ক্যামেরা লইয়া গিয়েছিলাম।' (পৃ ১৪৪-৪৬)।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারের সময় থেকেই স্বদেশী নেতাদের ফোটগ্রাফের মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি বিক্রি শুরু হয়। সেটা শুধু নব-জাগ্রত জাতীয়তাবোধেরই পরিচায়ক নয়, ইতিপূর্বে হাফটোন ব্লকের নির্মাণ কৌশল বাঙালিদের আয়ত্তে আসে নি। ব্যতিক্রম শুধু উপেন্দ্রকিশোর রায়। এবং ইউ রায়-এর তৈরি ব্লক থেকেই প্রথম জাতীয় নেতাদের ছবি ছেপে বিক্রি শুরু করেছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য পূর্বোক্ত বইটিতে লিখেছেন: 'বিপিন পাল মহাশয়ের স্বগ্রামনিবাসী রমেশচন্দ্র চৌধুরী নামক একজন যুবক বিখ্যাত ইউ. রায়ের প্রেস হইতে হাফ্‌টোন ব্লক তৈয়ারী করাইয়া ছবি ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেছেন। তখনও পর্যন্ত হাফ্‌টোন ব্লক তৈয়ারী করিতে বাঙ্গালীর মধ্যে ইউ. রায় ছাড়া আর কেহ জানিত না। তাহার পরে রমেশ বাবু বিজয়া প্রেস নামে একটি ছবি ছাপিবার প্রেস করিলেন। ছবিগুলি তখন হইতে সেই প্রেসেই ছাপা হইতে লাগিল। প্রত্যেকখানি ছবির দাম এক আনা, এক ডজন একত্রে কিনিলে শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাওয়া যাইত।' (পৃ ১৭৩)।

উপেন্দ্রচন্দ্রের বইটি থেকেই অরবিন্দের ছবি ছাপা অভিনব তাস প্রকাশের বিবরণও পাওয়া যায়। বিলিতি তাসের পরিবর্তে রবি বর্মার প্রেসে ছাপা রাজা-রামচন্দ্র, রাণী সীতাদেবী ও গোলাম-হনুমান মার্কা তাসের জনপ্রিয়তা লক্ষ করেই কে. ভি. সেন-এর ছাপাখানা থেকে 'অরবিন্দ প্লেইং কার্ড' মুদ্রিত হয়েছিল। (পৃ ১৪২)।

বাংলা দেশে, হয় তো বা ভারতেও ফোটগ্রাফ-নির্ভর সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে। তখন সংবাদপত্রে ফোটগ্রাফ ছাপার ব্যবস্থা ছিল না। পত্রিকাতেও এ-ধরনের ছবি ছাপলে রাজরোষে পড়ার আশংকা ছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯০৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল ৫" × ৪" মাপের 'অবলম্ব' আকারে আটটি ফোটগ্রাফের মুদ্রিত প্রতিচ্ছবির ছোট্ট একটি অ্যালবাম। এর আগে বাংলা বিবরণ সমেত আর কোনো 'ফোটগ্রাফিক অ্যালবাম' ছেপে বেরিয়েছিল বলে জানা যায় না।

খুব নিরীহ শিরোনাম ছিল পুস্তিকাটির—'চিত্র—রাখি-সংক্রান্তি, ৩০ শে আশ্বিন সোমবার, ১৩১২ সাল।' ভূমিকার বালাই ছিল না। প্রথম পাতাতেই 'বন্দে মাতরম' ঘোষণার নিচে 'রাখি সঙ্গীত' শিরোনামে ছাপা এবং এই উপলক্ষেই রচিত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানের বাণী। পুস্তিকার শেষেও ছিল রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি স্বদেশী গান—'বাণ' (সারি গানের সুর) শিরোনামে

'এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে'। গান দু'টির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের শুধু যে এখানে কোনো নামোল্লেখই নেই তা নয়, পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে 'শ্রী যামিণী প্রকাশ গাঙ্গুলী প্রণীত'। নক্‌শা-ওলা বর্ডার ও শিরোনাম রচনা ছাড়া এই পুস্তিকা প্রণয়নে শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলি আর কি ভূমিকা নিয়েছিলেন বোঝা যায় না। নিশ্চয় ধরপাকড়ের আশংকা থেকেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। মহিলা প্রেসে ছাপা ছয় পয়সা দামের ছবির বইটি বিক্রি করতেন ৫৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ভাণ্ডার অফিসের সি. কে. দত্ত এবং ২৯-২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বন্দে মাতরম এজেন্সি। জি. এন. মুখার্জি অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের তৈরি ব্লক থেকে ছাপা ফোটগ্রাফগুলির অধো-পরিচয় উদ্ধৃত করছি—বন্দে মাতরম-সম্প্রদায়ের রাখি স্নানযাত্রা (২টি ফোট), গঙ্গা তীরে রাখি স্নান (২টি ফোট), স্নানান্তে রাখি বন্ধন উৎসব, মাতৃ মন্দির প্রতি-ষ্ঠার স্থানে যাত্রা, মাতৃ মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানে লোক সমাগম, মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠান্তে জাতীয় ধন ভাণ্ডারে দানার্থে যাত্রা।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে প্রকাশিত ফোট-অ্যালবামের প্রচ্ছদের প্রতিচ্ছবি

ফোটগ্রাফারের নামের কোনো উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায় এগুলি কুন্তলীন-খ্যাত হেমেন্দ্রমোহন বসু গৃহীত। এইচ বোস নামে সুপরিচিত এই উদ্যোগীর জীবন ও কর্মের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে 'এক্ষণ'-এর ১৩৯০ সালের শারদীয় সংখ্যায়। পুনরুক্তি না ঘটিয়ে এখানে শুধু অনুমানের কারণ-টুকু জানাতে চাই। অনেক বিপর্যয়ের পরেও এখনো হেমেন্দ্রমোহনের তোলা বেশ

কিছু গ্লাস প্লেট নেগেটিভ, বিশেষ ক'রে স্টিরিও নেগেটিভ বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর পৌত্র ডাক্তার সুগত বসু। এই ভগ্নাবশেষ হেমেন্দ্রমোহনের ফোটগ্রাফি-চর্চার বিপুল উৎসাহের ও পারদর্শিতার সাক্ষী। এবং এরই মধ্যে রয়েছে ১৯০৫-এর অ্যান্টি-পার্টিশান মিটিঙের ও গঙ্গায় রাখি-স্নান উপলক্ষে তোলা বেশ কিছু স্টিরিওস্কোপিক নেগেটিভ ও স্লাইড। ছোট্ট একটা টেবিলে চড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন সুরেন বাঁড়ুজ্জে। গাছের ডালে বা ভাঙা পাঁচিলের উপরেও লোক চড়েছে। দু'টি ফেস্টুন—একটিতে লেখা 'Bengal shall never be reconciled to partition,' অন্যটিতে 'দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ'। বিভিন্ন কোণ থেকে এই দৃশ্যের বহু ফোটগ্রাফ আছে। আছে ব্রাহ্ম স্কুলের মেরি কার্পেন্টার হলের সামনে ও গঙ্গার ঘাটে তোলা জমায়েতের ছবি। পূর্বোক্ত অ্যালবামে মুদ্রিত ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যায়, এমন নেগেটিভও রয়েছে।

বিপ্লবী আন্দোলনের শহীদদের ফোটগ্রাফের একটা বড় অংশ তোলা হয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশের উদ্যোগে। তার মধ্যে ক্ষুদিরামের কয়েকটি ফোটগ্রাফ তোলার কাহিনী জানা যায় নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত 'শহীদ যুগল' গ্রন্থের ভূমিকায়: '১৯০৮ সনে মজঃফরপুরের বোমার ঘটনার পর স্থানীয় ফটোগ্রাফার স্বর্গগত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দিয়া তৎকালীন কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী এবং নীলকুঠির সাহেব ক্ষুদিরামের বিভিন্ন অবস্থায় ও বোমা বিক্ষত ফিটনগাড়ী ইত্যাদির ফটো তোলাইয়াছিলেন। বিহার ভূমিকম্পে ফটোগ্রাফারের স্টুডিও ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ সকল ফটো ও নেগেটিভ নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীননীগোপাল রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গগত কানাইলাল বাবু ক্ষুদিরামের ফটো আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে জানিয়াও গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ফটোগুলি আর কিছুদিন পরেই নষ্ট হইয়া যাইত। শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টায় এবং ফটোর মালিক শ্রীননীগোপাল রায়চৌধুরীর সৌজন্যে এইগুলি পাইয়াছি।'

এই বইটিতে উল্লিখিত ফিটন গাড়িটি ছাড়াও ক্ষুদিরামের চারটি ফোটগ্রাফ ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে কাঠগড়ায় ক্ষুদিরামের ফোটগ্রাফটি থেকে উপেন্দ্রকিশোরের তৈরি ব্লকের প্রতিচ্ছবি প্রথম ছেপে বের হয় ১৯০৮-এর জুলাই সংখ্যা 'মডার্ন রিভিউ'-এ। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যের তিক্ততাও স্মরণীয়: 'Our readers may be curious to know how a terrorist looks like. Physiognomists may also be interested in his portrait. We therefore reproduce his photograph in the deck.'

১৯০৯-এর মে মাসে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর তরফে তাঁর একটি ফোটগ্রাফ তুলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়। বিভিন্ন উপলক্ষে বিপ্লবী তরুণ অরবিন্দের এই সুপরিচিত ফোটগ্রাফটির প্রতিচ্ছবি আজো ছাপা হয়।

বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে দক্ষ ও পেশাদার ফোটগ্রাফার ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১-১৯৫০) । সম্প্রতি ফোটগ্রাফার সি. গুহ-র জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল যে তিনি মেদিনীপুরে ১৯১৯-এ একটি ফোটগ্রাফিক স্টুডিও স্থাপন করেন। হেমচন্দ্র আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন, চিত্রাংকনকে পেশা-রূপে গ্রহণও করে-ছিলেন কিছুদিনের জন্য। বিখ্যাত ফোটগ্রাফার শম্ভু সাহার ফোটগ্রাফি-শিক্ষা তাঁর কাছে।

১৯০৬-৭ : 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন'-এ বাঙালি ফোটগ্রাফার

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও বিদেশী দ্রব্য বয়কটের যুগে এই প্রদর্শনীটি দেশীয় শিল্পের বিকাশে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পি. জি. হালদাতালের (এস্. এস্. কে. এম) পূর্ব দিকে প্রায় ২২ একর জায়গা জুড়ে এই প্রদর্শনীতে ছিলেন সহস্রাধিক অংশ গ্রহণকারী। চারুশিল্প প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট তিনটি প্যাভিলিয়নের মধ্যে ফোটগ্রাফও স্থান পেয়েছিল। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরার বড় ঠাকুর বাহাদুর, ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ আর্টের অধ্যক্ষ মন্মথনাথ চক্রবর্তী, বিচারক উভ্‌রফ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জনের ফোটগ্রাফি-চর্চার কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত। পাঁচটি স্বর্ণ ও চারটি রৌপ্যপদক বিজেতা ফোটগ্রাফারদের পরিচয় জানা যায় ৫ মুকিয়া স্ট্রিটে থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল এগ্‌জিবিশন, ক্যালকাটা, ১৯০৬-৭' গ্রন্থটি থেকে –

স্বর্ণপদক : ১. কুলদারঞ্জন রায় – ব্রোমাইড পেইন্টিংস ; ২ এস. সি. সেন অ্যাণ্ড সন্স – বার্নট্ ইন ফোট ; ৩. এস. এইচ কনট্র্যাক্টর – পোট্রেট ; ৪. আর্যকুমার চৌধুরী – ল্যাণ্ডস্কেপ ; ৫. বিনোদবিহারী ঘোষ – ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট।

রৌপ্যপদক : ১. বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স – পোর্টেট ; ২. বি. এন. দাস – ল্যাণ্ডস্কেপ ; ৩. হুপ সিং – ২/৫ চৌরঙ্গী – ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট ; ৪. এ. ধর – ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট [চুঁচুড়ার বিখ্যাত অবিনাশ ধর]।

বি. দত্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের তোলা ফোটগ্রাফও প্রদর্শিত হয়েছিল।

আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ক্যামেরা তৈরি করার জন্য এম. ইসাজি অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বর্ণপদক লাভ। 'সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট' বিভাগে জগদীশচন্দ্র বসুর বিচারে ন'জন স্বর্ণপদক বিজেতার মধ্যে এই কোম্পানি ছিলেন চতুর্থ স্থানাধিকারী।

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রথম স্থানের অধিকারী কুলদারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় ভাই। উপেন্দ্রকিশোরের কাছেই তাঁর ফোটগ্রাফিতে হাতেখড়ি। উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন ব্লক নির্মাণে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলে উপেন্দ্রকিশোরের ব্রোমাইড

এনলার্জমেণ্টের পেশাটি কুলদারঞ্জন গ্রহণ করেন। পুরনো 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় প্রায়ই এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হতো :

High-class Oil Paintings
AND
Bromide Enlargements
(Duochrome & Coloured)
K. Ray, Artist
22, Sukea Street.

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কুলদারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গেই থাকতেন। ১০০ গড়পার রোডে বাসকালীন সত্যজিৎ রায়ের শৈশব স্মৃতি-তে উজ্জ্বল হয়ে আছেন কুলদারঞ্জন :

'গড়পারে সবচেয়ে বেশি মনে আছে ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায়কে। উনি থাকতেন একতলায় আমাদের শোবার ঘরের ঠিক নিচের ঘরে। দাদু মুণ্ডু ভাঁজতেন, দাদু মৃত লোকের ছবি এন্‌লার্জ করতেন, দাদু আমাকে পুরাণের গল্প বলতেন, আর দাদু এককালে ক্রিকেট খেলতেন।·· দাদুর পেশা ছিল ছবি এনলার্জ করা। ছোট থেকে বড় করা ছবি ফিনিশ করার কাজটা তাঁর নিজের ঘরেই করতেন তিনি। তেল রঙে ছবি আঁকার জন্য যেমন ইজেল থাকে, তেমনি ইজেলে এনলার্জ করা ছবি খাড়া করে রেখে পা দিয়ে একটা হাপরের মতো জিনিস দাবিয়ে হাতে ধরা এয়ার ব্রাশের সরু মুখ দিয়ে রঙের স্প্রে বার করে ফিনিশ করার কাজ চলত, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বেশিরভাগ ছবিই হত কালচে বা খয়েরি রঙে। কিন্তু একবার মনে আছে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণের ছবি ফিনিশ করছেন রং দিয়ে, গাছপালায় সবুজ, কাশ্মিরী শালের গায়ে লাল। পাশে বসে নতুন মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ দাদুর কাজ দেখছেন এটাও মনে আছে।' (দ্র. যখন ছোট ছিলাম, পৃ ১৪)।

রয়েল ফোটগ্রাফিক সোসাইটির ভারতীয় সদস্য প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ও সুকুমার রায়

রয়েল ফোটগ্রাফিক সোসাইটির (R. P. S.) প্রথম ভারতীয় সদস্য প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের জন্ম ১৮৭৩-এ। ১৮৯৭-এর নভেম্বর মাসে ৫এ, পল্ মল্ ইস্ট-এ R. P. S. -এর মিটিঙে মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর ১৮৯৮-এর মে মাসে তিনি 'ফেলো' মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯৪২-এ R. P. S.-এর জার্নালের নভেম্বর সংখ্যায় তাঁর মৃত্যু-সংবাদে লেখা হয়েছিল :

'বেনারসে গত ২৮ আগস্ট মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর,

কে. সি. আই. ই.-এর মৃত্যুর কথা জানাতে আমরা দুঃখিত বোধ করছি। ১৯০৯ -এ তিনি কলকাতার শেরিফ ছিলেন।

'প্রয়াত মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে. সি. এস. আই-এর এই একমাত্র পুত্রের জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩। ১৮৯৯ থেকে ১৯১১ তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক। কলকাতার তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন।···সরকারী মৎস্য প্রকল্পের সদস্য হিসাবেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।···ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাস্টি ও চেয়ারম্যান, ক্যালকাটা করপোরেশনের কমিশনার (ছ' বছর) এবং মেয়ো হাসপাতালের গভর্নর হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি।

'স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর একজন দক্ষ ফোটগ্রাফার ছিলেন এবং বেশ কিছু বছর আগে সোসাইটির অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।···১৯৩৭-এ তিনি "অনারারি ফেলোশিপ" লাভ করেন।'

প্রদ্যোৎকুমারের তোলা ফোটগ্রাফ আজ নিতান্তই বিরল। জীবনের প্রায় শেষ দিকে ১৯৩৪-এ মরকত কুঞ্জে (Emerald Bower) তিনি শ্রমিক-নেতা ও সমাজ-সংস্কারক অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম, অশ্বিনীকুমারের পৌত্র বর্তমানের খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর বয়সের পোর্ট্রেটটি কি কম্পোজিশনের দিক থেকে, কি আলোছায়ার আয়োজনে – প্রদ্যোৎকুমারের ফোটগ্রাফিক নৈপুণ্যের সাক্ষী। এই ফোটগ্রাফগুলি প্রদ্যোৎকুমারের তোলা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেকদিন হয়ে এলেও ফোটগ্রাফগুলির উপরে প্রত্যেকটিতেই July 1934 – কালিতে লেখা আছে এবং যে-খামটির মধ্যে এগুলি আমি দেখেছি সেটিও প্রদ্যোৎকুমারের নাম এবং ঐ বছরেরই পোস্ট অফিসের ছাপ বহন করছে।

রয়াল ফোটগ্রাফিক সোসাইটির দ্বিতীয় ভারতীয় সদস্য উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়।

১৯১২-র নভেম্বর মাসে তিনি R. P. S.-এর সদস্য নির্বাচিত হন। সুকুমার তখন বাস করছেন লণ্ডনে, ২১ ক্রমওয়েল রোডের ঠিকানায়। এর প্রায় বারো বছর পরে ১৯২২-এ তিনি 'ফেলোশিপ লাভ' করেন।

সিটি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সুকুমারের ফোটগ্রাফি-চর্চার শুরু। পুণ্যলতাদেবী লিখছেন : 'সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে ও মজার ছবি এঁকে বিলাতে "বয়েজ ওন্ পেপার" "চাম্‌স্" প্রভৃতি ছেলেদের কাগজে পাঠাত আর কত পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পেত। আমাদের কত রকমের ছবি দাদা তুলত ; পাড়ার অনেক বৌ মানুষ ছিলেন যাঁদের ফটো তোলবার ভারি সাধ কিন্তু দোকানে গিয়ে ছবি তোলাতে পারেন না, দাদা সকলের ছবি তুলে দিয়েছিল।' (দ্র. ছেলেবেলার দিনগুলি, পৃ ১১৪-১৫)।

'চাম্‌স' কাগজের সম্পাদক ছিলেন স্যার ম্যাক্স পেম্‌বারটন (১৮৬৩-১৯৫০)।

পরে তিনি 'ক্যাস্‌লস' ম্যাগাজিন (১৮৯৯–১৯০৬) সম্পাদনা করতেন।

সুকুমার রায় ১৯০৬ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট তুলেছিলেন। 'স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ' বা এই ধরনের টাইটেল শোভিত হয়ে এই ফোটগ্রাফটির অসংখ্য প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত। নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যের কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের এমন দৃপ্ত মূর্তির ফোটগ্রাফ আর নেই। এই সুপরিচিত ফোটগ্রাফের ফোটগ্রাফারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অমল হোম, তাঁর সম্পাদিত ও রবীন্দ্রনাথের আশিতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট-এর বিশেষ সংখ্যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ফোটগ্রাফি

কলকাতায় ফোটগ্রাফির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠস্থান বলা যায় সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অফিসকে। কলকাতার সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিসের ফোটগ্রাফি বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে ১৮৬৬-তে নিযুক্ত হন মেজর জে. ওয়াটারহাউস (পরবর্তী কালে মেজর-জেনারেল)। ১৮৭৪-এ শুক্রগ্রহের 'ট্র্যান্‌জিট' উপলক্ষে তিনি সোলার ডিস্ক-এর অজস্র ফোটগ্রাফ তুলেছিলেন। এ-কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন মিণ্ট-মাস্টার কর্নেল টেনাণ্ট। টেনাণ্ট ইতিপূর্বে ১৮৭১-এ গ্রহণের সময়ে সূর্যের ছটার ফোটগ্রাফ তুলেছিলেন। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৯ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ওয়াটারহাউস। তিনি এবং টেনাণ্ট দু'জনেই তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংশ্লিষ্ট ফোটগ্রাফি-চর্চার বিবরণ নিয়মিত সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করতেন।

ফোটগ্রাফের সাহায্যে প্রস্তুত কোনো ছবির ব্লক বা লিথো থেকে মুদ্রাযন্ত্রে প্রতিচ্ছবি ছাপার কাজেও ভারতবর্ষে পথিকৃৎ হয়ে আছেন ওয়াটারহাউস। ফোট-জিংকোগ্রাফি, ফোট-লিথোগ্রাফি, কলোটাইপ, অটোটাইপ, উডবেরিটাইপ ইত্যাদি ফোটগ্রাফ-নির্ভর প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেই প্রথম ফোট-মেকানিকাল পদ্ধতিতে ছাপা প্রতিচ্ছবির সন্ধান মেলে। এই প্লেটগুলি সবই সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার যন্ত্রালয়ে ছাপা হয়েছিল।

আজ অবধি ভারতীয়দের মধ্যে একা উপেন্দ্রকিশোরেরই ফোটগ্রাফি-নির্ভর চিত্র মুদ্রণে মৌলিক অবদান রয়েছে। 'হাফটোন-ব্লক'-এর উদ্ভাবক নন তিনি, কিন্তু 'হাফটোন ব্লক' বা স্ক্রিন-নির্ভর যে কোনো 'ফোট-মেকানিকেল' পদ্ধতি সংক্রান্ত ক্যামেরার কাজে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'এক্ষণ'-এর ১৩৯১ সালের শারদীয় সংখ্যায় 'উপেন্দ্রকিশোর

—শিল্পী ও কারিগর' প্রবন্ধটিতে। 'ফোট-মাইক্রোগ্রাফি' বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুর বা প্রাণীর ফোট তোলার কাজেও তাঁর উৎসাহের প্রমাণ রয়েছে পুরনো 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায়।

জগদীশচন্দ্র বসুর আলোকচিত্রের অনুরাগের ও দক্ষতার পরিচয় বহন করছে আচার্য ভবনে তাঁর তোলা কয়েকটি নিসর্গ-দৃশ্যের এনলার্জমেণ্ট। এক্স-রে ফোটগ্রাফির বা 'অদৃশ্য আলোয় ফোটগ্রাফি'র চর্চাতেও তিনি অগ্রণী। চিকিৎসার কাজে কলকাতায় প্রথম 'এক্স-রে' যন্ত্র স্থাপন করেন নীলরতন সরকার।

কালার ফোটগ্রাফ—উপেন্দ্রকিশোর, হেমেন্দ্রমোহন ও আর্যকুমার চৌধুরী

'এক্ষণ'-এর ১৩৯০ ও ১৩৯১-এর শারদীয় সংখ্যায় যথাক্রমে হেমেন্দ্রমোহন বসু ও উপেন্দ্রকিশোরের ফোটগ্রাফি-চর্চার কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে শুধু 'কালার ফোটগ্রাফি'-চর্চার কথাই এখানে বলছি।

উপেন্দ্রকিশোরের তোলা কোনো কালার ফোটগ্রাফের সন্ধান পাওয়া যায় নি, কিন্তু 'কালার ক্যামেরা' তৈরি করার জন্য তিনি চিন্তা করেছিলেন, সে-কথা জানা যায় ১৯১২-র ১৯ ডিসেম্বর তারিখে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে পিতাকে লেখা সুকুমার রায়ের চিঠি থেকে: 'Three colour camera-র যে idea পাঠিয়েছ তার যতরকম possible variation হ'তে পারে বোধহয় সবই patent হ'য়ে গেছে—তার অনেকগুলো Ives এর। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও আছে। তবে, Halftone এতে তার application ব'লে নতুন design claim করা যায় কি না জানি না···।' (এক্ষণ, গ্রীষ্ম ১৩৯০)।

অপেশাদার হেমেন্দ্রমোহনের তোলা বেশ কিছু 'স্টিরিওস্কোপিক ফোটগ্রাফ' ও কয়েকটি 'গ্লাস প্লেট কালার ট্রান্সপেরেন্সি'-র নিদর্শন রক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকচিত্র অধ্যায়েএই স্টিরিওস্কোপ ফোটগ্রাফগুলির কথাই আলোচিত হয়েছে। হেমেন্দ্রমোহন 'অটোক্রোম' নামে পরিচিত (প্রথম সাধারণভাবে ব্যবহারের উপযোগী কাঁচের পাতের উপর স্বচ্ছ রঙীন ছবি তোলার) প্লেটগুলি ব্যবহার করতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য অব্যবহৃত অবস্থায় ১৯১৪-র বেশ কিছু 'অটোক্রোম প্লেট' এখনো রয়েছে ৫২ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে। (প্লেট দ্রষ্টব্য)। ১৯০৭-৮-এ প্রথম এই অটোক্রোম তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে। হেমেন্দ্রমোহনের তোলা তাঁর স্ত্রী-র একটি অটোক্রোম-চিত্র দেখে অনুমান করা যায় ১৯০৮-৯ থেকেই তিনি 'কালার ফোটগ্রাফ' তুলতে শুরু করেন। তাঁর ১৯১২-র ডায়েরিতেও বিভিন্ন আকারের অটোক্রোম প্লেটের দাম নোট করা রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই আরেকজন বাঙালি তর্কাতীত ভাবে 'কালার ফোটগ্রাফি'-চর্চায় এ-দেশের পথিকৃৎদের দলভুক্ত হয়েছিলেন—তিনি আর্যকুমার চৌধুরী।

প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর-গৃহীত পোর্ট্রেট

[সৌজন্য : অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়]

স্টিরিওস্কোপিক ক্যামেরা হাতে এইচ বোস

[আনুমানিক : ১৯১৪]

ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া' ও ফোটগ্রাফির শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর কথা এর আগেও আলোচিত হয়েছে। আশুতোষ চৌধুরী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্যকুমারের জন্ম ১৮৮১ সালে। ইংলণ্ডে তিনি স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং জলরঙে চিত্র রচনা করেও খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু ফোটগ্রাফি-চর্চায় তাঁর সাফল্যের কোনো নিদর্শনই প্রায় রক্ষা পায় নি। 'ভারতী'-র পাতায় ছাপা কয়েকটি ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবির কথা ধরছি না। ১৯১৪-তে ফোটগ্রাফিক সোসাইটিতে প্রদর্শিত আর্যকুমারের ফোটগ্রাফগুলির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেই বছরেরই সোসাইটির জার্নালে। সে বছরের প্রদর্শনীতে কি পুরস্কারের সংখ্যায়, কি প্রদর্শিত ফোটর সংখ্যায় বা বৈচিত্র্যে — আর্যকুমারই শীর্ষস্থানীয়।

কলকাতা ও কলকাতার বাইরের আরো কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিজ্ঞাপন

সস্তায় সোণা ! টাকি গোল্ড !!!

অর্থাৎ মিত্র কোম্পানির কেমিকাল সোণা।

ইহা সিল্টি করা বা অন্য কোনরূপ অস্থায়ী নয়। কখন ইহার রং খারাপ হয় না। ব্যবহারে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়। ইহা অবিকল গিনি সোণার ন্যায়। মূল্য সামান্য। নাম খোদাই সিল আংটী ৩ টাকা। ফটোগ্রাফযুক্ত আংটী ৫৲ টাকা ম্যাজিক আংটী ২৲ টাকা সর্ব্বব্যাধিবিনাশক অষ্টধাতু বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক আংটী ৩৲ টাকা গলার ও হাতের বোতাম এক সেট ৩৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সোণার বালা, অনন্ত, হার, মাথার ফুল ও অন্যান্য সমস্ত গহনা প্রস্তুত হয়। মাপ ও ওজন লিখিলে পাঠান যায়। ফটোগ্রাফযুক্ত আংটী লইতে হইলে গ্রাহককে স্বয়ং আসিতে হইবে, অথবা ফটোগ্রাফ থাকিলে তাহা পাঠাইলেও হইবে। সমস্ত দ্রব্য ভ্যালু পেয়েবল ডাকে পাঠান যায়।

ডি মিত্র এণ্ড কোং।
ন্যাসনাল ফটোগ্রাফার ও জুয়েলার
৬৭ নং মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বিজ্ঞাপনটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো ১৮৮৭-তে বামাবোধিনী পত্রিকায়। কলকাতার অনেক প্রাচীন পরিবারের সংগ্রহে এখনো এ-ধরনের আংটি ও লকেট ফোটগ্রাফ, কি পোর্সিলেনের উপর বা মিনে-করা ফোটগ্রাফ দেখতে পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের কয়েকজন ফোটগ্রাফারের শুধু নামোল্লেখ করেছেন জুডিথ গাটম্যান তাঁর পূর্বোক্ত বইটিতে যাঁদের সম্বন্ধে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি—বি. মল্লিক, ভোলানাথ গোস্বামী, দে বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোং ও নারায়ণ মুখার্জি।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪-তে এলাহাবাদে আগমনের পর ফোটগ্রাফি-চর্চায় মন দিয়েছিলেন। শান্তা দেবী লিখেছেন: 'তিনি যখন প্রথম ফোটোগ্রাফির চর্চা শুরু করেন তখন অশোকই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি কুরিয়ার ব্যাগ স্কন্ধে শিশু অশোকের ছবি তুলিয়া 'প্রবাসী বাঙালী' নামে প্রবাসীতে ছাপাইয়াছিলেন। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বন্ধুদেরও ছবি তুলিতেন। উমেশচন্দ্র ঘোষ [গণিতের অধ্যাপক] এবং চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা প্রেমকুসুম সেনেরও ছবি তুলিয়াছিলেন।... মিস সেন মনোরমা দেবীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উমেশবাবুর বাড়ীতে বোধ হয় dark room ছিল এবং সেইখানে ছবির প্লেট ধুইতে রামানন্দ যাইতেন। এই সময় মনোরমা দেবীর দুইখানা ছবিও তিনি তুলিয়াছিলেন; সে ছবির বিষয় সব কথা তাঁহার বরাবর মনে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'তোমাদের মায়ের যে দুটি ফোটোগ্রাফ আমি তুলেছিলাম, তা এই সাউথ রোডের বাসাতেই তোলা। চুল-খোলা ছবিটি তিনি একদিন স্নান করে কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে তোলা। আমি তখন সবে ফোটোগ্রাফ তুলতে শিখেছি। কতকটা ভাল ফোকাস্ (focus) করবার জন্য, কতকটা বোধহয় মহিলাদের মোগল পদ্ধতির আইভরী মিনিয়েচার্সের অনুকরণে তাঁর হাতে একটি গোলাপ ফুল দিয়েছিলাম। অন্য ছবিটি তুলেছিলাম তিনি যখন রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন—ডালে হলুদ দিবার জন্য হাতে করে হলুদ নিয়ে যাচ্ছিলেন।' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ ৭০-৭১)।

বাংলার বাইরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন বাঙালি ফোটগ্রাফারদের মধ্যে প্রখ্যাত গিরিশচন্দ্র দে-র পিতা সিপাই অভ্যুত্থানের অনেক আগেই কাশীপ্রবাসী হন এবং পাঁড়ে হাউলী ও মদনপুরায় বাড়ি করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-রচিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালি' (উত্তর ভারত) থেকে জানা যায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন 'কাশীনরেশের দেওয়ান'। জুডিথ গাটম্যান গিরিশচন্দ্রকে বেনারসের প্রথম ফোটগ্রাফার আখ্যা দিয়েছেন। ১৮৬০ নাগাদ তাঁর ফোটগ্রাফি-চর্চার শুরু। বেনারসের মহারাজা তাঁর কাজে প্রীত হওয়ার পর রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের ডার্করুম ও কাঁচঘরের স্টুডিও। গাটম্যানের বইটিতে গিরিশচন্দ্রের তোলা দু'টি ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছে। বেনারসের ডব্লু. ও. ঘোষ-এর শুধু নামেরই উল্লেখ করেছেন গাটম্যান, কোনো পরিচয় দেন নি।

এলাহাবাদের প্রথম ভারতীয় পেশাদার ফোটগ্রাফার শ্রীবৎস দেবের কথা জানা যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের পূর্বোক্ত বইটি থেকে। সিপাই অভ্যুত্থানের পূর্বেই কাশীপুর গান্ ফ্যাক্টরি থেকে ফতেগড়ে বদলি হয়ে আসেন ঈশানচন্দ্র দেব ও তাঁর

ভাই। শ্রীবৎস দেব ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রমোহন লিখছেন : 'শ্রীবৎস বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রেভারেণ্ড পেরারী তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ফরাসী ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) শিখাইতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে কলকারখানা সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে যখন দেশীয় ব্যক্তিগণের ভিতর, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নাম মাত্র প্রবেশ করে নাই, এমন সময়ে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। এখন কলকাতায় যেমন বোর্ন শেপার্ডের দোকান, লক্ষ্ণৌতে এ প্রদেশে তখন (Sache) স্যাচের একমাত্র ফটোর দোকান ছিল। শ্রীবৎস বাবুর ফোটোগ্রাফীর দোকান এলাহাবাদে সেই সময়ে স্থাপিত হয়। তাঁহারা একটি সোডাওয়াটারের ফ্যাক্টরীও খুলিয়াছিলেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোতে তাঁহাদের ভদ্রাসন ছিল। কলিকাতার 'বলরাম দের স্ট্রীট যাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে তিনি ঈশানবাবুর পিতামহ।' (পৃ ২৩২)।

কলকাতার বাইরে বাঙালি ফোটগ্রাফারদের মধ্যে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র, সমরেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ, চুঁচুড়ার অবিনাশ ধর ও ঢাকার রঘুনাথ দাস, গৌরচন্দ্র রায় ও আনন্দকিশোর ঘোষ (পূর্বধী, থানা কেরাণীগঞ্জ)—এঁদের নামের সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি। এ-ছাড়া আরো কয়েক জনের নাম জানা যায় বিখ্যাত বাঙালি প্রতিষ্ঠান পি. এম. বাক্‌চি কোম্পানি-র ১৯১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দের বর্ষপঞ্জি (ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরি) থেকে। এই বর্ষপঞ্জিতে প্রকাশিত রাধার স্ট্যাম্পের বিজ্ঞাপনে ঢাকার বানখণ্ডের জনৈক এইচ. রায়, 'আর্টিস্ট ও ফোটগ্রাফার'-এর নাম জানা যায়। ঢাকায় বেঙ্গল স্টুডিও পরিচালনা করতেন পি. মুখার্জী। তাছাড়া ময়মনসিংহের আর. দে ও সুবলচন্দ্র সাহা, নোয়াখালির অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও জানকীনাথ সেন, ফরিদপুরের সতীশচন্দ্র শিকদার, বেনারসের মোজেস এণ্ড সন্স (স্বত্বাধিকারী সামন্ত এণ্ড কোং), মীরাটের (সদর স্ট্রীট) সান্যাল এণ্ড গাঙ্গুলী ও তমলুকের বসন্তকুমার বসু, শিবসাগরের (আসাম) ডি. ঘোষাল ও শিলঙের ঘোষাল ব্রাদার্স-এর (ফোটগ্রাফার ও বায়স্কোপ প্রদর্শক) উল্লেখ রয়েছে।

ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ফোটগ্রাফার পি. বোস (১১৫বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট) ১৮৯০ নাগাদ ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি টালিগঞ্জ ক্লাবেরও ফোটগ্রাফার নিযুক্ত হন। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত কলকাতার একটি ডাইরেকটরিতে (১৯৩০-এর দশকে) ছাপা কলকাতার বাড়িঘর ও পথদৃশ্যের সব ক'টি ফোটগ্রাফই তাঁর তোলা। উল্লেখ না থাকলে এই ছবিগুলি জনস্টন হফম্যান বা বোর্ন এণ্ড শেফার্ডের তোলা বলেই মনে হতো।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যাত্রা শুরু ক'রে এখনো সুনামের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এই রকম চারটি স্টুডিও—কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ডি. রতন ও দা ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারি, কলেজ স্ট্রীটের কফিহাউসের বাড়িতে সি. গুহ,

১, শিকদারবাগান স্ট্রিটের পি. কে. বোস অ্যাণ্ড কোং ও ভবানীপুরের দাস স্টুডিও। প্রায় সমকালীন কিন্তু অধুনালুপ্ত ও স্বল্পপরিচিত নিম্নোক্ত বাঙালি স্টুডিওগুলির

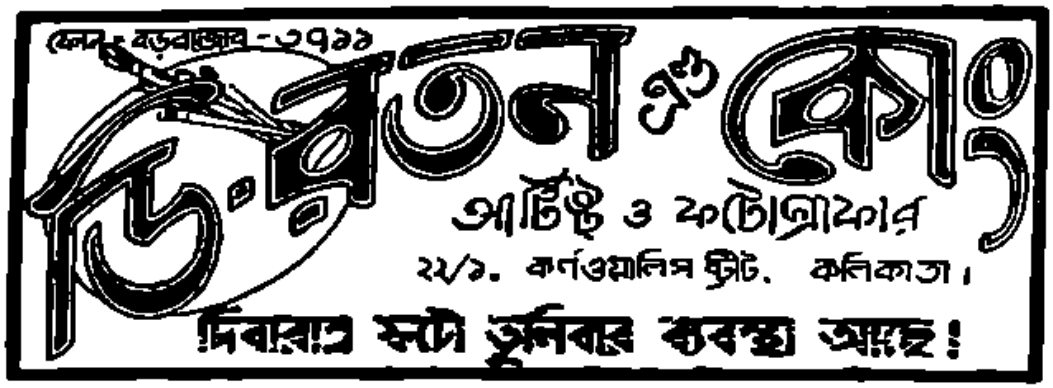

কলকাতার প্রাচীন ষ্টুডিওগুলির অন্যতম ডি. রতন-এর একটি পুরনো বিজ্ঞাপনের প্রতিচ্ছবি

নাম জানতে পেরেছি নলিন সরকার স্ট্রিটের বিখ্যাত পালিত পরিবারের প্রশান্ত কুমার পালিতের সৌজন্যে তাঁদের প্রাচীন অ্যাল্‌বাম থেকে : ডায়মণ্ডহারবারের 'দা বেঙ্গল ন্যাসনাল ফোটোগ্রাফার', Dutt's Photo Club (ঠিকানা নেই), ৩৪ কলেজ স্ট্রিটের 'দা আর্ট ওয়ার্কার্স লিগ', ৭০ পদ্মপুকুর রোডের অনিলচন্দ্র মিত্র (স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের আত্মীয় ?), ৮২/৪ ডি কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'চিত্র ভবন' ও ১৩১ এ-ডি কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'আর্ট সিণ্ডিকেট'।

বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবার পূর্বে সি. গুহ ষ্টুডিওর ফোটগ্রাফের নিচে থাকত এই ছাপটি। 'Guho' বানানটি লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের থ্যাকার্স ডাইরেক্টরি, পি. এম্. বাক্‌চি-র ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরি' (বাংলা ভাষায়) থেকে আরও কিছু বাঙালি ফোটগ্রাফার ও সংস্থার নাম উদ্ধৃত ক'রে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাচ্ছি — বি. বল্লভ অ্যাণ্ড কোং ; বি.

দত্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, এস. সি. সেন, টি. পি. সেন, শেখ নাসিরুদ্দিন, এন. কাপ অ্যাণ্ড কোং, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, এস্ লাল অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, গ্র্যাণ্ড ফোটগ্রাফার্স, গ্রেট ইস্টার্ন স্টুডিও, ডন স্টুডিও, ক্রেগস্ আর্ট ইউনিয়ন, ফিনিক্স আর্ট ইউনিয়ন, বটকৃষ্ণ দত্ত অ্যাণ্ড কোং, বিডন স্টুডিও, ভোলানাথ দত্ত অ্যাণ্ড কোং, মিত্র অ্যাণ্ড কোং, পি সেট অ্যাণ্ড কোং, এম. জি. সিদ্দিক, এস. হালদার, জে. এন. রায়, ইউনিভার্সাল আর্ট অ্যাণ্ড ফোট-গ্যালারি, ক্যালকাটা ফাইন আর্ট কটেজ, চন্দর ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং (সুবোধ স্টুডিও), মেরি আর্ট স্টুডিও ও ফোট-অ্যাটেলিয়ার।

৪

পাঁচজন বাঙালির পোর্ট্রেট

> কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো, যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনই ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়।
>
> — ছিন্নপত্র ৭১, ১৮৯৩।

ওয়াটার্লু স্ট্রিটে রবীন্দ্রনাথ : ১৮৮০-র পর থেকে ড্রাই প্লেট-এর ব্যাপক প্রচলন শুরু। ড্রাই প্লেট-ই ফোটগ্রাফারকে 'ডার্করুম' সঙ্গে ক'রে বয়ে বেড়ানোর দায়মুক্ত করল। ওয়েট প্লেট ও ড্রাই প্লেটের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই সুন্দর উপমাটি প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

এই ওয়েট প্লেট-এর যুগেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ফোটগ্রাফ তোলা হয়েছিল।

'জীবন স্মৃতি'-তে শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন : 'বেশ মনে পড়ে তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজী ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দীতে বাংলাতে তিনি এমন আলাপ জমাইয়া তুলিলেন — অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মত তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন, ছবি তোলার জন্য অত বেশী দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরীব মানুষ, — না, না, সাহেব সে কিছুতেই হইতে পারিবে না — যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতর অসঙ্গত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিকটক ছিল —'

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল সাব্যস্ত করেছেন এই ফোটগ্রাফটি

১৮৭৪-এ তোলা। তখন তাঁর বয়স তের। এর আগে রবীন্দ্রনাথের কোনো ছবি তোলা হয়েছিল কি না জানা যায় না। তের বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের যে ক'টি ছবি দেখা যায়—পূর্ণাবয়বে একা দাঁড়িয়ে কি আবক্ষ মূর্তি—সবই এই শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে গৃহীত ফোটগ্রাফ-নির্ভর।

ডান পা ছোট্ট একটি গদিওলা গোলাকার চৌকিতে রেখে কোলের উপর একটি বই খুলে চেয়ারে বসে আছেন শ্রীকণ্ঠ বাবু। মাথায় পাগড়ী বাঁধা। মুখটি একটু ডান দিকে কাত ক'রে রেখেছেন। টুপি মাথায় জোব্বা গায়ে তাঁর পিছনে তিনটি বালক—রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী। রবীন্দ্রনাথের ডান হাতের কনুইটি একটি চেয়ারের মাথাকে আশ্রয় করেছে। চেয়ারটি ও বাকী তিনজনকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এই ফোটগ্রাফের যে প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন জায়গায় ছাপা হয়েছে—তাতে রবীন্দ্রনাথের হাত দু'টির বিন্যাস তাই অস্বাভাবিক লাগে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের সংগ্রহে (রেফারেন্স নং ৯৩৩·৩—৩৩/২২, F Fr. ২৩৮, F ৪৮. অ্যাক্সেসন নং ১১৬৪) বহুকাল পূর্বে এই ফোটগ্রাফ থেকে তৈরি ব্লক-মুদ্রিত চিত্রগুলি এখন মূল প্রিন্টটির চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। কিন্তু মূল প্রিন্টটি ঐতিহাসিকদের কাছে ভিন্ন কারণে মূল্যবান। ফোটগ্রাফটি কোথায় তোলা হয়েছিল, এটি সম্ভবত তার একমাত্র সাক্ষী।

মাউন্ট বোর্ডে সাঁটা ফোটগ্রাফটির তলায় লেখা আছে 'ক্যাবিনেট পোর্ট্রেট'। ৪ ইঞ্চি × ৫½ ইঞ্চি মাপের শক্ত বোর্ডে সাঁটা ফোটগ্রাফকে তখন এই নামেই অভিহিত করা হতো। মাউন্ট বোর্ডের উল্টো পিঠে ছাপা রয়েছে স্টুডিওর পরিচয়—

Artists in Photography
WESTFIELD & COY.
3 Waterloo Street,
Calcutta.
This photograph is registered
and reserved for further copies.

বিশ্বভারতী থেকে খণ্ডে খণ্ডে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহ : নির্মীয়মান তালিকা। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ফোটগ্রাফের তালিকাও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফোটগ্রাফের পাত্র-পাত্রীর ও কালের নির্দেশ থাকলেও ফোটগ্রাফারের নাম-ধামের কোনো উল্লেখ নেই সেখানে। তালিকা-প্রণয়নকারীরা এ-দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে।

১৮৯০-এর মার্চ মাসে তোলা বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত ফোটগ্রাফ রয়েছে রবীন্দ্র-ভবনে। (রেফারেন্স নং, R316/F66)। ছবিটি একটি অ্যালবাম থেকে ছিঁড়ে নেওয়া কালো কাগজে সাঁটা।

পাশে লেখা রয়েছে গগন ঠাকুরের তোলা ছবি। এরই উল্টো পিঠে আরেকটি ফোট সমরেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের। সম্ভবত একই সময়ে গগন ঠাকুরেরই তোলা।

গগনেন্দ্রনাথের ফোটগ্রাফি-চর্চা সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্মৃতিকথায়। কন্যা পূর্ণিমা দেবী লিখেছেন: 'পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে বসে দাদাদের আঁকো শেখাতেন। বাবাও দেখিয়ে দিতেন, সব সময় কাছে রাখতেন, ছবি তোলা শেখাতেন। কনক দাদা বেশ ভাল ছবি তুলতে পারত, বড়দাদাও তুলত। বাবা নিজের ছবি তোলার সব সরঞ্জাম ওদের দিয়েছিলেন। ওদের দেখতুম কি সব নুনের মত ওষুধ দিয়ে ট্রের ভিতর জল নাড়িয়ে নাড়িয়ে ছবি ডেভেলাপ করত। খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দিত, আমি কুড়িয়ে নিতুম।' (ঠাকুর বাড়ির গগন ঠাকুর, পৃ ১৫)।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'তিনি প্রথম যৌবনে ফটোগ্রাফীর চর্চা করেছিলেন। তারপর কিভাবে ফটোগ্রাফী ছেড়ে শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন সেই ইতিহাসও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।' (গগনেন্দ্রনাথ: সেন্টেনারি এগজিবিশন পুস্তিকা, কলা-ভবন)।

মনে হয় ১৯০০/১৯০১ গগনেন্দ্রনাথ ফোটগ্রাফি-চর্চা ত্যাগ করেছিলেন।

কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি ফোটগ্রাফের কথা বলি। 'জনস্টন ও হফম্যান' নামে কলকাতার বিখ্যাত এক স্টুডিওর তোলা 'কার্টে-ডি-ভিসিট' অর্থাৎ ভিজিটিং কার্ড গোছের, ২½ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি সাইজের) কিশোরী মৃণালিনীর একটি ফোটগ্রাফ আছে রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে। (রেফারেন্স নং, RF 123/F162)। আর একই ফাইলে রয়েছে ছবিটি অনুমোদন ক'রে রবীন্দ্রনাথের এই নোটটির কপি: 'Approved. 1 dozen required.—R. Tagore.' বলা নিষ্প্রয়োজন এটি মৃণালিনীর সেরা ফোটগ্রাফ।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'কালার ফটোগ্রাফ'-এর সংখ্যা দুইয়ের বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের প্যারিস ভ্রমণকালে, 'অটোক্রোম' নামে পরিচিত গ্লাস ট্র্যান্সপেরেন্সিতে এই ছবি দু টি তুলেছিলেন অ্যালবার্ট কান্ বা তাঁর কোনো সহকারী। প্যারিসের উপকণ্ঠে 'ফাউণ্ডেশন অ্যালবার্ট কান্' নামে 'অটোক্রোম পোট্রেট'-এর একটি সংগ্রহশালা আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কান্ তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে খ্যাতনামাদের অসংখ্য কালার ট্র্যান্সপেরেন্সি গ্রহণ ও সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীসত্যজিৎ রায় একবার প্যারিস সফরের সময়ে এই সংগ্রহালয় পরিদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের অটোক্রোম থেকে ডাই-ট্র্যান্সফার পদ্ধতি অবলম্বনে মুদ্রিত ফোটগ্রাফ থেকে একটি রঙীন পোস্টার ছেপেছিলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। সত্যজিৎ রায়ের কাছে এই পোস্টারটি আছে। তাঁর কাছেই একটি সাদা-কালো ফোটগ্রাফে দেখে জেনেছি 'ফাউণ্ডেশান অ্যালবার্ট কান্'-এর প্রাঙ্গণে সোলাপ-বাগানেও রবীন্দ্রনাথের একটি ফোট তোলা হয়েছিল। এটিও অটোক্রোম-চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশমান রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নীল জোব্বা গায়ে রবীন্দ্রনাথের অটোক্রোম-এর যে-প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছে সেটি পূর্বোক্ত পোস্টার অবলম্বনে।

মৃত্যুর পরেও পরোপকারী বিদ্যাসাগর

'শরৎবাবু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুকালে তাঁহার তিন প্রকার ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৎকালে ধনাঢ্য লোকের ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পর্য্যন্তও এই তিন প্রকার ছবি কিনিয়া গৃহে রাখিয়া দিয়াছিলেন। · তিনি [শরৎবাবু] বলিলেন দিল্লীতে ফটোগ্রাফারের দোকান খুলিয়া অনেক টাকা লোকসান দিয়া কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিয়াছি ইহা আপনারা জানেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিন প্রকার ছবি তুলিয়া আমি কিছু পাইয়াছি। আমি বলিতেছি যে, দিল্লীতে থাকিয়া যে লোকসান দিয়েছিলাম কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় তাহার চতুর্গুণ লাভ করিয়াছি। একটি কথা আপনাদিগকে প্রাণ ভরিয়া বলিতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত থাকিয়া অনেকের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পরেও তিনি আমার এই পরম উপকার করিলেন !···' (দ্র. 'স্বর্গত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি', পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, 'বাতায়ন,' চৈত্র ১৩৩৮, পৃ ১১৩৫)।

শরৎবাবু অর্থাৎ এস. সি. সেন নামে পরিচিত ফোটগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন ১৮৯০-৯১ নাগাদ 'গভর্মেণ্ট হাউসের ঠিক পূর্ব্ব দিকের ফটকের পূর্ব্ব দিগবর্ত্তী একখানি বৃহৎ বাটীতে সুরম্য ফটোগ্রাফের কারখানা খুলিয়াছিলেন।' (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। তাঁর অগ্রজ সংসারচন্দ্র ছিলেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি ও মধ্যম অগ্রজ দিল্লীর বিখ্যাত ডাক্তার হেমচন্দ্র।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ রাত্রে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার বলেছেন, বিদ্যাসাগরের ভাইয়েরা চেয়েছিলেন পর দিন সূর্যোদয়ের আগেই নিমতলা ঘাটে তাঁর সৎকার সম্পন্ন হোক।' দৌহিত্রদের ইচ্ছাতেই ফোটগ্রাফ তোলার জন্য সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থেও এই ফোটগ্রাফটির উল্লেখ রয়েছে। ১৩০২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের অন্যান্য চিত্রের মতো এটিরও লিথো-চিত্রী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। [বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'র প্রথম সংস্করণে (১৩২৩) ফোটগ্রাফটির হাফটোন-প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছিল।]

এই গ্রন্থে অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর লিথো-চিত্রের আরো কয়েকটি অনুপম নিদর্শন রয়েছে। যৌবনে বিদ্যাসাগর, বার্দ্ধক্যে বিদ্যাসাগর, তাঁর জনক জননী ও পত্নী এবং

শ্যামাচরণ দে প্রমুখ কয়েকজন স্বজনের। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থচিত্রনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিকৃতি মূল অয়েল পেইন্টিং অনুসরণে আঁকা এবং বাকিগুলি শ্মশান-দৃশ্যটির মতো ফোটগ্রাফ-নির্ভর।

বিদ্যাসাগরের বৃদ্ধবয়সের লিখো-চিত্রটি যে ফোটগ্রাফ অবলম্বনে রচিত তাতে সন্দেহ নেই। ডান হাতে ধরা বইটি জানুতে রেখে শাল গায়ে ঋজুদেহ চেয়ারে উপবিষ্ট বিদ্যাসাগরের একটি ফোটগ্রাফ বহু বইয়েতেই ছাপা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এটিই তাঁর সর্বাধিক পরিচিত মূর্তি। নকলের নকল, তারও নকল করতে করতে বর্তমানে ছাপা এই ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি নানা ভাবে বিকৃত। মূল ফোট-প্রিন্টের ব্যালর-বিশিষ্ট গদিওলা চেয়ার ও সুদৃশ্য টেবিলটির পরিবর্তে এখন অতি কুৎসিত একটি চেয়ার-টেবিলের দেখা মেলে। সম্ভবত বিদ্যাসাগরের 'ভাবমূর্তি' উজ্জ্বল করার জন্যই তাঁর কোনো বিকৃতমনস্ক অনুরাগী এই কারিকুরি করেছিলেন, তারপর সেটি থেকে আবার নকলের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মূল ফোটগ্রাফটির অবিকৃত হাফটোন প্রতিচ্ছবির সন্ধান মেলে মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন' বইটিতে। সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-জীবনীতেও সেটি আছে। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও ঈশান-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংশোধিত 'বিদ্যাসাগর – জীবনচরিত' গ্রন্থে (১২৯৮) ত্রৈলোক্য-নাথ দেবের তৈরি একটি উড্-কাট ছবি ছাপা হয়েছিল। সেটিও এই ফোটগ্রাফের অবিকল অনুসরণ। বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব এই ফোটগ্রাফটি থেকে অন্নদাপ্রসাদ শুধু আবক্ষ চিত্র রচনা করলেও গলা ও বুকের কাছে চাদরের প্রতিটি ভাঁজ মূল ফোট-গ্রাফের সঙ্গে অভিন্ন।

সংস্কৃত-কলেজের বিপরীতে অবস্থিত বিদ্যাসাগর-সুহৃদ শ্যামাচরণ দে-র বাড়িতে বর্তমান বংশধর জয়ন্ত দে ও কল্যাণ দে-র হেফাজতে বিদ্যাসাগরের একটি অনুপম আবক্ষ ফোটগ্রাফের (সস্-ফিনিশ) এনলার্জমেণ্ট আছে।

অন্নদাপ্রসাদের আঁকা যুবক বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় লিখো-চিত্রটি কোনো ফোটগ্রাফ-নির্ভর বলে মনে হয় না। এপর্যন্ত উল্লিখিত ফোটগ্রাফটি ছাড়া বিদ্যাসাগরের আর মাত্র একটি ফোটগ্রাফেরই সন্ধান পেয়েছি। মন্মথনাথ ঘোষের লেখা 'সেকালের লোক' বইটিতে এই দুর্লভ ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। খুবই অপরিচিত দর্শন এই মধ্যবয়স্ক বিদ্যাসাগরের মুখটি। শীর্ণতায়, ক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই। তবে তখনই তিনি বিরল কেশ। আর অপরিবর্তিত সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। প্রথম ফোট-গ্রাফটির তুলনায় এখানে বিদ্যাসাগর অতটা দৃঢ় ওষ্ঠ নন, প্রসন্নতার মৃদু আমেজ রয়েছে।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে 'রঞ্জন প্রকাশনী' থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর 'সমাজ' খণ্ডে বিদ্যাসাগরের প্রথমোক্ত ফোটগ্রাফের অনুপম একটি প্রতি-

ছবি আছে। ছবিটির নীচে মূল ফোটগ্রাফটির জন্য যতীন্দ্রমোহন দত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মুখে শুনেছি 'ঘরে-বাইরে' তোলার সময়ে চকদীঘির জমিদার বাড়িতে তিনি বিদ্যাসাগরের একটি সম্পূর্ণ অচেনা ফোটগ্রাফ দেখেছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিদ্যাসাগরের ফোটগ্রাফটিও উচ্চ-মানের। বিদ্যাসাগর কলেজের গ্রন্থাগারে অতি অযত্নে ঝোলানো আছে প্রথমোক্ত ফোটগ্রাফটির একটি পুরনো প্রিন্ট।

মধুসূদন, পাইকপাড়ার ছোট রাজা ও ডেভিড গ্যারিক

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'My Dear Gour' সম্ভাষণে গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' তখনকার সেরা বাঙালি মুদ্রণালয় স্ট্যানহোপ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইটি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটিও উপহার দিয়েছিলেন। সেটি সযত্নে তাঁর গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছিল। মধুসূদন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাস বশত প্রস্তাব করেছিলেন, কবি কর্তৃক যতীন্দ্রমোহনকে পাণ্ডুলিপিটি উপহার-দানের একটি ফোটগ্রাফ তোলা দরকার। যতীন্দ্রমোহন প্রথমে মধুসূদনের সঙ্গে একমত না হলেও মধুসূদন তাঁর কোনওজরেই কান দেন নি। শেষে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে তাঁরা সেকালের কলকাতার সেরা ফোটগ্রাফিক প্রতিষ্ঠান রাইনেকে কোম্পানিতে হাজির হন। একটি ফোটগ্রাফ তোলা হয়। কিন্তু ছবিটি মধুসূদন বা যতীন্দ্রমোহন কারোই পছন্দ হয় নি—'neither I nor Michael liked the pose or the general execution of the picture···।' তাঁরা ঠিককরেন পরে আরেক দিন ছবি তোলাতে যাবেন। কিন্তু নানা কাজে তার বিলম্ব ঘটে এবং কবি ছবি তোলার কথা ভুলে যান। [১৮৯২-এর ১ ডিসেম্বর ইংরাজিতে লিখিত চিঠি, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-এ উদ্ধৃত]।

১৮৬০-এর মে মাসে প্রকাশিত হয় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। কাজেই এই ছবি তোলার ঘটনা নিশ্চয় তার কয়েক মাস পরের কথা। এই অমনোনীত ফোটগ্রাফটি রক্ষা পেয়েছে বলে মনে হয় না। ১৫নং চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত T. Reinecke & Co.-র নাম ১৮৫৮-এর ডাইরেক্টরিতেও পাওয়া যায়। ১৮৬০ অবধি তাঁরা ফোটগ্রাফ ও দাগেরোটাইপ—দু' ধরনের ছবিই তুলতেন। পূর্বোক্ত ছবিটি অবশ্য সাবজেক্ট হিসাবে দাগেরোটাইপের উপযুক্ত নয়। এই কোম্পানির মালিক T. Reinecke ছিলেন পাইকপাড়ার ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ঘনিষ্ঠ। তাঁরা দু' জনেই ছিলেন 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের

কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য (১৮৫৬ ও ১৮৫৭)।

পাইকপাড়ার বড় রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বিকাশের যোগাযোগ সুবিদিত। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম অভিনীত হয় এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর। বেলগাছিয়া নাট্যশালার দ্বিতীয় নাটক। ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাট্যানুরাগের পরিচয় অল্পবিস্তর জানা থাকলেও তাঁর বিজ্ঞান এবং বিশেষ ক'রে ফোটগ্রাফি-চর্চার কথা একমাত্র গৌরদাস বসাকই লিপিবদ্ধ করেছেন। মধুসূদনের অনুরাগী ও বন্ধু গৌরদাস বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয় করতেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাইকপাড়ার বাড়িতে রাজভ্রাতারা 'আওয়ার ওন্ ক্লাব' নামে একটি ডিবেটিং ক্লাব স্থাপন করেছিলেন। পরে সেটি উঠে আসে বেলগাছিয়ায়। এই ক্লাব থেকেই নাট্যশালার উদ্ভব। গৌরদাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি চমৎকার গবেষণাগার ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। পারিবারিক চিকিৎসক সুখ্যাত দুর্গাচরণ ব্যানার্জির সহায়তায় ঈশ্বরচন্দ্র চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। ফোটগ্রাফি, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ও কাঁচ-নির্মাণ শিল্পের চর্চায়ও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতে তখন এসব শিল্পের শৈশব। মিস্টার নিউল্যাণ্ডের কাছ থেকে তিনি দাগেরোটাইপ ছবি তোলার শিক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় তিনি রসায়নবিদ্যার শরণ নেন। তাঁর সহযোগী ডক্টর কানাইলাল দে-র সাহায্যে রসায়ন বিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ক'রে তিনি কলোডিয়ান পদ্ধতিতে ফোটগ্রাফ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকালে তাঁর ফোটগ্রাফগুলি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। (Reminiscences of Michael M. S. Dutta by Gour Das Bysack, পরিশিষ্ট, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।)

জে. এস. নিউল্যাণ্ডের কথা দাগেরোটাইপ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র ও কানাইলাল দে দু'জনেই আদিপর্বে 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর সদস্য ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চ তথা ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার জন্যই বোধহয় ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে মধুসূদনের ফোটগ্রাফ তোলা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তুলে থাকলেও তার কোনো নিদর্শন বা প্রমাণ রক্ষা পায় নি।

মধুসূদনের ফোটগ্রাফ ও তৈল-চিত্র নির্মাণ করেছিলেন এমন একজনের পরিচয়ই আমরা শুধু জানতে পারি। তিনিও ছিলেন বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন, 'কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে [১১ জুন, ১৮৭৩] গ্যারিক সাহেবের প্রস্তুত তাঁহার বহু তৈল-চিত্র (oil-painting) ৪০৲ টাকা এবং carte-de-visit ফটো ২৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল।'

গ্যারিক সাহেব মানে ডেভিড গ্যারিক। তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে কাঠ-খোদাই শিক্ষকের কাজ নিয়ে কলকাতায় আসেন। ১৮৬০-এর দশকে প্রধান শিক্ষকের পদ

লাভ করেন। পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিত্রকর ও ফোটগ্রাফারের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি 'ফোটগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সোসাইটির ১৮৬৩-র এপ্রিল সংখ্যার 'জার্নাল'-এর তালিকায় সদস্য হিসাবে তাঁর নাম দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সহযোগী কানাইলাল দে-ও তখন সদস্য ছিলেন। ১৮৬৭-র মার্চ সংখ্যায় 'জার্নাল অফ বেঙ্গল ফোটগ্রাফিক সোসাইটি'তে গ্যারিকের পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি ফোটগ্রাফ নিয়ে প্রকাশিত হয় এক বিতর্ক। তিনি 'অ্যামেচার' বিভাগের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। সমিতির অনেকেই তাতে আপত্তি করেছিল, কারণ গ্যারিক কিছু পেশাদারী কাজও করতেন। সমিতির কার্যকর্তারা অবশ্য গ্যারিককেই সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের মতে গ্যারিক অবসর সময়ে দু'-চারটি 'কমার্শিয়াল' কাজ করেন। তাঁকে কিছুতেই পুরোপুরি 'পেশাদার' আখ্যা দেওয়া যায় না।

এই গ্যারিকের স্ত্রী-ই সম্ভবত কলকাতার প্রথম পেশাদার মহিলা ফোটগ্রাফার। যাঁর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৭৩-এ গ্যারিক গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের জন্মকালে কয়েকটি সিন্ এঁকে দিয়েছিলেন (কলকাতার থিয়েটার, শঙ্কর ভট্টাচার্য)। পরবর্তী জীবনে তিনি পুরনো ছবি পুনরুদ্ধারের কাজটিকেই (restoration) মুখ্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

মধুসূদনের ফোটগ্রাফ যা-ই তোলা হয়ে থাক তার মধ্যে মাত্র দু'টির দৌলতে আমরা চিরকাল তাঁকে স্মরণ করে আসছি। এ-ছাড়া যোগীন্দ্রনাথ বসুর জীবনীগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৯৩) অন্তর্ভুক্ত লিথো-চিত্রটির বহু নকল ছাপা হয়েছে। লিথো-শিল্পীর নাম না জানা গেলেও অনুমান করা যায় এটি ফোটগ্রাফ অবলম্বনেই রচিত। সর্বাধিক পরিচিত, সিগারেট হাতে মধুসূদনের পূর্ণাবয়ব ফোটগ্রাফটি তোলা হয়েছিল তাঁর প্যারিস বাস কালে (১৮৬৪-৬৫)। এস. সি. সান্যাল অ্যাণ্ড কোং থেকে ১৯২১-এ প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি'-তে এই ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবির নীচে তার উল্লেখ রয়েছে। কোট-প্যাণ্ট প'রে মধুসূদন একটি চৌকো 'প্রপ্'-এর উপর বাঁ হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর উচ্চতার জন্য কনুইয়ের নীচে প্রপ্-টির উপর একটি মোটা আকারের বাহ্য জাতীয় কিছু রাখতে হয়েছে। চৌকো থামটির শোভা বাড়াতে টবে রাখা হয়েছে পাতাবাহারী গাছ। এই ফোটগ্রাফে মধুসূদনের মুখটিতে আলোছায়ার কোনো খেলা নেই, তাই মৃতের মতো মসৃণ ও 'ফ্লাট'—কোনো টোন্ নেই। এই ফোটগ্রাফ অবলম্বনে প্রস্তুত মধুসূদনের শুধু মুখাবয়বের চিত্রতেও তাই কাঠিন্যের প্রকাশ। মধুসূদনের ভিন্ন একটি ফোটগ্রাফের সেরা প্রতিচ্ছবি রয়েছে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এর প্রথম সংস্করণে। শুধু মুখাবয়ব। এটিই গ্যারিক সাহেবের তোলা কিনা নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়।

বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু মধুসূদন ও তাঁর পত্নী হেনরিয়েটার দু'টি প্রতিকৃতি রচনা

করেছিলেন। মধুসূদনের ছবিটি আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে আর হেনরিয়েটার ছবিটি শিল্পী-পুত্র সজিত বাবুর যত্নে তাঁদের বাড়িতে। অতুল বাবুকে এই চিত্র-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন মধুসূদনের পৌত্র নেভিল চার্লস ডাটন। তিনি পারিবারিক সংগ্রহ থেকে মধুসূদনের কয়েকটি ও হেনরিয়েটার একটি ফোটগ্রাফ তুলে দিয়েছিলেন অতুল বসুর হাতে। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন কমল সরকার 'হেনরিয়েটার ফোটোগ্রাফ' নামে প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৯)। হেনরিয়েটার সম্ভবত একমাত্র লভ্য এই ফোটগ্রাফটি অতুল বসু কমল সরকারকে উপহার দিয়েছিলেন।

রাধাবাজারে রামকৃষ্ণ

'আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পীঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়; যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।' — শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫ম ভাগ।

সেদিন ১৮৮১-র ১০ ডিসেম্বর। রামকৃষ্ণ এসেছিলেন ১০৭ রাধাবাজারে 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'-এ। স্টুডিওর মালিক নীলমাধব দে শুধু ফোটই তোলেন নি, ফোট তোলার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। এই সুপরিচিত ফোটগ্রাফে রামকৃষ্ণ একটি চেউ-খেলানো গোলাকার স্টুডিও প্রপ্-এর উপর ডান হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে ঘোরবর্ণ কোট, ধুতির কোঁচাটি বাঁ কাঁধে তোলা। ঈষৎ উন্মুক্ত ওষ্ঠ, উদাস দৃষ্টি। 'অদ্বৈত আশ্রম' প্রকাশিত 'SRI RAMKRISHNA — A Biography in Pictures' গ্রন্থে মূল নেগেটিভ থেকে কোনো অংশে বর্জন না ক'রে এই ফোট-গ্রাফের সুন্দর প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছে। পিছনে টাঙানো ক্লিনের পাশ দিয়ে একটি ইটের দেয়াল উঁকি মারছে ছবির ডান কোণে।

এই বইটিতে কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে তোলা ব্রাহ্ম-ভক্ত পরিবৃত রামকৃষ্ণের ফোটগ্রাফেরও সুন্দর প্রতিচ্ছবি আছে। ১৮৭৯-র ভাদ্রোৎসবের সময় ২১ সেপ্টেম্বর 'কমলকুটীরে' এটি তোলা হয়েছিল। ফোটগ্রাফারের নাম জানা যায় না। রামকৃষ্ণের সমাধি হয়েছিল বলেই ফোটগ্রাফে তাঁর মুখটি সবচেয়ে ভালোভাবে ফোকাসে রয়েছে — আর সবাই কিঞ্চিৎ আবছা — নড়ে গেছেন।

১৯৮৪-র ১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পীযূষকান্তি রায়-এর প্রবন্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ফোটো'। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রেরিত চিঠিপত্র থেকে রামকৃষ্ণের সবচেয়ে পরিচিত ও পূজিত ফোটগ্রাফটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

পীযূষবাবুর বিবরণ অনুসারে বরানগর কলুপাড়ার বাসিন্দা (অধুনা অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন) ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহেই এই ফোট তোলা সম্ভব হয়েছিল। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির সংলগ্ন শ্রীশ্রীরাধাকান্তের (বিষ্ণু ঘর) মন্দিরের বারান্দায় ছবিটি গৃহীত হয়। ফোটগ্রাফটি কখন গৃহীত হয় তার খোঁজ পাওয়া যায় মহিমাদলের দেবপ্রসাদ গর্গের চিঠি থেকে। তিনি ১৯৪০-৪১ নাগাদ বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড-এর দোকানে এসেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দা রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ-এর নেগেটিভ খুঁজতে। কথা প্রসঙ্গে তিনি দোকানের তৎকালীন ম্যানেজার এ. ডব্লু. মাসেলহোয়াইট-কে প্রশ্ন করেন তাঁদের কাছে রামকৃষ্ণের ফোট আছে কি-না। পুরনো ইনভেন্স বই ঘেঁটে দেখা যায়, ১৮৮৩-র অক্টোবর মাসে এ. সি. দাঁ একটি ফোট তুলেছিলেন। ১৭" × ১২" মাপের ওয়েট প্লেটে তোলা নেগেটিভও খুঁজে বার করা হয় এবং দেবপ্রসাদ বাবু ২১০ টাকা দিয়ে তার একটি প্রিণ্ট সংগ্রহ করেন।

অবিনাশচন্দ্র দাঁ বরানগরের বাসিন্দা ছিলেন। মূল নেগেটিভ থেকে প্রথম দফায় ছ'টি প্রিণ্ট করা হয়েছিল। পীযূষবাবুর মতে এই ফোটর 'রামকৃষ্ণের বাঁ হাতের কনুয়ের কাছটা ডান হাতের মতো স্বাভাবিক নয় এবং সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় হাতখানা ভাঙা এবং কিছুটা ফোলা। শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁ হাতখানা যে ভেঙে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কথামৃত করের ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারির বর্ণনায়…'।

এই প্রবন্ধ পড়ে স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় (৩ নভেম্বর, ১৯৮৭)। তার থেকে জানা যায় সারদা দেবীর সুপরিচিত ফোটগ্রাফ তিনটি ১৮৮৯-র নভেম্বর মাসে ভগ্নী নিবেদিতার বাড়িতে তোলা হয়েছিল। নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুল-এর উপস্থিতিতে ও আগ্রহে একজন ইংরাজ ফোটগ্রাফার এই ছবিটি তুলেছিলেন।

১৮৮৬-র ১৬ আগস্ট কাশীপুর বাগানবাড়িতে রামকৃষ্ণের চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নির্দেশে মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের দু'টি ছবি তুলেছিলেন 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ্ণের সচিত্র জীবনী-র ৯৬ পৃষ্ঠায় এই ফোটগ্রাফটির প্রতিচ্ছবিতে শবদেহ বাদে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের দলটির দর্শন মেলে।

পীযূষকান্তি রায় লিখেছেন ১৮৭৫-তে 'দা বেঙ্গল ফোটগ্রাফার্স'-এর স্টুডিও ১৯/৮ বৌবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল, কিন্তু তখন ১০৭ রাধাবাজার – এই ছিল স্টুডিওটির ঠিকানা। এবং ১৯।৮ নয়, ১৯/৩ বৌবাজার স্ট্রিটে উঠে আসে অনেক পরে।

বঙ্কিমচন্দ্র : চারটি ফোটগ্রাফ

'সেই যূথমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক-প্রফুল্লমুখ জ্ঞানগরী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ

হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন'।
—রবীন্দ্রনাথ।

বালক বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দর্শনের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ লালন করেছিলেন। এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জে (এমারেল্ড বাওয়ারে) কলেজ-রিইউনিয়ন নামে মিলনসভায়। সেদিনের সভায় উপস্থিত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালের 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি 'বাইশ তেইশ বছর' আগের কথা বলে উল্লেখ করেছেন এই ঘটনার সেই অনুসারে এটি ১৮৭৫ বা ১৮৭৬-এর কথা। রবীন্দ্রনাথের বয়স চোদ্দ কি পনের আর বঙ্কিমচন্দ্র পঁইত্রিশ বা আটত্রিশ।

গুম্ফধারী বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর সুপ্রচলিত ও প্রায় একই সময়ে তোলা ফোটগ্রাফ দু'টিতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় শ্মশ্রুরাজির বর্ণনা নেই কিন্তু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন, 'শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র দাড়ি-গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন।' দাড়ি তাঁর কত দিনের সঙ্গী ছিল বলা যায় না, কিন্তু সুপরিচিত ফোটগ্রাফ দু'টি যে শেষ বয়সের তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ছবি দু'টি তোলার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঝকঝকে সোনার চশমাটিও খুলে রেখেছিলেন।

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমের প্রচলিত বিখ্যাত ফটো চিত্রে উল্টো বঙ্কিম' নামে একটি রস-রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে শেষ জীবনে তোলা, দাঁড়ানো অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় পূর্ণ দেহের ফোটগ্রাফটির উল্টো প্রতি-চ্ছবি মুদ্রণের কথা আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ছবিটি কি ভাবে উল্টে গেল তা বলা হয় নি। মূল ফোটগ্রাফের প্রিন্ট থেকেই হোক বা মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি থেকেই হোক—কপি নেগেটিভ তৈরি করা হয় ব্লক প্রস্তুতের জন্য। সেই নেগেটিভটি উল্টে গিয়েই ডান-বাঁয়ের বিভ্রম ঘটিয়েছিল—যাকে ব'লে lateral inversion—আয়নার সামনে দাঁড়ালে যে ব্যাপারটা ঘটে। প্রবন্ধটিতে তথ্যের আরো কিছু ভুল আছে।

১. এটিই বঙ্কিমের একমাত্র পূর্ণ দেহের আলোকচিত্র নয়; ২. এই উল্টো ছবিটিই শুধু প্রচলিত ও স্বীকৃত নয় এবং ৩. রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম আলোকচিত্রে চেয়ারের মাথায় তাঁর বাম হাত নয়, ডান হাত ন্যস্ত রয়েছে।

উল্টো প্রতিচ্ছবি ছাপার ভুলটি সম্ভবত প্রথম ঘটেছিল সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে। তারপর এই প্রতিচ্ছবির পরবর্তী নকলকারীরাই ভুলটিকে আরো ছড়িয়েছেন। অবশ্য নকল করতে গিয়ে আরেকবার নেগেটিভ উল্টে ফেলে কেউ যদি অজান্তে ভুল সংশোধন ক'রে থাকেন, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' সমেত বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থেই তিনি অভ্রান্ত বিরাজ করছেন। আলোচ্য চিত্রটির মতই সুপরিচিত সম্ভবত একই সময়ে একই বেশে ও একই স্টুডিওতে (চেয়ারের অভিন্নতা লক্ষণীয়) তোলা চেয়ারে উপবিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্রের আলোকচিত্রটি। এটির পাগড়ী-বিন্যাস ও ডান-হাতের বইটিই তো নির্দেশ করছে প্রথমোক্ত ছবিটির ঠিক-ভুল। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র এই দ্বিতীয় আলোকচিত্রের সুন্দর প্রতিচ্ছবি রয়েছে।

শেষ জীবনের ফোটগ্রাফ দু'টি ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের আর মাত্র দু'টি আলোকচিত্রের প্রতিচ্ছবির ও তার বিবরণ পাওয়া যায়। তরুণ বঙ্কিমের ও রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত 'শুশ্রূষাধারী' বঙ্কিমের দু'টি ছবির মধ্যে একটিতে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে।

এই ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি রয়েছে মন্মথনাথ ঘোষের 'মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র' বইয়ের ১৬৫ পৃষ্ঠায় (১৩৩১-এ প্রকাশিত) ও সাহিত্যসাধক চরিতমালা-র বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩৪৯)। বাঁ-দিকে অনেকটা হেলে কিছুটা পা ছড়িয়ে, টেবিলে বাঁ কনুইয়ের ভর রেখে বসে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ডানহাতের কানা-ওলা টুপিটি জানুর উপরে ন্যস্ত, কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি, পুরু গোঁফ। ছিপছিপে মেদহীন দেহ। তীক্ষ্ণ চাহনিতে, বসার ভঙ্গিতে একটা বেপরোয়া ভাব। চাপকানের কাঁধের উপর চড়ানো শাল বা চাদরটা পিছনে দু'পাশ থেকে ঝুলছে।

সম্ভবত প্রায় একই সময়ে তোলা বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটি আবক্ষ ফোট-চিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন চরিত' গ্রন্থে (১৩১৮-য় প্রকাশিত)। একই ছবি ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইটির দু'টি প্রবন্ধে বঙ্কিমের তরুণ বয়সের চেহারা ও ফোটগ্রাফ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য ও তথ্য আছে।

দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র লিখেছেন : 'বিয়াল্লিশ বছরের অধিক হইবে [আনুমানিক ১৮৭৩-এর পূর্বে] একদিন বঙ্কিমবাবু আমার পিতৃদেবের সঙ্গে গল্প করিতে ছিলেন, দুই জনে দুইটি তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে অর্ধ-শায়িত ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর গায়ে একটি পাতলা দুগ্ধফেননিভ লং ক্লথের কোট ছিল। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার রং ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার নিজের উপমা ব্যবহার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়া আলো যেমন অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তেমনিই তাঁহার রং সেই কোটের আবরণে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। গোঁফ ও কেশ ঘন ও নিশমিসে কাল। তাঁহার এই সময়ের ফটো আমাদের আছে।'

'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ১৮৮৩ বা ১৮৮৪-তে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে এসেছিলেন দুর্গাপূজা দেখতে। সেদিন নবমী, 'বঙ্কিমবাবুর প্রথম যৌবন কালের একখানি ছোটো ফোট-গ্রাফ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীশচন্দ্র আমায় দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "এখানি দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগের ছবি"।'

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫-তে। রচনাকাল আনুমানিক ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৪। ফোটগ্রাফটি সম্ভবত ১৮৬৪-র মার্চ থেকে ১৮৬৫-র প্রথমার্ধে

মহারাজা বীরচন্দ্রের ফোটগ্রাফের কলোটাইপ প্রিন্ট অবলম্বনে

নীলমাধব ঘে

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফোটগ্রাফ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সদ্য তিরিশ করা ফোটগ্রাফ থেকে

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার মধ্যে কোনো এক সময়ে তোলা। কারণ, ৯ নভেম্বর ১৮৬০ থেকে ৪ মার্চ ১৮৬৪-তিনি খুলনায় ছিলেন। তারপর বদলি হয়ে আসেন বারুইপুর ও ডায়মণ্ডহারবারে। সে-সময়ে কলকাতার বাইরে ফোটগ্রাফ তোলানোর প্রায় কোনোই ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ফোটগ্রাফটি বঙ্কিমের ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়সের। ছবির চেহারাও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল।

শ্রীশচন্দ্র আরো একটি ফোটগ্রাফ দেখেছিলেন সেদিন, 'বাহিরের বৈঠকখানার টেবিলের উপর বঙ্কিমবাবুর আর একখানি বড় ফটো দেখিলাম। খুব অল্প বয়সের ছবি, রবিবাবুর প্রথম বয়সের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের মত চুল, মুখের চেহারাও অনেকটা সেইরূপ, এখন কিছু মেলে না। চন্দ্রবাবু আমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনকার চেহারার সঙ্গে কিছু কি মেলে? আচ্ছা বলতো, এখনকার চেহারা ভাল, কি তখন কার?" আমি তখনকারটাকেই পছন্দ করিলাম। চন্দ্রনাথবাবু হাসিয়া আমার মতে-মত দিলেন। বঙ্কিমবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, "ও কথা সেজবাবু স্বীকার করেন না, বলিলে মারিতে আসেন"।'

দুই বয়সের বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ফোটগ্রাফের কোনোটিরই গ্রহীতার নাম জানা যায় নি। দুঃখের কথা, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় স্থাপিত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের বহু ফোটোগ্রাফের মূল প্রিন্টের অধিকাংশই বর্তমানে অপসৃত। শুধু এককালে তাদের অস্তিত্বের সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে ফোটগ্রাফ-নির্ভর দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু হাতে আঁকা ছবি যার গালভরা নাম 'পেইন্টিং'। প্রাচীন বিবর্ণ ফোটগ্রাফের পরিবর্তে সংগ্রহশালার কর্তাদের কাছে স্থূল রেখার রঙীন পুতুলমানুষের ছবিই বেশি মনোগ্রাহী। কাঁটালপাড়া না গিয়েও এগুলির 'শিল্পমান' বিচার করা সম্ভব গোপালচন্দ্র রায় প্রণীত 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইটির প্রথম কয়েক পাতা উল্টালে।

শেষ জীবনে তোলা চেয়ারে উপবিষ্ট বঙ্কিমের ফোটগ্রাফটির সম্ভবত মূল প্রিন্ট শুধু আজো লড়াই করছে পরিবেশ দূষণের সঙ্গে।

৫

ফোটগ্রাফিক প্রিন্টের আয়ু বিশেষত আমাদের দেশের মতো উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে খুব বেশি নয়। বিবর্ণ, ভঙ্গুর ফোটগ্রাফকে পুনরুদ্ধার করার বৈজ্ঞানিক কিছু পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো উপায়, সময়মতো ফোটগ্রাফ প্রিন্টটির দ্বিতীয় একটি নেগেটিভ তুলে রাখা।

বইয়ে ছাপা ফোটগ্রাফের প্রতিচ্ছবি তুলনামূলক বিচারে দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া

একটি নেগেটিভ থেকে যতই প্রিন্ট করা যাক, ব্লক থেকে তার চেয়ে সুলভে ও সংখ্যায় বহু বেশি ছবি ছাপা সম্ভব। সত্যি বলতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদের অধিকাংশ ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেটই হাফটোন ব্লকের সৌজন্যে আজও আমরা দেখার সুযোগ পাচ্ছি। মূল ফোটগ্রাফিক প্রিন্টের তো কথাই নেই, তস্য তস্য সেকেণ্ড কি থার্ড জেনারেশন ফোটগ্রাফিক প্রিন্টও হয় আজ নিশ্চিহ্ন নয়ত বিবর্ণতার শিকার।

বাংলা দেশে ১৮৫০ নাগাদ ফোটগ্রাফির প্রচলনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হাফটোন ব্লকের আবির্ভাব। এই পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানের কারণেই ফোটগ্রাফের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি হাফটোন ব্লকের প্রচলনের কালেই আর ব্যবহার করার মতো অবস্থায় ছিল না। তবু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিদের যে ক'টি ফোটগ্রাফ বইয়ের পাতায় রক্ষা পেয়েছে তার জন্য আমরা প্রধানত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত বিবিধ জীবনী গ্রন্থ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ভারতবর্ষ'—এই ক'টি পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ ক'রে মন্মথনাথ। ফোটগ্রাফ সংগ্রহে ও মুদ্রণে তাঁর প্রয়াস অদ্বিতীয়।

বইয়ের পাতায় হাফটোন ব্লক-মুদ্রিত প্রতিচ্ছবিগুলির স্থায়িত্ব ফোটগ্রাফিক প্রিন্টের চেয়ে ঢের বেশি, কিন্তু এই ছবিগুলি কপি করতে গেলেই শুরু হয় নতুন সমস্যা। বিভিন্ন আকারের বিন্দুর সমাবেশে গঠিত হাফটোন প্রতিবিম্ব থেকে দ্বিতীয় বার হাফটোন ব্লক তৈরি করলেই তাতে 'ক্রস্ স্ক্রিন এফেক্ট' নামে পরিচিত এক ধরনের নকশা ফুটে উঠে ছবিটির ক্ষতি করে। বারবার এইভাবে হাফটোন ব্লক-মুদ্রিত ছবির কপি করার ফলেই বর্তমানে সুপ্রচলিত বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের প্রতিচ্ছবিগুলি বীভৎস রূপ নিয়েছে। তাছাড়া কপি করার পর অপটু হাতে নেগেটিভ বা প্রিন্ট টাচ্ করতে গিয়েও কি অবস্থা ঘটে তার কথা আগে বলেছি।

এই জাতীয় নানা বিঘ্ন থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার একটি ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট গ্যালারি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, মহাজাতি সদন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি সংস্কৃতি-কেন্দ্রে বহু মনীষীর তৈলচিত্রের সংগ্রহ রয়েছে। কিন্তু আলাদা ভাবে ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট সংগ্রহের কথা কোনো প্রতিষ্ঠানই চিন্তা করেন নি। অতুল বাবুর আঁকা মধুসূদন বা তাঁর পত্নী হেনরিয়েটার তৈলচিত্র নিশ্চয় সংরক্ষণযোগ্য, কিন্তু যে ফোটগ্রাফগুলি এ-কাজে শিল্পীর অবলম্বন সেগুলি কেন অনাদরে থাকবে! একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরি ঘরেই দেখেছি এনলার্জড ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছে।

ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট গ্যালারির উদ্দেশ্য শুধু মূল্যবান প্রাচীন ফোটগ্রাফ বা তার ভালো প্রিন্ট সংগ্রহ করাই নয়, যাঁরা প্রতিচ্ছবি ছাপতে চান তাঁদের নেগেটিভ দিয়েও সাহায্য করা। বিকৃতি রোধ করার এইটাই উপায়।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুসন্ধানের কাজ চালানোর জন্যও একটি ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট

গ্যালারি প্রয়োজন। ফোটগ্রাফির প্রচলনের পর মৃত্যু হয়েছে অথচ ফোটগ্রাফ দেখা যায় না, যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ (মৃত্যু ১৮৭০), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৮৬১) প্রমুখের ফোটগ্রাফ সন্ধান। এমন কি দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও দাগেরোটাইপ ছবির সন্ধান মেলা অসম্ভব নয়। দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় ১৮৪৬-এ, কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি দু'বার বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিশেষত তাঁর দ্বিতীয়বারের পাড়ির সময়ে ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে দাগেরোটাইপ রীতিমতো জনপ্রিয়। ১৮৪২ নাগাদ তোলা বালজাকের দাগেরোটাইপ ছবিটিই তার প্রমাণ। যিনি বিভিন্ন কয়লাখনি ও স্টিমার তৈরির কারখানা ভ্রমণ করেছিলেন, প্রথম অবৈদ্যুতিক কম্পিউটার নির্মাতা ব্যাবেজ যাঁর বন্ধু, যন্ত্রযুগের নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ব্যাপারে কৌতূহলী সেই দ্বারকানাথের পক্ষে তাই ছবি তোলার কল-এর আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল মনে হয় না।

কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' গ্রন্থে লণ্ডনের 'মান্থলি টাইম্‌স' পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'Sir Martin Shee is painting a full-length portrait, and Mr. Say is also taking a likeness of this eminent Hindu.' (Oct. 4, 1842)।

মিস্টার সে, অর্থাৎ এফ. আর. সে-র আঁকা দ্বারকানাথের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে টাঙানো আছে। কিন্তু এই চিত্র রচনায় কি তিনি ফোটগ্রাফির সাহায্য নিয়েছিলেন? না হলে 'taking a likeness' বলা হল কেন? 'likeness' বলতেই ফোটগ্রাফ বোঝায় না, কিন্তু ফোটগ্রাফির প্রবর্তনের পর থেকেই পোর্ট্রেট ফোটগ্রাফ বোঝাতে 'likeness' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

দ্বারকানাথ প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের সময়ে ১৮৪২-এর ২৯ আগস্ট এডিনবরায় আসেন। অন্তত এগারো-বার দিন তিনি সেখানে কাটান। কুইন ভিক্টোরিয়াও এই সময়ে প্রথম এডিনবরা সফর করেন। ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই এডিনবরারই দুই বাসিন্দা ডেভিড অক্টাভিয়াস হিল ও রবার্ট অ্যাডামসন ১৮৪০-এর দশকের সেরা ফোটগ্রাফারদের অন্যতম। তাঁদের তোলা অসংখ্য ফোটগ্রাফিক পোর্ট্রেট রক্ষা পেয়েছে। হিল ও অ্যাডামসনের তোলা ফোটগ্রাফের মধ্যেও দ্বারকানাথের ছবির সন্ধান মিলতে পারে। অবশ্য এগুলি দাগেরোটাইপ ছবি নয়, ক্যালোটাইপ।

স্বীকৃতি

এই লেখার শুরু থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার নির্দেশ ও পরামর্শ পেয়েছি শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীনির্মাল্য আচার্যের কাছে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহ থেকে অমূল্য নথিপত্র, পুরনো ফোটগ্রাফ ব্যবহার করতে দিয়ে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅরণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী দেবলীনা মজুমদার, ডক্টর অলোক রায়, শ্রীমতী পারমিতা বিশ্বনাথন, শ্রীনির্মাল্য দত্ত (আগরতলা), শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদার (সুবর্ণরেখা), ভাস্কর শ্রীঅনিল পাল ও শ্রীসুনীল পাল, শ্রীহরিপ্রিয় পাল, শ্রীধীরেনরুদ্র দেববর্মা, আলোকচিত্রী শ্রীসুমন দত্ত, ডক্টর শ্রীসুগত বসু, শ্রীসজিত বসু ও শ্রীবিশ্বনাথ বসু (ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও)।

ত্রিপুরা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে শ্রীরমেন্দ্র বর্মন, শ্রীবিমান দেব রায়, শ্রীমতী নিবারিণী দেব রায়, শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত ও শ্রীভবতোষ আচার্যের সাহায্যে। ত্রিপুরার রাজকুমার সহদেব কর্তার সৌজন্যে সংগ্রহে করতে পেরেছি অমূল্য প্রাচীন ফোটগ্রাফিক নিদর্শন। সাহায্য পেয়েছি শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়; শ্রীমোনা চৌধুরী, শ্রীবিমল মজুমদার, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, পি. এম. বাক্চি কোম্পানির শ্রীজয়ন্ত বাক্চি, শ্রীদেবব্রত রায়, শ্রীশিশির মজুমদার(শ্যামা প্রেস), শ্রীদেবকুমার রায়, অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীমতী গার্গী দত্ত,, শ্রীঅরূপ রুদ্র, শ্রীবিমান সিংহ, সহকর্মী সত্যেন দত্ত, বন্ধু প্রবীর সেন ও আনন্দরূপ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও শ্রীবিভাস গুপ্ত সর্বদা উৎসাহিত করেছেন।

ফোটগ্রাফ কপি ও এনলার্জমেন্টের যাবতীয় কাজ করেছেন শ্রীসুমন দত্ত ও শ্রীবিকাশ বসু (ফোট হবি সেন্টার)। রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ, কর্মীবৃন্দ ও শ্রীসনৎ বাগচীর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছেও।

I am also indebted to the following persons and institutions for supplying invaluable information and documents: Joan Hayes and the Royal Photographic Society, Mrs. P. Kattenhorn and The British Library, Mr. J. P. Ward and Science Museum, London, Mr. John Hardy (Watford, Herts), Mrs. Zareen Chaudhuri, Mrs. Manisha Chaudhuri, Mrs. I. Sen Gupta and Mrs. Gita Lal.

সোমনাথ হোর

মনে পড়ে, মনে পড়ে না

১৯৩০-৩১ হবে। নরেন্দ্র সেন ছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের প্রৌঢ়। তখনকার দিনে ঐ বয়সকে প্রৌঢ়ত্ব মনে করা হতো। রোজ সন্ধ্যায় গ্রামের জমিদার বাড়িতে হাজিরা দিতেন; ফিরতেন রাত দশ এগারোটা নাগাদ। রাতের খাওয়া ওখানেই সারতেন। একদিন সকালে জানা গেল—আগের রাত্রে ফেরার পথে কয়েকজন যুবক নরেন সেনকে আটক ক'রে কঞ্চির বেড়ার ফাঁকে মাথা গলিয়ে পরনের ধুতি খুলে পাছায় লাল সিঁদুরে ছেড়ে দিয়েছে। এটা স্বদেশীদের কাজ। তারা শাসিয়েছে যে গ্রামে থেকে টিক্‌টিকিগিরি করা চলবে না।

রঘু ডাকাত ছিল এই কর্মের নায়ক। মধ্যবিত্ত পরিবারের রঘু—বছর পঁচিশ বয়স। স্বাস্থ্যবান কালো ডাকাতে চেহারা। ডাকাতি ঠিক করত না, তবে ডানপিটে এবং বেপরোয়া ছিল। লেখাপড়া বিশেষ করে নি, বয়োবৃদ্ধদের খুব একটা সমীহ করত না। সেকালে যা হতো, স্বদেশীরা এদের দলে টানত এবং ভালোমন্দ কিছু কাজ করিয়ে নিত।

রঘু কেন জানি না মনোহারী দ্রব্যের একটি দোকান খুলেছিল—স্নো এসেন্স পাউডার সাবান ইত্যাদি বিক্রি করত। সপ্তায় একদিন পাঁঠা বিক্রি করত। কাটা ছাটা সব নিজেই করত। তখন পাঁঠার মাংস সের প্রতি ছ'আনা দরে বিক্রি হতো।

সম্ভবত ১৯৩১ কি ৩২ সালে একদিন গ্রামের শঙ্খ নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি নাকে রুমাল বেঁধে রঘু ডাকাত কয়েকদিন আগে মারা বিরাট বাঘের পচাগলা শবটিকে তীরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কাটাকুটি করছে। নাকের রুমালে মাঝে মাঝে সুগন্ধি আতর ঢালছে আর বাঁ-হাতে অণ্ডপতি ঘিন ঘিনে পোকা সরিয়ে বাঘের দাঁত নখ সব কেটে বের করছে। জিগেস করতে বলল, 'হ্যাঁ রে খুবই দুর্গন্ধ, তবে এসেন্স লাগাচ্ছি তো। তাছাড়া জানিস, এতবড় বাঘের নখ আর দাঁত অনেক দামে বিকোবে; না বিকোলেও ক্ষতি নেই, ঘরে রেখে দেব, স্বদেশীর কাজে লাগবে।'

ব্যাঘ্র পুরাণের সব খুঁটিনাটি মনে নেই। গরমের ছুটির আগে আমাদের তখন ভোরের স্কুল, হঠাৎ ঝপাঝপ দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল। মাস্টার মশায়রা ব্যস্ত হয়ে ছোট ছোট দল ক'রে নানা অভিভাবকত্বে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামে বাঘ এসেছে।

আমাদের গ্রাম বাঘ-এলাকায় পড়ত না। হঠাৎ কয়েক বছরের ফারাকে একটা কেঁদো বাঘ পথ ভুলে এসে পড়ত ; গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা, গাদাবন্দুক নিয়ে প্রায় উৎসব ক'রে সে বাঘ মারত। এবারে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল—কেউ বলছে হাতির মতো বড় বাঘ—কেউ বলছে কেঁদো। আমাদের ১০/১১ বছর বয়স, আমরা গৃহ-বন্দী। মায়েরা জানলায় অতি সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছেন—বাঘ দেখলেই ফটাফট পাল্লা বন্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে।

ছোট কাকা বললেন, 'যার যা খুশি বলছে—একবার বাঘ দেখে আসি।' পাশের বাড়ির নলিনী চক্রবর্তী বললেন, 'চল খুড়ো, আমি থাকতে ভয় নেই, বাঘ ব্রহ্ম-হত্যা করে না।' পথে ক্ষেমেশ জ্যাঠার সঙ্গে দেখা। উনিও সঙ্গী হলেন। ঘণ্টা খানেক বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট কাকা ফিরে এলেন, তাঁর চোখে মুখে মৃত্যুভয়। সে এক বিশাল বাঘ, পানের বরজে বসে আছে। ওঁরা তিনজনে একই সঙ্গে বরজের বেড়া ফাঁক ক'রে দেখছেন। হঠাৎ নলিনী বলে উঠলেন—'ঐ যে বাঘ।' বাস্, মুহূর্তের মধ্যে বাঘের লাফ ; তিনজনেই ধরাশায়ী, বাঘ নলিনীকে গোটা দুই আদুরে থাবা লাগাল, ক্ষেমেশ জ্যাঠার পিঠের উপর দিয়ে পা ফেলে চলে গেল। কাকা ইষ্টনাম জপ করছিলেন।

নলিনীকে ধরাধরি ক'রে গ্রামের চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসা হল। থাবলা থাবলা মাংস উঠে গেছে। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সদর হাসপাতালে পাঠানো হল। ক্ষেমেশ জ্যাঠার পিঠে বেশ বড় একটা ক্ষত। সারাদিন সদর হাসপাতালে আরো আট জনকে পাঠাতে হয়েছিল। প্রথম যার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল, সে বরজের মালিক—গোলাম রসুল। খুব ভোরে ক্ষেতির কাজে বরজে ঢুকে দেখে, বিরাট জন্তু। ষাঁড়ও হতে পারে এই ভেবে এক বাঁশ এনে তাক বেদম প্রহার। বাড়াবাড়ি দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বাঘ রসুলকে দুই থাবার কিছুটা কচলা কচলি ক'রে আবার বসে পড়ল। পাথরকোঁদা স্বাস্থ্যের অধিকারী রসুলের আর্তনাদ শুনে তার স্ত্রী এসে প্রচণ্ড চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আনা বাঁশ দিয়ে বাঘকে আবার প্রহার শুরু। বাঘ নীরবে মার খেল, কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে হাত না তুলে সরে গিয়ে বসল।

ইতিমধ্যে আরও লোকজন এসে গেছে। তাদেরই কেউ কেউ দেখে বুঝে নিল এ তো বাঘ; রসুলকে সাবধানে বাইরে নিয়ে এসে চারদিকে খবর ছড়িয়ে দিল—'বাঘ এসেছে।' তুফাইক্কা (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) বয়সে আমাদের চেয়ে বড়, ক্লাস দুই উপরে পড়ত। পাশের গ্রাম আমিজুরিতে বাড়ি। ওদের গ্রামে হাতি বাঘ দেখা যেত। হাতি হাতিই ছিল, তবে বাঘ মানে কেঁদো বাঘ। বেতের ছড়ি হাতে বলতে বলতে ছুটল,

'আমাদের গাঁয়ে কত বাঘ মারি, বাঘের ভয় করলে চলে?' বয়স্কে শুকনো কলা-পাতার আড়াল সরিয়ে বেই বলেছে 'ওই যে বাঘ', চোখের পলকে বাঘ তুফাইস্তার ঘাড়ে।

হাসপাতাল থেকে সেরে উঠে ফিরে এলেন যখন, তাঁর নতুন নামকরণ হল—বাঘ খাইয়া; ঘ্যর্থক, বাঘে খেয়েছে কিংবা বাঘকে খেয়েছে।

সোবহান আলি। ইনিও পাতার পরদা ফাঁক ক'রে বাঘ দেখে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'ওই তো হালার পুত।' পলকের মধ্যে বাঘ লাফিয়ে এসে একটি থাবায় একটি গাল ঝুলিয়ে দিল, আরেক থাবায় তাকে চিৎ থেকে উপুড় ক'রে রাজার চালে চলে গেল।

সন তারিখ মনে নেই কিন্তু সে দিনটা বড় ভয়ংকর ছিল। সারা দিনে নয় জন গ্রামবাসী মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। যতই বেলা বাড়ছে, বাঘ ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। পাশের গ্রামে লোক পাঠানো হল কুশলী শিকারীর সন্ধানে। শিকারী এল দুপুর পেরিয়ে। বাঘ দেখে সে হতচকিত। এত বড় বাঘ সে কখনো দেখে নি এবং তার বন্দুকে এই বাঘ মারাও সম্ভব নয়। এক ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে বড় বন্দুক ধার নেওয়া হল। প্রায় ঘণ্টা চারেক অবিরাম লুকোচুরি খেলে লাফিয়ে আসা রয়েল বেঙ্গলের বিরাট হাঁ-এর মধ্যে গুলি চালিয়ে ধূলি ফাটিয়ে দিয়ে শিকারী সঙ্কে নাগাদ বাঘ মারল। গ্রামের লোক হাঁফ ছাড়ল, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে চরম ত্রাস—রাত হলে গুলি-খাওয়া বাঘ সমগ্র এলাকা তছনছ ক'রে বেড়াবে, এই তাদের বিশ্বাস।

বাঘ গেল, শুরু হল অন্য এক নাটক। আমাদের গ্রামে তখন স্বদেশী দমনের জন্য মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে। সকাল-সন্ধ্যায় রুট মার্চ হয়। প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত কিশোর কিংবা যুবকদের বাড়িতে বার বার তল্লাসীর নামে হানা—অকারণে আমাদের মতো কিশোররা বাদের চড়-চাপড়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, সেই মিলিটারি সৈন্যরা বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সারাদিন ধরে কুটোটি নাড়ল না; পেতল মাখা ছোট ছোট ছড়ি হাতে দলে দলে দূর থেকে বাঘ দেখে আর বলে, 'ইয়ে কাম হামারা নেহি', তারাই হঠাৎ ক্যাম্প থেকে রাইফেল নিয়ে এসে মরা বাঘের উপর পর পর বাইশটি গুলি চালিয়ে দিল।

দস্তুর হিসাবে শিকারী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বাঘের চামড়া দাবি করার উত্তর হল এই বাইশটি গুলি। অর্থাৎ 'বাঘ আমরা মেরেছি, অতএব বাঘ আমাদের'! সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদারদের এই দাপট সেদিন নিরুপায় গ্রামবাসীদের কাছে মর্মান্তিক ঠেকেছিল।

শিকারী বাঘের চামড়া পেল না। মৃত বাঘ রেখে দেওয়া হল কমিশনারকে দেখানোর জন্য। উনি শহর থেকে আসবেন এবং দেখবেন তাঁর মিলিটারি ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষায় কতটা ব্রতী! কমিশনার এলেন না। বাঘটিকে তখন শহরে

পাঠানোর জন্য সাম্পানে তোকানো হল। কিন্তু বাঘের বিপুল বপু কয়েকদিনের মধ্যে ফুলে কেঁপে সাম্পানের ছই ছুটিয়ে কাত হয়ে নদীর জলে ভেসে পড়ল। সেই অবস্থায় রঘু ডাকাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর কিনারায় খুঁটিতে আটকে রেখে দাঁত নখ ছাড়িয়ে নিল। মৃত বাঘ দেবতার সম্মান পেল। কারণ কাউকে সে কামড়ায় নি কিংবা প্রাণে মারে নি। এবং এও এক অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার যে, বাঘ তাদেরই শুধু আক্রমণ এবং আহত করেছে, যারা তার সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ কিংবা কটূক্তি করেছে। স্বভাবতই গ্রামবাসীরা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্যে উদ্‌বোধিত। কিন্তু বোধ আসে দেরিতে, তাইতে রক্ষা। এ তো আর অভয়ারণ্য নয়, অপরিচিত পরিবেশে প্রতিপদে বাঘের ক্ষেপে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং ক্ষেপে গেলে বিরাট এলাকা কুমায়ুনের মানুষখেকোর দখলে চলে যেত। কিন্তু জিম করবেটের এই আনকোরা বাঘ এল কোত্থেকে! প্রায় ১০/১৬ ফুট লম্বা—এই বাঘ তো সুন্দরবনের বাসিন্দা। সম্ভবত মিজোরামের পথ ধরে বর্মা মুলুক থেকে এসেছিল। আমাদের পাঠ্যবইতে তখন অতুল বসুর আঁকা আশু মুখুজ্জের ছবি ছাপা হতো। খুব মনোযোগ দিয়ে দুই রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেহারা মেলাবার চেষ্টা করতাম। সত্যি খুব মিল ছিল।

মিলিটারির আমলে স্কুলে একদিন ফতোয়া এল—দল বেঁধে পটিয়া যেতে হবে, সেখানে মিলিটারি নকল লড়াই (mock fight) দেখাবে। তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। অনেকেই ধরা পড়েছেন। কল্পনা দত্তর খুব নাম, উনিও ধরা পড়ছেন। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ন' মাইল হেঁটে পটিয়ায় সেলাম। চারিদিকে মিলিটারি আনাগোনা, কেউ বিদ্রোহী সেজেছে, কেউ মিলিটারি। গুলি-গোলা চলছে। হঠাৎ একটি আগুনে গোলা ওপর আকাশ দিয়ে দূরপ্রান্তে একটি খড়ের ঘরে পড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘর থেকে বেরিয়ে শাড়ি পরা কল্পনা দত্তর মূর্তিটি আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় খুড়তুতো ভাই তড়িৎ ভারী অবাক হয়ে বলল,'ছাখো ছাখো, কল্পনা দত্তর সোঁফ ছাখো।' প্রধান শিক্ষক মশায় তাড়া-তাড়ি ওকে পেছনে ঠেলে দিলেন। মিলিটারির রসজ্ঞান মগজে নয়, ব্যাটনের ডগায় থাকত।

এই সময়ে বম্বের কোনো এক মিলের ধুতি শাড়ি বাজারে পাওয়া যেত, যার লেবেলে হাতে-ছুরি, কোমরে-পিস্তল ঝুলিয়ে এক মহিলা অর্থপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন। কোনো চাকুওয়ালী পিস্তলওয়ালী ছবির নায়িকা হবেন। আমরা ভাবতাম কল্পনা দত্ত। ওটি সংগ্রহ ক'রে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতাম। তল্লাসীর সময় মিলিটারির হাতে পড়লে হুজ্জুতি হবেই—এই বোধ আমাদের ছিল।

মাস্টারদা অর্থাৎ সূর্য সেন কবে ধরা পড়েছিলেন মনে নেই। তবে গ্রামে চাপা উল্লাস বয়ে গিয়েছিল যেদিন জানা গেল যে, নেত্র সেন, সূর্য সেনের আত্মীয় যিনি তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, বিপ্লবীদের হাতে খড়্গাঘাতে কোতল হয়েছেন। পুলিস কোতলকারীর কোনো সন্ধান পায় নি। বহুকাল পরে আমরা তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম

—হাসিখুশি সরল সিধে কিরণ দা। উনি কিছু বলতেন না, অন্তরা জানত।

তখনকার দিনে গ্রামের গোয়েন্দারা নির্বিঘ্ন ছিল না। একবার গ্রামে একটা টাগ মারা হল। টাগ একধরনের আধা বাদুড় আধা শিয়াল জন্তু। গাছ থেকে গাছে হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে। চাটগেঁয়ে প্রবাদ 'বাঘের উপর টাগ, টাগের উপর ট্যাবট্যাবা।' অর্থাৎ বাঘ ঘায়েল হয় টাগের পাল্লায়, টাগ ঘায়েল হয় বৃষ্টির ফোঁটায়। টাগ না কি লাফিয়ে বাঘের মুখ জড়িয়ে ধরে চোখ খুবলে নেয়, তাতেই বাঘ খতম হয়। সেবারে ঘণ্টা তিন চার সমবেত সন্ধান আর হল্লার পর আছোলা বাঁশের বেড়াজালে আটকে টাগ মারা হল। সেই প্রথম এবং শেষ টাগ দেখা।

চট্টগ্রামে ট্যাবট্যাবার বড় উৎপাত ছিল। বর্ষার বৃষ্টি একবার শুরু হলে আর থামতেই চাইত না। বছরে কমপক্ষে বার দুই বন্যা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ছোটরা বড় বিমর্ষ হয়ে পরতাম; দশ-পনেরে দিনেও বৃষ্টির বিরাম না হলে খুঁজে পেতে ব্যাঙ মেরে চালে শুকোতে দিতাম—যাতে রোদ লেগে বৃষ্টি থামে। কিন্তু রোদ লাগলেও থামত না; না লাগলে তো কথাই নেই। মাঝ থেকে কিছু ব্যাঙ মারা পড়ত।

একবার খুব বন্যা হল। বেশ কিছুটা উঁচু জমিতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের উঠোনে প্রায় দু'ফুট জল জমে গেল। মাটির বাড়ি; বাবা একটি মেচান তৈরি ক'রে উঠোনে পুঁতে দিলেন। সারা রাত ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে জলের স্ফীতি দেখেন; খুব দুশ্চিন্তা। আমরা সারা রাত ঘুমুই। দিনে মাছ ধরার ফন্দি ফিকির করি। জল যখন নামতে শুরু করল মা-কাকিমারাও মাছ ধরার হুল্লোড়ে নেমে পড়ল। পুকুর ডুবে গিয়ে সারা উঠোনে মাছের ছুটোছুটি। মা আর জেঠিমা তাড়া ক'রে একবার ৭।৮ সের ওজনের একটি কাতলা মাছ পাকড়াল। আমরা ধরতাম ছোট ছোট কই, মলসে। বন্যার সময় গরীবের বড় কষ্ট। তাদের জমানো কিছু থাকত না বলে উপোস দিতে হতো। সে সময় কাজও জুটত না, পয়সাও পেত না। জল নামতে শুরু করলে অনেকেরই ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ত, তেমনিই জল বাড়ার সময় নীচুজমির বাসিন্দাদের উঁচু আশ্রয়ের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হতো।

বন্যার পর শঙ্খ নদীর পারে পারে পলি পড়ে জমি অতি উর্বরা হয়ে যেত। ধান রোয়া ক'রে কৃষকের বড় সুখ হতো। ট্যাবট্যাবা না হলে কি হয় সে দেখেছি ৪৩ সনে। আবার দেখলাম ১৯৮২-তে। ধরার বিভীষিকা অসহনীয়।

১৯৩১ সাল হবে। বিপ্লবী কাজকর্ম দমনের উদ্দেশ্যে গ্রামে সুরেশ দত্ত এল। বছর ৩৫ বয়স হবে। হিটলারী গোঁফ, কোঁকড়ানো কালো চুল দু'ভাগে বিভাজিত, মাঝারি উচ্চতার মজবুত স্বাস্থ্য। খুব মস্তানি ক'রে বেড়াত, সঙ্গে পিস্তলের অবস্থিতি কারণে-অকারণে জানিয়ে দিত। থাকত স্থানীয় জমিদার বাড়িতে। আমরা ভয় পেতাম।

হেম পাণ্ডা আমাদের চেয়ে কিছুটা বড়। আর খুব রগুড়ে ছিলেন। ভালো গান

করতেন। সে সময় হিন্দু যুবকদের অধিকাংশ জেলে, নয় পালিয়ে থাকত। হেম পাণ্ডা এসেছেন শুনে সুরেশ দত্ত তাঁকে ডেকে পাঠাল। হাজির হতেই সুরেশ দত্ত হুকুম করল, স্বদেশী গান শোনাও। তখন নজরুলের গান মুখে মুখে। হেমদাও গাইতেন, কিন্তু সুরেলা গলায় সুরেশ দত্তকে শোনালেন, 'অজ অথ আম আর ইট কীট উট পাখি রে···!' সুরেশ দত্ত বেওয়াকুফ; রেগে গিয়ে বললেন, 'ফের যদি বেয়াদপি দেখি গ্রেপ্তার করব।' বিনীত হেমদা বললেন, "হুজুর, লেখাপড়ার দৌড় যে ঐ অবধি।'

শৈশবে পড়াশুনা শুরু করি চট্টগ্রাম শহরে। বাবার সঙ্গে থাকতাম, মা গ্রামে থাকতেন। মিউনিসিপ্যাল স্কুল ছিল বিখ্যাত কাছারি পাহাড়ের নীচের ঢালুতে। যাওয়া-আসার পথে এক জায়গায় দেখতাম বড় বড় অক্ষরে একটি বাড়ির সামনে বোর্ডে লেখা আছে—'যীশু বলেন—আমিই সত্য পথ ও জীবন'। আমার কেবলই মনে হতো কথাটি শিশু হবে, বানানে গরবর আছে। এখন মনে হয় বানান তো ঠিকই ছিল, তবে কথাটি শিশু হতে পারত কি?

আমাদের স্কুলবাড়িটি কঞ্চির দরমা দিয়ে তৈরি ছিল। যা হয়, ছাত্রদের অবিরত মনোযোগের ফলে বেড়ার গোড়ার দিকে ভেঙে ভেঙে ফাঁক হয়ে যেত এবং আমরা তাই দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতাম। ক্লাসে সর্দার পড়ুয়া ছিল ইদ্রিস মিঞা, বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। ঝাউ গাছের সরু লম্বা ডাল ওর কাছে মজুত থাকত। ওগুলি আমাদের পিঠে ভাঙত। হাঁটু গাড়া, চেয়ার হওয়া—এগুলি খুব শিখেছিলাম। একবার পেছনের বেড়া দিয়ে গলে বইপত্তর ছেড়ে খেলাধূলায় মত্ত. এই ফাঁকে গরুতে এসে আমি এতদিন যা করতে পারি নি, সেই নতুন কেনা বইগুলি বেমালুম কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলল। বাড়ি ফেরার পর বাবা শুনে বললেন, 'ওকে গ্রামে পাঠিয়ে দিই, ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে থেকে (একান্নবর্তী পরিবার) যদি কিছু হয়।'

গ্রামের স্কুলে পুলিন মাস্টারকে খুব ভয়। চোখে ঝাপসা দেখতেন, কিন্তু বেতে খুব তেজ। একের কারণে অন্যে মার খেত। নানাভাবে ওঁর খুব 'শ্রাদ্ধ' করতাম। একবার প্রাতঃকালীন ক্লাসে পরীক্ষা হওয়ার কথা। ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে দেরি হয়ে গেছে বলে সজল নয়নে স্কুলের পথে যাওয়া করলাম—পুলিন মাস্টার নির্ঘাৎ মার লাগাবে। প্রায় অর্ধেক পথ ছোটার পর মনে হল, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। গা-ঢাকা দিয়ে পেছন পেছন সেজদা আসছিলেন। যখন বেশ ভয় ভয় করছে এগিয়ে এসে হাত ধরে নিয়ে বললেন—'ওরে বোকা, এ তো সাঁঝবেলা; কাল সকালে পরীক্ষা দিস্, এখন বাড়ি চল।' জীবনের সাঁঝবেলায় ভোর আর আসবে না; তবু খারাপ লাগে না—আলোয় কত রঙ!

গ্রামের স্কুলে পাশে খুব একটা অসুবিধা হল না। একটু উঁচু ক্লাসে বাংলা পড়াতেন মনোমোহন বিশ্বাস। ছোটখাট রসিক মানুষটি। রসের মোক্ষম পরিচয় পাওয়া যেত কানে একবার হাত পড়লে; বুড়ো আঙুল আর তর্জনী কানের পাতের

ভেতর দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করত, আর তা হতো মরণান্তিক। সুরেন ভট্টাচার্য ডাস্টার দিয়ে পেটাতেন, তবে বেশি নয়। এমনিতে খুব স্নেহশীল ছিলেন। পরীক্ষিৎ-বাবুর বেত খুব চলত। পরীক্ষার সময় নকল করা খুব অপছন্দ করতেন এবং তালে থাকতেন হাতেনাতে পাকড়াও করার জন্য। ধ্রুব সেন খুব বিচ্ছু ছিল। একবার পরীক্ষার হলে বসে কেবল পকেটে হাত দিচ্ছে আর উস্‌খুস্ করছে। অনেকক্ষণ নজর করার পর আচমকা ধ্রুবর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। পকেট থেকে বেরোল খোসা ছাড়ানো মজা কলা—হাতে লেপটে গেছে। ধ্রুব আপশোস্ ক'রে বলল, 'টিফিনে কলা খাওয়া আর হল না।'

সংস্কৃত পণ্ডিত মশায়ের নাম ভুলে গেছি, কোনো এক স্মৃতিতীর্থ হবেন। খুব নস্যি নিতেন আর সঙ্গে বেত থাকত, প্রায় সকলেই পড়াশুনায় ফাঁকি দিত, মার খেলেও ওঁকে বিশেষ ভয় পেত না। বিমলকে মারতে গিয়ে একবার খুব নাজেহাল হয়েছিলেন। মারার জন্য উদ্যত বাবা সজোরে পড়ল লম্বা টেবিলের শক্ত কাঁধে; কারণ বিমল তুরন্ত টেবিলের তলায়। আবার যখন তাড়া করলেন, বিমল জানলা দিয়ে গলে ব্যানার্জিদের পুকুরপাড়ে ফলবাগানে। আমরা স্তব্ধ, ঘটনা হাস্যকর হলেও ঠিক হাসির নয়। পরে প্রধান শিক্ষকমশায় কিছু শাস্তি দিয়ে থাকবেন।

মালদা জিলা স্কুলে যিনি সংস্কৃত পড়াতেন, তিনি খুব হাসিখুশি রসিক শিক্ষক ছিলেন—যা সাধারণত দেখা যায় না। গায়ে শুধু একটি উড়নি জড়িয়ে চেয়ারে বসে মুখে মুখে শেখাতেন। প্রিয় ছাত্র লেবুকে একদিন বললেন সংস্কৃতে অনুবাদ কর—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর,
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর।'

লেবু অম্লানবদনে অনুবাদে যা বলল তার মর্মার্থ দাঁড়াল—পুকুরে পদ্ম ফুটেছে আর শোভা মনোহরকে জড়িয়ে ধরেছে—সত্যই কি অপূর্ব দৃশ্য! বাস্টারমশায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কি একটা রসিকতা করায় লেবুর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

বাবার মৃত্যুর পর মালদা জিলা স্কুলে পিসেমশায়ের কাছে পড়তে গেলাম। পিসিমা বললেন, 'সমুকে সংস্কৃতে লেটার পেতে হবে।' নবম শ্রেণীতে শতকরা ৩২ নম্বর পেয়ে এক বছরের প্রস্তুতিতে দু-দুটো লেটার পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু আসলে পুরোটাই মায়া। উনি ব্যাকরণ কৌমুদী এবং Study of Sanskrit মুখস্থ করিয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর মুখিয়েছিলেন মাত্র। পরীক্ষা অবসানে পুনর্মূষিক থেকে গেলাম।

পিসিমা এবং পিসেমশায় কোনো এক আশ্রমের শিক্ষত্ব নিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের উৎসাহে পিসিমা ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। পিসেমশায় মালদা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দু'জনেই অত্যন্ত সৎ লোক—নিরামিষাশী এবং নির্বিরোধ। দু'জনেই খুব রুগ্ন ছিলেন। পিসেমশায় একটু খিটখিটে করতেন; আমরা ভয়ও পেতাম, তবে ঐ পর্যন্তই। ওঁদের একটি দুধের ছাগল ছিল, প্রচুর দুধ দিত। পিসিমা

বললেন, 'সমু তড়িৎ ছাগলের দুধ খাও, মাথা খুলবে। তড়িৎ মুখে দিয়েই বলল, বিচ্ছিরি গন্ধ, আমি খাব না। সমু সুশীল ছেলে, যাহা বলে তাহাই খায়। ছাগলের দুধ, ছানা, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে শুরু করলাম। মালদা ছাড়ার পর ছাগলের দুধ আর খাই নি।

সেই ছাগলের বড় একটি এঁড়ে বাচ্চা হল। ভারি সুন্দর। রাস্তার ওপারে সামনের বাড়িতে অশোকবাবু থাকতেন। উনি ওটি চেয়ে নিয়ে নাম রাখলেন 'বুধন'। ভালো খেয়ে ব্যাটা শশিকলার মতো বাড়তে লাগল। হঠাৎ একদিন ওর পাত্তা নেই। সবাই বলল বাঘের পেটে গেছে। তখন মালদা শহরের কাছাকাছি জঙ্গল ছিল। দু'রেকটা কেঁদো বাঘ চরাচর করতো। তবে কারো কারো অনুমান কচি এবং নধরকান্তি বুধন বোলবিলাসীদের ভোগে গেছে।

পিসেমশায়ের সঙ্গে আমি ও তড়িৎ প্রথম মালদা যাই ট্রেনে চেপে; সেই আমাদের প্রথম বাইরে যাওয়া। রাত্রে চট্টগ্রাম স্টেশনে উঠে দেখি সবাই বিছানা পেতে শুয়ে আছে। পিসেমশায় অন্য কামরায় উঠেছিলেন, আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে। তৃতীয় শ্রেণীতে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা থাকত না। আগে ভাগে এসে যে যার মতো আসন দখল ক'রে শুয়ে পড়ত। আমরা এসব জানতাম না, একটি বেঞ্চের কোণে জড়সড় হয়ে বসলাম। সারারাত নড়াচড়া করি নি। পরদিন সকালে চাঁদপুরে স্টিমারে, স্টিমার থেকে আবার ট্রেনে, বিখ্যাত সারা ব্রিজ পেরিয়ে বোধ হয় তৃতীয় দিনে কোনো একটা সময়ে মহানন্দার তীরে একটা স্টেশনে নেমে, নৌকোয় নদী পেরিয়ে ইংরেজবাজার হয়ে পুরনো মালদা শহরে পৌঁছেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে এই দীর্ঘ যাত্রায় গ্রাম্য সংকোচে একবারও 'প্রাকৃতিক' প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারি নি! সারা পথ চুপচাপ শুধু রাস্তা দেখে গেছি। মাঝে মাঝে পিসেমশায় এসে কিছু খাইয়ে দিতেন। এক-কামরা অপরিচিত লোকের মধ্যে খেতে খুব সংকোচ হতো।

মালদায় পৌঁছেই পিসেমশায় বাটা থেকে আমাদের দেড় টাকা জোড়া বাটার কেড্‌স জুতো কিনে দিলেন। সেই আমাদের প্রথম জুতো পরা। ১৯৩৭ সালের গোড়ার কথা—বয়স তখন বোলো দু'ই দু'ই।

বাবা বেঁচে থাকতে একবার পরীক্ষার পর ডিসম্বরের শেষ দিকে অনঙ্গ কাকাকে বলে দিলেন শহরে ফেরার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেন বাবার কাছে পৌঁছে দেন। ছুটি-ছাটাতে বাবার কাছে থাকা আমার কাছে খুব লোভনীয় ছিল।

প্রচণ্ড শীতে দোসুতী চাদর গায়ে খালি পায়ে পাঁচ মাইল শুকনো ধান ক্ষেতে কেঁচোতে তোলা মাটিতে ঠোক্কর খেতে খেতে রেলস্টেশনে যখন পৌঁছলাম, দু'টি পা তখন রক্তাক্ত; সে দিনের কষ্ট এখনো অনুভব করি। তবু শহরে পৌঁছে বাবার কাছে যেতে পারার আনন্দ সব কষ্টকে ছাপিয়ে গেল।

১৯৩৪ সনে আবার একদিন যেতে হয়েছিল। যখন বেরোচ্ছি—সম্মুখে সেগুনের উঁচু ডালে একটি শকুন বসে, আগে পরে কোনোদিন যা দেখা যায় নি। শহর থেকে

হলতান এসেছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য—বাবা শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন ; দীর্ঘ দু'মাস কঠিন রোগভোগ এবং অস্ত্রোপচারের পর যখন বুঝলেন সলতের তেল নেই, কতই বা বয়স—৪৬ মাত্র, জ্যেষ্ঠ সন্তান আমাকে দেখতে চাইলেন। পৌঁছে দেখলাম সব শেষ। শব ঘিরে আকুতি ও কান্না। আমি বোবা হয়ে গেলাম। ধীরে-ধীরে উপলব্ধি হল—একান্নবর্তী পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী এই মহীরুহের পতনের ফলে সংসারে অঘটন ঘটবে। তাই হল, কিছুকাল পরে, মহেন্দ্র ধূর্ণী হাটে একদিন বলল, 'তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। গয়নাচুরির অভিযোগে বরদার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার শাস্তি তোমাদের পেতে হবে।' শুনে বড় অসহায় বোধ হয়েছিল।

বাবা যে-বছর মারা গিয়েছিলেন, সে-বছরের গোড়ার দিকে সম্ভবত চৈত্র-বৈশাখ মাসে মার সব সোনার গয়না চুরি হয়ে গেল। মা শহর থেকে গ্রামে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। ৩২ ভরি সোনার সবই গেছে। খবর পেয়ে থানা থেকে দারোগা পুলিস এল, প্রথমেই সন্দেহ করল গৃহভৃত্য বরদাকে। তার ভাই মণীন্দ্র চুরির দিনে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তাকেও পুলিস গ্রেপ্তার করল এবং যথারীতি তৃতীয় ডিগ্রির প্রয়োগ। মারের চোটে দু'ভাই পুকুরে ঝাঁপ দিল। ধরে এনে আবার প্রহার। বরদা বলল, 'জানি বলব।' কিন্তু বলবে কোত্থেকে, ও তো চুরি করে নি। ও রকম সৎ লোক হাজারে একটি হয় না। মহেন্দ্রর মতো লোকেদের অসহায় বোধ আমাদের চেয়ে বেশি।

বাবা বাড়ি ছিলেন না ; খবর পেয়ে এসে শুনে বললেন, বরদার গায়ে হাত তোলা চলবে না। দারোগা পুলিসকে বিদায় করা হল, পুলিসী তদন্ত আর হল না।

মঞ্চে আবির্ভাব হল সূর্যকান্ত আচার্যের। সূর্যকান্ত ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। নানা লোকে তার অলৌকিক কাহিনী শুনেছে। নানা হুঙ্কার, মন্ত্রপাঠ, বাগযজ্ঞের মারফত বাড়িতে এমন এক আবহাওয়া তৈরি করল যাতে প্রকৃত অপরাধী ভয় পায়। শুরুতেই ঘটনার বিবরণ শুনে অনুমান ক'রে নিল যে, চুরির পেছনে বাড়ির লোক আছে। আমার এক জ্যাঠতুত দিদি এবং তাঁরই বছর ষোল বয়সের দাদা ভয় পেয়ে সব কবুল করল—বলল, 'বরদার ভাই মণীন্দ্রর সহায়তায় গয়না সরানো হয়েছে, উদ্দেশ্য স্বদেশীর কাজে লাগানো হবে। বাবার স্নেহভাজন অমি পিসি এবং তাঁর রাজনৈতিক দাদা, বছর পঁচিশের গ্রামেরই এক যুবক এই গয়না হাতিয়ে নিয়ে শহরে পাড়ি দিয়েছে ; নাগালের বাইরে, কাজেই কিছুই পাওয়া গেল না। সূর্য ঠাকুরের জয়গান হল, কিন্তু কেলেংকারি আর বাড়ল না।

বরদা অভিশাপ দিল না। বাবার শব যখন দাহের জন্য শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে আনা হল, বরদা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং শ্রাদ্ধ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ সন্তানের মতো অক্লান্ত পরিশ্রম করল ; এক বছরের মাথায় সেও চলে গেল।

দুই শাপভ্রষ্ট মুক্তি পেল। একজন অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, অন্যজন দরিদ্র। শ্রেণী-

বিভক্ত সমাজের অমোঘ নিয়মে একে অন্যের কারণে নিগৃহীত হল। জীবননাট্যের যবনিকায় দু'জনে আবার একে অন্যের সঙ্গী।

অমি পিসি 'ঘরে বাইরে'-র বিমলা ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন – তিনি আর যাই হোন, নিখিলেশ নন। তাঁর প্রণয়ীকে সন্দীপ বলা চলে। সব করতেন গোপনে, সম্ভবত অনুশীলন দলের ছত্রছায়ায়। লোভ আর লালসা, দুই-ই নিয়ে পার্টিকে পাশ কাটিয়ে তাঁরা পাড়ি দিলেন সুদূর কলকাতায়। মণীন্দ্র, দিদি এবং দাদা অসহায় ক্রীড়নক হয়ে রইলেন – দলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হিমাংশু দাসেই শেষ ছিল।

বীরেন কাকা সদাশিব বলে জানিত ছিলেন। তবে আর যাই হোক তিনি শিববীর্য ছিলেন না। হুতখন জমিদার, প্রায় সারাদিন হুঁকো টানতেন। চেহারায় আভিজাত্য থাকলেও, ঘটে বুদ্ধি ছিল না বললেই চলে। অমিপিসি ছেড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। কিন্তু দন্তহীনের আপেল খাওয়ার শখের মতোই অবস্থা হল। ৪৮ সনে শেষবারের মতো গ্রামে যাই। তিনি তখন বেঁচে নেই। কিন্তু গৃহভৃত্যের ঔরসজাত সন্তান তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। চেহারায় পিতৃপরিচয় স্পষ্ট। বীরেন কাকা বেঁচে থাকতেই তার জন্ম এবং তাকে আপন সন্তান জ্ঞানে পালন করতেন।

আজ ঝাপসা চোখে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সমাজ সংসারের বেড়া ডিঙিয়ে পুরো দৃশ্যটাকেই বড় সহজ সাবলীল মনে হয়। অমি পিসির বঞ্চনাবোধ, বীরেন কাকার সন্তান কামনা, তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর স্বাভাবিক জীবনচর্যা, আর গৃহভৃত্য শচীনের যৌবন সম্ভোগ ; সবই সরলরেখায় এগিয়েছে ; কোনো জটিলতা নেই।

১৯২৯ কি ৩০ সালে গান্ধিজীর আহ্বানে বাড়িতে বাবার উদ্যোগে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হল। মা সেই যে খদ্দর ধরলেন, সধবা জীবনে খদ্দর ছাড়া দিশি মিলের কাপড়ও পরতেন না। বাবা তো বরাবরই দোসুতী খদ্দরের কোট প্যান্ট কিংবা ধুতি শার্ট ইত্যাদি পরতেন। আমাদেরও পরতে হতো ; যদিও ঠিক মনঃপূত হতো না। ছেলেদের সবাই তকলি আর মেয়েরা চরকা নিয়ে সুতো কাটত। অবশ্য বেশিদিন এসব চলে নি। জ্যোতিষী দেখলেই হাত দেখাতাম, আর জিগেস করতাম ভারত কবে স্বাধীন হবে। হাতের রেখা বিচারে তারা বলত এক বছরের মধ্যে। গান্ধিজী বোধহয় এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার কথা বলেছিলেন। স্বরাজ এল না বলে দাদাদের মতো আমরাও গান্ধিজী, অহিংসা – এ সবে বিশ্বাস হারালাম। মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, চারুবিকাশ দত্ত – এরাই আমাদের বীর নেতা।

আমাদের জ্যাঠতুত দাদা সুধাংশু রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। জ্যাঠামশায় এসব পছন্দ করতেন না, কিন্তু দাদা শুনতেন না। ফিরিঙ্গিবাজারে ছিল আমাদের বাসস্থান। একদিন রাত প্রায় আটটায় বুকচেরা আর্তনাদ, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সুধাদাঘরে ঢুকলেন – সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে – যুগান্তর পার্টির

ছেলেরা তাঁকে সাইকেলের চেন দিয়ে নৃশংসভাবে মেরেছে। জ্যাঠামশায় বকাবকি করলেন, কাকা পুলিসে খবর দিতে চাইলেন। দাদা নারাজ, ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল, শোধ নেবেন। দিন দুয়েকের মধ্যেই শোধ-বোধ হয়ে গেল—পালটা মার—ট্যাগরা আর তার সঙ্গীকে। সেই ট্যাগরা পরবর্তী কালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে আত্মদান ক'রে যে অমর হয়ে রইল। অন্তর্দ্বন্দ্বে কত যে রক্ত তখন অকারণ ঝরেছে তার ঠিক নেই।

স্বদেশী সুধাদার জন্য আমাদের খুব গর্ব ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অন্তরীণ থাকাকালে অল্পবয়সে মারা যান। লোকে বলে ক্রম বিষারণের (slow poisoning) ফলে এই অকালমৃত্যু।

সতীন্দ্র সেন আমাদের গ্রামে মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি অনুশীলন দলের একজন কর্মী ছিলেন। তাঁর বিশাল স্বাস্থ্য আমাদের ব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করত; দলে পড়ে ব্যায়াম অনেক করেছি তখন, তবে গন্তি লাগে নি। বাংলা বছরের শেষ দিকে গ্রামে ষাঁড়ের লড়াই হতো। আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতাম। একবার একটি ষাঁড় ক্ষেপে গেল। দর্শকের সারি থেকে সতীনদা কী কৌশলে ষাঁড়ের শিং বাগিয়ে ধরে তাকে মালিকের জিম্মায় দিলেন। আমরা বিস্ময়ে গর্বে উৎফুল্ল।

প্রায় একই সময়ে কুস্তি খেলা হতো। একোয়াল বলী (একবাল মিঞা) ছিল শ্বেত শ্মশ্রু এক মুসলমান ক্ষুদ্র চাষী। যৌবনে কুস্তিগীর ছিল বলে 'বলী' বা বলবান নামে খ্যাত। প্রতি বছর গ্রামের সম্পন্ন লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে সোনার জলে চোবানো মেডেল কিনে আনত। কালো কিতের ঝোলানো সেই মেডেলগুলো দেখে কুস্তিগীর হওয়ার ইচ্ছে হতো। খোলামাঠে দিন ক্ষণ ঠিক ক'রে কুস্তিখেলা হতো। এই সময় চারপাশের গ্রামগুলি বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যেত। প্রধানত মুসলমান চাষীরা এতে অংশ নিত। সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে হাজির থাকত। আমরা বড়দের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে থাকতাম। মারামারি হবেই; সেটা শুরু হতেই যাতে ছুট লাগানো যায় তার মানচিত্র ভেবে নিতে হতো। গণ্যমান্যরা যখন খেলা দেখতে যেতেন, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হতো। একোয়াল বলীর বড় ছেলে টুনু বলী খুব নামী খেলোয়াড় ছিল। লম্বা লোহাপেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী এই বলী আমাদের পাশের বৈলতলী গ্রামে থাকত। তার জন্য আমাদের বিশেষ গর্ব ছিল, কারণ আমাদের গ্রামে গর্ব করার মতো বলী কেউ ছিল না।

ফি বছর গ্রামে আরেক ধরনের লড়াই হতো। শঙ্খ নদীতে শ্রাবণের ঢলে প্রায় নদীর পারে ভাঙা-গড়া চলত। নতুন চরের দখল নিয়ে মারদাঙ্গা হতো। ঘোষিত দিনে দু'পক্ষের লাঠিয়ালরা পরস্পরের মাথা ফাটাফাটি করত, কিছু খুন হতো, কিছু আহত এবং আইন আদালত। যারা সর্বস্বান্ত হতো তাদের হাহাকারের অন্ত থাকত না। জমিদারদের স্বার্থ কি ক'রে এর মধ্যে জড়িয়ে যেত বুঝতাম না, কিন্তু তাদের

উত্তেজনা দেখে মনে হতো গভীরে কিছু আছে।

নজরুলের গান তখন মুখে মুখে। গাইতে পারতাম না, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। স্বদেশী ছেলেরা গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ইত্যাদির মহড়া দিত। বন্দেমাতরম্ ও নজরুলের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন হতো। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে' অথবা 'লাথি মেরে ভাঙরে তালা যত সব বন্দিশালার, আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা'—শুনতে শুনতে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যেত। বন্দিশালা বলতে কারাগার বোঝাত নিশ্চয়ই; আমি ভাবতাম বন্দীদের উত্তেজিত করার জন্য 'শালা' সম্বোধন করা হচ্ছে। আমরা নজরুল যতটা জানতাম রবীন্দ্রনাথ অতটা জানতাম না; কারণ ছোটদের কাছে নজরুলের গানের সাময়িক ব্যঞ্জনার আবেদন খুব জোরালো ছিল।

গ্রামের জমিদার যোগেশ সেনেদের বাড়িতে পুজোর সময় যাত্রা হতো। যাত্রা দেখতে গ্রামের লোক ভেঙে পড়ত। আমরাও যেতাম; আগে ভাগে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আসরে গিয়ে বসতাম। নানা ভালবাহানায় মাঝরাত্রে শুরু হতো, শেষ হতো ভোর রাত্রে। সকালবেলা শূন্য আসরে টিনের চুমকি কুড়োতাম—সেগুলো খুব দামী মনে হতো। আরো লোভনীয় মনে হতো ঝাড়-লণ্ঠনের বেলোয়ারি কাচ এবং লাল নীল কাচের ছোট ছোট ঝুলন্ত বলগুলি। এখনও ওগুলি মন কাড়ে—'ফুলকুমারী ঘোমটা খোলো, ডাকছে তালে বুলবুলি হায়'; 'কে বিদেশী মন উদাসী, বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে'; 'চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর আঁখির টানে' ইত্যাদি গান যাত্রায় সখীর দল নেচে নেচে গেয়ে যেত। বয়স্ক শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে দেখত আর শুনত। সেই সব রমণীয় ছোকরাদের সম্পর্কে সকলেরই নানা কৌতূহল থাকত। একবার সকালে শোনা গেল একটি ছোকরাকে কারা লুঠে নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে গ্রামের দুই দলের ঝগড়া মারামারিতে পর্যবসিত। টুনু বলীদের কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত। অসহায় অধিকারী লুণ্ঠিত ছোকরার সন্ধানে সকলের কাছে মিনতি ক'রে ঘুরছে। পরে বড় হয়ে এর মর্মার্থ অনুধাবন করেছি। তখন বুঝি নি। তখন এও জানতাম না যে এগুলি নজরুলের গান—চটুলতায় যা অতুলনীয় ছিল এবং গ্রাম বাংলার এক অংশে যৌনতায় আলোড়িত করত। অথচ গানগুলি খুব সুন্দর, এখনো শুনতে ভালো লাগে।

পুলিন চৌধুরীরা ছিলেন সুবর্ণখোর মহাজন। তাঁদের বিপুল সম্পত্তি। অন্যরা নামে জমিদার, পুলিনবাবুরা আসল ধনপতি। তাঁদের বাড়িতে এক শহরে যাত্রাপার্টি এসেছে সম্ভবত কলকাতা থেকে। ৩।৪ দিন ধরে যাত্রা হবে। আমরা প্রথম দিন 'কালাপাহাড়' দেখে এলাম। কালাপাহাড় চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতার মাথায় চুল শুরুতে ছিল বিলম্বিত; দৃশ্যে দৃশ্যে মাথা ঝাঁকানোর সঙ্গে তাল রেখে সে চুল বিশালাকার ধারণা করল; অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ। ইচ্ছে ছিল আবারও দেখব, কিন্তু বড়রা যেতে দিলেন না। পরের দিন সারা গাঁয়ে হৈ চৈ। কী একটা নাটকে

মহিলা শিল্পীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে গ্রামের স্বদেশী ছেলে-পেটানো দারোগাবাবু বেসামাল হয়ে তার উপর দুষ্কৃতি করার চেষ্টা করেন, প্রচুর কুট ঝামেলা হয়। যাত্রা দল ক্ষুব্ধ হয়ে দু'দিন আগেই চলে যায়।

পুলিনবাবু, যোগেশবাবুদের দারোগাপ্রীতি নিয়ে গ্রামের যুবকেরা ক্ষুব্ধ ছিল। বীরেন সেনগুপ্ত ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ছোট ভাই। তাঁদের গৃহে পুলিশের আস্তানা হতো না।

আমাদের পাশের বাড়ি ছিল নলিনী চক্রবর্তীদের, যিনি বাঘের খপ্পরে পড়েছিলেন। তাঁর মা দুর্গা ঠাকরুণ জাঁদরেল মহিলা ছিলেন। অল্পবয়সে পঞ্চ সন্তান নিয়ে বিধবা হওয়াতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়তে গিয়ে সন্তবত সবাইকে শত্রুজ্ঞান করতেন। তাঁর মেজোছেলের স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকত। একদিন দেখি উঠোনের মাঝখানে বউকে বসানো হয়েছে, সামনে বিরাট ধুনি, আগুনে মস্ত মানকচুর পাতা সেঁকা হচ্ছে – গায়ে ব্যথার জন্য সংসারের কাজ করতে অপারগ বলে বউয়ের চিকিৎসা হবে। পাত আগুনের মতো গরম ক'রে বউয়ের পিঠে চেপে ধরা হচ্ছে। বউ আকুল চেঁচিয়ে দেখাচ্ছে – পিঠের থেকে পিছনে এসেছে, পিছনে লাগালে পেটে, পেট থেকে বুক, বুক থেকে আবার পেটে ইত্যাদি। সে এক আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা এবং বউয়ের অদম্য প্রতিরোধ। হঠাৎ দেখা গেল, উপস্থিত ভাশুরদের মধ্যে বচসা হতে হতে উঠোনের ভাঁই করা জ্বালানি কাঠ পরস্পরের পিঠে ধপাধপ পড়তে শুরু করেছে। রুগ্ন বড় ছেলের পক্ষ নিয়ে মাও কাষ্ঠযুদ্ধে লেগে গেল; কিছুক্ষণ ধরে কে যে কার পিঠে চালাচ্ছে বোঝা গেল না। এই যুদ্ধুমার লড়াইয়ের ফাঁকে বউ সটকে পড়ল। এই রূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে শুরু করল এবং টগরের রোপের ফাঁকে আমরা দর্শকের ভূমিকায় থাকতাম। মেজো বউয়ের লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছল; একদিন শোনা গেল বউ পালিয়ে গেছে। বহুদিন পরে জেনেছিলাম, দুর্গা গাঙ্গুলি এক সহকারীর সাহায্যে তাকে শহরে পৌঁছে দেয়। সেখানে সে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ক'রে নার্সিং শিখে হাসপাতালে কাজ নিয়েছে।

দুর্গাদা গাঁজা খেতেন। তাঁর গায়ে বাঘের শক্তি ছিল, আমরা ছোটরা বেশ ভয় পেতাম – কিন্তু কারও ক্ষতি করেছেন বলে শুনি নি। তাঁরই জ্ঞাতি সম্পর্কে তাঁর কাকা সতীশ গাঙ্গুলিও গাঁজা খেতেন। আমরা কখনো খেতে দেখি নি, গাঁজা কি বস্তু তাও জানতাম না, লোকমুখে শুনতাম। সতীশ গাঙ্গুলী সম্পর্কে নানা প্রচলিত গল্পের মধ্যে একটি হল, এক মেমসাহেবকে পাঁজাকোলা ক'রে দোতলা থেকে লাফিয়ে উধাও হয়েছিলেন। মেমসাহেব জড়িত থাকায় আমরা খুব শিহরিত হতাম। কারণ এর মধ্যে ইংরেজ রাজের ইঙ্গিত অনুভব করতাম।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত-র গ্রাম 'বরমা'য় আমাদের জন্ম। দেশের কাজে খুব নামডাক ছিল, সেজন্য তো বটেই, মেমসাহেব বিয়ে করেছিলেন বলেও আমাদের খুব গর্ব ছিল। আমরা সাহেব-বিদ্বেষী ছিলাম, কিন্তু মেম পরিগ্রহ করলে পরিস্থিতি

কেমন পালটে যেত। অবচেতনে এমন ধারণা হয়ত ছিল যে, বোমা পিস্তলে হত্যা এবং মদনবাণে ঘায়েল করা একই রকম ফলপ্রসূ। নেলী সেনগুপ্ত শুধু হৃৎয়ে বিদ্ধ হন নি, ভারত প্রেমেও সমান বিদ্ধ হয়েছিলেন – জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের সেবা করেছেন।

সতীশ গাঙ্গুলী গ্রামের পূর্ব প্রান্তে কিছুটা নির্জন স্থানে একটি কালীবাড়ি ক'রিয়ে-ছিলেন। ওঁর ছিল বিরাট গোঁফ জোড়া আর লাল চোখ। সম্ভবত তন্ত্রসাধনা করতেন। বলা বাহুল্য, এ সব বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। সে যাই হোক, একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখি ঘরের ভিতর দেয়ালে কী সুন্দর ছবি, দু'জন গ্রাম্য শিল্পী মাটির দেয়ালে 'শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র' কাহিনী আঁকছে। দিশী রঙ তুলি। অপূর্ব আলো-অন্ধকার গাছগাছড়া শেয়াল শকুনি জ্বলন্ত চিতা ইত্যাদি নিয়ে আমার চোখে এক অপার বিস্ময়! আমি মাঝে মাঝে যেতাম এবং ওদের আঁকা দেখতাম। লোকে আঁকে কি ক'রে – বড় ভাবাত। ঐ আমার প্রথম কোনো একজনকে সরাসরি আঁকতে দেখা।

অজিত দাস বয়সে আমাদের চেয়ে বড় ছিল। বারে বারে ফেল ক'রে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। ভালো ফুটবল খেলত আর গানের গলা ছিল। ওর বাবা ভালো বাজানোর সুবাদে হারমোনিয়ম দাস বলে পরিচিত ছিলেন। অজিতও হারমোনিয়ম বাজাতে পারত। যাত্রা দলের গানগুলি ওর মুখে লেগে থাকত। আমার চিবুক ধরে বলত, 'আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দেরই নন্দন, তোমারে বানাবো রাধা।' গাইবার ভঙ্গিতে কেমন একটা অশ্লীলতার গন্ধ পেতাম। অশ্লীল কথাও খুব বলত, যার স্পষ্ট মানে বুঝতাম না। ওর একটা চালু প্রতিপাদ্য ছিল – যাদেরই ছেলেমেয়ে আছে তারা খুব বদমাস। আমাদের বাপ-মা তো বটেই, এমন কি অতবড় দেশনেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তিনিও; কারণ তাঁরও সন্তান আছে। বয়ঃসন্ধিকালে এগুলি সংশয় জাগাত।

অজিত সম্ভবত আমাদের যৌনজ্ঞান দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু তাতে আমাদের জ্ঞানের বদলে অজ্ঞানতাই বাড়ত। ভারতবাবু আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। উনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন। উনি এবং আমাদের স্বদেশী গন্ধওয়ালা জ্যাঠতুত দাদা, যাঁকে আমরা ছোড়দা বলতাম, বাড়ির ছেলেদের বয়ঃসন্ধির চঞ্চলতার কিছুটা বিহ্বল বোধ ক'রে আমাদের পড়তে দিলেন অশ্বিনী দত্তর ভক্তি যোগ, কর্মযোগ। খুব একটা কাজ হল না দেখে ওঁরা প্রত্যেককে একটা ক'রে চার্ট ক'রে দিলেন। চার্টে অনেকগুলি ঘর কাটা ছিল। পবিত্রতা, অপবিত্রতা, সুকর্ম, কুকর্ম, কলহ, পরচর্চা ইত্যাদি। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের মেজদার দারিদ্র্যবোধের মতোই, দিনে কতবার কি পাপ করা হল, দেহমন কুচিন্তায় কতবার অপবিত্র হল, যোগবিয়োগ চিহ্ন প্রয়োগ ক'রে এগুলি নথিভুক্ত করা হতো। সপ্তায় একদিন ছোড়দা কিংবা মাস্টারমশায় দেখে নিয়ে আমাদের চরিত্র সংশোধন করতেন। নরকের কীট ছিলাম বলে

আমাদের পাল্লা ভারী ছিল। চার্টের ক্ষমতা ছিল না দেহমনের স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করা।

প্রধান শিক্ষক মশায় প্রথমা পত্নীর প্রয়াণের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। প্রবাসে থাকতেন বলে প্রতি সপ্তাহে তাঁকে বাড়ি যেতে হতো, আবহাওয়া যতই দুর্যোগপূর্ণ হোক না কেন। আমরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম, বড়রা অতটা করতেন বলে মনে হয় না। বছর দশেক বাদে খানিকটা চালু হয়ে যখন গ্রামে আসি, তখন তাঁর নামে বেশ কিছুটা চাচাকাহিনী চালু হয়ে গেছে। মন সেটা মানতে চায় নি—কারণ মাস্টারমশায়ের সদা প্রফুল্ল, বন্ধুভাবাপন্ন, কৌতুকপূর্ণ সঙ্গ আমাদের কাছে রীতিমতো উপভোগ্য ছিল। রাতে একই সঙ্গে মাটিতে পাতপেড়ে খেতে খেতে শোভন সীমার মধ্যে হাসিঠাট্টায় আমরা বয়সের পার্থক্য ভুলে যেতাম।

সকাল সন্ধ্যায় আমরা দশ-বারো জন গোল হয়ে বসে পড়া তৈরি করতাম। সন্ধ্যার গোটা দুই লণ্ঠনকে ঘিরে এই পাঠ চলত। সারাটা বিকেল খেলাধূলা ক'রে এসে কারো কারো অপ্রতিরোধ্য ঘুম পেত। চিৎকার ক'রে সেই ঘুম কাটাতে হতো। ঘুম জড়িয়ে এলে, পাশের জনের খোঁচা খেয়ে গলা আবার চড়িয়ে নিতে হতো। নিম্ন-মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের এক দঙ্গল পড়ুয়ার এই বিচিত্র পঠন যাতে একই সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে এবং গ্রাম্য পরিবেশে মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কাহুয়া, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে—এর কোনো তুলনা নেই।

মেধা এবং বুদ্ধির জোড়া বলি আমি নিজে। এতেও নিস্তার ছিল না। বার্ষিক পরীক্ষার সময় ডিসেম্বরের রাত তিনটে সাড়ে তিনটের পড়ুয়াদের ঘুম ভাঙিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হতো, শেষ রাতের পাঠের জন্য। এতে নাকি মনে থাকে ভালো; এবং সেই পাঠের প্রস্তুতি হিসেবে চোখে সর্ষের তেল লাগানও বিধিবদ্ধ ছিল। অবশ্য তখনকার সর্ষের তেল ভেজাল হতো না; এমনও হতে পারে দৃষ্টিশক্তি তাতে প্রখর হতো। তবে স্মৃতি এবং মেধার সারের বদলে ক্ষারের প্রয়োগ ঘটত—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গ্রামে এখনো পঠনের এই রীতি দেখি এবং হতভাগ্যদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি।

গ্রামের স্কুলে পড়ার সময় আমি গোলে ফুটবল খেলতাম। অজিত দাশ ব্যাকে খেলত। বিভিন্ন ক্লাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ আমাদের হারাতে পারত না। কিন্তু যখনই বাইরের কোনো স্কুল বা গ্রামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো, গোলরক্ষকের বদলে আমি গোলভক্ষক হয়ে যেতাম। ফলে বাকি খেলোয়াড়রা, স্কুল, গ্রাম সবাই গোলাহত হতো এবং সেটার পরিণাম হতো মর্মান্তিক। আসলে খুব নার্ভাস প্রকৃতির ছিলাম। শেষকালে ফুটবল ছেড়েই দিলাম।

পূর্ণ ঠাকুর ছিলেন আমাদের বাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ, তাঁর চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রকাণ্ড জিভ; সামনের দিকটা অস্বাভাবিক পুরু এবং দু'ভাগে বিভক্ত।

লোকে সর্পজিহ্ব বলত। কথা বলার সময় জিভ প্রায় বেরিয়ে আসত। কথা জড়িয়ে গেলেও উনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতেন না, বরং লোককে ধারণা দিতেন যে, ওঁর জিভে শাপের ক্ষমতা রাখেন। ভূতেরও কারবারী ছিলেন। শ্মশানে ভূত দেখাবেন কথা দিয়েও বার বার পিছিয়ে যাচ্ছেন দেখে জ্যাঠামশায় বললেন—ওঁর বয়েস হয়েছে, ভূতেদেরও বয়েস হয়েছে—ওঁর এখন অতটা কণ্ট্রোল নেই। আমাদের একবার দেখিয়েছিলেন। ঘোর অমাবস্যার রাতে এক নির্জন শ্মশান প্রান্তরে রাত বারোটা নাগাদ ভূত আবাহন শুরু হল। ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল—কয়েকটি কালোমূর্তি আগুনের মশাল হাতে বিচিত্র আওয়াজ সহ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আমরা দু'একজন সাহস ক'রে আড়াল নিয়ে কাছে গিয়ে দেখি—বাঁরু, নীরু এরা কালিঝুলি মেখে নেংটিপরা ভূত বনে গেছে। তবে পূর্ণদার ভূতের কোনো অমর্যাদা করি নি। ভূতেরা আর যাই করুক ঘাড় তো মটকায় নি।

নীরুকাকাকে গ্রামে কম দেখা যেত। যুদ্ধের সময় একগাদা বই পত্তর এবং যেন কিছু ওষুধ নিয়ে গ্রামে এসে হোমিওপ্যাথির আসর জমিয়ে বসলেন। কিছুদিনের মধ্যে রটে গেল—উনি অসাধারণ চিকিৎসক, প্রায় ধন্বন্তরী হয়ে ফিরেছেন। তাঁর ফি ষোল টাকা, এখনকার টাকার হার তিন-চারশ। তাও এক অন্ধ পাড়াগাঁয়ে। জানি না এই ফি দিয়ে কেউ চিকিৎসা করিয়েছিলেন কিনা; তবে আমাকে বিনা ফি-তে দেখতেন। একগুঁয়ে এবং নির্বোধ আমি, দু'মাস বাদে ম্যালেরিয়া সারাতে গিয়ে যখন মৃত্যুশয্যায়, জ্যাঠামশায় তারবার্তা পেয়ে নেমুন থেকে ছুটে এলেন, নীরুকাকার ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কুইনিন ইঞ্জেকশনে দু'দিনেই জ্বর বন্ধ হল—কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বহুদিন লেগেছিল। দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে ম্যালেরিয়া-ভীতি এমন হয়েছিল যে নীরুকাকার ভূত তাড়ানো চিকিৎসায় অতদিন ধরে আস্থা রাখতে পেরেছিলাম এবং জ্যাঠামশায় এসে না পড়লে নির্ঘাৎ একটি ভূত বেড়ে যেত। আশে পাশের গ্রামে জনা দুই ফৌত হওয়ার পর ওঁর চিকিৎসায় ভাঁটা পড়ে। নন্দীভৃঙ্গীরা অনেক চেষ্টা করেও পুরনো পাদপীঠে তাঁকে আর বসাতে পারে নি।

পূর্ণ ঠাকুর আর ছেলে বনমালী ঠাকুর আমাদের এবং আরো কিছু বাড়িতে পুজো আর্চায় পৌরোহিত্য করতেন। স্বভাবতই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য ছিল। একবার পঙ্কজ চক্রবর্তীর বাড়িতে এক শ্রাদ্ধবাসরে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। পঙ্কজদা তখন পূর্ণ যুবক এবং স্বদেশীওয়ালা, টাক সত্ত্বেও সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। তাঁকে বেশ সমীহ করতাম। শ্রাদ্ধের পর সারি বেঁধে ব্রাহ্মণরা পাত পেড়ে বসেছেন, সবাইকে ভাত এবং বেগুনভাজা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ খাচ্ছেন না। হঠাৎ কে একজন বলে উঠলেন, 'পূর্ণ আর বনমালীকে একঘরে করা হয়েছে, ওদের পাত থেকে উঠিয়ে না নিলে আমরা খাব না।' তখন শরৎবাবুর 'পল্লীসমাজ' পড়া হয়ে গেছে। বেণীমাধব আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের চাক্ষুষ দেখলাম। পঙ্কজদা গুরুগম্ভীর

গলায় বললেন, 'পাত থেকে কারও ওঠা চলবে না!' আমাদের বললেন, 'তোরা লাঠি নিয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে যা—আমি দেখি কে পাত থেকে ওঠে।' হৈচৈ চেঁচামেচি—শেষে বাড়ির লোকে পঙ্কজকে চেপে ধরল, 'তুই ছোঁড়াগুলিকে সরিয়ে নে, এদের তোরা চিনিস্ না। আমরা পূর্ণ আর বনমালীকে বাড়ির ভেতরে বসিয়ে খাওয়াব—তাতে কারও আপত্তি হবে না।' হলও তাই। দু-পক্ষই আহারে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি গেলেন। আমরা কয়েকজন কিশোর আর তরুণ অভুক্ত রইলাম—পুরো ঘটনা আমাদের রুচিতে বড় বিস্বাদে ঠেকেছিল।

ঝন্টু বেশ চালাক চতুর ছিল। আমাদের এক ক্লাশ নীচে পড়ত। গ্রামে এক যাদুকর এলেন। স্কুলে তাঁর যাদু দেখানোর ব্যবস্থা হল। উনি এক একটা খেলা দেখান, আর ঝন্টুর নানা রকম চতুর মন্তব্য। কিছুক্ষণ নজর ক'রে যাদুকর ঝন্টুকে স্টেজে ডেকে নিলেন। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা একটু ওয়াক কর তো!' ঝন্টু ওয়াক করল, আর মুখ থেকে বড় আকারের একটি হাঁসের ডিম বেরিয়ে এল। আবার ওয়াক, আবার ডিম। ডজনখানেক ডিম পাড়ার পর যাদুকর যেই ঘোড়ার ডিমের প্রস্তাব করেছে—ঝন্টু ছুট মেরে পগার পার।

ভোলা সেন বার কয় ফেল ক'রে আমাদের সহপাঠী হল। তারও নানারকম ওপর-চালাকি ছিল। আমরা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে, পেন্সিল-কাটা ছুরি নিয়ে হঠাৎ 'তামেচা, বাহেরা' শুরু করল। কিছুদিন আগে গ্রামে স্বদেশীদের লাঠিখেলা, ছুরিখেলা হয়ে গেছে—তাতেই তার উত্তেজনা। হঠাৎ ছুরি ঘ্যাঁচ ক'রে বসে গেল পাশে বসা অমর চক্রবর্তীর কাঁধে। একে তো রোগা, তায় ছুরি একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকল। হাড়-মাস দুই-ই সাদা। তাড়াতাড়ি সামনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। এখন হলে কী হতো জানি না, সেকালে অভিভাবকরা উচ্চবাচ্য করেন নি।

অমরের বাবা উপেন্দ্রলাল শর্মা চট্টগ্রামের বিখ্যাত আইনবিদ্ ছিলেন। ব্যক্তি হিসাবে অতি সজ্জন, অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী বর্তমানে রাজ্যসভায় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

স্বভাবগুণে তিনি দলমত নির্বিশেষে চট্টগ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রীতিভাজন। অথচ গত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের উঠ্‌তি যৌবনের ভিন্ন রাজনীতির খন্নরে পরস্পরের সঙ্গে কত অর্থহীন লড়াই না করেছি।

যামিনীদা ক্লারিওনেট বাজাতেন। এই যন্ত্রটি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম। একটি সুন্দর বাক্সে তিনটি ভাগে এটি গুটানো থাকত। কালো বাঁশির গায়ে রুপালী যন্ত্রাংশ-গুলিকে মনোরম কারুকৃতির মতো দেখাত। ছেলেবেলা থেকে গানবাজনা শুনতে বড় ভালো লাগে। রাগ তাল লয় ছন্দ—এগুলি বুঝি না। অন্যদের তারিফ দেখে মনে হতো যামিনীবাবু ভালোই বাজাতেন। তবে খুব মজা লাগত যখন দেখতাম পকেট থেকে চিরুনি (তখনকার দিনে পকেট-চিরুনির চল বিশেষ ছিল না) বের

ক'রে খুব যত্নের সঙ্গে মাথা আঁচড়ে নিচ্ছেন। কী আঁচড়াতেন উনিই জানতেন—কারণ মাথার পেছনে গোণাগুণতি ২০।২২ গাছি চুল হয়ত ছিল—বাকিটা গোলাপী আপেল। এখন মনে হয়, আঁচড়ে মাথা সাফ ক'রে নিতেন যাতে বাজনা খোলে এবং খেলে।

বড় পিসিমাকে জ্ঞান হওয়া থেকেই আমাদের বাড়িতে দেখে'ছি। উনি বিধবা ছিলেন। বাবা জ্যাঠাদের মধ্যে উনি জ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং বাড়িতে সেই সম্মানও তিনি পেতেন—নিজগুণে ও ভ্রাতাদের সহজাত প্রীতিতে। অতি আদরের এই পিসিমাকে আমরা 'ঝি' সম্বোধন করতাম—চট্টগ্রামের ভাষায় যার নিহিতার্থ হল—আদরিণী কন্যা (দুহিতা)। বাবার মৃত্যুর পর আমার এক জন্ম-পাগল ভাই ও ছোট বোনকে আমৃত্যু সর্বপ্রকার দুর্যোগে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন; অথচ ওঁর নিজের কোনো সহায় সম্বল ছিল না। ভাইয়ের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই তাঁর শক্তির উৎস ছিল।

পিসিমা হুঁকো খেতেন, বাবাও খেতেন। বাড়িতে এলে পিসিমা হুঁকো সেজে বাবার হাতে তুলে দিয়ে গল্পগুজব করতেন। একবার কেন জানি না মা গোঁ ধরলেন, বাবার তামাক খাওয়া চলবে না। বাবা রাজি না হওয়ায় মা একটি ছোট হুঁকো আনিয়ে নিজেই ধূমপানের আয়োজন করলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে বাবা তামাকু সেবন বন্ধ করলেন। দু'দিন যেতে না যেতেই বাবার ঘুম গেল ছুটে—মাথা ধরা, কাজে মন না লাগা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিল। পিসিমার দৌত্যে শেষ অবধি রফা হল, মা হুঁকো বর্জন ক'রে তাঁর যন্ত্রের নোটিশ উঠিয়ে নিলেন। বড় হয়ে এই নিয়ে মাকে অনেক জ্বালাতন করেছি।

বাবা বয়সে মার চেয়ে সতের বছরের বড় ছিলেন। পনের বছর বয়সে মার বিয়ে হয়। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। স্বভাবে গ্রাম্য সরলতা ছিল। পরে বাবার সঙ্গে বছর দু-তিন শহরে কাটানোর ফলে একটা শহুরে ছাপ পড়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর বরাবরের জন্য গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হল। সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর জন্য ছোট একটি দুধেল গাই পুষেছিলেন। গরুর সেবা শোনা সব নিজেই করতেন। বর্ষায় গরুর জন্য ঘাস কেটে কাস্তে দিয়ে যখন সারা গা থেকে অসংখ্য জোঁক ছাড়াতেন, তখন দেখে কে বলবে যে, বছর দুই আগে এই মহিলা স্বামীর পাশে বসে নিজের হাতে লাগাম নিয়ে শহরের রাস্তায় টমটম্ হাঁকিয়ে চলেছেন। অবস্থার বিপর্যয়কে এতটা মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন যে আমাদের প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান চাষীরা ১৯৫০ সন অবধি, অর্থাৎ মা যতদিন চট্টগ্রামে ছিলেন, তাঁকে নিজেদের আত্মীয় জ্ঞান করত এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।

টমটমের সঙ্গে মখলজ রহমানের নাম অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সেই কালো ঘোড়া আর মখলজ—দু'জনেরই গায়ে আলো পিছলে পড়ে। না খেয়ে যেমন রসগোল্লার

স্বাদ বোঝা যাবে না, না দেখে তেমনি মখলজের রূপ কল্পনা সম্ভব নয়। ছোট-খাটো, কুতকুতে কালো, রক্তচক্ষু, বেশ বড় চোখ, তেল চপচপে টেরিবাগা চেহারা নিয়ে হাজির হলে ঘর আলোকিত না হলেও আমি পুলকিত হতাম—বাবার সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘুরে বেড়ানো যাবে—বিশেষত ছুটির দিনে। বাবা মারা যাওয়াতে মখলজও পিতৃহীন হল। ঘোড়া গাড়ি সব বিক্রি করতে হল। চোখের জলে মখলজ বিদায় নিল। কোথায় তার দেশ, তার ভাষা তো অজ্ঞ ছিল, কেন এখানে এল—সব জানার কথা তখন ভাবি নি, তার অমনভাবে যাওয়া মনে এক অবোধ শূন্যতা এনেছিল।

আমাদের বাড়ির সম্মুখে কয়েক ঘর মুসলমান কৃষকের বসতি ছিল। তারা চাষবাস করত, কিছু ক্ষেতমজুরও ছিল। তাদের সঙ্গে গ্রামের সবাই মিলেমিশেই থাকতাম। কিন্তু তাদের বসত এলাকা ছোট ছিল, কারণ অর্থ নৈতিক। চারপাশে হিন্দু যারা ছিল, তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং কিছু না কিছু জমির মালিক। এই মুসলমানরা স্বদেশীদের খুব একটা পছন্দ করত না। বোমা, পিস্তল, লাঠি খেলা, ছোরাখেলা—এইগুলি ওদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। স্বদেশী ছোঁড়াদের কেউ কেউ কেরামতি দেখাতে গিয়ে হাঁস, মুরগি, কচি পাঁঠা কি ক্ষেতের আখ, শশা-তরমুজ ইত্যাদি হাত সাফাই করত। এতে ওরা ক্ষুব্ধ হতো। পুলিশ মিলিটারিকে খুব ভয় করত। আমরা খানিকটা ধরেই নিয়েছিলাম যে স্বাধীনতা আসলে হিন্দুদের প্রয়োজন মুসলমানদের প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামাতাম না; আমাদের সে মাথা ঘামানোর বয়সও ছিল না। বয়সে খানিকটা বুঝেছি; বোঝাটা সুখকর হয় নি।

বাবা বাড়ি এলে রোজ সন্ধ্যায় ওরা আমাদের বাড়ি আসত। বৈঠকখানায় জড়ো হয়ে নানা সুখদুঃখের কাহিনী বলত; হাতে হাতে হুঁকো ফিরত। কোজাগরী রাত্রে উঠোনে দশ পঁচিশ খেলার এক বিশাল আসর বসত। ৪০।৪৫ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ওরা যেমন থাকত, আমরা ছোটরাও থাকতাম। সেদিন অনেক রাত অবধি খই মুড়ি মোয়া আখ কলা ইত্যাদি দিয়ে জোর ফলার হতো। তেমনি আমরা বিশেষ ক'রে ছেলেরা ওদের পরবের দিনে সেমাই খেতাম—অতি উপাদেয় মনে হতো। বড় পিসিমা বেঁচে থাকতে বাড়িতে মুরগি রান্না বারণ ছিল; কিন্তু সুযোগ পেলেই ওদের রান্না খেতাম। দেশবিভাগের পর বহুদিন বিচ্ছেদের বেদনা বোধ করেছি।

সাম্পানের মাঝিরা এখন আছে কিনা জানি না। সাধারণত ভূমিহীন মুসলমান কৃষকরা সাম্পান চালাত। বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ছন্দে দুই দাঁড়ে কাঁচ-কাঁচ করতে করতে দেশ-দেশান্তরে চলে যেত। নির্জন রাতে চলার ছন্দে চট্টগ্রামী ভাষায় গীত সাম্পানের মাঝির গানে বিরহিণীর আর্তি নানান ছায়ে বিধৃত। শহরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল সাম্পান। ৭৮ ঘণ্টার সেই পরিক্রমা নানা বৈচিত্র্যে নেচে উঠত। এখন সম্ভবত সেই সব যান ইঞ্জিন চালিত হয়ে গেছে এক যাত্রীদের সময় সচেতন ক'রে তুলেছে। তবু দু'পাশের প্রকৃতির অঝোর সুষমা

নিশ্চয়ই আগের মতোই বিরাজ করছে।

গ্রামের মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে একটি ছোট খাল এঁকে বেঁকে শঙ্খ নদীতে গিয়ে পড়েছিল। কিছু কিছু এলাকায় এই খালটি পরঃপ্রণালীর প্রয়োজন মেটাত। বর্ষার জোয়ারের সময় এই খালে নানা প্রজাতির প্রচুর মাছ ঢুকে পড়ত। ধর্মজাল বলে একরকম জাল ফেলে গ্রামবাসীরা সেই মাছ ধরত। আমাদের বড়দা(জ্যাঠতুত) ডাক্তার ছিলেন ; ওঁর ঘেন্নাপিত্তি আমাদের চেয়ে কম ছিল। যখন জাল ভর্তি চিংড়ি মাছ উঠত, উনি সুকৌশলে নরবর সরিয়ে প্রতিটি চিংড়ি ঝুড়িতে উঠিয়ে নিতেন এবং চিংড়ি মাছের উপকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত জানাতেন। চিংড়ি তখনো খুব সুলভ ছিল না ; সুতরাং পাতুরি, ভাজা কিংবা ঝোলের মাধ্যমে সেই সব মতামতের সারবত্তা সহজেই উপলব্ধি করতাম।

এই বড়দাদার বাবামশায় আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বড় জ্যাঠামশায় ছিলেন। সমুদ্রের ধারে বড়ঘোনা নামে এক জায়গায় ছোট একটি নারকেল বাগান করেছিলেন। আমাদের গ্রাম থেকে ত্রিশ মাইল হেঁটে একবার সেখানে গেলাম। সারি সারি নারকেল গাছ আর গোটা দুই পুকুর নিয়ে ওঁর বাগান। পুকুরে হাত জাল ফেললাম, জাল আর গুটাতে পারি না ; সারা জাল বড় বড় ট্যাংরার ভরতি। নারকেল সারির মাঝে নয়ানজুলি – তাতে বালতি বালতি কই মাগুর। জ্যাঠাইমার জনা দেড়েক বনমুরগি ছিল—তারা খড়ের গাদায়, গাছের কোলে খাটের ওপরে নীচে সর্বত্র ডিম পেড়ে রাখত। সেগুলো বিলানো হতো, অত খাবে কে ? ওখানে হাটবাজার বলে কিছু ছিল না, কাজেই বিক্রির প্রশ্ন ওঠেই না। বাড়িতে গোটা দুই খুব বড় তেঁতুল গাছ ছিল। অসংখ্য বড় বড় বাদুড় সারাদিন মাথা ঝুলিয়ে থাকত আর সন্ধ্যায় ঝটাপট আওয়াজে ভয় ধরিয়ে দিত।

একটি লোহার শিক আর শাবল নিয়ে সমুদ্রের ধারে কাদার মধ্যে গর্ত খুঁজে খুঁজে বড় বড় কাঁকড়া ধরতাম। সে এক মজার খেলা। কাঁকড়ারা সে খেলা পছন্দ করত বলে মনে হয় না। যথাসাধ্য লড়াই চালিয়ে যেত। বড়ঘোনায় হিন্দু বসতি বিশেষ ছিল না। চারিদিকে মুসলমান কৃষকের বাস। পরবর্তী কালে একটা সময়ে চতুর্দিকে যখন সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া উঠেছে, সবাই ওঁকে বলল ঐ এলাকা ছেড়ে আসতে। উনি নারাজ—বললেন, 'আমি একাই ওদের ঠিক করে দেব।' আসলে ওঁর শক্তি ছিল—সকলের সঙ্গে সৌহার্দে। শেষ দিন পর্যন্ত ওদেরই মাঝে শান্তিতে কাটিয়ে গেছেন।

কলেজে পড়ি, একটু সায়েক হয়েছি। বাড়িতে শুধু মা আর ছোট বোন। বন্ধু বিমলের সঙ্গে রাজনীতির নামে খুব আড্ডা দিই। সেদিন আড্ডা থেকে ফিরতে খুব রাত হল—প্রায় সাড়ে বারোটা। হাত পা ধুতে গিয়ে পুকুরঘাটে ঝপঝপ আওয়াজ। এগিয়ে গিয়ে দেখি হাতজালের টানের রসি জলের কিনারায়। জালে বেশ মাছ পড়েছে। বোঝা গেল মা একা আছেন জেনে কেউ মাছ চুরি করতে এসেছিল।

আমরা জাল তুলে ধুয়ে নিয়ে শুকোতে দিলাম। জানতাম মালিকের পক্ষ থেকে অত ভালো জালের খোঁজ পড়বেই। দিন দু-তিন বাদে জমিদারবাবু নিজেই এসে বললেন, 'শুনলাম ফুলা তোমাদের পুকুরে মাছ চুরি করতে এসে জাল ফেলে গেছে। জালখানি আমার। ওকে খুব বকেছি, শাস্তিও দেব। জাল ফেরত দাও।' জালের কথা অস্বীকার ক'রে ফেরত দিলাম না। পরে বড় জ্যাঠামশায় বাড়ি এসে সব শুনে আমাদের বকাবকি করলেন; জালখানি নিজের হাতে জমিদারবাবুকে ফেরত দিলেন। মিষ্টি কথায় তাঁকে অসীম লজ্জা দিলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের এই মনোহারী কৌশল আমাদের আয়ত্তে ছিল না।

ফুলা, ভালো নাম প্রফুল্ল। তাকে নিয়ে অনেকেই রঙ্গ করত। তখন এর মর্মভেদে অক্ষম ছিলাম। তার চেহারা ছিল অবিকল জমিদারবাবুর আদলে। গ্রামবাসীদের ইংগিত ফুলা গায়ে মাখত না। বরং জমিদারবাবুর প্রশ্রয়কে শ্লাঘ্য পাওনা বলে মনে করত। বাবা রসিকচাঁদ কি ভাবত কে জানে। ওরা তো জমিদার বাড়ির পোষ্য প্রতিবেশী ছিল। বোধ হয় সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে লেনদেনের অঙ্গ হিসেবে এটাকে গণ্য করতে হতো।

বীরেন কাকা আর শচীন, যোগেশবাবু আর রসিক, কোথাও ভৃত্য সকর্মক, কোথাও প্রভু। উভয় যুগলই স্বঃস্ফূর্ততায় প্রকৃতির প্রয়োজন মিটিয়েছে।

জমিদার বাড়িতে মাঝে মাঝে কবিগানের আসর বসত। এসব আসরে আমাদের যেতে দেওয়া হতো না। সেখানে অশ্লীলতার চূড়ান্ত হতো। বড়দের কাছে তা অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল। গ্রামে একবার এক 'পোয়া' কবি এল। পোয়া মানে বাচ্চা, এ ক্ষেত্রে কিশোর। চারদিকে তার খুব নাম মাত্র ১৩।১৪ বছর বয়সে অনেক প্রবীণ কবিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘায়েল করেছে। তবে সে অশ্লীল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত। এক পালায় বয়স্ক কবি গোবিন্দ শীলের সঙ্গে সে জোর লড়েছিল; কিন্তু শেষ অবধি পরাজয় মানল। তার পরাভবে আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

অনেক পরে চট্টগ্রামের স্বনামধন্য পল্লীকবি রমেশ শীলের গান শোনার ভাগ্য হয়েছে। বায়োজিদ্‌বস্তামে প্রতি বৎসর কোনো মুসলিম উৎসবে রমেশ শীল তাঁর গানে ৫০।৬০ হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন বলে শুনেছি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত গীত—'দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে, এখনও দেশ জাগিল না কেনে' শুনে হাজার হাজার লোক চোখের জলে ভাসত। তেমনি জাতীয় ঐক্যের উপর রচিত গানে উদ্বেলিত জনতা 'হিন্দু মুসলিম ঐক্য জিন্দাবাদ,' 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠত। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, গানে অশ্লীলতা পরিহার। কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে আরেক দুর্ধর্ষ পল্লীকবি মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানীর সঙ্গে রমেশ শীলের কবিগানে ১৯৪৪ সালে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তবে রামগতির কবিগানে আগেভাগেই প্রগতি-বাদী এবং প্রতিক্রিয়াবাদী পক্ষ স্থির ক'রে দেওয়া হতো বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধার

অনেক কম থাকত। কিন্তু কিছু কিছু মর্মস্পর্শী গান রচনার গুণে জনমানসে গভীর ছাপ রাখত।

চট্টগ্রাম শহরে এক ডাকে যাকে সবাই জানত সেই প্রবাদ পুরুষ আবদুল হক দোভাষী তাঁর এক নাতিকে সরকারী কলেজে ভর্তি করাতে গিয়ে অধ্যক্ষ পদ্মিনী রুদ্রকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, 'আরে এ ত দেখি মদ্দ, আমি ভেবেছিলাম মাদী।' পদ্মিনীভূষণ রুদ্র জাঁদরেল সাহেবী অধ্যক্ষ ছিলেন। দোভাষী তাঁর সম্পর্কে এরকম মন্তব্য আদৌ হয়ত করেন নি। তবে রঙ্গপ্রিয় মজলিশী এই বয়োবৃদ্ধের পক্ষে এরকম উক্তি বেমানান ছিল না। পরহিত ব্রতের জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ভয় ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। বাবা রেবতী, জ্যাঠামশায় রজনী তাঁর অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন। নামমাহাত্ম্যও বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকতে পারে।

[বিখ্যাত ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরী বিশ্বভারতী কর্মসচিবের কাছ থেকে ১৯৬৯ সালে শিক্ষকপদে নিয়োগপত্র পেয়ে কাজে যোগ দিতে ইতস্তত করছিলেন এই ভেবে যে শ্রীমতী শর্বরী আর কেউ হতে পারেন, শ্মশ্রু-বিড়ম্বিত তিনি না হওয়ারই সম্ভাবনা।]

দোভাষী সাহেবের নিকট আত্মীয় সোলেমান আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত। তখন মুসলিম লীগের খুব হাঁকডাক। সোলেমান লীগের জোর সমর্থক ছিল, অথচ একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিল না। ও বলত, 'স্বশাসন না পেলে আমরা তোদের সমকক্ষ হতে পারব না, শিক্ষা দীক্ষা চাকরি বাকরি সব কিছু তোদের দখলে।' হায় রে ভাগ্য, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাঙালিদের আবার সে প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হল—রক্তের বিনিময়ে। এখন অন্য প্রশ্ন এসে গেছে ওদেরও, আমাদেরও।

রাজনীতির কথায় আজকাল খুব অরুচি বোধ করি। যতবারই আমরা নানা পর্যালোচনায় কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, ঘটনা ঘটেছে অন্য খাতে। ১৯৪৬-এর ২১শে জুলাইয়ের সাফল্যে কলকাতায় আমরা যখন স্বাধীনতা ও বিপ্লবের তাপ অনুভব করছি, ১৬ই আগস্টে ঘটল নারকীয় দাঙ্গা। তারও আগে গান্ধি-জিন্না মোলাকাত আর সমঝোতা নিয়ে কী বিপুল শক্তিক্ষয়ই না হয়েছে, অথচ তখন বুঝি নি ঐ সোনার পাথর বাটি হওয়ার নয়। এমন অনেক কিছুই আমাদের মধুর ইচ্ছাজগতে রূপ পেত, যা সত্যে পরিণত হতো না। এখন তো আদায় ব্যাপারী হয়ে গেছি—জাহাজের খবর একেবারেই অবান্তর।

দু'টি অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ে। প্রথমটি ঘটে ১৯৪২-৪৩-এর কোনো এক সময়ে। আমরা তখন জাপবিরোধী আন্দোলনে নেমেছি। গ্রামে গ্রামে হিন্দু মুসলমান কৃষক যুব ছাত্রদের বড় একটি অংশ এই আন্দোলনে শামিল। একদিন সকাল বেলা—বোধ হয় জুলাই মাসের কোনো এক সময়—হঠাৎ গুজব শোনা গেল, জাপানীরা এসে গেছে ; কিছু লোক ছুটতে ছুটতে এসে বলল স্বচক্ষে তারা অস্ত্রধারী

জাপানীদের এগোতে দেখেছে। শোনামাত্রই গ্রামরক্ষীবাহিনীর নেতৃত্বে সারা গ্রামের লোক দা কুড়ুল শাবল লাঠি হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। আতংক আস্ফালন উৎকণ্ঠা সবে মিলে এক অবাস্তব পরিস্থিতি। কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা যেন পাগল হয়ে গেলাম। প্রায় তিনটে নাগাদ অবস্থা শান্ত হল। পরে জানা গেল, একই সময়ে একই ভাবে চট্টগ্রামের শত শত গ্রামে এই গুজব ছড়িয়েছিল এবং সর্বত্র সাধারণ মানুষ এক অভূতপূর্ব আতংক মিশ্রিত উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু কোনোদিন জানা যায় নি, কেন কোত্থেকে কীভাবে এই গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল। জাপানীরা তো সত্যিই আসে নি। তারা আকাশ থেকে বোমা ফেলত, মেশিনগান চালিয়ে নির্বিচারে লোকজন মারত—মাটিতে পা ফেলেছে বলে জানা যায় নি।

অন্য ঘটনার নায়ক ১৭।১৮ বছরের এক গ্রাম্য চতুর। পটিয়ার নিকটবর্তী এক গ্রামে সাপের কামড়ে একজন মারা যায়। গ্রামে গ্রামে রটে যায় যে উক্ত চতুর মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তুলছে। ১৯৪৭ সালের গোড়ায় হবে, হিন্দুদের মধ্যে আলোড়ন, অমুক মরা মানুষ বাঁচিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে গুজব, মৃতদেহ যে ঘরে আছে—সেখান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে হিন্দুরা গোলাবারুদ মজুত করছে - মুসলমানদের তাড়াবার জন্য। যে ঘরে মৃতদেহটি পচে গলে এক বীভৎস পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, ঘটনাক্রমে আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষীও ছিলাম। কিন্তু গ্রামে এসে যখন সত্য ঘটনা জানালাম তখন গ্রামের বেশ কিছু শিক্ষিত লোক আমাকেই মিথ্যেবাদী আখ্যা দিল। এই ঘটনা এতদূর গড়িয়েছিল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমনের তাগিদে জেলার রাজনৈতিক নেতাদের মিলিত পর্যবেক্ষক দল গঠন ক'রে সরেজমিনে তদন্তের পর আসল ঘটনা বিবৃত ক'রে গ্রামে গ্রামে প্রচারপুস্তিকা বিলি করতে হয়েছিল। এখনও প্রশ্ন জাগে, কার প্রয়োজনে কেন এই আপাত অর্থহীন ঘটনা চট্টগ্রামের একটি বিরাট এলাকাকে সেদিন বিষজর্জর করেছিল।

সংস্কৃত পণ্ডিত প্রসঙ্গে বিমলের উল্লেখ একবার করেছি। ওর বাবা ছিলেন মোক্তার। কথায় কথায় মোকর্দমা করতেন বলে গ্রামের লোকে ওঁকে ভয় পেত। উনি ব্রাহ্ম ছিলেন। মাসে একবার অন্তত মন্দির নিতেন। আমরা ছোটরা দল বেঁধে যেতাম—মুড়ি, মোয়া, বাতাসা, গুড় কিছু-না-কিছু জুটতই। তাছাড়া পরমব্রহ্মের উল্লেখেই চোখের জলের ধারা নেমে গোঁফ দাড়ি ভিজবে তাও কম আকর্ষণীয় ছিল না। ওঁর দেখাদেখি আমরাও চেষ্টা করতাম, কিন্তু কিছুতেই হতো না। বাইরে বেরিয়ে এসে অনুকরণের তামাসায় মেতে যেতাম।

ধাপে ধাপে আমি কমিউনিস্ট মতবাদের স্পর্শে এসেছিলাম। প্রথম ধাপে জেলখাটা দাদাদের দেখাদেখি। মাঝে নিবু সে এক আধপাগলা, ভোলাভালা বাউণ্ডুলে। কলকাতায় হস্টেলে থাকতে গোপনে পোস্টার আঁকতে প্ররোচিত করত। ওই করতে করতে ছবি আঁকার ইচ্ছে হতো। যে ঘরে থাকতাম, পাঠাভ্যাস ছেড়ে

দেয়াল জুড়ে পেন্সিলে অজন্তার একটি দৃশ্য পুরো নকল করেছিলাম। সুপারিন্টেন্ডেন্ট দ্বিজেন্দ্র বড়ুয়া নাকি বহু বৎসর সেই দেয়ালে চুনকাম করতে দেন নি। আশা করি এতদিনে আর কিছু না হোক চুনবালি খসে গিয়ে তার বিলুপ্তি ঘটেছে।

এবার ১৯৩০-৩১-এর কথা, যুদ্ধের কারণে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে এসে শেষ ধাপে বিমলের খপ্পরে পড়ি। বিমল আমার ভাইয়ের মতো। ওর বাবার সঙ্গে গ্রামের লোকের যতটা বৈর ছিল, বিমলের সঙ্গে ততটাই মৈত্রী। বাবা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে আশ্রয় নেন; তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিমল সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে—গ্রামের দরিদ্র সাধারণের আপনজন হয়ে ওঠে। তার তখন কঠোর দারিদ্র্য। বিমলের মা অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। সরল এবং বেহিসাবী ছিলেন বলে হাতে কিছু এলে দু'দিনে খরচ ক'রে পরের সাত-দিন আধপেটা কি উপোসে কাটাতেন। এই অবস্থাতেই বিমল হিন্দুমুসলমান গ্রাম-বাসীর একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে তাদের সুখদুঃখের ভাগীদার ছিল। জমিজমার কোন্দল থেকে শুরু ক'রে নরনারীঘটিত মামলা পর্যন্ত নানাবিধ সমস্যায় বিমলের সালিশী অপরিহার্য ছিল।

সুশীল আমাদের দু-এক ক্লাস নীচে পড়ত এবং বয়সেও ছোট ছিল। গ্রামে সেবার বর্মা থেকে কিছু আশ্রয়প্রার্থী এলেন; তাঁদের খুব কঠিন সময়। প্রায় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে ফুলে যাওয়া পরিবেশে ফিরে এসেছেন। এমনি এক পরিবারের সঙ্গে সুশীলের ঘনিষ্ঠতা হয়। কিছুদিন বাদে বিমলের কাছে খবর এল সে পরিবারের কুমারী বড় মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা। এর সঙ্গে সুশীলের নাম জড়িয়ে গেছে। অনুসন্ধানে বিমল সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, এর পেছনে রঘু ডাকাতের কিছু গোলমেলে ভূমিকা আছে। সুশীল নির্দোষ। কিন্তু রঘু ওকেই দায়ী করছে। শেষ অবধি ভদ্রলোক সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করেন। এককালীন স্বদেশী রঘু তখনো অমিতবিক্রম।

বিমল সেই বিরলদের একজন, পাকিস্তান হওয়ার পর যে চট্টগ্রাম ছাড়ে নি। মনুষ্যমহিমায় তার বিশ্বাস অটুট। গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নানা টালমাটালেও চট্টগ্রামে হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি কখনো বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি—তার কারণ, প্রধানত দোভাষীদের মতো উদারচেতা সমাজনেতা, বিমলদের মতো সৎসাহসী নাগরিক আর এক সময়ে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদী দলের বিপুল কর্মকাণ্ড। পঞ্চাশের মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মৃত্যু সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ মানে নি; সেই না-মানাই আবার জীবন সংগ্রামে সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। আশা করব শোষকের শত চক্রান্ত শোষিতের অন্তিত্বে ফাটল ধরাবে না।

শেষবার গ্রামে যাই ১৯৪৮ সালে। গ্রাম-শহর-গ্রাম যেখানে যাই শুনি পুলিশ অস্ত্র খোঁজ ক'রে গেছে। আমি এক নগণ্য পার্টিকর্মী। কিন্তু উভয় সরকারই অতি ব্রস্ত, অতিসাবধানী—পরস্পরের যোগসাজসে সকলের গতিবিধি নজরে রাখছে এবং

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরছে ; ভারতে গ্রেপ্তার অতটা নয়, কিন্তু প্রহরায় ঢিলেমি নেই। রাত্রির অন্ধকারে একদিন ট্রেনে চেপে পাড়ি দিলাম — আর ফেরা হয় নি।

তিন কি চার বছর বয়সের একটি ঘটনা অদ্ভুতভাবে মাঝে মাঝে মনে আসে। আমাদের নতুন বাড়ি আগুনে পুড়ে গেল। আমি মার আঁচল ধরে সেই পুড়ে যাওয়া দেখছি। দৃশ্যটি কাল্পনিক হতে বাধ্য, কারণ যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি ঘরের সেই দরজাও পুড়ে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, অথচ বাড়ি পুড়েছিল এবং নতুন ক'রে খড়ের বদলে টিনের ছাউনি লাগানোর সময় মেরামি করতে গিয়ে কাঠের খাঁজে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যা হয়ে যে ইকিখানেক টাকের উৎপত্তি হয়েছিল, তা এখনো বজায় আছে। অথচ এখনো মনশ্চক্ষে ওখানে দাঁড়িয়ে মার চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া দেখতে পাই। দূর স্মৃতি বোধ হয় এমনই হয় — বাস্তবে অবাস্তবে জোড় লাগা।

এক রাত্রে আহার কালে গলায় ইলিশ মাছের কাঁটা বিঁধে গেল। ছটফট ক'রে সকালবেলা যোগেশ ডাক্তারের শরণ নিয়ে কাঁটা বের করা হল। পরে বহু বছর চিংড়ি আর চাঁদা ছাড়া অন্য মাছ খাই নি। কমপিউটার থাকলে হিসেব করা যেত — জীবনে কতগুলি ইলিশ এবং অন্যান্য উত্তম মৎস্যভক্ষণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। এগুলি বাল্যের। কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ছোট বড় মাপের এমন অনেক কীর্তি ঘটেছে — যা গেঁয়ো ভূতের দ্বারাই সম্ভব।

শেষ কীর্তি হল শান্তিনিকেতনের দুগ্ধফেননিভ আরাম কেদারা ছেড়ে এক গ্রাম্য খাটালে আশ্রয় গ্রহণ। এখানে দুগ্ধ উত্তম মেলে — কিন্তু জীবনধারণ কেদার উপরে চরণ ফেলার মতো নয়। তবু কী আশ্চর্য, দিন ভালোই কাটে।

রেবা দেবী — যাঁর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আমি আবদ্ধ জীব, তিনি আমাকে Jack in the box বলেন। তাঁর মতে আমার পেছন সীসের মোড়া। তাইতে যে কোনো পতিত অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে সময় লাগে না।

খুব ছোট, যখন চার-পাঁচ বছর বয়স, খুব ফোঁড়া হতো। জ্ঞাতি সম্পর্কে আমাদের এক ঠাকুর্দা ফোঁড়া কাটায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। মাসে কম পক্ষে একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াতে হতো। বাঘের নখের মতো বেঁকানো এক ছুরি দিয়ে ক্যাচ ক'রে ফোঁড়া কেটে দিতেন ; টিপেটুপে পুঁজ বের ক'রে হলুদের রসে চোবানো পাকানো সলতে ফোঁড়ার মুখে ঢুকিয়ে দিতেন। দু'চার দিনের মধ্যে ঘা শুকিয়ে যেত।

ফোঁড়া, ফাঁড়া এবং বারো চোদ্দর ধাক্কা — জীবন মন্দ কাটে না।

প্রসঙ্গ-কথা

১৩৮৮ সালের শারদীয় এক্ষণ-এ প্রকাশিত সোমনাথ হোর-এর 'তেভাগার ডায়েরি' পাঠকমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সেই সচিত্র পুরনো ডায়েরিটি এক ঐতিহাসিক ঘটনার তথা আন্দোলনের সজীব দলিল। অন্যদিকে সেটিকে শিল্পীর আত্মকথা রচনার পরোক্ষ সূত্রপাত রূপেও চিহ্নিত করা যায়। 'আত্মকথা' মানে নিজের কল্পনা ও কর্মের ভাবগত বিবর্তনের ইতিহাস।

তেভাগা আন্দোলনের সমসাময়িক ও অনতিপরবর্তী দেশ-কালের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে তাঁর অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সকর্মক ভূমিকা নিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ জানানো তাই আমাদের পক্ষে অনিবার্য ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নিজের শিল্পসাধনায় তন্ময় শিল্পীর পক্ষে সাহিত্যিক ভাষাচর্চার মানসিক তাড়না প্রায় অনুপস্থিত। তবু গত তিনবছর আমাদের প্রায়শ তাগিদে শিল্পী নিজের মধ্যে নিশ্চয়ই নানা আলোড়ন অনুভব করেছেন। তার প্রমাণ, শান্তিনিকেতন থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাদের দপ্তরে এসে প্রাসঙ্গিক নানা আলোচনা এবং চিঠিপত্রে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।

গত ১৮. ৭. ৮৫ তারিখে তিনি এক চিঠিতে জানিয়েছেন :

> ...আমি আপনার প্রস্তাব মত...স্মৃতিকথনের চেষ্টা ক'রে দেখলাম। উদ্দেশ্য অবশ্যই আমার চিত্রভাবনার মূল খোঁজা। কিন্তু পেরে উঠলাম না। কয়েকবারই চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুঁটিনাটি উপাদানগুলি এমন ভুলে গেছি যে লেখাটি কেবলই মোটা দাগের বর্ণনায় পর্যবসিত হচ্ছে। মাসখানেকের উপর এই চেষ্টা করলাম—আমার চিত্রভাস্কর্যের কাজ বন্ধ রেখে। এখন বুঝতে পারছি—এ হবার নয়। লেখার প্রতিভা ত নেই-ই, সাধারণ ক্ষমতাও নেই। তাই পরধর্ম ছেড়ে স্বধর্মে মনোনিরোগ করছি।

অর্থাৎ, মনে হয়, আমাদের প্রস্তাবটি তিনি বুঝি মন থেকে মুছে ফেলেছেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ বর্তমান রচনার খাতাটিসহ একটি চিঠি আমাদের হস্তগত হয়। চিঠির তারিখ ১৪. ৯. ৮৫ এবং তার কিছু অংশ এই :

> বছর দুই আগে আপনি প্ররোচিত করেছিলেন...লিখতে, তখন ভাবি নি, যা মনে পড়ে না, তা নিয়ে লেখার কথা। এবারে...বিষয়ে আপনার ফরমায়েশ পালন করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। তার পরে হঠাৎ কয়েকদিন ধরে এই লেখা লিখলাম। ...শেষ বিচার আপনার হাতে। .. প্রধানত বাল্য ও কৈশোরের কথা লিখেছি। এলোমেলো ভাবে আরো পরের কথাও এসে গেছে।...

এই সঙ্গে পাঠক আমাদের পুরনো সংখ্যাটি থেকে 'তেভাগার ডায়েরি' উপলক্ষে প্রদত্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি আর একবার দেখে নিতে পারেন। —স. এ।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

এক বিস্মৃত শিক্ষক

আর কিছু পুরনো কথা

আমার স্কুল আর দু-বছর কলেজ জীবন কটকে কেটেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদের কড়চা-লেখক মুরারী গুপ্ত-র সময় থেকে কুমারহট্ট-হালিশহর বা হাবেলি শহরে আমাদের পরিবারের বাস। এই হাবেলি শহর ছেড়ে হঠাৎ আমরা কেন ওড়িশার কটক বলে অন্য হাবেলিতে যাই তার কারণ গোড়ায় বলা দরকার। এটা ঠিক উঠল বাই তো কটক যাইয়ের মতন ব্যাপার নয়। আমার ঠাকুরদা বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৯০২ সনে যখন বাংলা-বিহার-ওড়িশা এক রাজ্য ছিল তখন কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যক্ষ হন। তারপর ১৯১১ সনে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পেনশন নিয়ে আবার কটকে অবসর জীবন বাস করতে যান।

এখন দু-চারজন অশীতিপর বৃদ্ধ আর প্রবীন শিক্ষাব্রতীরাই কেবল বিপিবিহারীর নাম জানেন। যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরিজির প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ সুবোধ-চন্দ্র সেনগুপ্ত, আর একদা ওড়িশাবাসী অন্নদাশঙ্কর রায়। কিছুদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে জানলাম বিদ্যাসাগর কলেজের আমাদের ইংরিজির প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল আর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভবতোষ দত্তও ম্যাথামেটিসিয়ান বি ভি গুপ্ত-র কথা মনে রেখেছেন। আর একটা কারণ হতে পারে যে ছেলেবয়সে তাঁরা বি ভি গুপ্ত-র 'এরিথমেটিক' পড়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর একটা চাক্ষুষ স্মৃতি রয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে টাঙানো তাঁর তেল রঙা প্রতিকৃতিতে। এই ছবিটি তাঁর ছাত্র ডাঃ হরেন মুখার্জি বাংলার গভর্নর থাকার সময় উদ্বোধন করেছিলেন।

আমার এই লেখায় প্রধানত আমার ঠাকুরদার কথা। তাঁর বাবার সম্বন্ধেও প্রসঙ্গত দু একটা কথা বলব। আশা করি যে আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা শ্রাদ্ধবাসরে পড়ার জীবনীর মতন হয়ে যাবে না। তবে আমার লেখার সপক্ষে একটা কথা বলতে পারি। মহাপুরুষদের জীবনী যুগে যুগে নতুন ক'রে লেখা ছাড়াও অতীতের বিস্মৃত অথচ স্মরণীয় লোকদের কথা লিখলে তারও একটা দাম আছে। যেমন দাম আছে ধরুন 'উলো বা বীরনগরের ইতিহাসে'র মতন আঞ্চলিক ইতিহাসের।

গত শতাব্দীর শেষ দু'দশক আর এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বিপিনবিহারী গণিতজ্ঞ শিক্ষক, আর তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে বিদ্বজ্জন মহলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আগেকার সমাজে শিক্ষকদের কি স্থান ছিল তা এখনকার রাজনীতিক-আমলা-ব্যবসায়ী বিধ্বস্ত সমাজে ভাবাই যায় না। গত শতাব্দীতে এত মহামানব থাকতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ীর মতো একজন মাস্টারমশাইকে যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের প্রতিনিধি করেছিলেন সেটা অমনি অমনি নয়।

প্রথমে বিপিনবিহারীর বাবা গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত-র কথায় আসা যাক। তিনি তাঁর ছেলের মতন খ্যাতিমান না হলেও হালিশহর-নৈহাটি কাঁচড়াপাড়া-ভাটপাড়া অঞ্চলে সংস্কৃতজ্ঞ আর সজ্জন বলে পরিচিত ছিলেন। আমি এই লেখায় গোবিন্দচন্দ্র আর বিপিনবিহারী সম্বন্ধে যে কিছু তথ্য দিচ্ছি সেগুলি ১৯৫৪ সনে ছাপা কুমারহট্ট-হালিশহর অ্যাংলো-ভার্নাকুলার উচ্চ বিদ্যালয় স্মারক-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

> গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সাধুপুরুষ ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই সত্যনিষ্ঠ ও রসিক পুরুষ ছিলেন। প্রথমে জীবনে কবিরাজী শিক্ষা করিতেন, কিন্তু একদিন এক রোগীর রোগনির্ণয় করিতে না পারিয়া চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বে হালিশহরে তিনি অধ্যাপনা করিতেন এবং হালিশহরে ১৮৫৪ সালে অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠার পর হুগলী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ থোরেটস্ সাহেবের সাহায্যে এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ২০ টাকা অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়।
>
> চৈতন্য পারিষদ মুরারী গুপ্ত প্রমুখ তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। এবং তিনিও নিজে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। বৈদ্যপাড়ার ঘাটের উপর গঙ্গাতীরে এক আটচালায় তিনি বুনোঘাটার রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাধন ভজন ও ভক্তসঙ্গে সৎকথা প্রসঙ্গে অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের নাড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারেন ও বাড়ী ছাড়িয়া আটচালায় চলিয়া আসেন। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাকালে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করিতে করিতে গোবিন্দচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমি পরে প্রজ্ঞের ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি তাঁর পিতামহ কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ইংরিজির অধ্যাপক হিসেবে গোবিন্দচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। এবং তাঁদের দু'জনের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ধূর্জটি বাবুদের আদিনিবাস ছিল ভাটপাড়ার অন্তর্গত নারাণপুরে এবং তাঁর মামার বাড়ি ছিল হালিশহরে। তিনপুরুষ বাদে আমার যখন ধূর্জটি বাবুর পুত্র কুমার-প্রসাদের সঙ্গে আলাপ হয়, বহুদিন আগের পারিবারিক সম্পর্ক আবার জোড়া লাগে।

এবার আমার ঠাকুরদার বিষয়ে স্মারক-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেব :

বিপিনবিহারী গুপ্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলেও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-বলে প্রথম হইতেই বৃত্তিলাভ করিয়া শিক্ষালাভে সক্ষম হন। কুমারহট অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল হইতে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে সময় যোল বৎসর পূর্ণ না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু তিনি বিশেষ অনুমতি বলে পনের বৎসর বয়সে প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হইয়া এবং প্রত্যেক বিষয়ে রেকর্ড নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি মোট নম্বরের শতকরা ৯৩ ভাগ লাভ করিয়া ৫০ টাকা প্রবেশিকা বৃত্তি লাভ করেন এবং অন্যান্য বৃত্তিসহ মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি পান। এফ-এ পরীক্ষায় তিনি ত্রিপুরাচরণ সেন অপেক্ষা তিন নম্বর কম পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় আবার রেকর্ড নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাঁহার পাঁচ বৎসর পূর্বে ও পাঁচ বৎসর পরে কেহ প্রথম বিভাগে পাশ করে নাই।

এম-এ পরীক্ষার পর তিনি কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে ও রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এক সঙ্গে সতের বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি ছোটনাগপুর ডিভিসনের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং একবৎসর পরেই কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ পদে স্থানান্তরিত হন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর খেতাব লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ক্রফোর্ড সাহেব তাঁহাকে ইমপিরিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করিবেন প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি জজের পদ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ক্রফোর্ড সাহেব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ গণিতজ্ঞ বলিয়া আজও তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে।

বিপিনবিহারীর ইস্কুল জীবনের একটা ছোট কথা এখানে বললে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছেলেবয়সে তাঁর স্বভাব ছিল বইয়ে মুখ গুঁজে চুপ ক'রে পড়াশোনা করা। পাড়ার অনেক ছেলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করত। বিপিনবিহারীর মা তাই দেখে ছেলেকে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলতেন : 'ওরে বিপিন ? দেখ ত এরা সব কেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া করছে। আর তুই বই নিয়ে কি যে করিস জানি নে।

তোর কি হবে রে বাবা!' ছেলেও নাকি পরীক্ষা দিয়ে এসে মাকে কেঁদে কেঁদে বলত, 'মা আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারব না।'

স্মারক-গ্রন্থের উপরোক্ত লেখায় বিপিনবিহারী সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলা হয় নি। যেমন, ছাত্রজীবনে হালিশহরের সাধারণ লোকজনের তাঁর প্রতি বদান্যতা। সংসার খরচের টাকা সাধারণত বাড়ন্ত হওয়ায় পণ্ডিত মশাইয়ের ছেলেকে দেখে মুদি, তাঁতী, তেলি, জেলেরা ধারে জিনিসপত্র দিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাবার পর বিপিনবিহারী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছিলেন।

তা ছাড়া উপরোক্ত লেখায় বলা হয় নি যে বিপিনবিহারীকে সরকার গণিতে উচ্চশিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ দিয়ে কেমব্রিজে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের কথায় তিনি সেই বৃত্তি নেন নি। মা-র তাঁকে বিলেতে না যেতে বলার অবশ্য একটা কারণ ছিল। আমার ঠাকুরদার বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল তখনকার দিনের সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্নেল কে. পি. গুপ্ত-র সঙ্গে, যিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এফ. আর. সি. এস., আর, আই. এম. এস. ছিলেন। তা ছাড়াও তাঁর এম. ডি., এম. আর. সি. পি. ইত্যাদি এক হাত লম্বা ডিগ্রি ছিল। ১৮৬৮ সনে কে. পি. গুপ্ত প্রথমবার বিলেত গিয়ে ফিরে এলে জাতে তোলার আগে গোঁড়ারা তাঁকে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। তিনি তাতে রাজি না হয়ে খ্রীস্টান হয়ে যান। ঠাকুরদাদার দিদি অবশ্য বিয়ের পরেই মারা যান। জামাইয়ের এ অবস্থা দেখে মা-র তাঁর ছেলের বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে ভীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি তাঁর ছেলের মতিগতি যা জানতেন তাতে পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে সে বিলেত থেকে ফিরলে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে বিধর্মী হয়ে যাবে।

আরেকটা কথাও উপরোক্ত স্মারক-পত্রিকায় বলা হয় নি। এই শতাব্দীর গোড়ায় হালিশহরের সর্বকালের গর্ব রামপ্রসাদের ভিটের তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে যে ব্যবস্থা করা হয় তার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বিপিনবিহারী।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আর হুগলী কলেজের এক-কালের অধ্যক্ষ কে. জাকারাইয়ার লেখা হুগলী কলেজের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বিপিনবিহারীর আগে সেই কলেজের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে ছিলেন 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র লেখক হরচন্দ্র ঘোষ, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র আর বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৫৪ সনে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মোট ২৭৫·৫ নম্বর পেয়ে প্রথম হন। সেই বছরে যিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন তাঁর নম্বর ছিল ২২৯.৫। বঙ্কিমের পর বিপিনবিহারী ১৮৭২ সনে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হন।

ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিপিনবিহারী গণিতে বুৎপত্তির জন্যে খুব নাম করেন। তখনকার কলেজের গণিতের ডাকসাইটে অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম বুথ 'বিপিন বলিতে অজ্ঞান ছিলেন'। এম. এ. ক্লাসের ছাত্ররা যখন মাঝে মাঝে কোনো

অঙ্ক কষতে পারত না তখন অনেক সময় বুথ সাহেব 'কল্ বিপিন' বলে তাঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাঁকে দিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্ক করিয়ে নিতেন। আবার এ রকম হয়েছে যে কখনো কখনো বুথ সাহেব নিজে ছেলেদের ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্ক দেখিয়ে দিতে গিয়ে ভুল ক'রে বিরক্ত হয়ে যেতেন আর ছেলেরা চুপ ক'রে মজা দেখত। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে বলতেন : 'Forty pairs of blank eyes staring at the black board ! And you Bipin ! What are you doing ?'

এই গল্পগুলো বহুদিন আগে ধূর্জটি বাবুর বাড়িতে আমার বলেছিলেন স্বয়ং সত্যেন বোস মশাই। অবশ্য বলা দরকার যে গল্পগুলো তাঁরও শোনা।

বিপিনবিহারী ১৮৮৩ থেকে ১৯০২ অবধি একনাগাড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমে গণিতের সহকারী অধ্যাপক আর তারপর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর আগে ১৮৭৫-তে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গণিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এক বছরের জন্য প্রেসিডেন্সির অঙ্কের লেকচারার হন। তার আরও আগে দু'জন বাঙালি কিছুদিনের জন্য এই কলেজে অঙ্ক পড়িয়েছিলেন। আমি অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত-র কাছ থেকে শুনেছিলাম যে তাঁর স্যার প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর পিতৃবন্ধুর স্মরণ-সভায় বলেছিলেন যে বিপিনবিহারী নতুন ছাত্রদের প্রথম দিন পড়ানোর আগে রোল কলের সময় বিশ-তিরিশ জন ছাত্রের চেহারাগুলো ভালোভাবে দেখে নিতেন। তারপর থেকে প্রতিদিন ক্লাসে ছাত্রদের ওপর চোখ বুলিয়ে অনুপস্থিত ছাত্রদের অ্যাবসেন্ট মার্ক ক'রে পড়ানো শুরু করতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আঠার বছর অধ্যাপনার সময়ে গত শতাব্দীর শেষ দিকের আর এ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বহু কীর্তিমান ও বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী বাঙালি তাঁর ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'বঙ্গের রত্নমালা'-র তৃতীয় ভাগে স্যার আশুতোষের গাণিতিক প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'যখন তিনি এম. এ. ক্লাসে পড়েন, তখন রায়বাহাদুর বিপিনবিহারী গুপ্ত কিছুদিন তাঁহার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন—"গণিতে আশুতোষ বেশী জানে না আমি বেশী জানি, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমার মনে হয় সে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পড়িতেছে"।'

বিপিনবিহারীর যুবক আশুতোষের এই প্রশংসা মনে হয় খোশামোদ নয়। কারণ আশুতোষের তখন কেউকেটা হতে অনেক বাকি। সি. পি. স্নো তাঁর 'On Magnanimity' বলে এক সমাবর্তন বক্তৃতায় কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বিখ্যাত অধ্যাপকদের প্রতিভাশালী ছাত্রদের কাছে নতিস্বীকারের কথা বলে সেগুলিকে magnanimity-র উদাহরণ বলেন। আমার বিশ্বাস স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিপিন-বিহারীর উপরের উক্তি এই মনোভাবেরই একটা প্রকাশ। এখানে একটু অপ্রিয় জলেও বলা দরকার, পরের জীবনে বিপিনবিহারী যখন বহুদিন কলকাতা বিশ-

বিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন তখন তাঁকে আবার অসীম প্রতাপশালী আশুতোষের সংস্পর্শে আসতে হয়। আমি কয়েকজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ লোকের মুখ থেকে অনেকদিন আগে যা শুনেছি তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের সব কার্যকলাপ পছন্দ না হওয়ায় এবং নিজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়ায় অবসর জীবনের দিকে আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকেন। আর একটা কথা বলা দরকার। আমি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বললাম সেটা না থাকার জন্য বিপিনবিহারী এমন কিছু ক'রে যান নি যাতে শিক্ষাজগতের বাইরে লোকেরা তাঁকে মনে রাখতে পারে। তবে একটা কথা না বললে বিপিনবিহারীর ওপর অবিচার করা হবে। সেটি হল তাঁর লেখা এরিথমেটিক বই।

বিপিনবিহারীর 'দি এলিমেন্টস অফ এরিথমেটিক' ১৮৯৩ সনে বেরোয়। তাঁর চেয়ে কিছু ছোট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর বই ছাপা হয় ১৮৯০-এ। এই দু'টি বই বহু বছর ধরে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার স্কুলগুলোতে পড়ানো হতো। আমি বিপিন-বিহারীর এরিথমেটিকের শেষ যে বই দেখেছি তার বোধহয় অজস্র সংস্করণ হয়।

সেই মান্ধাতার আমলে যখন সাহেবদের লেখা অঙ্কের বই, হল অ্যাণ্ড স্টিভেন্স-এর জিওমেট্রি ছাড়া গতি ছিল না তখন গৌরীশঙ্কর দে-র অঙ্ক, অ্যালজেবরা আর জিওমেট্রি, বিপিনবিহারীর এরিথমেটিক আর মেনসুরেসান, যাদবচন্দ্রের অঙ্কের বই আর কে পি বসুর অ্যালজেবরা দেশি পড়ার বইয়ের ইতিহাসে রাস্তা দেখানোর কাজ করে। অঙ্কদের মতন বিপিনবিহারীকে তাঁর অঙ্কের বই বংশপরম্পরায় বলতে গেলে ছাত্রদের কাছে পরিচিত ক'রে দেয়।

দেখা-শোনা আর যুগোপযোগী সংশোধনের অভাবে বিপিনবিহারীর বই আস্তে আস্তে স্কুল পাঠ্যপুস্তক হিসেবে উঠে যায়—যদিও যাদবচন্দ্র আর কে পি বোসের বই সংশোধিত সংস্করণে এখনো যতদূর জানি চলছে। আমরা ছেলেবেলায় যা শুনেছি যে বিপিনবিহারীর বইয়ের অঙ্কগুলো সাধারণত যাদবচন্দ্রের বইয়ের অঙ্কের চেয়ে একটু শক্ত ছিল। আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই বলতেন যে এমনও মাঝে মাঝে হয়েছে যে তাঁরা একটি অঙ্ক কষতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে বিপিনবিহারীর কাছে শুয়ে শুয়ে গিয়ে অঙ্ক কষিয়ে আনতেন। সবচেয়ে মজার কথা, কখনো কখনো লেখক স্বয়ং নিজের অঙ্ক করতে গিয়ে ভুল ক'রে বসতেন।

এইখানে 'বঙ্গের রত্নমালা'র থেকে বিপিনবিহারী সম্বন্ধে আরো যে দু'টো কাহিনী আছে তার একটা 'বাঙালির দৈহিক বল' যতই অবিশ্বাস্য হোক আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

> অধ্যক্ষ বিপিনবিহার। শুপ্ত কৈশোরাবস্থায় রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি সেই সময় একদিন রেলগাড়িতে যাইবার জন্য এক স্টেশনে উপস্থিত হন। স্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র ট্রেন ছাড়িল। তিনি ট্রেনে উঠিতে পারিলেন না। অথচ তাঁহাকে সেই ট্রেনে যাইতেই হইবে। তখন তিনি অনন্যোপায়

হইয়া ভাবিয়া লইলেন : "পর স্টেশন এখান হইতে তিন মাইলও হইবে না। এই পথ যাইতে ট্রেনের এত মিনিট লাগিবে। পর স্টেশনে ট্রেন এত মিনিট থামিয়া থাকে। অতএব ছুটিয়া গিয়া এই ট্রেন ধরিতে পারিব।" যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। বিপিনবিহারী ট্রেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। ট্রেনের অনেক লোক তাকাইয়া বলিতে লাগিল "একটি ছেলে ট্রেনের পাছু পাছু ছুটিয়া আসিতেছে।" বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় ছেলের ট্রেন ধরার ব্যাপারে সকলে হাসিতে লাগিল। বিপিনবিহারী পশ্চাদপদ হইবার নন। তিনি ছুটিয়া গিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঠিক সময়ে পর স্টেশনে পৌঁছিলেন। পৌঁছিবার সময় আরোহিগণ অধিকাংশই দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা তাঁহাদের গাড়িতেই বালকটি উঠে। তিনি গাড়িতে উঠিলে সকলের মধ্যেই মহা আনন্দ কোলাহল উঠিল। যাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল তাহারা বলিতে লাগিল "ইনি যে কেউ নন, ইনি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত।"

এই গল্পের আমরা সমর্থন পাই অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলির ১৯২৬ সনে বিপিনবিহারীর মৃত্যুর পর লেখা স্মৃতিকথা থেকে, যেটি যোগেশ বিদ্যানিধির কাছ থেকে পেয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সনের মডার্ন রিভিউয়ে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে ছাপান। বিপিনবিহারীর সহপাঠী র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক গাঙ্গুলি তাঁকে keen sportsman, dead shot, ছেলেদের খেলায় উৎসাহিত করার চেষ্টা ইত্যাদির পর লিখেছিলেন : 'When before the last summer vacation I saw Principal Gupta unable to move without others' help I thought of the time when in his youth, incredible as it might appear, he ran having missed a train at Natore, ran with it and caught it at the next station.' তিনি লেখেন যে তাঁর চৌত্রিশ বছর কর্মজীবনে বিপিনবিহারী মোট মাত্র তিনমাস ছুটি নিয়েছিলেন।

এই লেখা থেকে বিপিনবিহারীর সম্বন্ধে অনেক ছোট বড় কথা জানা যায়। যেমন তিনি 'knew something of everything and everything of something.' ডিকেনস ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে কঠিন সমস্যা অবিলম্বে সমাধানের ক্ষমতা, তাঁর সদাপ্রসন্ন মিশুক স্বভাব ইত্যাদি।

অঙ্কের মাস্টার হিসেবে সুনাম ছাড়াও তাঁর ছাত্ররা যেমন একদিকে তাঁর রাশভারি স্বভাবের জন্য তাঁকে সমীহ করত, আবার তাঁর রসিক স্বভাব ও দরাজ মনের জন্যে তাঁকে তেমনিই ভালোবাসত। আমাকে অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত মশাই বলেছিলেন যে প্রফুল্ল ঘোষ তাঁকে বলেন যখন বিপিনবাবু বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে পালকি ক'রে কলেজে আসতেন তখন খানিক দূর থেকে তাঁর পাল্কির শব্দ পেলেই কলেজের ছেলেদের চিৎকার থেমে যেত। তাঁর একজন ছাত্র আর অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি মশাই বহুদিন আগে গল্প করতে করতে বলেন যে গত শতাব্দীর শেষের

দিকে একদিন বিকেলে ছোটলাটের প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার কথা। দুপুরের দিকে কোনো একটা কারণে ছাত্ররা ছোটলাটের আসা নিয়ে ভয়ানক গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করেছিল। সাহেব অধ্যক্ষ আর অন্যরা তাদের সামাল দিতে পারছিলেন না। অথচ লাটসাহেব এলে হৈ চৈ হলে ভয়ানক কেলেংকারি হবে। সেদিন শরীর কিছুটা খারাপ হওয়ার জন্যে বিপিনবিহারী কলেজে যান নি। তখন উপায়ান্তর না দেখে সাহেব-প্রিন্সিপ্যাল হুকুম দিলেন : 'Call B. V.।' তাঁর ডাক পেয়ে বিপিনবিহারী কলেজে আসতে ছেলেরা চুপ। তারপর তিনি বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করাতে সে যাত্রা একটি গণ্ডগোলের সম্ভাবনা কেটে যায়।

এ তো গেল একদিকের কথা। ১৯৩৯ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনের সিলভার জুবিলি নম্বরে বিপিনবিহারীর ছাত্র ও প্রাক্তন সিভিলিয়ান স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি 'Fifty Years Ago' বলে একটি ছোট স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন : 'Mathematics we had the privilege of starting with Professor Bipin Vihari Gupta. He was both an excellent teacher and a humorous, kind and wise guide to the students under his care.' প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক-বইতে তাঁর বিপিনবিহারীর ছবির তলায় আরো নানা কথার মধ্যে লেখা আছে : 'one of the most respected teachers of his time.'

যতদূর মনে আছে ঠাকুমার কাছে এক ছাত্রের কাছে জব্দ হওয়ার গল্প বলেছিলেন তিনি। ছেলেদের কলেজে ধুতির সঙ্গে চাদর না পরে এলে বকতেন। একটি ছেলে তা না করায় বিপিনবিহারী তাকে খুব বকুনি দিয়েছিলেন। পরের দিন ছেলেটি প্যান্ট্‌লুন আর কোট পরে, তার ওপর চাদর জড়িয়ে ক্লাসে আসে। তাঁর অধ্যাপক ছাত্রের রসিকতার সবচেয়ে বেশি তারিফ করেন।

বিপিনবিহারীর কথা তাঁর বহু ছাত্রের লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন রামানন্দ চাটুজ্জে মশায়ের 'প্রবাসী' আর 'মডার্ন রিভিউ'য়ে স্মৃতিতর্পণ, ও. সি. গাঙ্গুলির আত্মজীবনীতে, ১৯৪০-৪১ সন নাগাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে বিপিনবিহারীর তৈলচিত্র উন্মোচনের উপলক্ষে ডাঃ হরেন মুখার্জির বক্তৃতায়, তার বহু আগে ১৯২৬ সনে তাঁর মৃত্যুর শোকসভায় প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের বক্তৃতায় র‍্যাভেন্‌শ কলেজের তাঁর কৃতি ছাত্রদের স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে।

উপরোক্ত নানান বিষয়গুলির মধ্যে থেকে আমি এখানে ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী' থেকে বিপিনবিহারী সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

> আমি কয়েকমাস ভারতের বাহিরে থাকায় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর যথাসময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে পারি নাই।
>
> আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম তখন

গুপ্ত মহাশয় গণিতের সহকারী অধ্যাপক রূপে আমাদের গণিত পড়াইতেন। গণিতে আমি মনোযোগী ছিলাম না কিংবা আমার বুদ্ধি খেলিত না, অথচ তৎ সত্ত্বেও আমি কেন বি এ পরীক্ষার জন্য গণিত লইয়াছিলাম তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি গণিতে গুপ্ত মহাশয়ের খুব অযোগ্য ছাত্র ছিলাম এবং তাঁহার ক্লাশে প্রায় যাইতাম না। তথাপি তিনি আমাকে চিনিতেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা শাস্তি দেন নাই। একদিন কেবল বলিয়াছিলেন, 'চাটুজ্জে, তোমাকে যে দেখতেই পাওয়া যায় না।'

গুপ্ত মহাশয় গণিতে যে খুব প্রতিভাশালী, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্লাশে উপস্থিত থাকায় বুঝিতে পারিতাম। খুব শক্ত বিষয়ও যখন তিনি আমার মত গণিতে অমনোযোগী বা অল্পবুদ্ধি ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিতেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতাম তিনি শিক্ষাদান কার্যে সুনিপুণ। গণিতে প্রতিভাশালী সহপাঠী ছাত্রদের প্রশংসা হইতেও অবশ্য অধ্যাপক মহাশয়ের গণিতজ্ঞতার পরিচয় পাইতাম। আমরা বি-এ পড়িবার সময় বিলাত হইতে লিটল্ সাহেব আমাদের গণিতাধ্যাপক হইয়া আসিলেন। তিনি কেমব্রিজের উচ্চ র‍্যাংলার ছিলেন। পাশ করিয়াই একেবারেই পুরা অধ্যাপক হইয়া আসিলেন। বিপিন বাবু কয়েক বৎসর চাকরী করা সত্ত্বেও কিন্তু তখন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। গণিতে লিটল্ সাহেবের বিদ্যার দৌড় কতটা ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু তিনি যে বিপিন বাবুর মতন শক্ত জিনিষ সোজা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না তাহা আমার মনে আছে। তাঁহার চেহারা ও অধ্যাপনা এখনও মনে পড়িতেছে। তাঁহার মুখের রং তৎকালে লাল ছিল, এবং তিনি কোটের নীচে, শীত না থাকিলেও, ফ্লানেলের কামিজ পরিতেন। কামিজের আস্তিন কোটের আস্তিনের চেয়ে খাট ছিল। যখন তিনি চা-খড়ি হাতে লইয়া উঁচু করিয়া বোর্ডে লিখিতেন, তখন কামিজের কফ্ অল্প দেখা যাইত। গণিতের বহিতে যে-সব নিয়ম বিবৃত আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বাম হাতে বহি খুলিয়া ধরিয়া বোর্ডে লিখিয়া আমাদের শিখাইতেন। বিপিনবাবুকে এরূপ কিছু করিতে কখনও দেখি নাই। তিনি যাহা কিছু শিখাইতে চাহিতেন, তাহাতে তাঁহার স্মৃতির সাহায্য লওয়াই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শিক্ষক হিসেবে তাঁহাতে ও লিটল্ সাহেবে এরূপ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও পেন্সন লইবার সময় তিনি মাত্র ছয় শত টাকা বেতন পাইতেন, আর লিটল্ সাহেবের ডিরেকটর হইয়া উহার পাঁচগুণ বেতন ভোগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রাপাড়ায় দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিরন্ন লোকদের সাহায্যার্থে অনেক চেষ্টা করিয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য দানের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

গুপ্ত মহাশয় সরকারী শেষ কাজ করেন কটকে রেভেন্‌শ কলেজে। তিনি সেখানে প্রিন্সিপাল থাকিবার সময় অধ্যাপনা ও ছাত্রদের থাকিবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি নিজে পুরুষোচিত ক্রীড়ায় নিপুণ ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যেও তাহাতে খুব উৎসাহ দিতেন। গরীব ছাত্রদের সরকারী কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এইবার বিপিনবিহারীর চেহারার কথায় আসা যাক। প্লুটার্ক, এলিজাবেথান যুগের অব্‌রে (ব্রিফ লাইভস্‌) থেকে আজকের মার্কিনি 'টাইম' কাগজ সবাই কোনো লোক সম্বন্ধে ছোট চরিত কথা লিখতে গেলে তাঁর চেহারার বর্ণনাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। ছেলেবেলার স্মৃতি ছাড়া আমার কাছে বিপিনবিহারীর চুঁচ্‌ড়োর ১৯১১-র তোলা বিশাল ফোটোগ্রাফ, সেই সময়ে তোলা অন্য আর তারও আগের তোলা ছবি আছে। সেই বিশাল ছবিটায় তাঁকে দেখা যায় তাঁর মাথায় ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা সোজাভাবে আঁচড়ানো চুল, চোখে নিকেলের চশমা, মুখে চাপদাড়ি, পরনে গলাবন্ধ থ্রি-পিস স্যুট, 'ওয়েস্‌কিট' থেকে পকেট ঘড়ির রুপ চেন ঝুলছে। এই জীবন্ত ফোটোগ্রাফটা দেখলে গত শতাব্দীর অনেক খ্যাত-নামা লোকের চেহারার কথা মনে পড়ে যায়।

প্রসঙ্গত বলি, অবিনাশ ধরের কথা। বলা বাহুল্য, কলকাতার পুরনো ফোটোগ্রাফে উৎসাহী লোকেদের মধ্যেও দেখেছি প্রায় কেউই জানেন না। এই ওস্তাদ শিল্পীর তোলা লোকের চেহারা আর আমার দেখা অন্তত একটি গ্রুপ-ফোটো হায়দ্রাবাদের লালা দীনদয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে মনে হয় তাঁর সময়ে তিনি বেশ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর তোলা কিছু কিছু ছবির তলায় দেখেছি তাঁর ইংরিজিতে নামের পাশে লেখা রয়েছে ধরুন 10 G. M. 1910. অন্য একটি ছবিতে দেখা যায় লেখা আছে 17 G. M. 1919. এর মানে ধর মশাই ১৯১০ থেকে ১৯১৯ এই ন'বছরের মধ্যে তাঁর ছবি দেখিয়ে সাতটা gold medal জিতেছিলেন।

যাই হোক অবিনাশ ধরের তোলা বিপিনবিহারীর বড় ছবিতে দেখা যায় যে তাঁর চোখ, যা তাঁর চেহারার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল, বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আমি একটু আগে বলেছি যে ১৯২৬ সনে বিপিনবিহারীর মারা যাবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে যে শোকসভা হয় তাতে প্রফুল্ল ঘোষ মশাই তাঁর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর বাবা ঈশানচন্দ্রকে দেবতার মতন ভক্তি করতেন। সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নয় যে তাঁর দুই অন্তরঙ্গ পিতৃবন্ধু বিপিনবিহারী আর বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র উল্লিখিত বক্তৃতায় বিপিনবিহারী কি রকম শিক্ষক ছিলেন সে দিক একদমই মাড়ান নি। তিনি কেবল তাঁর সম্বন্ধে, দু-একটি গল্প, তাঁর রসিকতা জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে বলেন, যা সেই সভায় উপস্থিত তখনকার দিনের যুবক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-র কথায় সবাইকে 'ইলেক্‌ট্রিফায়েড' ক'রে দেয়।

এর একটা গল্প হল যে একবার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এক ছুটির দিনে তিন বন্ধুতে ট্রেনে চড়ে ব্যাণ্ডেল-হুগলী অঞ্চলে বেড়াতে যান। তাঁরা ট্রেনে একটা ছোট খালি থার্ড ক্লাস কামরাতে ওঠেন। যদিও তাতে 'এই কামরায় বার জন বসিবেক' গোছের একটি লেখা ছিল, তাঁরা চাইছিলেন যে আর অন্য কোনো লোক যেন তাঁদের ঘরে ঢুকে তাঁদের নিরিবিলিতে গল্প, রঙ্গরসে ব্যাঘড়া না দেয়। যেহেতু এঁদের মধ্যে কেউ ধর্মপ্রাণ একেশ্বরবাদী ছিলেন না এবং এদের একজন ছিলেন গিরিশ বোস, তখন রঙ্গরসে কিঞ্চিৎ রসের আধিক্য থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। গিরিশ বোস মশাই যে কি অদ্ভুত রসিক পুরুষ ছিলেন তা যাঁরা তাঁর বিখ্যাত ইয়োরোপে ভ্রমণের কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন। দরজা বন্ধ করলে দরজা খুলে লোক উঠে পড়তে পারে এই ভেবে ঈশানচন্দ্র হাওড়া থেকে গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত দরজায় মোতায়েন থাকেন। খানিকক্ষণ বাদে দেখা গেল তাঁর লোক ঠেকাতে একটু কষ্ট হচ্ছে। তখন বিপিনবিহারী তাঁকে বললেন : 'ঈশান, ও তোমার কম্ম নয়, তুমি বোসো, আমি দরজা আগলাচ্ছি।' এরপর প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন যে তাঁর বাবা তাঁকে হাসতে হাসতে গল্প বলেন যে বিপিনের রাশভারী চেহারা দাড়ি আর বিশেষ ক'রে চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে আর বিশেষ কেউ তাঁদের গাড়িতে উঠবার চেষ্টা করে নি।

১৯০২ সনে যখন বিপিনবিহারী চাকরি করতে কটক যাত্রা করেন তখন বি এন আর হয় নি বলে তাঁদের কলকাতা থেকে বি আই কোম্পানির মাদ্রাজগামী জাহাজে চড়ে বালেশ্বরের কাছে চাঁদবালি হয়ে প্রথমে মহানদীর মুখে হুকি টোলার (Hooky Tollah) ফল্‌স পয়েন্ট বলে জায়গায় যেতে হয়। তারপর সেখানে থেকে স্টিমার ক'রে মহানদী দিয়ে কটক।

আমার কাছে যে ১৯৬৮-তে ছাপা র‍্যাভেন্‌শ কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ রয়েছে তাতে দেখছি ১৮৭৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত চল্লিশজন অধ্যক্ষ এই কলেজে মোট কাজ করেছেন। এই লিস্টি থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৯৭ সনে কয়েক মাসের জন্য নীলকণ্ঠ মজুমদার র‍্যাভেন্‌শ কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী বইতে দেখছি নীলকণ্ঠ মজুমদার ১৮৯০-৯১-তে কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন স্বনামধন্য ডাঃ প্রসন্নকুমার (পি কে) রায়ের পর। তার পরে ১৯০০ সনে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী কিছুদিনের জন্যে অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ হন। ক্ষীরোদচন্দ্রও অবসর নিয়ে কটকে অনেকদিন ছিলেন। আমার মনে আছে খুব ছেলেবেলায় ঠাকুমা আর মা-র সঙ্গে কটকে বারবাটি কেল্লার পশ্চিম ধারে ছবির মতন বাগান-দেওয়া সুন্দর বাড়িতে ক্ষীরোদচন্দ্র থাকতেন ঠিক বিজু পট্টনায়কের বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের বাড়ির পাশে। ক্ষীরোদবাবুকে আমি দেখি নি কিন্তু দেখে থাকলেও মনে নেই। তবে ওঁর মেয়েদের এলাদি আর বেলাদির কথা খুব আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ে। এঁদের একজনের ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের নামজাদা

লোক মৃত্যু সেনের সঙ্গে পরে বিয়ে হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা বলব। যোগীনসরকারের 'খুকুমণির ছড়া'র আমার যে 'শৈব্যা'র বইটা আছে তাতে আসল সংকলনের কাঠখোদাইগুলির দু-একটা ছাড়া সব বাদ দিয়ে বইটাকে তছনছ ক'রে দেওয়া হয়েছে। তবে 'শৈব্যা'র কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এই কারণে যে বইটির শেষে 'খুকুমণির ছড়া : আলোচনা ২' বলে তাঁরা ক্ষীরোদচন্দ্রের খুকুমণির ছড়ার একটা সমালোচনা ছেপে বার করেছেন। ১৯০৬ সনে খুকুমণির ছড়া বেরনোর পরই 'নব্য-ভারতে' প্রকাশিত এই তিন পাতার সমালোচনাটি ভাব, ভাষা, দরদ ও বোধশক্তির দিক থেকে তুলনাহীন। ক্ষীরোদবাবু তাঁর লেখার যেভাবে বইটি যাচাই ক'রে তার তুল্য মূল্য দিয়ে গেছেন সেখান থেকে বইটিকে নড়ানোর কারুর সাধ্যি নেই।

বিপিনবিহারী ১৯০২ থেকে ১৯০৯ অর্থাৎ প্রায় আট বছর র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন অধ্যক্ষ ছিলেন বি সামন্ত রায়, যিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ অবধি এই পদে বহাল ছিলেন। বিপিনবিহারীর আমলের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ১৯২০-তে কিছুদিনের জন্যে অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আর একজন দিকপাল বাঙালি যিনি এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে র‍্যাভেন্‌শ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি হলেন বাঁকুড়ার স্বনামধন্য আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

রসায়নের অধ্যাপক আচার্য যোগেশচন্দ্র অল্প বয়সে যাকে বলে একটু এক্‌সেনট্রিক ছিলেন। কটকে তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প বাঙালি মহলে খুব চালু ছিল। একবার হঠাৎ দেখা গেল যে যোগেশচন্দ্র বেশ ক'দিনের জন্যে কলেজে আসছেন না। কেন তিনি আসছেন না তাই জানতে বিপিনবিহারী তাঁর বাড়ি যান। গিয়ে দেখেন তিনি শয্যাগত। তাঁর কি অসুখ করেছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে আসলে তাঁর অসুখ করে নি। তাঁর বাড়ির লোকেরা শেষে বিপিনবিহারীকে জানালেন যে তিনি বেশ কিছু দিন ধরে পেঁপে খেয়ে থাকা যায় কি না তাই নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তখন বিপিনবিহারী যোগেশচন্দ্রকে ধমক ধামক দিয়ে আবার সাধারণ খাবার-দাবার খাওয়ানোর জন্যে কড়া হুকুম দিয়ে এলেন। বলার দরকার নেই মাছ-মাংস-তরি-তরকারী আর ডালভাত খেয়ে যোগেশচন্দ্র করেকদিনের মধ্যেই আবার চাঙা হয়ে উঠলেন।

নীলকণ্ঠ মজুমদার, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রমুখ র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যক্ষদের নাম-যশ তাঁদের চাকরি ছাড়ার বহুদিন বাদেও ওড়িশার শিক্ষিত লোকজনের মুখে মুখে ফিরত।

১৯০৭ সনে আমি কটক থেকে কলকাতায় চলে আসি। তারপর একবার গরমের ছুটিতে কটক যাই। সেই সময়কার গত শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যের বাঙালি দিকপাল কবি রাধানাথ রায়ের নাতি আর তখনকার ওড়িশা কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা যুবক গিরীশঙ্কর আমাকে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস মশাইয়ের

কাছে নিয়ে যান। সেকালের রীতি অনুযায়ী আমার বংশ-পরিচয় দেওয়াতে দাস মশাই তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেন যা তখন আমি মোটেই ভালোভাবে শুনি নি। তবে তিনি খুব অবাক হলেন যখন তিনি জানলেন যে ম্যাথামেটিসিয়ান বি ভি গুপ্ত-র নাতি হয়ে আমি অঙ্কর 'ব্লাংগলার'। এর পরে পঞ্চাশের দশকে আর একজন মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহাতবের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম তিনি বি ভি গুপ্ত-র কাছে না পড়লেও তাঁর এরিথমেটিক ইস্কুলে পড়েছিলেন।

আমি আগে র‍্যাভেন্‌শ কলেজের যে তিনজন বাঙালি অধ্যক্ষের কথা বললাম তারপর ১৯০৯ থেকে ১৯৩১ অব্দি যে ক'জন অধ্যক্ষের কাজ করেছেন তাঁদের তিন জন বাঙালি অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছাড়া সবাই সাহেব। হঠাৎ এত সাহেব আমদানির একটা কারণ আমরা পাই ওড়িশার অমর লেখক ফকীরমোহন সেনাপতির ছেলে মোহিনীমোহন সেনাপতির ১৯৩৯-এ ছাপা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে প্রবন্ধ-সংকলনে। মোহিনীমোহন ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক আর র‍্যাভেন্‌শ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। আমাদের তাঁর কাছে তিনি পেনশন নেবার আগে ১৯৩৮-৩৯ দু'বছর লজিক পড়বার সৌভাগ্য হয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অবতরণিকায় তিনি এক জায়গায় র‍্যাভেন্‌শ কলেজ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার বাংলা অনুবাদ হল : 'আমি যখন র‍্যাভেন্‌শ কলেজে পড়তাম তখন নীলকণ্ঠ মজুমদার ও বিপিনবিহারী গুপ্ত-র মতন যোগ্য বাঙালি পণ্ডিতরা অধ্যক্ষের কাজ করছিলেন। ওড়িয়াদের মধ্যে অধ্যক্ষ হবার মতন যোগ্য লোক তখন ছিলেন না। এই সময়ে বাঙালিদের অধ্যক্ষ পদ থেকে তাড়ানোর জন্য আন্দোলন উপস্থিত হল। সরকার ওই সুযোগ নিয়ে উক্ত পদে অযোগ্য ইংরেজ কর্মচারীদের নিযুক্ত করতে লাগলেন। এই কর্মচারীদের অধীনে থেকে র‍্যাভেন্‌শ কলেজের শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।' এখানে লক্ষ করার জিনিস যে ভাষার ব্যবহারে চোস্ত ওস্তাদ মোহিনীমোহন সাহেবদের খালি খালি 'কর্মচারী' বলে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষাব্রতী বলে নয়। সুপণ্ডিত বিচক্ষণ মোহিনীমোহন শ, ল্যামবার্ট, হুইটলক্, আউস্টন স্মিথ, অরগিল, ডিউক প্রমুখদের তাঁবে কাজ ক'রে তাঁদের বিদ্যেবুদ্ধির বহর হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন।

মোহিনীমোহন সেনাপতির কথার জের টেনে আমি অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলির লেখা থেকে বিপিনবিহারীর শিক্ষকতা আর অধ্যক্ষতার বিষয়ে আর কিছু কথা তুলে দিতে চাই। গোপালচন্দ্র লিখেছিলেন :

> Successive Directors of Public Instruction and Principals of Presidency College had nothing but the highest praise for him and his work. 'When he was Principal of Ravenshaw College,' remarks one, 'his work was admirable both from the scholastic and administrative point of view…'. 'It may

be stated without exaggeration,' remarks another, 'that a complete revolution was effected in every department of the College and the School attached to it by Mr B. V. Gupta.'

আমাদের জন্মাবার আগে ঠাকুরদাদার কটকের জীবনের একটা মজার ঘটনার কথা বলি। ১৩৮২-র শারদীয়া 'কথাসাহিত্য'তে শরৎস্মৃতি নামে প্রবন্ধে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশাই এক জায়গায় লিখেছিলেন: 'শরৎবাবুর দ্বিতীয় গল্প কটক যাওয়া প্রসঙ্গে। তিনি বলিয়াছিলেন,—আর একবার বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হলেম। হাঁটাপথে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে পুরী পৌছুলাম। পথে এক গ্রামে কলেরার বীভৎস লীলা দেখে পালিয়ে গেলাম। পুরীতে কয়েকদিন মন্দ কাটল না। শেষে কটকে এলাম। তখন আমার দেহ শীর্ণ, বস্ত্র জীর্ণ, পদযুগল জীর্ণ, জুতা জামা ছিন্ন। এই বেশে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশেই এক বাঙালির বাড়ি থেকে একটা চাকর এসে বলে, বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

চাকরের সঙ্গে পৌছুলে, বাবু ধমক দিয়েই জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তুমি?' ধমকে ধমকে স্বীকার করেন—আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। শেষে অর্ধাভাবে ধর্মশালায় ঠেকেছি, যেখানে যা জুটেছে তাই খেয়েছি। তিনি বল্লেন—বেশ করেছ। শেষে তিনি আমাকে বন্দী ক'রে রেখে বাড়িতে খবর দিলেন। শেষে বাড়ি থেকে লোক গিয়ে আমাকে নিয়ে এল। এই মহামনা বাঙালী সুপ্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক মিঃ বি ভি গুপ্ত।

আমার মনে হয় যে বাড়িতে বিপিনবিহারী শরৎচন্দ্রকে কয়েদ ক'রে রেখেছিলেন সেটি আমাদের ক্যানটনমেন্ট রোডের বাড়ি নয়, বক্সিবাজারের ভাড়া বাড়ি। আমরা ছোটবেলায় মা-র কাছে শুনছি যে উনি অনেকদিন দেখেছেন যে শ্বশুর মশাই শরৎবাবুর নভেল তাঁর নিরক্ষরা কিন্তু সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর উঁকি দিয়ে দেখতেন যে শ্বশুর মশাইয়ের গলা পড়তে পড়তে ভারি হয়ে আসত আর শাশুড়ীর চোখ জলে টস্‌টস্ করত।

১৯১১ সনে বিপিনবিহারী হুগলী কলেজ থেকে পেনশন নেন। মা-র কাছ থেকে তখনকার চুঁচড়োর হুগলী কলেজের জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শুনেছি। কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার ছিল কলেজ-বাড়ির একাংশে গঙ্গার ঘাটের ওপর। ঠাকুরদা হয় চোগা-চাপ্‌কান কিম্বা গলাবন্ধ কোট আর প্যান্ট পরে ওপর তলার একটা দরজা খুলে কলেজে চলে যেতেন। মা, তাঁর ছোট জা আর ননদরা দোতলার চিকের আড়াল থেকে বিকেলে ছুটির সময় ছেলেদের হৈ-হল্লা দেখতেন। আর গঙ্গার ধারের বারান্দায় তাঁরা দেখতে পেতেন গঙ্গার বুকের অজস্র পাল তোলা নৌকোয় যাত্রীদের যাতায়াত। কত গৌর মাঝি হয়ত হাল ধরে সদ্য বিয়ে করা বর-বৌদের পাল দেওয়া নৌকোয় পার ক'রে দিত। মাঝিদের গানও মাঝে মাঝে কানে আসত। বহুদিন আগে হালিশহরের মাঝিদের একটি গানের দু'টো কলি ছিল: 'ওরা

গাঙে এলো জোয়ার মাঠ করে থৈ থৈ / গাঙ্গিনী কামিনী হল ভরযুবতী সই / দু'টো মনের কথা কই।'

তবে মা বেটা বেশ গর্ব ক'রে বলতেন সেটা হল মাঝিরা যখন গঙ্গায় ইলিশ ধরে প্রিনসিপাল সাহেবের বাড়ির ঘাটে জল থেকে মাছ-ভরা জাল টেনে তুলত তখন তাঁরা জ্যান্ত ইলিশ মাছ ধড়ফড় করতে দেখেছেন।

১৯১১-র হুগলী কলেজ ছাড়বার সময় সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেন। ছেলেবয়েসে দেখা সেই সিংহ আর ইউনিকর্নের ছবি দেওয়া আর 'ডিউ এট্ মন্ ব্রোয়াট' লেখা খেতাবের বয়ান এখনো আমার মনে আছে। 'I hereby confer upon you the title of Roy Bahadur as a personal distinction.' বড়লাটের নাম ছিল Lord Hardinge of Penhurst.

আমি এই খেতাব-প্রসঙ্গ তুলছি একটা কারণে। কটকের বাড়িতে আমাদের ঠাকুমার একটা বিশাল কাঠের দরজা দেওয়া আলমারি ছিল। সেই আজব আলমারিতে কত রকমের জিনিস আর খেলনা থাকত তা বলা যায় না। ঠাকুমা মারা যাবার পর আমি একদিন মা-র কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে দেখলাম লাল-ফিতের বাঁধা ইংরিজি আর বাংলায় লেখা মোটা চিঠির তাড়া। চিঠি-গুলো তখনকার বাংলার বড় বড় শিক্ষাব্রতী, পণ্ডিত, নামজাদা লোকদের লেখা ঠাকুরদার খেতাব পাওয়ার 'অভিনন্দন' পত্র। তবে মনে আছে অভিনন্দন ছাড়া অনেক চিঠিতে আরও নানান কথা লেখা ছিল। বারো-চোদ্দ বছর বয়স হলেও আমি সেই চিঠিগুলোর তখন দাম বুঝি নি। পরে সেগুলো জঞ্জালের সঙ্গে বিদেয় হয়ে গিয়েছে। বছর তিরিশেক আগে যখন আমার পুরনো জিনিসের ঝোঁক হয় তারপর থেকে মাঝে মাঝে এই চিঠিগুলোর কথা মনে পড়লে দুঃখু হয়।

সাহেবদের আমলে রায় বাহাদুর বা অন্য কোনো খেতাবের কথা উঠলেই দু-একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন, কেন আর কাদের খেতাব দেওয়া হতো। সব যুগের শাসকদের রীতি অনুযায়ী খেতাব দেওয়ার দু'টো মোটা কারণ ছিল। ছোট বড় সম্মান সাহেবরা প্রথমত তাঁদেরই দিতেন যাঁরা তাঁদের নিজের নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে লোকেদের উপকার করতেন। আর দ্বিতীয়টা হল, বলা বাহুল্য, রাজনীতিক আনুগত্য। যাঁদের খেতাব দেওয়া হতো তাঁরা খয়ের খাঁ না হলেও রাজনীতিক ব্যাপারে তাঁদের নির্লিপ্ত বা নির্বিরোধ থাকতে হতো।

রমেশ দত্ত, সুরেন বাড়ুজ্জের মতন কিছু লোক আদর্শ ও হয়ত তার সঙ্গে কখনো ব্যক্তিগত কারণে রাজনীতিতে ঝাঁপ দিলেও তখনকার আমলে বেশির ভাগ উঁচু পদের সরকারি চাকুরেরাই, বলা বাহুল্য, তাঁদের মনের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপ বা মনোভাব তাঁদের কথায় বা লেখায় প্রকাশ করতে পারতেন না। বিপিনবিহারীর যতদূর জানি চিরজীবন 'অ্যাপলিটিকাল' ছিলেন। বহু বছর আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে তাঁর একজন বৃদ্ধ রাজ-

ভক্ত ভক্তজন যখন জানতে পারেন যে তাঁর পরিবারের এক ছোকরা পলিটিক্স করছে তখন ভয়ানক রেগেমেগে বলেন : 'আমাদের পরিবারে পাগল আছে ছাগল আছে, কিন্তু কেউ কখনও রাজনীতি করে নি।' বিপিনবিহারী এতটা 'ডবল বহরী রাজভক্ত ছিলেন না বললে ভুল হবে না।

অবসর নেওয়ার পর বিপিনবিহারী কলকাতায় না থেকে আবার আত্মীয়স্বজনহীন কটকে ফিরে গেলেন কেন? এর কারণগুলোর মধ্যে প্রথম হল যে র‍্যাভেন্‌শ কলেজে চাকরি করতে করতেই তিনি কটকের ক্যানটনমেন্ট অঞ্চলে ছ'বিঘে জমি, বাগান পুকুর-সমেত বাংলো কিনে তার পিছনে একটা বড় দোতলা বাড়ি করে-ছিলেন। ক্যানটনমেন্ট অঞ্চলে ঝকঝকে-তকতকে সুন্দর নির্জন পরিবেশ আমাদের ছেলেবয়সেও ছবির মতো রমণীয় ছিল। শান্তিতে অবসর জীবন কাটাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা বলেই বিপিনবিহারী সেখানে থাকতে ভালোবাসতেন। তা ছাড়াও তাঁর বাত কটকের গরম আর খটখটে আবহাওয়ায় ভালো থাকত। রেল হবার পর কলকাতা ইউনিভার্সিটির মিটিং করতে আসারও কোনো অসুবিধে ছিল না।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমাদের কটকের বাড়ির পরিবেশ বড় সুন্দর ছিল। বাড়ির সামনে ছিল বড় বড় গাছের ছায়া-ঘেরা রাস্তা। সুরকি দিয়ে রাস্তা তৈরি করা এদেশে গত শতাব্দীর গোড়ায় প্রথম চালু করেন ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেক্‌পিস থ্যাকারের বাবা রিচমণ্ড থ্যাকারে। চাকরির একেবারে গোড়ার দিকে তিনি যখন বীরভূমে ছিলেন তখন সেখানে বীরভূম রাবল্‌ দিয়ে রাস্তা করেন। তারপর মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি যখন চব্বিশ পরগনার কমিশনার হয়ে কলকাতায় আসেন তখন তিনি এখানে লাল সুরকির রাস্তা করেন। দুঃখের বিষয় ১৮৮৫ সনে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর চাকরি-জীবনের মধ্যাহ্ন গগনে তিনি মারা যান।

আমাদের এই লাল সুরকির রাস্তা বাড়ির পাশ দিয়ে বাঁ দিকে কেল্লার মাঠ আর তারপরে ডান ধারে বিখ্যাত পাঠান আমলের বারবাটি কেল্লার পরিখার পাশ দিয়ে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে কেল্লার পাশ দিয়ে মহানদীতে পড়ত। এই রাস্তায় ঠাকুরদা বিকেলে হাঁটতে যেতেন। তারপর ইচ্ছে হলে এই রাস্তা দিয়ে না ফিরে মহানদী আর কেল্লার মাঝখানের রাস্তা ধরে গড় পরিক্রমা ক'রে বাড়ি ফিরতেন। আমার সামনে শ্রীমান ইন্দ্রনাথ মজুমদারের দেওয়া মোলোনে (Moloney) বলে এক সাহেবের গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আঁকা 'The Mahanadi at Cattack' বলে একটি সাদা-কালো এনগ্রেভিং রয়েছে যা ছবির পিছনের ছাপ দেখে জানা যায় যে এককালে অমৃতলাল বসুর বিশাল বই আর ছবির সংগ্রহে ছিল। তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে একটি গাছের তলায় এক সাহেব দম্পতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামনে রেড রোডের মতো পাঁচিল দেওয়া ছোট ছোট বাহারী গাছ লাগানো ফুটপাথ—সামনে প্রবহমানা মহানদীর বুকে তিনটি পাল-তোলা নৌকো। আর নদীর ওপারে বনজঙ্গলের পিছনে ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের সারি, যা পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ। এ যেন

আমাদের ছেলেবেলায় দেখা কটকের জোবড়া অঞ্চলের মহানদীর হুবহু ছবি।

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ জন বীম্‌স তাঁর The Memoirs of a Bengal Civlian-এ লিখেছেন যে তাঁর ভারতীয় জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন কেটেছে কটকের মহানদীর ধারে তালদন্ডা কেনালের পাশে জোবড়া অঞ্চল। বীম্‌স বালেশ্বরে থাকতে কটকে বড়দিন কাটাতে আর ছুটকো-ছুটকা দু-একবার গেলেও ১৮৭৩-এ ওড়িশা ডিভিসানের কমিশনার হয়ে কটকে যান। তাঁর আগেকার কমিশনার ছিলেন যাঁর নামে র‍্যাভন্‌শ কলেজ সেই টি ই র‍্যাভেন্‌শ। তিনি অবসর নেবার আগে তিনমাসের প্রিভিলেজ লিভে যাবার আগে একদিনও ছুটি নষ্ট না করার জন্য স্টিমারে ওঠার আগে পর্যন্ত বীম্‌সকে চার্জ বোঝাবার কাগজপত্তর সই করতে রাজি হন নি। ফলে বীম্‌স সাহেবকে র‍্যাভেন্‌শ-র সঙ্গে স্টিমারে ক'রে ফল্‌স পয়েন্ট অবধি যেতে হয় যেখান থেকে র‍্যাভেন্‌শ সাহেব জাহাজে মাদ্রাজ যান। বীম্‌স ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ অবধি তাঁর কটকে ও ওড়িশায় থাকার আনন্দজনক অভিজ্ঞতার কথা লিখে শেষে বলেছেন : 'I was bitterly disappointed in leaving Orissa, to which I was grown very much attached...'

কটক বলতে সবাইকার মনে সাধারণ জেলা সহরের ধুলো-মাখা, ঘিঞ্জি, নোংরা, চটা-ওঠা চেহারার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তবে কেন আগেকার দিনে লোকেদের কটক ভালো লাগত? ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে একটু খুলে বলা দরকার। কোম্পানির আমল এবং সাহেবি আমলের প্রায় শেষ অবধি কলকাতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যেত। একটা হল ঝকঝকে সাহেব কলকাতা, অন্যটা ঘিঞ্জি নোংরা দিশি কলকাতা। ভারতের সব ক্যানটনমেন্ট সহরেরও পক্ষে কথাটা খাটত।

সাহেব-মেমরা যেখানেই থাকতেন সে জায়গাগুলোকে ছিমছাম পরিষ্কার আর সুদৃশ্য ক'রে রাখতেন। আর মিলিটারি থাকলে তো চাঁদে চুড়ো। কটকের ক্যানটনমেন্ট অঞ্চল আর খানিকটা উল্টো দিকের কাঠজুড়ি নদীর পাড়টা বড় মনোরম ছিল। এখানে বলা দরকার যে কটক সহরকে উত্তরে মহানদী আর দক্ষিণে কাঠজুড়ি সাঁড়াশির দাঁড়ার মতন ঘিরে রয়েছে। আর যেহেতু নদী দু'টো বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে উঠলে কটক সহরের ভেতরটা নদীর জলের লেভেলের চেয়ে নিচুতে চলে যেত তাই দু'টো নদী মারাঠাদের তৈরি মজবুত পাথরের বিশাল মাইল-কে-মাইল লম্বা বাঁধ দিয়ে ঘেরা ছিল। এই বাঁধ দেখলে মনে হয় কোনো অতিকায় দৈত্যদের কীর্তি।

কটকের দিশিপাড়া ছিল অনেক জায়গায় অসম্ভব নোংরা, অনেক জায়গায় কম লোকের জন্যে ফাঁকা আর অপেক্ষাকৃত কম নোংরা। বাকি ছিল তিনটে জিনিসের জন্যে বিখ্যাত – ধুলো, ফুলঝাঁটা আর হরিণের পেটের চামড়া উল্টে নিয়ে তার ওপর মুগা বা রঙিন সুতোর কাজ করা চটি। এই চটি আগেকার দিনে কটকের বালু বাজার আর চৌধুরী বাজার যেখানে মিশেছে সেখানে তেলেঙ্গা দু'তিন ঘর মুচির কাছে পাওয়া যেত। এই চটি এত প্রসিদ্ধ ছিল যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের

অভিধানে কটকীর মানে কটক-জাত দ্রব্য লিখে বলা হয়েছে. যেমন কটকী চটি। এটা আবিষ্কার ক'রে খুব মজা পাই।

কটকে তখন একটা রোগের ভীষণ উৎপাত ছিল। তা হল গোদ। আমার জন্মাবার আগে আমাদের একজন ঠাকুরদা-স্থানীয় লোক, গিরিডির তৎকালীন নাম-জাদা ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত ওড়িশায় কটক, পুরী, কেন্দ্রাপাড়া আরো নানান জায়গায় বেড়াতে যান। ফিরে এসে তাঁর সেই ভ্রমণের কথা তখনকার অনেক বাঙালির মতো লম্বা একটা পদ্য লিখে ছাপিয়ে বার করেন। যা অতি অল্প বয়সে পড়ে ভয়ানক মজা লেগেছিল। নানা রঙ্গরসে ভরা সেই পদ্যের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন :

'ওলকচু নয় মানকচু নয়
গেঁজ তাতে ধরে,
খুঁজলে পরে দেখতে পাবে
আছে অনেক ঘরে।'

গ্যাজ মানে গোদের ওপর বিষফোড়া।

জীবনানন্দ দাশই কি লিখেছিলেন যে 'ও কেন কেবল জলের মতন ঘুরে ঘুরে কথা কয়?' জীবনানন্দর 'ও'র কোনো দিকে সামিল না হলেও আমি এ-র একবার ঘুরে ঘুরে বলব যে কটক থেকে ক্যানটনমেণ্ট গত শতাব্দীতে উঠে গেলেও তার ছাপ থেকে গিয়েছিল কিছু কিছু অঞ্চলের ছবির মতন পরিবেশে, শহরের ইস্টিশান ছাড়িয়ে চাউলিয়াগঞ্জের সার সার ব্যারাকে, কেল্লার মাঠ আর পল্টন বাজার বলে জায়গার নামে।

খুব ছেলেবয়সে যতটুকু মনে আছে আত্মীয়-স্বজনে, লোক-জনে, কাজের লোকে বাড়ি গম্‌গম্‌ করত। আমরা ছিলাম চার ভাই আর তিন দিদি। আমার আর ছিলেন বাবা-মা, ঠাকুমা, আর বটগাছের মতন ঠাকুরদা। আমাদের বড়দিদি মীরা আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তাঁর যখন চোদ্দ বছর বয়েসে বিয়ে হয় তখন আমার বয়েস চার কি পাঁচ। কিন্তু সেই বিয়ের ব্যাপারে কতকগুলো কথা আমার বেশ মনে আছে। যেমন উঠোনে সাজানো বিয়ের তত্ত্বর কথা। তত্ত্বগুলোর মধ্যে আমি একটা জিনিস খুব মন দিয়ে দেখেছিলাম। সেটা হল একটা গামলার মতন জিনিসে জলে-ভাসা মাখনের বা ননীর হাঁস। ধবধবে সাদা সেই হাঁস দেখতে হুবহু আমাদের পুকুরের হাঁসের মতন ছিল। আর মনে আছে ফটকের দু'-পাশে দু'টো হাউইয়ের 'গাছের' কথা। সন্ধ্যাবেলায় যখন নিমন্ত্রিতরা জড়ো হয়েছেন তখন খাওয়ার আগে সেই বাজি পোড়ানো হয়েছিল। গাছগুলো থেকে একটির পর একটি হাউই আকাশে উঠে ফেটে পড়ছিল আর আকাশ দিয়ে নেমে আসছিল রাশি রাশি ঝকঝকে আর রঙিন তারা। বাজি দেখে যেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তেমনই আবার ভয়ানক ভয় করছিল এই ভেবে যে এই বুঝি আমার মাথায় বাজি পড়বে।

বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫-১৯২৬)

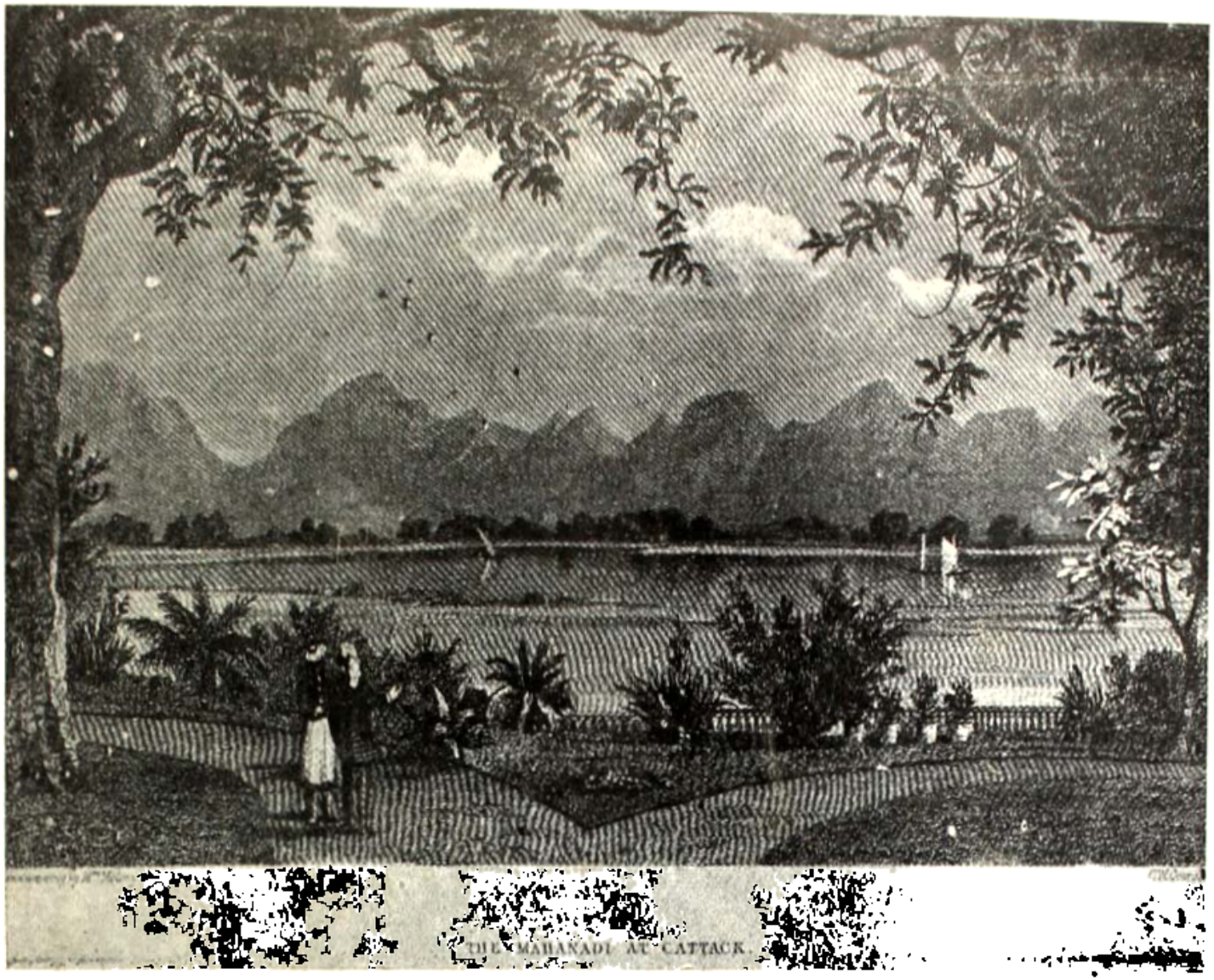

মোলোনে-আঁকিত এনগ্রেভিং 'কটকের মহানদী'

আমি দিদির বিয়ে আর বিশেষ ক'রে বাজি পোড়ানোর কথা এতখানি লিখলাম কারণ এ প্রকার যে কতবার স্বপ্নের ভিতরে দেখেছি তা বলা যায় না।

দিদির বিয়ে হয় কটকের তখনকার নামজাদা উকিল কাঠজুড়ির ধারের গণেশ ঘাটের ব্রজরাজ চৌধুরীর বড় ছেলে ডাঃ সন্তোষকুমার চৌধুরীর সঙ্গে। শেষ যেবার কটকে গিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে বাড়িটা একটু রং-চটা হলেও সেই পুরনো দিনের জাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে খানিকটা চিৎপুর রোডের ছোটখাট থামওয়ালা বাড়ির মতন।

এই ফাঁকে ওড়িশার প্রবাসী বাঙালিদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। কলকাতা ভারতে ইংরেজদের রাজধানী হওয়ার ফলে গত শতাব্দীতে বাঙালিরাই এদেশে ইংরিজি শিক্ষার সুযোগ পান। তারপর শিক্ষিত বাঙালিরা সারা ভারতের দিকে দিকে ছোট বড় চাকরি আর নানান পেশা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কে একজন সাহেব বলেছিলেন যে উনিশ শতকে The Dhoti spread from Sind to Assam কোয়েটার ইস্টিশান মাস্টার থেকে বড় বড় রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদির কাজ সারা উত্তর ভারতে প্রায় একচেটে ছিল। ওড়িশাতেও তাই। ব্রজরাজ বাবুর বাড়ির পাশেই থাকতেন আর এক বাঘা উকিল বিশ্বনাথ সিংহ। তাঁর বিরাট রাজবাড়ির মতন বাড়িতে। দু-তিন মাইল দূরে থাকতেন ওড়িয়া বাজারে এঁদের চেয়ে কমবয়েসি প্রতিভাবান উকিল সুভাষ বোসের বাবা জানকীনাথ বোস। এ ছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিশের 'সানসেট্ ল'-এর দৌলতে সারা ওড়িশায় এমনকি গঞ্জাম অঞ্চলেও বাঙালিদের বিশাল বিশাল জমিদারি ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, চন্দননগরের বসু পরিবার, ঠনঠনের রাজবাড়ি ও আরো কত পরিবারের ওড়িশার নানান অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বালেশ্বর আর কটকে কায়েমীভাবে থাকতেন। নাম ভুলে গেছি, বোধহয় গোলক চৌধুরীর বিশাল বাড়ি আমাদের ছেলেবেলায় র‍্যাভেন্‌শ গার্লস স্কুল ছিল, এখন কলেজ। সেখ বাজার অঞ্চলে অন্যান্য রায়চৌধুরীদের বড় বড় বাড়ি এখনো ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যাঁদের নাম করলাম তাঁরা গত শতাব্দীর শেষ দিকে সাহেবদের আমদানি বা পেশার তাগদে ওড়িশা-প্রবাসী বাঙালি। কিন্তু বাঙালিদের সঙ্গে ওড়িশার সম্পর্ক আসলে ঢের ঢের পুরনো। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে যেসব বাঙালি বৈষ্ণবরা নীলাচলে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কটক, মাহাঙ্গা, ভদ্রক, জাজপুর ইত্যাদি নানান অঞ্চল থেকে গিয়েছিলেন। কটকের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের একটা স্মৃতি এখনো অটুট রয়েছে। আমি যে বারবাটি কেল্লার কথা আগে বলেছি তার কিছু দক্ষিণে আছে গড়গড়িয়া ঘাট। এই ঘাটে শ্রীচৈতন্য পুরী যাবার রাস্তায় একদিন বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর এই সাময়িক স্থিতিকে স্মৃতি ক'রে এখনো প্রত্যেক বছর অঘ্রান মাসের পূর্ণিমার দিনে ঘাটের সামনের মাঠে একটা বড় মেলা বসে। আমাদের ছেলে-

বেলায় এই মেলা একটা বিরাট ঘটনা ছিল। কটকের ঘুমন্ত জীবনে এই মেলা অন্তত একদিনের জন্ত ভীষণ চাঞ্চল্য এনে দিত। চৈতন্তদেবের সময়ে একটু পরে ওড়িশায় তোডরমল্লার জমি বন্দোবস্ত পত্তন করার জন্তে অনেক বাঙালি কানুনগো জাতীয় লোক ওড়িশায় গিয়ে সেখানে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এই বাঙালিরা শ শ বছর ওড়িশায় থাকলে কি হবে এঁরা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-শাদি করতেন আর এঁদের রান্নাবান্না, জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাকে আর ভাষায় বাঙালিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। দেশ, দেশের জীবন, লোকজনের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে বিদেশে সেই ভাষার চরিত্র বজায় রাখা যায় না, আর বলা বাহুল্য, তার বাড়-বৃদ্ধি হয় না। ফলে কালক্রমে এঁদের ভাষার চেহারাটা যা দাঁড়ায় তাতে 'করে', 'কেরে' ধরনের শব্দের আধিক্য থাকায় তা 'ক্যারা বাংলা' বলে পরিচিত হয়। সেই ক্যারা ভাষা বৈষ্ণব যুগের বাংলা আর ওড়িয়া দুই ভাষার শব্দের বিকৃত ও বিচিত্র মিশেল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ছেলেবেলায় আমাদের ক্যারা বাঙালি বন্ধুদের ভাষা শুধু বুঝতামই না নয়, আর ছোট ছেলেদের স্বভাবানুযায়ী শুনে হাসতাম আর ঠাট্টা করতাম। একটা উদাহরণ দি। একবার মর্নিং স্কুল থেকে আসবার সময় কটকের বহুযুগবাসী বাঙালি সেকরাদের বাসস্থান বণিয়া সাহী বলে একটা জায়গায় শুনে-ছিলাম একজন মা তাঁর ছেলেকে ধমকে বলেছিলেন : 'এত খারা (খরা) করেছে, সজনা খাড়া গাছে উঠেছিস্, উলে (নেবে উলে আয়।' এর মধ্যে পুরনো বাংলা আর ওড়িয়া শব্দের মিশাল স্পষ্ট। আমরা যখন কটকে র‍্যাভেন্‌শ কলেজে পড়ি তখন শুনেছিলাম যে প্রভাত মুখার্জি বলে একজন ভদ্রলোক ক্যারা ভাষায় তখনো ব্যবহৃত বৈষ্ণব যুগের বাংলা শব্দের একটা ফিরিস্তি করছেন। সে কাজ শেষ হয়েছিল কি না, বা সেই চেষ্টার শেষ পর্যন্ত কি ফল হয় জানি না। আগে যে বণিয়া সাহীর কথা বলেছি সেখানকার সেকরারা বেশিরভাগ রুপোর মোটা কাজ করত, যেমন হাতে পরার ভারি খাড়ু। কটকের যে সেকরারা বিখ্যাত Filigree বা সূক্ষ্ম রুপোর তারের কাজ করত তাদের মধ্যে অনেকেই বাঙালি ছিল। কারুর কারুর মতে বহুদিন আগে ঢাকা থেকে এই কাজ ওড়িশায় যায়।

আমাদের বাবা ভূপেন্দ্রকুমার বিহার-ওড়িশার রেভিনিউ বিভাগের অফিসার ছিলেন। বাবার খেলাধুলোয় ভীষণ উৎসাহ ছিল। কটকের ভারতীয়দের ইউনিয়ান ক্লাবের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আর ছিলেন ওড়িশা অ্যাথলেটিক অ্যাসো-সিয়েশানের প্রতিষ্ঠাতা। আমার কাকা মণীন্দ্রকুমার (অমরু) তখনকার দিনের একজন নামজাদা স্পোর্টসম্যান ছিলেন। তিনি এক সময়ে মোহনবাগানের হয়ে ফুটবল, স্পোর্টিং ইউনিয়ানের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। হকি, টেনিস আর বিলিয়ার্ডস খেলায়ও ওস্তাদ ছিলেন। আর কমপাল্লায় দৌড়ে অমরুর জুড়ি ছিল না। কয়েক বছর আগেও তাঁর বাড়িতে একটা বাঁধানো ছবি দেখেছিলাম যাতে তিনি গড়ের মাঠে একশ গজ দৌড়ে ফার্স্ট হয়ে তখনকার দিনে 'রেকর্ড' করছেন।

কাকার কাছ থেকে বাংলা দেশের 'ডবলিউ জি গ্রেস্' অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম যা হয়ত এখনকার দিনে অনেকের জানা নেই। মার্কাস স্কোয়ারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল, সারদাবাবু ফিল্ড করছিলেন। হঠাৎ একজন তাঁর দিকে ক্যাচ তোলেন। বলটা ব্যাটে লেগে ধনুকের মতন বেঁকে সারদারঞ্জনের পিঠের কাছাকাছি পিছনে যায়। সারদারঞ্জন না ফিরে পিছন দিকে হাত দিয়ে ক্যাচ নেন। সবাই অবাক। কি ক'রে ধরলেন, কি ক'রে ধরলেন বলাতে গণিতজ্ঞ সারদারঞ্জন নাকি বঙ্কিমচরণের মতন একটু মুচ্‌কি হেসে শুধু বলেছিলেন 'প্যারাবোলা, প্যারাবোলা'।

আমরা ছেলেবেলায় কলকাতায় এলে প্রায়ই তখন শিবনারায়ণ দাস লেনে সিমলের পুরনো দিনের বিখ্যাত ইনজিনিয়ার বাবার দাদামশাই যদুনাথ সেন বরাটের বিরাট বনেদি ধাঁচের বাড়িতে উঠতাম। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে অল্প বয়সে যদু-নাথের কাছে কিছুদিন কাজের তালিম নিয়েছিলেন। এই খবরটা ছেলেবেলায় তাঁর পরিবারের বহু লোকের মুখ থেকে বহুবার শুনেছি বলে মনে হয় না যে কথাটা ভুল। যদুনাথ তখন গত হয়েছেন। তবে বার্মার পুল, কটকে এনিকাট ইত্যাদি বড় বড় জিনিস তৈরি ক'রে সিমলে অঞ্চলে বিশ-বাইশ খানা বাড়ি, দমদমে বাগানবাড়ি আর টাকা-কড়ি রেখে গিয়েছিলেন যার সব কিছুই অবশ্য তাঁর ছেলেরা তাঁদের জীবদ্দশায় শেষ ক'রে দিয়েছিলেন। তবে আমাদের ছেলেবয়সে 'সিমলে বাড়ি'র খুব বোলবোলাও। যেমন বড়লোকদের বাড়িতে হতো সিংদরজায় দরোয়ান, পুজো-দালান, ভেতরের মহল সবই লোকজনে জম-জমাট ছিল। আর ছিল বাড়ির পিছনে নানান জীবজন্তু, পশুপাখি ভরা একটা ছোট চিড়িয়াখানা। রাধারমণ মিত্র মশাই তাঁর 'কলিকাতা দর্পণে' যদুনাথ সেন বরাট আর বাড়িটার সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখেছেন। তবে যতদূর জানি নম্বরটা ভুল দিয়েছিলেন।

যদু বরাটের নামে পাশাপাশি এখনো একটা ছোট্ট গলিও আছে। এখানে বলতে চাই যে মুকিয়া স্ট্রিটের যে বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর সুকুমার রায় কিছুদিন ভাড়াটে ছিলেন সেটার মালিক ছিলেন বরাটরা।

এখানে তখনকার দিনের পাড়ার পড়শি ভাবের কথা বলি। রবিবারে দেখতাম কাট বাড়ির পুজো দালানের বাইরের দিকে টানা হলে গরম কালে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে পাড়ার বিশ-তিরিশজন লোক ফরাসে ঘুমিয়ে বিকেলবেলায় হাতল-ভাঙা কাপে চা খেয়ে গল্পগুজব ক'রে যে যার বাড়ি চলে যেতেন।

কটকে হঠাৎ বাবার অসুখ হওয়ায় তাঁর চিকিৎসার জন্যে আমরা কলকাতায় 'সিমলে বাড়ি'তে গিয়ে উঠলাম। কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা দেখে বললেন থাইসিস। বাবাকে দেখতে অনেক লোক আসতেন। তার মধ্যে যাঁর কথা মনে আছে তিনি হলেন যদু বাবু, শিবনারায়ণ দাসের নাতি। মনে থাকার কারণ সোজা। তাঁর মতন ঢেঙা লোক তখন কলকাতা শহরে ছিল না। উঁচুতে মনে হয় সাত ফুট ছিলেন। সে যাই হোক, বাবার যখন থাইসিস হয় সেই রাজ রোগের কোনো

ওষুধ ছিল না। থাকবার মধ্যে গোলড্, ইনজেক্শান. তাও শেষ অবধি কাজ দিত না। তাই ভরসা ছিল জল-পড়া, পীরের দরগার মাটি, অমুক স্থানের মাদুলি, অমুক বাবার তাগাতাবিজ, টোটকা-টুটকি, গুরুবল, তারকেশ্বরে হত্তে আর কাশীঘাটে মানত। এ সব করাই সার হতো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবধারিত ছিল।

এক সকালের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। বাবাকে দেখতে ডাক্তাররা এসে-ছিলেন। দেখে শুনে তাঁরা পুজোর উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলাবলি করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্যুটপরা বেঁটে চেহারা, মাথায় সাদা চুল, হাসলে একটা সোনার দাঁত দেখা যাচ্ছিল। পরে জেনেছিলাম ইনি নীলরতন সরকার। আর ছিলেন আমাদের সম্পর্কে দাদা ডাঃ নালনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, যাঁর শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম দেওয়া বাড়ি রয়েছে ক্যালকাটা ক্লাবের আগে চৌরঙ্গিতে। আর ছিলেন ঠাকুরদা আর আমাদের ঠাকুরমার ভাই পূর্ণচন্দ্র বরাট। আমি তাঁদের কথাবার্তা থেকে যেটুকু বুঝলাম যে তাঁরা বলছেন বাবাকে পুরীতে চেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে।

তাঁদের কথা শুনে আমি সুখবরটা তক্ষুণি আমার ভাইবোনদের দিতে গেলাম। আর তারপর একদিন পুরী এক্সপ্রেসে ভোরবেলায় আমরা পুরী পৌঁছলাম। ইস্টিশান থেকে সামান্য দূরে চক্রতীর্থে বি এন আর হোটেলের কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে আমরা যে বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তার নাম ছিল 'নীলিমা কুটীর'। এখন ভাবি বাড়ির মালিক এই নাম দিয়েছিলেন কি পুরীর আকাশের বা সমুদ্রের নীলের কথা ভেবে 'কাব্য' ক'রে, না তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে। দু-চার বছর আগে গিয়ে বাড়িটার হতশ্রী চেহারা দেখলাম। তখন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি জনমানবহীন, একতলাটা প্রায় বালি-ভরতি। তবে নীলিমা কুটীর নামের ট্যাবলেটটা এখনো টিকে রয়েছে।

শিশু বয়সে প্রথম সমুদ্র দর্শনের অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার কথা সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকু বলব যে সমুদ্রের মতন কোনো জিনিস দুনিয়াতে থাকতে পারে তা সমুদ্র না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। এর পর আমি যে কতবার পুরী গেছি তার ঠিক নেই। মোটামুটি এই অপূর্ব চক্রতীর্থ অঞ্চলের বিশেষ কোনো অদল বদল হয় নি, শুধু কয়েকটা এধারে-ওধারে নতুন বাড়ি ছাড়া। তবে যেটা মনে হয় জায়গাটা এখন যেন বেশ সভ্য হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখা উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি, সেই উদ্দাম ভাব কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে যে বদলটা সবচেয়ে চোখে পড়ে সেটা হল বালিতে ঝিনুকের বাহার। এখন দু চারটে মামুলি ধরনের ছাড়া সমুদ্রের ধারের বালি নেড়া হয়ে গেছে। তখন যে বালিতে কতরকমের ছোট-বড় রঙ-বেরঙের নানান ধরনের ঝিনুক, কত বিচিত্র আকারের গুগলি, গেঁড়ি, শামুক, ছোট ছোট আকারের রঙ-বেরঙের শাঁক পড়ে থাকত ভাবা যায় না। আমরা দিনের পর দিন সেই ঝিনুক-শামুক কুড়িয়ে জড়ো করতাম, রোজ রোজ সমুদ্রের ঢেউ আবার অগুনতি ঝিনুক বালিতে এনে ফেলত। এই ঝিনুক কুড়োনো আমাদের ছেলেবেলার পুরীর এক

উজ্জ্বল স্মৃতি।

আরো একটা জিনিস আমাদের ভয়ানক প্রিয় ছিল। সেটা হল রঙিন ফানুস। আমাদের ছেলে বয়সে মান্ধাতার আমলে আমাদের বিশেষ খেলনার বালাই ছিল না। তবে ফানুস ছিল আমাদের কাছে অদ্ভুত অবাক-করা জিনিস। আমরা পুরী যাবার আগে অসুখ হলেও বাবা আমাদের জন্যে গাদাগাদা ফানুস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ফানুসগুলো থেকে প্রতি হপ্তায় বাবা-মা আমাদের একটা একটা ক'রে দু'বার দিতেন। আমরা সেই ফানুস ফুলিয়ে লম্বা সুতোয় বেঁধে হাতে নিয়ে সমুদ্দুরের উদোম হাওয়ায় ছুটে ছুটে উড়াতাম। অনেক সময় হাত ফস্‌কে বা সুতো ছিঁড়ে ফানুস উড়ে আকাশে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যেত কে জানে। আবার কখনো ফেটে গেলে কি কান্না। আমাদের সমুদ্দুরের ধারে ধারে ছুটে ছুটে ফানুস ওঠানোর কথায় হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় যখন বহু বছর আগে হঠাৎ লা মরিসের সেই অপূর্ব ছবি 'দি রেড বেলুন' দেখি। আর তখন মনে হল সেই সুখের মুহূর্তগুলোতে আমরা সত্যিই স্বর্গের খুব কাছাকাছি ছিলাম। তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের Ode on Intimations of Immortality-র নতুন ক'রে মানে বুঝলাম।

পুরীতে যতটুকু মনে পড়ে বাবাকে দেখতাম দোতলার ঘরে শুয়ে আছেন, কখনো বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে আছেন, হয়ত মাঝে মাঝে বাড়ির সামনে দু-পা হাঁটছেন। এ ছাড়াও কচিৎ কখনো একতলায় নেবে সিঁড়ির নিচে মোড়ায় বসে তোলা উনুনে মাংস রাঁধছেন। মা সারাদিনই রান্না-বান্না আর বাবার দেখাশুনোয় ব্যস্ত।

পুরীবাসের একটা আসল কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। সেটা হল পুরীর মন্দিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। বাবার যাতে অসুখ সারে সেই জন্যে মানত-করা পুজো দিয়ে আমাদের পারিবারিক পাণ্ডা লোকনাথ মিশ্র প্রতি হপ্তায় কখনো নিজে কখনো লোক দিয়ে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আমরাও দু'ধারে দেওয়ালে ছবি-আঁকা ছোট ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে সরু সরু আঁকা-বাঁকা গলি দিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে যেতাম। বিশাল দরজা দিয়ে ঢুকে, সিঁড়ি ভেঙে উঠে চারিদিকে দুর্গের মতন দেওয়াল দেওয়া মন্দির মনে হতো একটা অজানা সহর। তারপর মন্দির পরিক্রমা ক'রে চারপাশের দেবদেবীদের মন্দিরে পুজো দিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে জগন্নাথ দর্শন ছিল এক অবর্ণনীয় অনুভূতি। গর্ভগৃহের ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রদীপের টিমটিমে আলো, লোকজনের ঠেলাঠেলি, মন্ত্রের গম্ভীর শব্দ, লোকেদের হর্ষধ্বনি, ফল-ফুল-প্রসাদ মেশানো তীব্র অচেনা গন্ধ আর কোনো রকমে জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রার ঝাঁকি দর্শন – বলার দরকার নেই, আমাদের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগত। এরপর বহুবার পুরীর মন্দিরে গেছি, জগন্নাথ দর্শন করেছি। প্রত্যেকবারই অনেক কিছুই নতুন অদেখা মনে হয়েছে। তবে প্রথম সমুদ্দুর আর প্রথম হিমালয় দেখার মতন মন্দির আর জগন্নাথ দর্শনের রহস্যময় অভিজ্ঞতা মনে হয়েছে ছিল আলাদা ব্যাপার।

এখানে খানিকটা অবান্তর হলেও একটা কথা বলি। এই 'জগন্নাথ' শব্দটা নিয়ে

আমার একবার অকস্‌ফোর্ড ইংলিশ ডিকসেনারির সেক্রেটারির সঙ্গে চিঠি-চাপাচি লেখা-লেখি হয়। কি একটা কারণে Jaconet শব্দটার ব্যুৎপত্তি দেখতে গিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া। 'শব্দটার অকস্‌ফোর্ডে' লেখা রয়েছে : 1769. Corruption of Urdu Jagannathi, from Jagannath (Juggernaut) or Jagannathpuri in Cuttack, where first made. আমি তখন ভুলগুলো দেখিয়ে চিঠি লিখলে ক্ল্যারেনডন প্রেসের সেক্রেটারি আমাকে ১৫ই মার্চ ১৯৬২-তে লেখেন :

Thank you for your letter of 5th March. Jagan-nath is also Urdu = Lord of the universe. Name given to temple and district near Cuttack, now called Puri, formerly Jagannthpuri. The definition in *Shorter Oxford Dictionary* would probably be better (sic) expressed as : 'Corruption of Hindi Jagannathi f. Jagannath (See Juggernaut) or Jagannathpuri (now Puri), name of temple and district near Cuttack, whare first made.' We shall consider the point when we are next revising the dictionary.

চিঠির লেখকের সই এমনই জবরদস্তভাবে করা ছিল যে কারুর বাপের সাধ্যি নেই তার পাঠোদ্ধার করে। ভদ্রলোকের সংস্কৃত আর উর্দুর জ্ঞান অবিশ্বাস্য দেখে আমি তাঁকে আর একটা চিঠিতে লিখি তাঁর উপদেশ 'পঞ্চ জাগরনট' অনুসারে আমি তাঁকে বলছি যে কথাটা তিনি দেখলে বুঝবেন সেখানে লেখা আছে '1638. Jagannath (a. Hindi Jagannath :—Skr. Jagannatha 'Lord of the world'. f. Jagat World + Natha, Lord Protector. তারপরে দেখলাম কেঁচো খুঁড়তে সাপ। জাগরনটের অনেকগুলো মানের মধ্যে লেখা আছে 'A title of Krishna, the eighth Avatar of Vishnu ; see the uncouth idol of this deity at Puri in Orissa etc. etc.'

জাগরনটের সংজ্ঞার idol-এর আগে uncouth কথাটা দেখে আমার আবার এই সাহেব বাবুটির সঙ্গে মজা করার ইচ্ছে হল। আমি তখন তাঁকেআর একটা চিঠি লিখি যার আমার কাছে 'কপি' নেই। সেই চিঠিতে আমি তাঁকে ঠাট্টা ক'রে লিখি, মজার জন্যে ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রেজুডিস অভিধানে ঢোকানোর ব্যাপারটা মহামতি জনসন তাঁর যুগান্তকারী অভিধানে ইচ্ছে ক'রে করেন। যেমন Oats কথাটায় তিনি ইংরেজদের 'বাডাল' স্কটসদের খোঁচা দিয়েছেন। জনসন Oats সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'A grain which in England is given to horses, but in Scotland supports the people.' তবে তারপর থেকে আমার যতদূর ধারণা ডিকসেনারি থেকে ইমোশানল, বায়াস, রসিকতা ইত্যাদি উঠে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠতাই অভিধানের আদর্শ হয়েছে। তাই যদি হয় তো 'আনকুথ' কথাটা কি ক'রে আধুনিক অভিধানে

ছোকে! এ ছাড়াও আমি সাধ্যমতো ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে লিখি যে 'সমুদ্রে যার শয়ন আর যাঁর স্ত্রী মুখরা তিনি কি "আনকুথ্" ন হয়ে "কুথ" হতে পারেন?'

এরপর বেশ কয়েক মাস বাদে ২রা এপ্রিল ১৯৬৩ সনে আবার সেক্রেটারির জবাব আসে। জবাবে তিনি লিখেছিলেন: 'Thank you for your letter of 28 March about the word *Jaoonet*. We have the impression you are right and we shall be investigating this more closely when we revise the dictionary. At the same time, we shall get rid of the unhappy word *uncouth* under *Juggernaut*.

মজার ব্যাপার আমার চিঠির 28 March-এর পরে '1962' কথাটা সাহেব লেখেন নি। অর্থাৎ একবছর কেটে গেছে। আর লিখলে কি হবে নতুন সংস্করণে যে ভুলগুলো শোধরাবেন তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

যাই হোক, আমরা জানতাম না যে বাবার শরীর ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই মাস ছয়েক বাদে একদিন পুরীর পাট গুটিয়ে আমরা কটক ফিরে এলাম। এর পর মনে পড়ছে সেই ভয়ানক রাত্তিরের কথা। পরে জেনেছিলাম তারিখটা ছিল ৬ই এপ্রিল ১৯২৬। গরম কাল। তাই আমরা সবাই আমাদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণ মুখে ঝকঝকে মেঝেয় শুয়ে আছি। বাবা এই বারান্দার পাশে মাঝখানের যে ঘরটায় শুয়ে থাকতেন সেখানে আমাদের ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে সাধারণত যেতে দেওয়া হতো না। তবে একটা অদ্ভুত পাগলামোর জন্যে আমার পক্ষে এই কঠিন নিয়ম মাঝে মাঝে ভাঙা হতো। আমার মনে আছে বৃষ্টির সময় বাজ ডাকলে আমি কি রকম উন্মাদের মতন হয়ে কেন বাজ ডাকছে, কখন থামবে, এই সব বলে চিৎকার ক'রে কেঁদে ছুটোছুটি করতাম। অসুখের আগে এমত অবস্থায় বাবা আমার বুকে জড়িয়ে শুয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মনে আছে বাবার মারা যাবার কিছুদিন আগেও দু-একদিন বৃষ্টি হলে আমাকে সামলাতে না পেরে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর অসুস্থ বাবা সবসময় বুকে নিয়ে শান্ত করে-ছিলেন।

এবার সেই রাত্তিরের কথায় ফেরা যাক। খুব হাওয়া দিচ্ছিল বলে আমরা আরামে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ভয়ানক কান্নার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমরা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লাম। তখন কারা জানি এসে 'কিছু হয় নি, কিছু হয় নি' বলে আমাদের আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

রোজকার মতন তারপর দিন সকালে মনে হল কি রকম যেন অন্য অন্য রকমের ভাব। মা দেখলাম আমাদের শোবার ঘরে মেজেতে অজ্ঞানের মতো শুয়ে আছেন। যাই হোক আমরা তখন সবে ইস্কুলে যেতে শুরু করেছি। তাই হাত মুখ ধুয়ে জামা-জুতো পরে আমি মর্নিং ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তখন আমাদের একজন গুরুজন বললেন যে আজ তোমাদের বাবা চেন্‌জে যাচ্ছেন, তাই তোমাদের ইস্কুল

যেতে হবে না। আমরা তখন মহাখুশি হয়ে বাইরে বাংলোর বাগানের পাশে খড়ের গাদায় লাফালাফি, তুতফল ফলসা পেড়ে খেয়ে খেলাধুলো করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে বাংলোর গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দেখলাম ঠাকুরদা চুপ ক'রে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। তারপর দেখলাম বাবাকে খাটে শুইয়ে গাড়ি-বারান্দার তলায় আনা হল। আমাদের সেদিকে ঘেঁষতে দেওয়া হল না। ঠাকুরদা একবার ইজিচেয়ার থেকে উঠে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে গিয়ে আবার চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। ঠাকুরদা দেখলাম চেয়ারে শুয়ে, মুখ থমথমে, চোখে কিন্তু জল নেই। পরে বুঝেছিলাম সেই দৃঢ়চেতা বাহাত্তর বছরের প্রায় বৃদ্ধ লোকটি বড় ছেলেকে শেষ বিদেয় দিয়েও চোখের জল ফেললেন না। বড় হয়ে জেনেছিলাম তাঁরই একজন ধর্মপ্রাণ কনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁকে নাস্তিক বলতেন। কথাটা খুব মিথ্যে নয়, কারণ তিনি অ্যাগনস্টিক ছিলেন। তবে ঠাকুরদা বাড়িতে পুজো-আচ্চা, বিয়ে-টিয়ে হলে চেয়ারে বসে পুরুতদের ভুল কথা আর উচ্চারণ রীতিমতো ধমক দিয়ে শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন।

গণিতজ্ঞ হলেও ঠাকুরদা শুনেছি সংস্কৃত ভালো জানতেন। অতি শৈশবে আট-চালার বাবার কোলে বসে তাঁর প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয়। পরে সংস্কৃতের খুব চর্চা করতেন। আমাদের কাকার একজন অল্পবয়সী বন্ধু বহুদিন বাদে তাঁর বি ভি গুপ্ত-র সঙ্গে মোলাকাতের কথা আমাদের বলেছিলেন। ১৯২৩-২৪-এর শীত-কালে একদিন সকালে তিনি আমাদের বাড়ির কাছে কেল্লার মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাবার জন্যে কাকাকে ডাকতে আসেন। বাংলোর গাড়ি-বারান্দায় পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মুখে। চেয়ারে শুয়ে স্টেটসম্যান নামিয়ে বিপিনবিহারী তাঁকে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তিনি আই-এ-তে সংস্কৃতে রঘুবংশ পড়েন জেনে বললেন: 'আচ্ছা অমুক সর্গটা মুখস্ত বল তো।' বলা বাহুল্য তাঁর সে সর্গটার কিছুই মনে ছিল না। তখন দাদাবাবু বললেন, 'আচ্ছা আমি তা হলে বলি শোনো,' বলে গড়গড় ক'রে সমস্ত সর্গটা আউড়ে গেলেন।

বাবার কথায় ফিরে আসা যাক। কারা জানি না বাবাকে খাটে ক'রে নিয়ে চলে গেলেন। আমার বয়স তখন ছ' বছর হলেও আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম যে বাবা সত্যিই বেড়াতে যাচ্ছেন, আবার কিছুদিন বাদে ফিরে আসবেন। আসলে মৃত্যু জিনিসটা কি তার কোনো ধারণাই তখন অন্তত আমার ছিল না। এই আমার দেখা প্রথম মৃত্যু। ছোট ছেলের মন বিশেষ ক'রে তখনকার দিনে এত অজ্ঞান আর অবুঝ ছিল যে বাবা মারা যাবার অনেক দিন অব্দি আমার তাঁর জন্যে ভীষণ মন কেমন করত। বাবা কেন ফিরে আসছেন না বুঝতে পারতাম না। শুনলে হয়ত অনেকে না হাসলেও অবাক হবেন যে বাবা বেঁচে আছেন আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। রাস্তার ঘাটে হঠাৎ হঠাৎ বাবাকে দেখতাম। এইসব ব্যাপার যখন ঘটত তখন আমি মোটেই শিশু ছিলাম না। তবুও পরে আমার এই শিশুসুলভ মনের

কথা ভাবলে আমার সেই লাইনগুলোর কথা মনে পড়ত :

A Child ! How lightly it
draws its breath
It feels its pulse every limb
What does it know of death !

বাবা ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন। আমরা তাঁকে ভীষণভালোবাসতাম। আমার মনে পড়ে বাবা বিকেলে অফিস থেকে আসার আগে আমরা হাঁ ক'রে তাঁর জন্যে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাবা এলেই চাপরাশি শ্যাম সিং সাইকেলটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিত। আর বাবা আমাদের এক এক ক'রে আদর করতেন। আর আমরা বাবার পিছন পিছন রেলগাড়ির মতন লাইন ক'রে তাঁর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে যেতাম।

বাবার স্মৃতি আমার এত কম যে আর একটা কথা না লিখে পারছি না। বাবাকে কাজে প্রায়ই গস্তে (tour) যেতে হতো। যখন ফিরতেন প্রায়ই পাখি শিকার ক'রে আনতেন। একবার এনেছিলেন একটা বিশাল সাদা সারসের মতন পাখি, তার ডানার তলাটা লালচে ছিল। সেই অবাক করা পাখি ছিল ফ্লেমিন্‌গো। মাঝে মাঝে আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে যেতাম। একবার মনে আছে কেল্লার ঘাটের কাছে একটা বড় অ্যাকোমোডেশান বোট আর জলি বোট নিয়ে কেন্দুপাটনা গিয়ে-ছিলাম। মহানদীতে যেতে যেতে এক জায়গায় দু'ধারে দেখেছিলাম যে করেক গজ বাদে বাদেই কুমিরগুলো রোদ পোয়াচ্ছিল আর আমাদের বোট কাছে আসতেই এক-পা এক-পা ক'রে বুকে হেঁটে এধার-ওধার তাকিয়ে জলে চলে যাচ্ছিল। এখন কেন, আজ বহু বছর ধরে মহানদীতে একটাও কুমির দেখতে পাওয়া যায় না। কুমির দেখতে গেলে বৈতরনি দিয়ে ভিতর কলিকায় যেতে হয়। সেই বোটে বেড়ানোর ব্যাপারে আরো মনে আছে মহানদী ছেড়ে কেনালের লক্‌গেটগুলো পেরিয়ে কেন্দুপাটনায় যেতে হয়। পরে জেরোম কে জেরোমের Three Men in a Boat পড়তে পড়তে লক্‌গেটগুলোর কথা মনে পড়ে।

বাবা মারা যাবার পর ঠাকুরদা আমাদের সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। বুড়ো বয়সে বড় ছেলের মৃত্যু তাঁকে শারীরিক আর মানসিক দু'দিক দিয়েই ভয়ানক জখম ক'রে দেয়—যার কথা গোপাল গাঙ্গুলি মশাই তাঁর আগে উদ্ধৃত লেখায় বড় দুঃখ ক'রে বলেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর ভাবনা হয়েছিল মেজদিদির বিয়ে আর আমাদের মতন আপনার নাতি আর নাতনিকে নিয়ে।

যাই হোক আমার চোদ্দ বছরের মেজদি খুব সুন্দরী ছিলেন বলে বিয়ে চট্ ক'রে হয়ে গেল।

তিরিশ অক্টোবর ১৯২৬ সনে ঠাকুরদা মারা যান। আমরা দেখলাম যে মারা যাবার পরের দিন সকালে বাড়ির আর বাড়ির রাস্তা লোকে গিজ্‌গিজ্ করছে।

এঁদের মধ্যে বলার দরকার নেই যে ঠাকুরদার দু-একজন জীবিত বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বেশির ভাগই তাঁর ছাত্র স্থানীয় ছিলেন। অনেকে আমাদের কোলে করেন, আদর করেন। আমার তখন নিজেকে কি রকম ভি আই পি-ভি আই পি মনে হচ্ছিল। আর ভাবছিলাম রোজ রোজ ঠাকুরদা মারা যান না কেন!

বাবার মতন আমার ঠাকুরদা সম্বন্ধেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুবই কম। তবুও অনেক কথা মনে পড়ে। সকালে দেখতাম যে বেড়ানোর পর তিনি বাংলোর গাড়ি-বারান্দায় বসে স্টেটসম্যান পড়তেন। লোকজন এলে গল্প করতেন। দুপুর বেলায় কাশিয়া চাকর তাঁকে চানের আগে তেল মাখিয়ে দিত। বিকেল বেলায় বেড়াতেন, আর বাগানের তদারকি করতেন। নানান লোকজন আসতেন। তবে যিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মহানদীতে বিকেলে বেড়ানোর আগে প্রায়ই আসতেন তিনি ছিলেন জানকীনাথ বোস, সুভাষ বোসের বাবা। আমার যতদূর মনে হয় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ঠাকুরদার ছাত্র ছিলেন।

একদিনের ঘটনা বলি। বিকেল বেলায় আমরা সামনের ফুলের বাগানে খেলা করছিলাম। পাশের বাগানে কি জানি কেন একটা গাছ কেটে তার কাঠ চেলা হচ্ছিল। ঠাকুরদা আর জানকীনাথ কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ আমার ঠাকুরদা ডেকে বললেন, 'তুমি রামায়ণের পদ্য মুখস্থ বলতো।' আমি কিছু কিছু গড়গড় ক'রে বলার পর জানকীনাথ বললেন 'খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না', বলে আমায় আদর করলেন। ছেলে বা নাতি-নাতনিদের স্মৃতিশক্তি দেখানোর যে ইচ্ছে হয় আমার ঠাকুরদাও আমাকে দিয়ে তাই দেখিয়ে নিশ্চয়ই বেশ গর্ববোধ করেছিলেন।

জানকীনাথের কথা প্রসঙ্গে বলি, আবার মা-র কাছ থেকে শুনেছি যখন ১৯০৪-এ ন-দশ বছর বয়েসে যখন বিয়ের পর নতুন বৌ হয়ে কটকে যান তখন ছোট্ট সুভাষ প্রায়ই আমার কাকার সঙ্গে খেলতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। জানকীনাথকে আমার বেশ মনে আছে, কারণ দাদাবাবুর মারা যাবার পর প্রায়ই উনি এবং ওঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জানকীনাথের চেহারা ছিল লম্বা, শান্ত, সৌম্য, মাথায় টাক আর রঙ ছিল টকটকে ফরসা। ওঁর স্ত্রীর চেহারাও ছিল তেমনি দপদপে সুন্দর।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার একবার কটকে অভাবনীয় ভাবে দেখা হয়। সময়টা ১৯৩৬ কি ১৯৩৭। আমি তখন কটকে একা। আমার বড়দিদি মীরারও টি-বি হয়, বয়স তখন তাঁর ছাব্বিশ কি সাতাশ। তাঁকে নিয়ে মা আর অন্য সবাই জোসিডিতে গেছেন। আমি যাই নি কারণ সামনেই আমার আই-এ পরীক্ষা। সেই সময় একদিন বিকেল বেলায় যখন আমি পড়ছি, আমাদের বাগানের মালি এসে খবর দিলে যে কারা সব বাইরে এসেছেন। বাইরে গিয়ে আমি অবাক, দেখি সুভাষ বোস দাঁড়িয়ে। সঙ্গে অনেকের মধ্যে ছিলেন একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান ভদ্রলোক, আসরাফ উদ্দীন আমেদ চৌধুরী।

সুভাষচন্দ্র কটকে গিয়েছিলেন, কারণ আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন আধুনিক ওড়িশার একজন প্রাণপুরুষ, বিখ্যাতরায় বাহাদুর মধুসূদন দাস যিনি আশু মুখুজ্জের প্রাইভেট টিউটার ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর তিনি তাঁর বাড়িঘর সব উইল ক'রে একটা সেবা প্রতিষ্ঠান গোছের কিছু ক'রে দেন। সুভাষ বোস এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করতে কটকে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর ইচ্ছে হয় কাছেই বিপিনবাবুর লোকজনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। তাই আমাকে একা দেখে তিনি জানতে চাইলেন যে বাড়ির অন্যরা সব কোথায়। আমি তাঁকে সব কথা এবং কেন একা রয়েছি তার কারণ বলতে উনি বললেন : 'তুমি তো খুব সাহসী দেখছি, একা থাকতে ভয় পাও না।' এই বলে আমায় আশীর্বাদ ক'রে চলে গেলেন।

লেখা শেষ করার আগে ঠাকুমা আর মা-র সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ঠাকুমা মনোরমা দেবী ছিলেন যদু বরাটের বড় মেয়ে। আমাদের ছেলেবেলাকার স্মৃতি ছাড়া তাঁর যে ফোটোগ্রাফ রয়েছে তা থেকে তাঁর গম্ভীর দশাসই চেহারা আর মুখের বনেদি ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। নিরক্ষরা হলেও প্রখর স্মৃতিশক্তি আর বিচক্ষণতার জন্যে তাঁকে কেউ পাই-পয়সা ঠকাতে পারত না। তিনি খুব দাপটের সঙ্গে সংসার চালাতেন। সব পুরনো ঠাকুমাদের মতন তিনি অশিক্ষিতা হলেও রামায়ণ মহাভারত পুরাণের গল্প দেবদেবীদের উপাখ্যান খুব ভালোভাবে জানতেন আর জানতেন অনেক গল্প। আমাদের বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গের রীতি অনুযায়ী কালীপুজোর দিন লক্ষ্মী পুজো হতো, যার শেষ হতো সন্ধ্যাবেলায় গোবরে তৈরি, কাঁটা-বেঁধানো অলক্ষ্মীকে কুলো বাজিয়ে প্যাকাটি পুড়িয়ে, 'ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক, অলক্ষ্মী দূর হ' বলে বাড়ির হাতায় বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হতো। সকালে লক্ষ্মীপুজোর পর সেই দুর্ভাগা ব্রাহ্মণের গল্প বলতেন, যাঁকে লক্ষ্মী স্বয়ং চেষ্টা করেও ভাগ্য ফেরাতে পারেন নি। সেটা এমন সুন্দর ক'রে শোনাতেন যে আজও তা ভুলি নি। আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন ঠাকুমা জামসেদপুরে কাকার বাড়িতে আমাদের চোখের সামনেই মারা যান।

মা ছিলেন কলুটোলার কবরেজ বাড়ির মেয়ে, যাদের সম্বন্ধে দা-ঠাকুর 'মরি কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' গানে লিখেছিলেন : 'ভাবলাম কলুটোলায় কলু আছে, আছে তাদের ঘানি, দেখি কলুর বলদ বন্দিরা সব করে তেল আমদানি।' অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়াতে মা আমাদের বড় মাসী আর মামা কলুটোলায় যে বাড়িতে ফৌজদারি বালাখানা ছিল সেই বাড়িতে ছিলেন। তাঁর জ্যেঠা কবিরাজ বিনোদলাল সেন আর কাকা কেশরঞ্জন তেলের কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনেদের আদর যত্নে মানুষ হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ অবশ্য একটু দূরে ১৮।১।১৯ লোয়ার চিৎপুর রোডে থাকতেন।

মায়ের মুখে শুনেছি ছেলেবেলায় যখন বাড়ির পাশের মেওয়ার দোকান থেকে তাঁদের মেওয়া খাওয়ার ইচ্ছে হতো তখন জ্যেঠার কাছ থেকে পয়সা চাইলে তিনি

তাঁর সামনে টাকার বাক্সর খাঁজ থেকে যে খুচরো হাতে উঠত তাই মেয়েদের হাতে তুলে দিতেন। একবার এই ব্যাপার দেখে তাঁর এক বন্ধু বলেন, 'করছেন কি বিনোদ-বাবু, করছেন কি ? মেয়েগুলোর কি মাথা খাবেন ?' তখন বিনোদলাল বলেছিলেন, 'ও কথা বলবেন না, ওরাই তো বাড়ির লক্ষ্মী, ওদের জন্যেই তো সব।'

মায়ের দশ বছর বয়েস হলে তাঁর কাকা-জ্যেঠারা বিপিনবিহারীর বড় ছেলে ভূপেন্দ্র-কুমারের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। মা বলতেন বর এসেছিলেন বাঁধা রোশনাই নিয়ে, আর গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে। আর সেনেরাও খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে দেন।

আমাদের বাবা-মায়ের বিয়ের ছবি ছাড়া আরো একটা স্মৃতি আমার কাছে রয়ে গেছে। সেটা হল তাঁদের বিয়ের পদ্য। পদ্যটা যেমন পরে দেখেছি রঙিন রুমালি কাগজে ছাপার রেওয়াজ হয়েছিল সেভাবে ছাপা হয় নি। ভারি সুন্দর ফুল-লতা-পাতার এক পাশে নক্সা করা দিকে নীল রংয়ের আভা দেওয়া ছোট কার্ড ছাপা হয়। সেহেতু পদ্যটা ঠিক 'আজকে দিদির বিয়ে, আজকে দিদির বিয়ে / বর আসবে সন্ধ্যে-বেলায় টোপর মাথায় দিয়ে' গোছের ছিল না, তাই অতীত দিনের স্মৃতি হিসেবে এখানে তুলে দিলাম :

শুভদবর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্তের

শুভ বিবাহোপলক্ষে

দুইটি তটিনী আজ একত্রে মিলিয়া
ধাইবে সাগর পানে সাগরে মিশিতে,
দুইটি কুসুম আজি একত্রে ফুটিয়া
চাহিবে অনন্ত পানে নীরব নিশীথে।

আজি এ নিকুঞ্জ মাঝে সহসা শ্রবণে
পশিল একটি গান প্রেমের ফোয়ারা,
স্বপ্নরাজ্য হতে যেন আজি এ ভুবনে
বরষিল সুবিমল অমৃতের ধারা।

প্রেমগীতি উচ্ছ্বসিত এ মধু ঝঙ্কার
সুবসন্তে প্লাবিয়াছে নিখিল জগত,
স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে আছি, এ বিশ্ব সংসার
বাজিতেছে এক সুরে স্বপনের মত।

এস সত্য এ মিলনে সদ্য প্রস্ফুটিত
পুষ্পসম প্রেমরূপে হও অধিষ্ঠিত।

— প্রবাসের বন্ধুগণ।

কিন্তু এই পঙ্গুর শেষ পঙ্‌ক্তির শুভেচ্ছা প্রেমরূপে বেশিদিন অধিষ্ঠিত থাকে নি। মা-র যখন বছর তিরিশেক বয়স, তখন তাঁকে হাতের নোয়া খুলে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়েছিল তা আমি আগেই বলেছি।

মা একা হাতে সংসার চালানোর ঠেলায় আমরা পড়াশুনো করছি কি না-করছি সেদিকে নজর দিতে পারতেন না বা চাইতেন না। তবে খুব কড়া শাসনে না হলেও শাসনের চেষ্টা ছিল না বললে ভুল হবে। আর মুখের উপর চোপা করলে তো আর রক্ষে ছিল না। আসলে মা-র স্বভাবটাই ছিল হাসিখুশি, শত দুঃখকষ্টেও তাতে টোল পড়ত না। পুরনো বাঙালি গিন্নিদের মতন লেখাপড়া বেশি না শিখলে কি হবে মুখে মুখে ছড়া কাটা আর পদ্য লিখতে ওস্তাদ ছিলেন। আর সব চেয়ে অসাধারণ যে ক্ষমতা তাঁর ছিল সেটা হল লোকজনকে নকল করার ক্ষমতা। এ ছাড়াও লিখলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা যায়, বিশেষ ক'রে তাঁর হেঁয়ালি রসিকতা সম্বন্ধে। মা প্রথম রেডিও দেখে বলেন—'বাবা! যেখানেই দেখি সেখানেই তার, সামনে তার পেছনে তার, এ পাশে তার, ও পাশে তার। তাও এর নাম, বেতার!'

মা-র সঙ্গে খুব ভাব ছিল কমলকুমার মজুমদার আর তাঁর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মা-র। কমলবাবু প্রায়ই এসে রান্নাঘরে বসে 'মাসিমা'র সঙ্গে সুখদুঃখ, রঙ্গরসের কথা বলতেন। মা মারা যান ১৯৫৬-র আগস্ট মাসে। সুখের কথা তাঁর মৃত্যু স্ট্রোক হওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই ঘটে।

বাড়ির মেয়েদের কথা শেষ করার আগে আমি আর একজন মানুষের কথা বলতে চাই। সে হল আমাদের বাড়ির ওড়িয়া ঝি। কি তার নাম আমরা কেউ জানতাম না। তাকে আমরা সবাই 'ঝি' বলেই জানতাম। সে কি ক'রে বাড়িতে এসেছিল তার কথা পরে জানি। আমাদের ঠাকুরদা আর বাবার খুব প্রিয় চাকর ছিল কাশিয়া বলে একজন যুবক। সে বিশেষ ক'রে বাবার একান্ত অনুগত ছিল। বাবার থাইসিস রোগকে তোয়াক্কা না ক'রে সে সর্বক্ষণ তাঁর দেখাশুনো করত। আমার চেয়ে চার বছরের ছোট সবচেয়ে ছোট ভাই যখন জন্মায় তখন তার দেখাশুনোর জন্যে কাশিয়া ঝি-কে আমাদের কাছে নিয়ে আসে।

ঝি-র মুখে শুনেছি যে কটক জেলায় কেন্দুপাটনার চাহাপড়া বলে একটা জায়গায় তার বিয়ে হয়। তার দুই মেয়ে ছিল রম্ভা আর উত্তমা। তাদের অবস্থা এতই গরীব ছিল যে রম্ভাকে তার বাবা টাকার জন্যে একদিন সকালে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে চাহাপড়ার হাটে বিক্রি ক'রে আসে। তার মা-র কাঁদাই সার হল। সে আর রম্ভাকে কোনোদিন চোখে দেখে নি। আমাদের ছেলেবেলায় তার ছোট মেয়ে উত্তমার বিয়ে হয়ে কটকের দক্ষিণে মাইল পনর দূরে একটা গ্রামে থাকত। উত্তমার প্রথম বর মরে যাওয়াতে ওড়িশার রীতি অনুযায়ী তার দেওরের সঙ্গে তার আবার বিয়ে হয়। আমরা তার কষ্টি-পরা বোষ্টম স্বামীকে দেখেছি। তবে সে কোন স্বামী,

প্রথম না দ্বিতীয়, তা মনে নেই।

প্রতিবছর বোধহয় দু'বার চার-পাঁচ দিনের জন্যে ঝি মেয়ের বাড়িতে যেত। তাকে যেতে হতো হেঁটে। ইস্টিশান পেরিয়ে তালদণ্ডা কেনালের পাশ দিয়ে পরমেশ বলে বিখ্যাত শিবমন্দির পার হয়ে তার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যেত। সে বেরতো একেবারে ভোর সকালে আর মেয়ের কাছে হেঁটে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যেত।

ফিরে এলে ঝি তার এই ভ্রমণ কাহিনী বলে চার-পাঁচ সন্ধ্যা আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিত। কি ক'রে আলো ওঠার আগে সকালে পান সেজে খেয়ে, বাড়ির ফটক পার হয়ে তার গোপ বেহারার সঙ্গে দেখা হল। গোপ গরু নিয়ে কেয়ার মাঠে চরাতে যাচ্ছিল। সে তাকে দেখে বললে : 'আরে মাসী এত ভোরে কোথায় চল্‌লে গো?' ঝি তখন তাকে কি জবাব দিলে, তার কথা। তারপর পদে পদে কত লোকের সঙ্গে দেখা। রাস্তার কোন জায়গায় কী ঘটেছিল, মেয়ের বাড়িতে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটির কথা, কেয়াপাতা দিয়ে খয়ের তৈরির বৃত্তান্ত, কেয়ার ঝোপে যে কতরকমের সাপের খোপ ছিল সে কথা, সন্ধেবেলায় গাঁয়ের ভাগবত ঘরে কীর্তন আর পাঠ, হাটের ঘাটের কথা, আরো কত গাঁয়ের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প যে সে জল-জ্যান্ত ক'রে বলত। এর সঙ্গে গাঁয়ের ভূতপ্রেতের ডাকিনি-যোগিনীদের রোমহর্ষক গল্পও থাকত। মাত্র দু-তিন দিন আগে সদ্য আসা একটা 'নিউ ইয়রকার' কাগজে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজের এই কথাগুলো পড়ছিলাম :

> I had an idea of what I always wanted to do, but there was something missing and I was not sure what it was until one day I discovered the right tone – the tone that I eventually used in my *One Hundred Years of Solitude*.
>
> It was based on the way my grandmother used to tell her stories. She told things that sounded supernatural and fantastic, but she told them with complete naturalness.

আমাদের ঝি-র ব্যাপারে মার্কুয়েজের কথাগুলো খাটে। তার সেই দশ-বিশ মাইল যাওয়া-আসাকে সে প্রায় একটা 'হোমারিক অডিসির' জাতে তুলে দিত। আর ডেস্‌ডিমোনা যে রকম ওথেলোর কাছ থেকে তার দুঃসাহসিক অভিযানের বিপদ আপদ, বন্যা, কান-ঘেঁষে মৃত্যু, নরখাদকদের কথা তন্ময় হয়ে শুনত আমরাও তেমনি ঝি-র মুখ থেকে হাঁ ক'রে গল্প শুনতাম।

কয়েক বছর আগে আমাদের বাড়ি বিক্রি না হওয়া অব্দি ঝি সেই বাড়িতেই থাকত আর সেইখানেই সে মারা যায়। তাকে অবশ্য আমরা তার খরচের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতাম। আমার শেষ তার সঙ্গে দেখা হয় প্রায় বিশ বছর আগে আমি যখন টাটা স্টীলের কাজে কটকে যাই। আসার দিন সন্ধের সে আমাকে তার 'বটুয়া' থেকে দু'টো টাকা বার ক'রে দিয়ে বললে যে রেলে যেতে যেতে কিনে খেলে

আমি যেন কিছু কিনে খাই। মা-মাসীদের চোখে ছেলেমেয়ে যেমন কখনোই বড় হয় না, এও ছিল তারই এক নিদর্শন।

এরপর ইস্কুল জীবন আর দু'বছর কলেজে কি ভাবে কাটিয়ে শেষে ১৯৩৭ সনে পাকাপাকিভাবে কটক ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। কটকের আমাদের বাড়ি আর তার চারধার ছিল এক শান্ত সুন্দর ছোট্ট জগতের মতন। এই জগতেই আমরা শিখলাম পুকুর আর নদীতে সাঁতার কাটা আর মাছ-ধরার মজা—বাগান ক'রে আর দেখে শুনে গাছ-লতাপাতা, ফলফুল চেনা, কীটপতঙ্গ পশুপাখির আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয়।

এখানে তার একটির কথা বলি, মুখপোড়া লম্বা ল্যাজওয়ালা হনুমান, যাকে আজকের প্রকৃতি-প্রেমিকরা 'লাঙুর' বলে জানেন। আমাদের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বিশাল বিশাল আম আর শিমুল গাছে এক বিরাট হনুমানের পাল থাকত। পালের গোদা বিশাল হনুমান, মাদি হনুমান আর তাদের বাচ্ছা হনুমান। তাদের কিচির মিচির দাপাদাপি হুটোপাটি সারাদিন ধরে চলত। সবচেয়ে ভালো লাগত যখন বিকেলে দেখতাম তারা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর বসে মাথা আর গায়ের উকুন বাছত। আমরা তখন বাচ্ছাকে বুকের তলায় নিয়ে ঘোরা, উকুন বাছা ইত্যাদি দেখলে ভাবতাম ঠিক মানুষের মতন। বুড়ো হয়ে জানলাম যে ব্যাপারটা উল্টো। অর্থাৎ আমরাই কিনা হনুমানদের মতন! হনুমানদের কথাটা তুললাম কারণ আজকাল ইউটিলিটান মন্দির নানা জায়গায় কাছাকাছি রুপি বাঁদর দেখতে পেলেও মুখপোড়া হনুমান আর দেখা যায় না। কোনো অভয়ারণ্যে সারাদিন ঘুরে ঘুরে পশুপাখি প্রেমিকদের হঠাৎ যদি দু-একটা হনুমান চোখে পড়ে যায় তখন এক সঙ্গে টেলিফোটো লেন্স লাগানো বিশটা ক্যামেরা প্রায় এক সঙ্গে ক্লিক্ ক'রে ওঠে। আর রাত্তিরে ফরেস্ট বাংলোয় সুপেয়র সঙ্গে সেই হনুমান নিয়ে আলোচনা চলে।

কটকের ছেলেবেলার ও কৈশোরের কথা লিখতে গেলে বিরাট কাহিনী ফাঁদতে হয়, যা দু-কারণে এখানে করছি না। প্রথমত সেই অভিজ্ঞতাকে সুনিপুণ ক'রে বলার আমার ক্ষমতা নেই। আর দ্বিতীয়ত তা লিখলে স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীর মতন শোনাবে, যা লেখবার আমার কোনো অধিকার নেই।

কেন? এই প্রশ্নের জবাবে ইয়োরোপিয় রেনেশাস যুগের এক খ্যাতনামা ভাস্কর আর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণকার-শিল্পী বেনভেনুতো চেল্লিনি-র মৃত্যুহীন জগদ্‌বিখ্যাত জীবনীর গোড়ার কয়েকটা কথা একটু উলটে পালটে বলি।

চেল্লিনি তাঁর বইয়ের গোড়ায় আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে বলেছেন :

No one should venture upon such a splendid undertaking before he is over forty.

এ দিক দিয়ে বিচার করলে আত্মজীবনী লেখার আমার একশো বার এক্তিয়ার আছে। কারণ আমি এখন সেই বয়সে পৌঁছে গেছি যখন ছেলেবেলার শোনা বোধ-

হয় লালচাঁদ বড়ালের গাওয়া সেই বিখ্যাত রসের গানটি গাইতে পারি :

দাদা গো আমার বিয়ে হল না
বছর হল তিন কুড়ি চার
আইবুড়ো নাম ঘুচল না।

কিন্তু তারপরই চেল্লিনির উপরোক্ত কথাগুলোর আগের আসল কথায় ফিরে আসা যাক :

No matter what sort he is, every one who has to his credit what are or really seem great achievements, if he cares for truth and goodness, ought to write the story of his own life, in his own hand ;...

এরপর আত্মজীবনী, বা এমন কি স্মৃতিকথা ?

কিছু কবিতা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি এখন যাবার জন্য তৈরি

আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।
মৃত্যুর আগে
আমার পিতা যেমন মুখ টিপে হেসেছিলেন
আমি তেমন প্রশান্ত
একমাত্র বিদায় নেয়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই।

এই ঘর ঘরের বাইরে পথ
পথের ধারে গাছ আবর্জনা
যত্ন করে লেখা
মনোহারী দোকানের নাম
পথের বুকের মধ্যে
পথিকের পায়ের চিহ্নের রহস্য
হাওয়ায় উড়ে আসা পাতা
রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস
খানা-খন্দে জমে থাকা বৃষ্টি
আমি তাদেরকে রোজ রোজ দেখি
অথচ চিনি না।

আমি জানতে চাই না
ঝড়ে পাতা ছিঁড়লে
গাছ কত কষ্ট পায়
পথিকেরা কোথায় গ্যাছে
কেন গ্যাছে
রোদ কখন নরোম হবে
জল-কাদা কবে শুকোবে

মনোহারী দোকানের নাম
কখন আর পড়া যাবে না,
এ সব নিয়ে
আমার মাথাব্যথা নেই
কারণ আমি সব সম্পর্ক
চুকিয়ে ফেলেছি।
আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।

আমি কোনোদিন কিছু ছিলাম না
আমি কোনোদিন কিছু হতে পারবো না।
আমাকে কাজের জন্য
যে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছিল
তা আমি জানালা দিয়ে
ফেলে দিয়েছি।
ঈশ্বরকে আমি চিনি না
কারণ তাঁর সঙ্গে
আমার পরিচয় ছিল না,
মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে
তারা সকলে বড় একরকম
তারা ভাবে কিন্তু ভাবে না।

আমি বৃক্ষ তরুলতা
সূর্যোদয় চন্দ্রিমা
তারার মত ফুল ফোটা
ঢালুর মধ্যে জল গড়িয়ে পড়া
ঘাসের মধ্যে হাওয়ার আনাগোনা
দেখতে চেয়েছি,
কিন্তু ভাবনা বৃষ্টিতে পথ চলার মতো
অস্বস্তিকর
আমার চোখকে ঝাপসা করে দেয়।
আমি আমার
ঘরের দেয়ালের নোনা ছাড়া
আর কিছুই দেখতে পাই না।

আমি কোনোদিন কিছু ছিলাম না
এবং আমার কোনো অভিলাষ ছিল না
অথচ আমার ভিতরে
পৃথিবীর তাবৎ স্বপ্ন,
ঘুম ভাঙলে মনে থাকে না।
আমার বুকের মধ্যে
অনেক ভালোবাসা
কিন্তু একমাত্র বিদায় নেয়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই।
আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।

আমি কবিতা লিখি
অথচ আমার কবি হবার
আকাঙ্ক্ষা ছিল না,
কবিতা আমার একলা থাকার উপায়।
ফুল যেমন স্বচ্ছন্দে ফোটে
জল যেমন ঢালুর মধ্যে গড়িয়ে পড়ে
হাওয়া যেমন পাতার মধ্যে কাঁপন তোলে
আমি তেমন অনায়াসে
লিখতে পারি না,
ভাবনা আমার চোখকে
ঝাপসা করে দেয়।

আমার পংক্তিমালা অসম
যেমন বৃক্ষের শাখারা সমান হয় না
এবং আমি জানি
অরণ্য বলে কিছু নেই
গাছ আছে
আকাশ বলে কিছু নেই
তারা আছে
সাগরে সূর্য ওঠে
পাহাড়ে অস্ত যায়
চাঁদ যখন পূর্ণ হয়

নদীতে ঢল্ নামে
কিন্তু গাছ তারা চাঁদ সূর্য
প্রত্যেকে একক এবং আলাদা।

আসলে স্বপ্ন ছাড়া
কোনো কিছুই সম্পূর্ণ না
আমি অনেক স্বপ্ন দেখতে চেয়েছি
দেখি নাই
এবং যা দেখেছি
ঘুম ভাঙলে মনে থাকে না,
আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।

আমি জানি
মনোহারী দোকানের
ষত্নে লেখা নামের মত
পথের পাশের গাছের মত
অথবা পথিকহীন পথের মত
আমার কবিতা মরে যাবে,
তবে আমার দুঃখ
আমার স্বপ্নদের জন্য।
কারণ যারা মরে যায়
তারা হয়তো
অন্য কোথায়ও বেঁচে থাকে
কিন্তু যে সব স্বপ্ন আমি দেখতে চেয়েছি
দেখি নাই
দেখেছি এবং ভুলে গেছি
তারা একেবারেই মৃত।

আমি কান্নাহীন অনুকম্পাকে
নিজের প্রতি উৎসর্গ করেছি
এবং জেনেছি
সুন্দর বলে কিছু নেই
ভুল ভুল
উজ্জ্বল বলে কিছু নেই

তারা তারা
শ্যামল বলে কিছু নেই
বৃক্ষ বৃক্ষ
প্রেম বলে কিছু নেই
মানুষ মানুষ
দয়া বলে কিছু নেই
ঈশ্বর ঈশ্বর
এবং ঈশ্বর যদি
ফুল কিম্বা তারা কিম্বা বৃক্ষ
তবে আমি তাঁকে দেখেছি।

আমি এখন
ভাবতে চাই না দেখতে চাই
আমি আমার
মুমূর্ষু পিতার মত প্রশান্ত
একমাত্র বিদায় নেয়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই।
আমি এখন
ভাবনাহীন গাথার জন্য তৈরি
আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।

চোখের আড়াল মানে মৃত্যু নয়

মোড় ঘুরলে
পথকে দেখা যায় না
যেমন সকাল বেলা তারাকে।
পথের চলার কোনো বিরাম নেই
তারারা সন্ধ্যা হলে ফিরে আসে—
চোখের আড়াল মানে মৃত্যু নয়।

আমি আমার মায়ের জন্য
অনেকদিন অপেক্ষা করেছি
এখন মার চেহারা মনে পড়ে না।
আমার বাবা একদিন হাঁটতে হাঁটতে
মোড় ঘুরলেন
তারপর বাসাটা কেমন
খালি হয়ে গ্যালো।

আমার ঘরের সামনে
গাছেরা জটলা করে
পাখিরা পখ হাঁটে,
আমার মেয়ে কাঁচা রোদের মত
কলকল করে কথা বলে।
আমি সমস্ত দিন তারা খুঁজি
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে দেখি
জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যখন অফিসে যাই
আমার মেয়ের ছবি
কাজের টেবিলে বসে থাকে,
আমাকে চোখে চোখে রাখে।
আসলে সব ছবি যদি
আকাশে টাঙিয়ে দেওয়া যেতো
অথবা গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে
তাহলে বাসা আর খালি থাকে না
ঊনোনে তারা ফোটে।

আমার মোড় ঘুরতে ভয় করতো
এখন ভয় করে না,
চোখের আড়াল মানে মৃত্যু নয়।

পরিচিত পথঘাট

আমার বাড়ির পাশে
একটা গাছ আছে
দীর্ঘদেহ সুপুরুষ
শাখা প্রশাখা
পত্র পত্রালিতে
প্রায় একটা অরণ্য
ভরা দুপুরে
সবুজ দীঘির মত।

আমার প্রতিবেশী
বহুৎ হৃদয়বান
পাখি পোকামাকড়
শ্যাওলা নক্ষত্র
অনেকেই তার কাছে থাকে
তবে পাখিদের প্রতি
তার বেশ পক্ষপাত।

অন্ধকার ঘন হলে
সে ভীষণ উদ্বিগ্ন
একটা পাখি বোধ হয়
ফিরে আসে নি
সে জানে
কোনো কোনো পাখি
ফিরে আসে না
যেমন পাতা উড়লে
উড়েই যায়।
কিন্তু জোনাকির মত ফুটফুটে ডিম
একটুতেই ভিজে যায়
তারারা ওম দিলে
আঁধার হয়ে আসে
চিরল পাতা
মেঘের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

আজকাল
আমার বাড়ির পাশের গাছটা
অত্যন্ত বিষণ্ণ।

পাখিরা আকাশে ওড়ে
গাছে বাসা বাঁধে
বৃক্ষ হৃদয়বান
দুই বাহু দিয়ে
পাখিদের ঘিরে রাখে
নদীরা যেমন
মাছের শিশুকে রাখে
কোলের গভীরে।

কিন্তু পাখিরা বড়
বড় ভালোবাসে
গানের পাখিরা গান
ফুল ফল এবং সবুজ,
বৃক্ষ নিষ্পত্র হলে
বিবর্ণ হলে
অথবা সহসা গান
নিঃশব্দ হলে
পাখিদের ঘর ভেঙে যায়।
সব পাখি ঘরে আসে
সব নদী
কোনো কোনো পাখি
ঘর ভেঙে চলে গেলে
পাখিদের ঠিকানা থাকে না।

পাখির উপমা নদী
টলোমলো বৃক্ষের ডানা
ঢেউয়ের চূড়ার মত
নদীর চিলেরা ভাসে
অরণ্যে কত ফুল ফোটে
পালকে ফুলের রেণু
পাখি আর মাছ খেলা করে।

পাখির চোখের কোণে
শিশির শুকায়
জল মাটি পুড়ে যায়
বৃক্ষের বিষণ্ণ কোল
একে একে খালি করে
পাখি তার ঘর ভাঙে
পাখি উড়ে যায়।

সব পাখি ঘরে আসে
সব নদী
কোনো কোনো পাখি
বহুদূরে উড়ে গেলে
পাখিরা আসে না।
আকাশ আঁধার হয়
মেঘ জমে
পাখির জননী
ঠোঁটের আদর নিয়ে
অপেক্ষা করে
মাছের হৃদয় কাঁপে
কোনো কোনো পাখি
দুই হাতে আঁধার সরায়—
মেঘের ওপারে আছে
আলোর কুঠুরি।

সব পাখি ঘরে আসে
সব নদী
পাখিদের জলের প্রপাত
আকাশ শীতল করে
বৃক্ষকে বাসর করে
কোনো কোনো পাখি
মেঘের ওপারে গেলে
পাখিদের ঠিকানা থাকে না
পাখিদের ঘর ভেঙে গেলে
পাখিরা আসে না।

পরিচিত পথঘাট
বড় বেশি নির্জন,
যাদের সঙ্গে রোজ দেখা হতো
সকাল বিকাল
কুশল বিনিময় করতাম
তারা অনেকেই মৃত,
কয়েকজনের অবশ্য বয়স হয়েছিল।
তাছাড়া বর্তমানে
কয়েক বছর ধরে
বৈশাখ বিক্ষুব্ধ।

আমার বাড়ির পাশের
পেশল বৃক্ষ
তার কি কোনো অসুখ হয়েছিলো ?
পাড়া প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব
কেউ কিছু বলতে পারে না
আমি প্রশ্ন করলে
এদিক ওদিক তাকায়
আজকাল ছোঁয়াচে রোগীর মত
আমাকে দেখলে
দূরে থাকে।

ভেবেছিলাম
পাখিদের জিজ্ঞাসা করবো
কারণ পাখিরা
স্বাধীন এবং সত্যবাদী
কিন্তু পাখিরা উড়ে গেলে
উড়েই যায়।

কয়েকটা কাক ছাড়া
কিছুই অবশিষ্ট নাই
না পাখি না বৃক্ষ—

পরিচিত পথঘাট
বড় বেশি নির্জন।

কৃষ্ণতী সেন

ঘুমের গঙ্গা বেয়ে

অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র 'কথা'

এক রাজা, তার দুই রানী, দুওরানী আর সুওরানী—এমন ক'রে তো বাংলাদেশের কত রূপকথাই শুরু হয়েছে। তবু সে ছিল এক কাহিনী, এক অদ্বিতীয় রূপকথা, যেখানে দুওরানীর বানর ছেলে মায়ের তৈরি ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে নিয়ে গেল। ফিরে এল সুন্দর এক জীবন্ত ছেলে আর তার বউ পাটালী দেশের রূপসী রাজকন্যা নিয়ে। দুঃখিনী দুওরানী ঘুম ভেঙে শোনেন, দাসীরা ডাকে 'ওঠ গো রানী ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বৌ-বেটা বরণ করসে!' রানীর ঘুম আর জাগরণ মিশে মিশে একাকার হয়ে যায়। স্বপ্নে তিনি দেখছিলেন, ষষ্ঠীঠাকরুণ বলছেন, 'রানী, ওই। চেয়ে দেখ্ তোর কোলের বাছা ঘরে এল।' পাটের শাড়ি পরে দুওরানী হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, 'ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনে ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

এমন ক'রে স্বপ্ন মেশে জীবনে, জীবন মেশে স্বপনে। দুওরানীর ক্ষীরের পুতুল গড়া যেমন সত্যি, আজ যে রাজপুত্র ছেলে বউ নিয়ে এসে রানীর যেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস হয়ে ভরিয়ে দিলে সব—এও তেমনি সত্যি। একেই বলে রূপকথা, যেখানে সবই সত্যি, অথচ তার চেয়ে বড় স্বপ্ন আর নেই; যেখানে সবই স্বপ্ন, অথচ তার থেকে বেশি সত্যি আর নেই।

কিন্তু কেমন ক'রে জীবন পেল ক্ষীরের পুতুল? ঠিক সেখানে এ রূপকথার মধ্যে আছে আরেকটা রূপকথা। কে না জানে ঠাকুরদেবতাদের লোভ মানুষের থেকে অনেক বেশি? ষষ্ঠীঠাকরুণ তো খিদের জ্বালায় বিয়ের বর ক্ষীরের পুতুল খেয়ে বসলেন। কিন্তু এক কানা কড়ি দিয়ে কেনা বানর, দুওরানীর আদরের বাঁদর, যে বানর কিনা দশবছর দশমাস আগে স্বপ্ন পেয়ে ছুটে গিয়েছিল রাজবাড়িতে—দুওরানী মায়ের রাজচক্রবর্তী ছেলে হবে—তার সঙ্গে পেয়ে উঠবেন ষষ্ঠীঠাকরুণ! ক্ষীরের ছেলে খাওয়ার দোষ ঢাকতে বানরকে দিতেই হলো একটি ছেলে, যাকে দুওরানীর মনে হবে আপনার ছেলে। ষষ্ঠীঠাকরুণের দেওয়া দিব্যদৃষ্টি নিয়ে ছেলে খুঁজতে

বানর গেল ষষ্ঠীতলায় — 'সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য।' নতুন বটে, স্বপ্ন বটে, কিন্তু সে দেশের কেউ কি অচেনা? সেথায় বনগা-বাসী মাসি-পিসি বনের ধারে থাকেন, ঘরের ধারে তালিম গাছটি, তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জম্বী গাছটি, তাতে জম্বী ফল ধরে। সে দেশে 'কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই।'

থাকবে কেমন ক'রে? কে গড়েছে এই স্বপ্নের রাজ্য? সে যে নর্মাল স্কুলের বেত-খাওয়া, নাম-কাটা ছাত্তর 'ওবিন ঠাকুর — ছবি লেখে।' তার বাড়ির কাছেই ছিল নর্মাল স্কুল, কিন্তু নিজের ইচ্ছের কোনোদিন যায় নি সে স্কুলে। পালিয়ে বেড়াত, আর পেটব্যথা, কাল মাথাধরার ছুতো-রেহাই নেই কিছুতেই। স্কুলে যাওয়ার জন্য আসত গাড়ি। চিৎকার কান্নাকাটি — গাড়ির চাকা দু'টো বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক সেও ভালো, তবু সে যাবে না স্কুলে। অবন ঠাকুর ছিল এমনি ছাত্র, এক দিনের জন্যও যে পাঠশালাকে ভালোবাসে নি, একটি প্রাইজও পায় নি কোনো দিন। নর্মাল স্কুলের লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতকে তার ঠেকত মা দুর্গার অসুরের মতো — মস্ত বড় মাথা, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, চোখদু'টো লাল টকটক করছে। তাঁর ক্লাসে যতক্ষণ থাকে, শিশুমন কাঁপে বলির পাঁঠার মতো। তারপর একদিন অবন ঠাকুর খেলে বেতের বাড়ি ইংরিজির মাস্টারমশাই-এর কাছে, কারণ কিনা সে বলেছিল p-u-d-d-i-n-g 'পাডিং' নয়, 'পুডিং'; মাস্টারমশাই বলেন, 'তবে রে ব্যাদড়া ছেলে, বলবিনে? বলতেই হবে তোকে পাডিং। দেখি কেমন না বলিস!' সপাসপ, বেত খেতে খেতে ছাত্র বলে চলে, পুডিং পুডিং। সেই দিনই অবনী ঠাকুরের বাবা নর্মাল স্কুল থেকে নাম কাটানোর হুকুম দিলেন।[১] অবন ঠাকুরের তৈরি ষষ্ঠীতলার স্বপ্ন-রাজ্যে তাই পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, আছে শুধু খেলা।

সে দেশের ছেলেরা নদীর পারে চরে বেড়ানো নীলঘোড়াকে পথেঘাটে গড়াগড়ি যাওয়া গৌড়দেশের সোনার নয়ুর দিয়ে সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরানীর বিয়ে দিতে যায়। কমলাপুলির দেশ কে না চেনে? খোকাখুকুদের মুখের প্রায় প্রথম বুলি সেই আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে / বাজতে বাজতে চলল ডুলি / ডুলি গেল সে কমলাপুলি / কমলাপুলির টিয়েটা —, এতেই না লয় পায় পুঁটুরানীর বিয়ের ব্যাণ্ডপার্টি। আবার সেই টিয়েপাখির দেশে গিয়ে বানর দেখে সেও বড় চেনা দেশ। এখানে টাপুরটুপুর বৃষ্টি নামলে, 'ক্ষেপ্ত' সব খোকাবাবুরা মায়ের কাছে জুড়িয়ে রাখা তপ্ত দুধ খান। শিবঠাকুর তিন বউ নিয়ে এসে নৌকো বাঁধেন 'সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে।' এক বউ রাঁধেন বাড়েন, এক বউ খান, আর একজন কিছু না পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানরও গেল সেই বাপের বাড়ির দেশে। এও যে দেখি 'খুকুমণির ছড়া'র দেশ। এখানে 'জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে,, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু'পাশে দুই কই কাতলা ভেসে উঠল,

তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন,' অন্ত মাছটা যেই না নিয়েছে এক নাকে ভরা টিয়ে, ভোঁদড় এসে এক হাতে টিয়ে আর অন্য হাতে মাছ নিয়ে নাচতে লাগল। তাই না দেখে খোকার মা ছেলেকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললে 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।'

এই খোকাবাবু বানরের মনে ধরল। ষষ্ঠীঠাকরুণের বরে এই হল দুওরানীর আপন ছেলে। আর এমনি ক'রে দেখা ছবি আর জানা সুর আর চেনা ছড়া গেঁথে গেঁথে অবন ঠাকুর বানালেন এক নতুন রাজ্য। খোকাবাবু খুকুমণিদের সব জানাচেনা, সব পড়াশুনা ঘুমের সাগর ভাসতে ভাসতে বুঝি এমনি কোনো দেশে পৌঁছিয়ে যায়, যা দেখাও বটে, আবার অদেখাও বটে।

বলছি বটে 'খুকুমণির ছড়া'র দেশ, কিন্তু তেমন কোনো নামে ছড়ার বাংলাদেশকে চিনে নেওয়ার সময় তখনো আসে নি। ১৮৯৬ সালে 'ক্ষীরের পুতুল' যখন সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকা ছড়া নিয়ে স্বপ্নরাজ্য গড়ছে, 'খুকুমণির ছড়া'র তাকে গেঁথে তুলতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের দেরি আছে আরো তিন বছর। ১৮৯৯-এর আগে যোগীন সরকারের সেই সংকলন পাঠক হাতে পায় নি। চিরকেলে বাংলা কবিতার মন্ত্রণায় যে ছবি লিখলেন অবন ঠাকুর, তার পিছনে আছে বাংলাদেশের আর পাঁচটা ছেলের মতো তাঁরও এক শৈশব-কাহিনী। সেই 'উত্তরের ঘর'-এর কাহিনী যখন 'গল্পকথার মধ্যে দিয়ে কতো কি' দেখেছে অবন। 'যখন চোখও চলে না বেশি দূর, পা-ও হাঁটে না অনেকখানি, তখন কান ছিলো সহায়। সে এসে পৌঁছে দিতো কাছে ছাত, হাতে এনে দিতো কমলাফুলির টিয়েপাখি, চড়িয়ে দিতো আগডুম বাগডুম ঘোড়ায় লাটসাহেবের পাল্‌কিতে এবং নিয়ে যেতো মাসিপিসির বনের ধারের ঘর-টাতে··· যখন সন্ধ্যা নামলেই 'পিদুমের ধারে বসে রূপকথা শোনা, ইকড়ি মিকড়ি, ঘুঁটি-খেলার সময় আসতো।'[২] 'আপন কথা'য় অবনীন্দ্রনাথ এর কিছু সূত্র রেখে যান, যাতে মনে হয়, সেই 'উত্তরের ঘর'খানিতেই 'ক্ষীরের পুতুল'-এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল —খুবই সম্ভব লেখকেরও অবচেতনে।

কানে শোনা সেই রূপকথা নিয়ে আরো রূপকথা আঁকা, শিশুর মুখের বুলি, মনের সুরে স্বপ্নের জগৎ গাঁথা, এই ছিল অবন ঠাকুরের খেলা। এ খেলায় নাবালক বন্ধুর অভাব নেই তাঁর। গোটা বাংলাদেশের কত খোকাখুকুই বুঝি 'ক্ষীরের পুতুল'-এর আশ্রয়ে ভেবেছে তাদের জীবনের প্রথম নিজস্ব ভাবনা, স্বপ্ন আর চৈতন্যকে ধরতে চেয়েছে একে অপরের পরিপূরক ক'রে। এমন কি দুষ্টু ছেলে রিদয়, ঘোড়াহাঁসের পিঠে চেপে বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে যে পাড়ি দিয়েছিল আকাশে, অবন ঠাকুরের ছবি লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল তারও। রিদয়ের স্বপ্নের দেশে, অনন্ত আকাশে উড়তে হাঁসের দল মটকার পাহারা দেওয়া কুঁকড়োদের কাছে খবর পায়— নিচের পৃথিবীটার ঠিক কোনখানটার উপর দিয়ে এখন উড়ছে তারা। তাই তো চলে সওয়াল-জবাব—"কার বাড়ি?" "ঠাকুরবাড়ি।" "কোন ঠাকুর?" "ওবিন

ঠাকুর—ছবি লেখে।"

ওই ঠাকুরবাড়িতেই ছিল আরেক ঠাকুর, ছবি লেখার কম যেত না সেও। স্বপ্ন দিয়ে জীবন আর জীবন দিয়ে স্বপ্ন তৈরির খেলায় অবন ঠাকুরের এই সাবালক বন্ধুটি তাঁর ঘরেরই মানুষ। বড়সড় নাম তাঁর ছিল একখানা—গগনেন্দ্রনাথ। কিন্তু 'ভোঁদড়বাহাদুর'-এর আদরের 'ভায়া'কে অতবড় নাম মানায় না। অবনীন্দ্রনাথ যেমন অবন ঠাকুর, তাঁর স্বপ্ন গড়ার সঙ্গী, আপনার বড়দাদা হলেন গগন ঠাকুর। কানা কড়ি দিয়ে কেনা বানর নিজের কমলাপুলি দর্শনের গৌরবে শৈশবের ঘুম কেড়ে নিতে নিতে প্রায় তিন-তিনটি দশক পার ক'রে দিচ্ছে, এমন সময় কোথা থেকে এল জমকালো মখমলের সাজ-গোজ পরা ভোঁদড়বাহাদুর, তার পরম বন্ধু বুদ্ধিমন্ত খরগোশ ; হৈহৈ ক'রে বলল, কমলাপুলি আমরাও দেখেছি।

শুধু কি দেখা ? সে যে এক বিরাট অভিযান। গগন ঠাকুরের বাড়ির চৌতলার ছাদ—তারই খুব কাছাকাছি কোনো ছাদে গগনের এক পূর্বপুরুষ তুলসীগাছের টবের পাশে রাজার বাড়ির হদিশ পেয়েছিল। আর গগন ঠাকুরের স্বপ্নের ছাদে ভাঙা পিলপের মধ্যে আছে ভোঁদড়রাজার সাতমহলা প্রাসাদ। ভোঁদড় রাজকুমার নিচুয়াকে দু-মুখো রাক্ষস নিয়ে গেছে চুরি ক'রে। তাকে উদ্ধার করতেই মোটাসোটা হ্যাটকোট পরা কুকুর সেনাপতি বকমল সাহেব, হাজার হাজার ভোঁদড়, বড় বড় কেঁদো বেড়াল, নানারকমের কাঠবেড়ালী আর খরগোশ সেনা নিয়ে ভোঁদড়রাজার যুদ্ধ যাত্রা।

সেনাবাহিনী অস্ত্র শাণিয়ে কলকাতা শহর থেকে কত রাস্তা, মাঠঘাট পার হয়ে যখন কমাপুলির ইস্টিশানে এসে পৌঁছল, তখনো তাদের গলায় সেই জাতীয় সংগীত—আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ঢাল মৃদং ঝাঁঝর বাজে। কমলাপুলি ইস্টিশানে স্টেশনমাস্টার টিরেসাহেব আছেন, আছেন গার্ড টুনটুনি সাহেব আর আছে টিকিট বাবুইরা। কিন্তু সেনাবাহিনী ট্রেন মিস ক'রে গেল। অবশ্য রাজা মহারাজারা মিস-টিস মানেন না। মানুষ রাজারাই বলে চেন টেনে দ্বিগুণ সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন, এ তো ভোঁদড়রাজা ! কে না জানে মানুষের চেয়ে এইসব জীবজন্তুদের ক্ষমতা অনেক বেশি হয় ! ষষ্ঠীঠাকরুণের ক্ষীরচুরির আয়োজন করতে ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি খুব যে ঘুম পাড়িয়েছিলেন খোকাখুকুকে, তাদের দিদি-দাদাকে, তাদের মা-বাবাদের, পেরেছিলেন নাকি গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি আর গাছের ডালে রানীর বানরকে ঘুম পাড়াতে ? এখানেও বুদ্ধিমন্ত, খুবই সম্ভব খরগোশ বলেই পারলে ইস্টিশানের লোহার ঘন্টি বাজিয়ে কমলাপুলির প্ল্যাটফর্মকে ইস্টিশান ছাড়া ক'রে যুগযুগান্তর ছুটিয়ে নিয়ে যেতে। শুভকাজে বাধা আসেই, তাই এত কাণ্ডের পরেও প্ল্যাটফর্ম ছুটতে ছুটতে বেগুনগাছে ধাক্কা খেয়ে হল চৌচির, সৈন্য সামন্তও বেপাত্তা, শুধু 'ভোঁদড়বাহাদুর'-এর রচয়িতা (ভোঁদড়দাদার দেওয়া বিজলে-বউল ফল খেয়ে সে এখন ছোট্ট ছেলে), বুদ্ধিমন্ত

খয়গোশ আর ভোঁদড়রাজা স্বয়ং নিচুরা উদ্ধারের শেষ পর্বে এসে পৌঁছলেন।

স্বপ্নে কেন, বাস্তবজীবনেও এমন দুর্গম পথ পাড়ি দেয় ক'জনা? পথে কমলাপুলির টিয়েসাহেব ওদের বন্ধু হয়েছিলেন। ভাগ্যিস তারা সবাই খেয়েছিল বষ্টিবুড়োর দেওয়া তেতো ওষুধ, না হলে চুটুপাল বনে কী ঘটত বলা কঠিন! দু'মুখো রাক্ষস ছলে-বলে এমন কি সিংহীর মামা ভোম্বলদাসের রূপ ধরে এদের বিব্রত করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত বষ্টিবুড়োর বোন জোটেবুড়িমার দেখা পেল তারা। বুড়িমার কাছেই জানা গেল, ভোঁদড় রাজকুমার নিচুরা সাতদিন-সাতরাত অক্লান্ত যুদ্ধ ক'রে দু'মুখো রাক্ষসকে মেরেছে। তাকে তাই বুড়িমা চুটুপাল বনের রাজা ক'রে দিয়েছে। এই সংবাদটুকু দিতেই জোটেবুড়িমা প্রকৃতির অপরূপ নৈবেদ্য - ঘাস, ফুল, শিশির, তারায় সেজে এসে সিংহাসনটিতে বসেছিলেন মুহূর্তের জন্য।

অনুমানে মনে হয়, এই জোটেবুড়িমার সঙ্গে অবন-গগনের আবাল্য পরিচয়। নিজের বালক-বেলার গল্পে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে দেখি ঘনকালো তেঁতুল গাছের মাথা। দাসীরা বলে, বংশের সকলের নাড়ী পোঁতা আছে তার তলায়। মাঝে মাঝে ছাতের উপরে ভোঁদড় চলে বেড়ায়, সেই চলার শব্দে গল্প তৈরি হয় মনের ভিতরে; ব্রহ্মদত্যি হাঁটছে, জটেবুড়ি কাশছে। জটেবুড়ি সত্যিই ছিল, লাঠি ঠকঠক ক'রে আসত; ময়ূরে তার চোখ উপড়ে নিয়েছিল। 'ক্ষীরের পুতুল-এ যে ষষ্ঠীবুড়ি এঁকেছি ঠিক সেই রকম ছিল সে দেখতে।'[৩]

জটেবুড়ি ছিল অসুন্দর, শিশুমনে সে এক ভয়ের ছবি। পরিচিত অসুন্দর হঠাৎ সুন্দর হয়ে উঠলে প্রসন্ন লাগে সাবালক, নাবালক সকলেরই। কিন্তু অসুন্দরকে মনে মনে সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিতে শৈশবের নিশ্চিতি থাকে অনেক বেশি। কে জানে, অন্ধকার রাতে মাথার উপর ছাদে ভোঁদড় চলার শব্দেই 'ভোঁদড়বাহাদুর'এর কাহিনী একদিন শুরু হয়েছিল কিনা! ভোঁদড়ের দেওয়া বিজলে-বউল খেয়ে গগনেন্দ্রনাথ হয়ে গেল ছোট্ট গগন, চড়লো কাঠের টাট্টুঘোড়ায়, গেল চুটুপাল জঙ্গলে। সেখানে তার আর ভোঁদড়দাদার দুর্গম পথপরিক্রমার শেষে পরম আনন্দের খবর নিয়ে এল জোটেবুড়িমা। হয়তো বা আজন্ম জানা অসুন্দর জটেবুড়ি রূপ পেল অপরূপ জোটেবুড়িমায়; ঠিক যেমন ষষ্ঠীঠাকরুন দুওয়ানীর শূন্য কোল ভরে দিয়েছিল রাজপুত্তুর দিয়ে তেমনি পুত্রগর্বে ভোঁদড়মহারাজের বুক ভরিয়ে তাকে পাখির গান আর প্রশান্ত ঘুমের আশ্রয় দেয় জোটেবুড়িমা। চুটুপাল বনে বুড়িমার কাছাকাছি যেতে যতখানি পরিশ্রম লেগেছিল, তার সবটুকু উজাড় ক'রে যদি যাওয়া যেত অসুন্দর জটেবুড়ির কাছে, হয়তো দেখত তারা, বুড়ির হাতে লাঠি নেই, চোখে ক্ষত নেই, সৌন্দর্যের উপমায় সে প্রকৃতির সাজে সাজা চুটুপালের জোটেবুড়িমারই তুল্য। তেমনি সেই ভয়ঙ্কর চুটুপাল জঙ্গলকে আবিষ্কার করা যেত কলকাতার ভিতরেই, জোড়াসাঁকোর অদূরে। আসলে পরিচিতকে অপরিচিত ক'রে, আবার তাকে নতুন

ক'রে চিনিয়ে দেওয়া, জানা-চেনা-দেখা জগৎ নিয়ে অজানা রাজ্য তৈরি করা—এ সবে যে মহা ফুর্তি এই দুই ছবি-লিখিয়ের !

তাই মা-বাপের অবাধ্য ছেলে রিদয় ঘুমের কিনার ধরে, খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে পাড়ি দেয় আকাশে। না হলে কি জানা যেত, আকাশে উড়ে যাওয়া ঝাঁকঝাঁক পাখির যে ছবিতে পরিচিত আমরা, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে কত খবরের দেওয়া নেওয়া ? বিপরীত মুখে উড়ে যেতে যেতে পরিচিতের কানে তারা বলে, 'ওধারে জল হচ্ছে', 'এধারে রোদে পুড়ছে', 'সেধারে ফল ফলেছে', 'এধারে বউল ধরেছে।' জানা কি যেত যে এই চির চেনা বাংলা দেশটাকে ওপর থেকে দেখায় রোদ্দুরে পেতে রাখা সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল, এমনি পাঁচরঙের ছককাটা চমৎকার একখানি কাঁথার মতো ! দেশাদেশান্তরের আকাশ বেয়ে কতইনা উড়ল রিদয় আর দেখল আর জানল।

মেঘনার চরে শুনলে হাঁসেদের হাঁকাহাঁকি, আলাপ হল চক্কা-নিকোবর-এর সঙ্গে। রিদয় বনে গেল হংপাল, মানে হাঁসেদের রাজা। কিন্তু তা বলে মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে হাঁস নয় সে, উড়বার মতো ডানা তার নেই ; মানুষও নয় সে, বুড়ো-আংলা যক্। আকাশযাত্রা তার পক্ষে কম কঠিন নয়। তারই মধ্যে আছে কাঠবেড়ালীর মতো তুচ্ছ প্রাণীর চোখ রাঙানি, আছে ছেলেদের হাতে পড়ে বন্ধু খোঁড়া হাঁসের ভয়ানক বিপদের মতো প্রতিকূলতা। তবু দমলে চলবে না। গণেশ-ঠাকুরের শাপে সে মানুষ থেকে যক্ হয়েছে। সেই শাপান্ত না হলে যে মুক্তি নেই।

মারাত্মক সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যদি বা পৌঁছনো গেল গণপতির কাছে, তিনি তো মানতেই চান না যে কোনোদিন তিনি ইঁদুরের পিঠে চেপেছেন বা রিদয়কে শাপ দিয়েছেন। বরং রেগেমেগে বললেন শাপ ছাড়াতে ওস্তার খোঁজ করতে হয়, এতে গণপতির কোনো হাত নেই। কিন্তু কে না জানে, স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের বুদ্ধি চিরকালই বেশি ! এ যাত্রায় কলাবৌ রিদয়কে পথ দেখালেন,'…ওই আমাদের ঘুমোর-বৌ কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে গড়ে ভটচায্যি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরে-ঘরে বিক্রি করতে পাঠায় সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ ? ওই দারোয়ানজীকে বল সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে।' সেই দোকানে গোবরগণেশ কলম হাতে পুঁথি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ একধামা দিল্লীর লাড্ডু নিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারিপট্টির টক-গণেশ বসে-বসে খালি আকাশে আঁকশী দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ আড়ম্বর ক'রে ঢোল পিটছেন।

এই শেষ গণেশকেই রিদয়ের দরকার। কারণ ইনিই যে তিনি—গণেশদাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—আমতলিতে রিদয়ের মায়ের কুলুঙ্গিতে ইনিই ছিলেন। এঁরই সঙ্গে বিশ্রীরকমের রসিকতা করতে গিয়ে রিদয়ের এত বিপদ। ইঁদুর তো হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে রিদয়ের হাত কামড়ে একলাফে কোথায় পালাল কে জানে ! আর পেটটি নাদা গণেশদাদা বিশাল মূর্তি ধরে ভয়ানক অভিশাপ দিলেন রিদয়কে, যেচারি বনে গেল বুড়ো-আংলা যক্। সেই তো রিদয়ের পথে বেরনোর কারণ,

আকাশে উড়েছে সে, শুধু এরই দর্শনলাভের আশায়।

গণেশদাদার এত শক্তির বার্তা অবন ঠাকুর ছাড়া কেউ পায় নি কোনোদিন। অবন ঠাকুরকে বাদ দিয়ে পেতাম না আমরাও। কিন্তু কেমন ক'রে এত খবর এসে পৌঁছল ঠাকুরবাড়ির এই ছবি-লিখিয়ের কাছে? খবর খুঁজে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা অবশ্য ছিল তাঁর। কোরগরের আনন্দময় জীবনের স্মৃতিতে তিনিই তো মুখর, 'এমনি ক'রে চলত আমার চেখের দেখা সারাদিন ধরে। রাত্রে যখন বিছানায় যেতুম তখনও চলত আমার কল্পনা। নানারকম কল্পনায় ডুবে থাকত মন; স্পষ্ট যেন দেখতে পেতুম সব চোখের সামনে। খড়খড়ির সামনে ছিল কাঁঠালগাছ। জ্যোৎস্না রাত্তির, চাঁদের আলোয় কাঁঠালতলায় ছায়া পড়েছে ঘন অন্ধকার। দিনের বেলায় চাটুজ্জেমশায় বলেছিলেন, আজ রাত্তিরে কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির বিয়ে হবে। রাত জেগে দেখছি চেয়ে, কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোয় মশাল জ্বালিয়ে এল তাদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হৈ-চৈ, বাদ্যভাণ্ড, দৌড়োদৌড়ি, হুলুস্থুল ব্যাপার। সব দেখছি কল্পনায়। কাঁঠালতলায় যে জোনাকি পোকা জ্বলছে তা তখন জ্ঞান নেই।'[৪] তারপর বালক অবন ঘুমের দেশ পেরিয়ে নিশ্চয় চলে যেত কাঠবেড়ালীর দেশে। সেই চোখের দেখা আর মনের দেখার পরিপূরক খেলাটা যে অবনীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যায় নি, বালকবেলা পেরিয়েও, তার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। তাই সন্দেহ হয় ঘুমের গঙ্গা পেরিয়ে, দিব্যদৃষ্টির মায়া ছড়িয়ে গণেশদাদা আর ইঁদুর ভায়ার কীর্তিকাহিনী এই যে গড়ল নতুন রূপকথা, তার সূত্রপাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ঘরে সাজানো জয়পুরের সেই পাথুরে গণেশঠাকুর করেন নি তো?

একবার এক সাহেব অবনীন্দ্রনাথের ঘরে সেই পাথরের গণেশ দেখে, প্রথমে তো বোঝেনই না, সেটা মানুষ না হাতী। তারপর উনি ভগবান জেনে সাহেব বলেন, 'ওটা আমাকে দাও। আমি দেশে নিয়ে যাব।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করেছিলেন, 'ও-ঠাকুর কি তুমি বিলেতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে?' যাই হোক, গণেশঠাকুর জাহাজে চেপে সাহেবের সঙ্গে বিলেত গেলেন। কিছুদিন পরেই বিলেত থেকে এক বাক্স এসে হাজির, ভিতরে সেই জয়পুরী গণেশ আর সাহেবের এক চিঠি, "টেগোর, তোমার ঠাকুর আমার বিকট মূর্তি ধরে রাত্তিরে ভয় দেখায়। বলে, 'তুই আমাকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে রেখে আয়। আমি এখানে থাকব না।' তুমি ওকে ফেরৎ নাও।"[৫] এ' ঘটনার সময়কাল জানা নেই, তাই 'বুড়ো-আংলা'র রচনাকালে তাকে মেলানো যায় না। পুরোটাই অনুমান। তবু ভাবি কাঁঠালতলায় জোনাকি-আলোয় কাঠবেড়ালীর বিয়ের সমারোহ দেখবার চোখ আর মন যার ছিল, সাহেবের এই জরুর স্বপ্ন থেকে রিদয়ের স্বপ্নের সূত্রটুকু নেওয়ার সুযোগ কি সে ছেড়ে দিতে পারে?

আকাশে উড়তে শুরু ক'রে রিদয় আর শুধু সমবয়সীদের বন্ধু রইল না—হয়ে গেল সকলের বন্ধু। গোমড়ামুখো পণ্ডিতদের মধ্যেও এমন পাষাণপ্রাণ বোধ করি কমই

আছেন, যিনি রিদয়ের মুখে বিশ্বকর্মা আর বিশ্বামিত্রতে মিলে পৃথিবী ও তার মানুষ গড়ার গল্প শুনতে শুনতে বলে উঠবেন না, সাবাস! কে তোমাকে পাঠশালে যেতে বলে? তুমি যে ভাই শুধু শেখাতেই এসেছ। আমরা কী শেখাব তোমায়? ধন্য তোমার সৃষ্টিকর্তাকে, ধন্য তার বাপকে, ভাগ্যিস ছেলের নামটা কাটিয়েছিলেন নর্মাল স্কুল থেকে, না হলে কাদার পৃথিবী গড়ার এমন কাহিনীটা সে নিজেই জানত না তো তোমাকে বলবে কী?

অথবা সুবচনীর খোঁড়া হাঁস; বুড়ো আংলার জগৎ যেপে সে ভালোবাসা আর সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে রইল। দুই ডানার আড়ালে বুড়ো-আংলা বন্ধুকে আগলে রাখাই যেন তার কাজ। হাঁসেরা যখন খোঁড়া বলে ঠুকরে দেয় তাকে, সে বলে, রিদয় সঙ্গে থেলে, সাহসে ভর ক'রে সে উঠতে পারবে অনেক উঁচুতে। অনাহারে ক্লান্তিতে রিদয় যখন অবসন্ন, খোঁড়া হাঁসই তাকে সাধ্যমতো খাবার এনে দেয়। হৃদয়ের সব অনুভব সকলের জন্য উজাড় ক'রে দিতেই যেন তার জীবন। রিদয়ের স্বপ্নের রাজ্য তাই খোঁড়া বন্ধুকে পুরস্কার দেয়—বালিহাঁসের মতো সুন্দরী সঙ্গিনী। আর স্বপ্ন ভেঙে রিদয় দেখে সুবচনীর হাত পুকুরপাড়ে ভাব জমাচ্ছে এক বুনো হাঁসের সঙ্গে।

ঘুমের দেশ থেকে ফেরার পথে যে বুদিগাই রিদয়কে জাগিয়ে তুলল, স্বপ্নে তার ভূমিকাটিও বড় সুন্দর। আকাশ-বাতাস দেশদেশান্তরের অভিজ্ঞতায় রিদয় যখন স্বপ্নের ঐশ্বর্যে ভরা, বুদিগাই-এর সঙ্গে তার দেখা। রিদয়, তার খটাস বন্ধু আর নেউল বন্ধু যে ঘরকে ভেবেছিল গঙ্গাযাত্রীর ঘর, সেইখানে থাকে এক বুড়ি আর তার আদরের বুদিগাই। সে রাতেই বুড়ি মরে গেল। ছেলেদের জন্য সে নাকি পাগল, তবু প্রবাসী ছেলের মায়ের শেষ সময়েও এল না। গঙ্গাযাত্রীর ঘর বলে ভুল হয়েছিল যাকে, বুড়িমার মৃত্যু দিয়ে সেই ঘরের সঙ্গে জানাচেনা শেষ হয়। বুদিগাই-এর কাছে বুড়ির দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে রিদয় বলে, 'আহা বুদি, আমতলিতে মাকে আমি এমনি ক'রে ফেলে এসেছি যে।' বুদি তাকে ঘরে ফিরতে পরামর্শ দেয়। আবার সেই বুদির ডাকেই রিদয়ের স্বপ্নের প্রথম আচ্ছন্নতা কাটে।

সব দেখেশুনে ভাবি, অবন ঠাকুর মানুষটা চায় কী? বালকের বন্ধু তো সে বটেই; কিন্তু কোন ফাঁকে সেই মনমাতানো ছড়া ছবিতে ভরা দেশে বালকদের দলে ঘাড় ধরে টেনে আনে, 'হোঁৎকা হয়ে যাওয়া' সব বড় আর বুড়োদের। বলে যেন, বাপু, যত নাবালক ভেবেছিলে আমায়, ততখানি নই কিন্তু। হোঁৎকারাও পড়ে বিপদে। লোকটা বলে কী! এই দেখি তার গুগলি 'গঙ্গাসাগরে ছান করি' যায়, তার সিদ্ধিদাতা গণেশ নিয়ে বসে বিল্লির লাড্ডু, পুঁথি লিখবার ক্ষমতা রাখে একমাত্র গোবর-গণেশ, আবার খোঁড়া হাঁস, বুদিগাই, রিদয়, আমতলি আর কৈলাস পাহাড়, মাটি আর আকাশ, জীবন আর স্বপ্ন নিয়ে ছেলেখেলা করতে করতে মিথ্যের মধ্যে দিয়ে রাশি রাশি সত্যি বের করে মানুষটা।

অথচ অবন ঠাকুরকে সাবালকের বাঁধা সংজ্ঞার মেলায়, সাধ্যি কার! আমতলির

গৃহস্থ ঘরে কুলুঙ্গির ইঁদুর তো তবু জীবন পায় স্বপ্নে। কিন্তু সত্তর বছরের খোকা অবনের হাতে তৈরি কাঠের ইঁদুর একদিন ভরসন্ধ্যাবেলা বিনা স্বপ্নেই জ্যান্ত হয়ে কী নাকানিচোবানিটাই না খাওয়াল আপন সৃষ্টিকর্তাকে! 'সময় আমারও বড়ো কম', বার্ধক্যের যে পারে দাঁড়িয়ে মানুষ একথা বলে, সে বয়স তখন অবনীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছে। তা বলে পুতুলের কারিগর, স্বপ্নের যাদুকর তো হারিয়ে যায় নি। একদিন সকালবেলা বাগানে আঁতিপাঁতি ক'রে কী যেন খুঁজে বেড়ায় সেই প্রাণবন্ত খেলুড়ে, 'একটা ইঁদুর, জ্যান্ত হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালালো! ও ঠিক গর্তে ঢুকে বসে আছে। কাল বিকেলে একটা ইঁদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু, বেড়ে ইঁদুরটি হয়েছিল, কেবল লেজটুকু জুড়ে দেওয়া বাকি। ভাবলুম এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধে হয়ে এসেছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না—চৌকিটা বারান্দার রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলো পাচ্ছি তাইতেই কোনোরকমে তারের একটি লেজ যেই না ইঁদুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটু মোচড় দিয়েছি—টক্ ক'রে হাত থেকে লেজসমেত ইঁদুরটি লাফিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, এদিকে খুঁজি, ওদিকে খুঁজি।···রাত্রে ভালো ঘুম হল না—ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম; ভাবলুম যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে।···কিন্তু আমার ইঁদুরের সন্ধান আর মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে বসে মজা দেখছে।'[৬]

এই না হলে অবন ঠাকুর! 'ভূতপত্রীর দেশ', 'হারুন্দের কথা', 'কিচ্‌কিন্দের গল্প' এইসব বলে ফেললেও যার আশ মেটে না। 'বাঁকানদীর ধার থেকে অনেক আঁকাবাঁকা ছবি যোগাড় করে' আনার শখ তখনো ষোল আনা ছেড়ে আঠেরো আনা। অনুযোগ করে, 'আমার ভূতপত্রী লাঠিটি কিন্তু গোবিন্দর মা চুরি ক'রে রেখে দিয়েছে। লাঠি নইলে তো চলতে পারি না। তোমরা সবাই চাঁদা ক'রে যদি আমাকে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি কেনবার পয়সা দাও তবে সেইটে নিয়ে আমি একবার মামার বাড়ি যাই, আর তোমাদের জন্যে বাঁকানদীর ধার থেকে অনেক···।'

পুরীতে কে না যায়? জগন্নাথ দর্শনের পুণ্যি কে না চায়? কিন্তু এমন ছিটিছাড়া মতিবুদ্ধি আর কার হবে ওই অবন ঠাকুর ছাড়া? যে ধূ ধূ বালি আর সমুদ্রের শোঁ-শোঁ শব্দের মধ্যে দিয়ে চক্রতীর্থে যাবে বলে কেবল সেইদিকেই এগিয়ে চলে, যেখানে সমুদ্দুর ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই! শেষে এক বুড়িমার কৃপায় চক্রতীর্থে পৌঁছিয়ে ভাবে, 'সারারাত···ঘুরে বেড়ালেও কিছু খুঁজে পেতুম না।···অন্ধকারে সমুদ্রের ধারে বালির উপর হাঁটতে কেমন ভুতুড়ে মনে হয়—মনসা গাছগুলিও কেমন যেন।'[৭] এইখানেই থামবে নাকি—সে ছেলেই নয় অবন ঠাকুর, সবাইকে নিয়ে যাবে সেই ভুতুড়ে দেশে, যেখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কানে আসে 'ভূতপেরেতে / চলছে রেতে / হনহনিয়ে / ভূতপেরেতে।···ভূতের জমি / ভূতের জমি / ভূতপেরেতের / নেইকো কমি।···চলছে কতক / গাছতলাতে / ঝুলছে কতক / তালপাতাতে।···'

সেকালের বাদশাহ হারুণ অল রসিদ নাকি আজকের ভূতপতরীর দেশের পাল্‌কী-বাহক হারুন্দে। সে না বললে কি জানাই যেত যে সতরঞ্চিতে চড়ে হারুণ অল রসিদ পাড়ি দিয়েছিল আকাশে। গিয়েছিল বাল্যবন্ধু আকবরের কাছে দিল্লিতে। ছেলে-নাতিপুতি, কারোরই মতিগতি আকবরের ভালো ঠেকে না; সেই নিয়ে কত দুঃখ করলে ছোটবেলার বন্ধুর কাছে। হাবড়ার পুল কলকেত্তা যে তখন থেকেই এত গোলমেলে জায়গা, তাও হারুন্দে বিনা জানা যেত না। সকালবেলায় কেতাব বগলে, কানে কলম গুঁজে মনের ফুর্তিতে লোকগুলো দপ্তরখানা কি কেতাবখানায় ঢোকে — কিন্তু বেরিয়ে আসে এক একটা বোকা ছাগল হয়ে!

কিন্তু দপ্তরখানায় না ঢুকেই বা কী করবে লোকগুলো? সকলে তো সাতমহলা বাড়ির মাথায় স্বপ্নে ভরা ছাদের প্রাচুর্য নিয়ে জন্মায় না। পাঠশালাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছবি-লিখিয়ের জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ আর যোগ্যতা থাকে ক'জনার? অথচ মাথার উপর একটু ছাদ দরকার সকলের, দু'বেলা পেটে দানা না পড়লে স্বপ্ন তো দূরের কথা, ঘুমই আসবে না। সেই সংস্থানটুকুর তাগিদে মানুষগুলোকে ঢুকতেই হবে দপ্তরখানা বা অনুরূপ কোনোখানে। সারাদিনের কাজের ফলে জীবনের সব ফুর্তি, সব হাসি মরে যাচ্ছে যে মানুষগুলোর, তাদের জন্য অবনীন্দ্রনাথের করুণা ছিল; আর বিদ্রূপ ছিল সেই জাঁতাকলটা নিয়ে, যা নাকি ফুর্তিবাজ লোক-গুলোকে বানিয়ে দেয় বোকা ছাগল। ওই করুণায়, ওই বিদ্রূপেই কি শেষ হয়ে যেত ছবি-লিখিয়ের অনুভব? তারপরেই সে অনুভূতি পালাত সব ছেড়ে ছুড়ে — আলিপুরের মানুষ-পাঁঠা জিইয়ে রাখা চিড়িয়াখানা, তাদের পোষ মানানোর আস্তাবল সেই দিঘির পাড়ের গোলামখানায় ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে কালাপানিতে পাড়ি জমাত হারুণ অল রসিদের সতরঞ্চি!

তা বলে এ কথা তো মানা যায় না যে ধানচালের পৃথিবীটা ছিল অবন ঠাকুরের সম্পূর্ণ অচেনা। বিশাল হলঘর কি দক্ষিণের বারান্দায় গড়গড়ার নল হাতে রাশি রাশি তামাকপোড়া খোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে যে ছবি দেখত আর আঁকত অবন ঠাকুর, সেখানে স্বপ্নের ছন্দ মিশে গেছে গাছে ফল ফলাবার, খেতে ফসল ধরাবার গানে। 'ভূতপতরী'র মাত্র ক'বছর পরে বিমলের আকাশযাত্রায় সুরেশ্বর পেরিয়েই নেমেছে বৃষ্টি। যখন 'নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে', আকাশের হাঁসেরাও 'পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক, সব্জী খেতগুলোর ধার দিয়ে ডাকতে-ডাকতে চলল — "রসা জমি ধ্বসে পড় না, বসে থেক না, ফসল ধরাও, ফল ধরাও, নতুন বীচে ফল ধরাও!" হাঁসের দল তখন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের পথে চলেছে, কাঠফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে বনের পাখি ধরেছে পৃথিবী ভরে ওঠার গান, 'বৃষ্টি পড়ে, টাপুর-টুপুর / বাজছে বাদল গামুর-গুমুর / ডাল-চাল আর মক্কা-যুন্নর / ফোঁটায় ফোঁটায় নামে — / আকাশ থেকে নামে — / জলের সাথে নামে — / ঘরে-ঘরে নামে — ...।' খুশিতে ভরাট এই ছন্দে

মিশে যায় চাষীর লাঙলের লয়, উপমা পায় জেলের হাতে ছিপ কিংবা জালের টান, স্বস্তি পায় গৃহস্থের জীবন, প্রেরণা পায় হাঁসেদের ডানার ছন্দ আর রিদয়ের স্বপ্নের আনন্দ।

জীবনজোড়া কাজের কঠিন গান, কর্মময় মাংসপেশীর ঝাঁকাবাঁকা ছবি, শ্রমে শ্রমে শক্ত হাতের খেলাকে যে অবন ঠাকুর ছবি-লিখিয়ের কলমে এমন প্রসাদ দেবেন, তা জানা কথা। উস্তরের ঘরে যখন বন্দী ছিল বালক অবন, বাইরের জগতে কাজের ছন্দকে আয়ত্ত করতে যখন তার আশ্রয় কেবল একটিমাত্র জানলা, তখন থেকেই তার সকাল জুড়ে থাকত এক ভিস্তি আর এক ডোম। রোজই দেখত অবন, 'এক ভিস্তি, গায়ে তার হাত-কাটা নীল জামা, কোমরে খানিক লাল শালু জড়ানো, মাথায় পোস্ট অফিসের গম্বুজের মতো উঁচু শাদা টুপি···চামড়ার মোষোকে জলে ভরে। মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ ক'রে জল খায়, যেন একটা জল-জন্তু ;··· মোষোকটা ফাটার উপক্রম হতেই ভিস্তি একটা সরু চামড়ার গলাট দিয়ে সেটাকে বেঁধে নিয়ে গায়ের জল মুছিয়ে যেন পোষা জানোয়ারের মতো পিঠে তুলে নিয়ে চলে যায়, খানিক দৌড়, খানিক আস্তে আস্তে চলা মিলিয়ে একটা চমৎকার চালে মাটির দিকে বুক ঝুঁকিয়ে।'[৮]

তারপর আসত ছীরে ডোম, দুই হাত খেলিয়ে চটপট দু'টো কলমের মতো ক'রে ঝাঁটা বুলিয়ে অতি আশ্চর্য আর পরিষ্কার ভাবে এঁকে দিয়ে যেত নক্সা। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'রাস্তার আর্টিস্ট, ধুলোর আর্টিস্ট, ডবল ঝাঁটার আর্টিস্ট – তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকতো কতোক্ষণ। আমরা যেমন ছবির নানা কাজে নানারকম সরু মোটা ভোঁতা চেটালো তুলি রাখি, আমাদের ছীরে মেথরও কাছে রাখতো রকমবেরকমের ঝাঁটা। রাস্তার ঝাঁটা ছিলো তার কলমের মতো ডগায় একধারে ছোলা ; জলের নর্দমা পরিষ্কার করবার জন্তে রাখতো সে দাড়ি কামানো বুরুশের মতো ছোটো এবং মুড়ো ঝাঁটা ; বাগানের পাতা-লতা কুটো-কাটা ঝাঁটানোর জন্তে ছিলো চোঁচের মতো খোঁচা দু'ফাঁক ঝাঁটা যাতে সামান্ত কুটোটিও বুড়িতে তুলে নেওয়া চলে অনায়াসে ; উঠোন, দালান, বারান্দা ঝাঁটানোর ঝাঁটা ছিলো চামরের মতো হালকা মুলমুলে, বাতাসের মতো হালকা পরশ বুলিয়ে চলতো মেঝের উপরে। এই নানারকম ঝাঁটার খেলা খেলিয়ে চলে যেতো সে রোজই।'[৯] আর উস্তরের ঘরে ঘরে বসে বসে শিশু কিংবা বালক অবন মিলিয়ে চলতো কাজের ছন্দকে শিল্পের প্রসাদে। এমনি ক'রে যার বাইরে দেখা শুরু সে যে বিশ্বজোড়া কর্মময়তার প্রসাদকে শিল্পে দেবে প্রাণ, এ তো স্বাভাবিক। তাই অবনীন্দ্রনাথের আদরের রিদয় স্বপ্নে দেখে নেয় তিস্তানদীর দুইপাশের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কাজের মানুষদের আনন্দকে।

এই আনন্দের ছবিতে ছোটদের তো খুশি করেনই অবন ঠাকুর, সাবালকদেরও কানে কানে বলে যান, স্বপ্ন নয় শুধু বাবু পলায়ন। তাই রিদয়ের আকাশযাত্রার

অভিজ্ঞতায় বাদ পড়ে না কলকাতার সেই এক বাবুর বেরসিক হাবভাব। পৃথিবীর মানুষ, আকাশের পাখি, সবাই যখন বৃষ্টির সুরে সুর মিলিয়েছে, 'কলকাতায় এক বাবু পাহাড়ে রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকে-কানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে-টানতে ছাতা খুলে হাঁফাতে-হাঁফাতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো হয়েছেন···।' কিন্তু কলকাতা ছেড়ে দার্জিলিঙেই যাও, আর স্বপ্নই দেখ, আর আকাশেই ওড়, বাবু-পলায়ন চলবে না। অবন ঠাকুরের এই মনোভাবটি অবরদস্ত প্রকাশ ক'রে দিলে তাঁর হাসের দল, তারা গাইলে,

'জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি
হয় না তো সিটি!
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!
জল না হলে গাছে-গাছে ফলে পেঁপে-আতা?
জল না হলে কোথায় পেতে আলু পটল চা!
হত না কো রবার-গাছ কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখ—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেক!
সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—
বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জলবে আঁত
না পাবে নদীতে মাছ, খেতেতে ফসল—
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখে জল।'

ভূত পত্রীর দেশে পিছিয়ে আসি। সেখানে হারুন্দে আর কিচ্‌কিন্দেতে বেজায় গোল বাঁধিয়েছে। কিচ্‌কিন্দে মানছে না, হারুন্দের একটি কথাও, বলছে, গল্পের খেই ধরতে জানে না যে, সে আবার কী গল্প বলবে! কিচ্‌কিন্দের রাগের আসল কারণটা কোথায় ছিল কে জানে! সে তো আজকের লোক নয়! মনে মনে হয়তো ছিল তার, সত্যিই যদি তুমি বাদশাহ হারুণ অল রসিদ, এত ক্ষমতা তোমার, আকাশে ওড়া নাকি হাতের মুঠোয়, তো কলকেত্তার গোলমাল দেখে পালালে কেন ভীতুর মতো? নীচে নেমে কোনো প্রতিকার বিধানের চেষ্টা তো বাপু করলে না! কিচ্‌কিন্দের নিজের গল্পে তেমন গোলমেলে জায়গা আসে নি কখনো। তবে বহু রূপকথার আদিকথা অজানা থেকে যেত তাকে বাদ দিয়ে।

সেই যে হুঁকোমুখো হ্যাডলা, তার আফিঙের খানাদার শ্যামাদাস মামা, গুড়্‌গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়িয়ে হামা থাপ্‌ পাতেন যে গোষ্ঠমামা, ব্যাকরণ শিং বি. এ.র কুমীরে খাওয়া মেজোমামা, এই সব মামার আদিমামার সঙ্গে ভাগ্নের সম্পর্ক তো একমাত্র কিচ্‌-কিন্দেই বলতে পারে। কিষ্কিন্ধ্যায় যেই না হনুমান জন্ম নিয়েছেন, 'রথে চড়ে সুষ্যি-মামা দেখা দিয়েছেন। মামার মুখটি যেন পাকা আমের মতো। দেখেই হনুমানের লোভ হয়েছে, একলাফে মামার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠেছেন। মামা—'হনু হনু।'—

বলে আদর ক'রে যেমন ভাগ্নেকে চুমু খেতে গেছেন আর হুল দিয়েছেন মামার গালে এক কামড় !' পৃথিবীর সমস্ত মামাভাগ্নেদের সম্পর্কের সূত্রপাত তো এখান থেকেই। কৃষ্ণ-কংস তো নিশ্চয় এর পরের ঘটনা।

এমন সব গল্পের খোরাক মানে এমন সব সত্য ঘটনার সাক্ষী কিচ্‌কিন্দের সাহায্য ছাড়া কি যাওয়া যেত পিসির বাড়ি ? বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তাঁদের কৃপণ হাত হঠাৎ দরাজ হয়ে উঠেছে, ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সে ডাকে সাড়া না দেওয়া অসম্ভব। এই মাসি পিসি দিগ্‌নগরে দিঘির ধারে ঘুম এনেছিলেন, ষষ্ঠীঠাকরুণের ক্ষীর চুরিতে সহায় হয়েছিলেন, দুটি ক্ষীরের কান দক্ষিণা পেয়েছিলেন, তবে না বানর ষষ্ঠীঠাকরুণকে পাকড়ে ধরে পেল দুওয়ানীর মেঠের লাছা ! পিসীর বাড়ি তাই যেতেই হবে।

পিসির দেশে সবই উল্‌টো—কলাপাতায় বসে পিঁড়িতে খায়, বিকেলের বদলে সকাল পাঁচটায় খোকাবাবুরা বেড়াতে যায়, 'ইকড়-মিকড়ি চামচিকড়ি / চাম কৌটো মজুমদার / ধেয়ে এসো দামুদার—'বললেই চিতাবাড়ির দল আর খাঁইকিড়ির দলে লাঠিখেলা শুরু হয়ে যায় ; মাছরাঙা গুরু বলেন 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে। / মৎস ধরিবে খাইবে সুখে॥' যদি ভুলে কোনো পোড়ো বলে ফেলেছে 'লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে। / মৎস ধরিবে মরিবে দুখে॥' গুরু দেবেন বেতের খোঁচা। পিসির দেশের লেঠেলরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি বন্ধ রেখে একজোট হয়ে জিতে নিত কমলাপুসি রাজ্য, আপত্তি থাকত না সেখানে একখানা পাঠশালা বসাতে। এমন কি নর্মাল স্কুলেও যদি লক্ষ্মী পণ্ডিতের জায়গায় এসে বসতেন মাছরাঙা গুরু, অবন হয়ে যেত সেখানকার একনম্বর পড়ুয়া। পিসির দেশের পাঠশালে সুখ্যাতির অন্ত ছিল না তার, গুরু খুশি হয়ে বলতেন, 'ভালো রে ভালো ! আচ্ছা তোর নাম তো অবু ? লেখ দেখি—'…

আঁকাবাঁকা ছবি এমনি আরো কত আছে বাঁকা নদীর ধার দিয়ে, তা কে জানে ! আঁকাবাঁকা লাঠি এমনি দুমূল্য যে তার দাম জোগাড় করতে পারে নি ছবি-লিখিয়ের বন্ধুরা ! চাঁদা তুলতে তুলতে দেরি ক'রে ফেলেছে, বুঝতে পারে নি অত টাকা উঠবে না। গগনভারার সাধের ভোঁদড়দাদাকে যদি পাওয়া যেত, তাল-বেতালসিদ্ধ লাঠিখানা চেয়ে নেওয়া যেত অবন ঠাকুরের জন্য। কিন্তু গগন ঠাকুরের কিছু আগে বা পরে ভোঁদড়দাদাও বোধ করি দেহ রেখেছেন অনেকদিন। নিচুয়া মহারাজও বুড়ো হলেন ; তাঁর উত্তর পুরুষেরা কেউই সম্ভবত বাপ-পিতামহর মতো বীর হয় নি। হলে, কলকাতা শহরে ছদ্মবেশী রাক্ষসের উপদ্রব এত বাড়তে পারত না। আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই যে মানুষটা লাঠিহাতে মামাবাড়ি যাবে, সেও তো কোন ফাঁকে হয়েছে বেপাত্তা ! শৈশব থেকেই মনে মনে মামার বাড়ির পথ একটা আঁকা ছিল তার ; সেই যখন 'মজুরী দাসী…খেয়ালমতো খোলা জানলার ধারে তুলে ধরতো আর বলতো—ঐ ছাখ্‌ মামার বাড়ি ! বাড়ির সন্ধানে উত্তর আকাশ হাতড়াতো চোখ, দেখতো না একখানিও ইট, শুধু পড়তো চোখে…উত্তর-পশ্চিম

কোণে মস্ত তেঁতুল গাছটার শিয়রে মন্দিরের চূড়োর মতো শাদা শাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে।[১১০] কোন শূন্যের দেশে পাড়ি জমিয়েছে সে আঁকাবাঁকা লাঠির আশা ছেড়ে? গেছে কি সেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাজ্য মামাবাড়ির দেশেই? কিন্তু খালি-হাতে, বিনা লাঠিতে, না পারছে ফিরতে, না পারছে ছবি লিখতে।

তাই কত খবরই আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে তার ঠিকঠিকানা নেই। জোটে-বুড়িমার প্রাসাদের সামনে বর্শা হাতে সন্‌সন্‌ ক'রে ঘুরপাক খাওয়া মারাত্মক তাল-পাতার সেপাইদের গায়ে মাণিকের ফুল ছুঁইয়ে দিলেই তারা প্রাসাদে ঢুকবার পথ ছেড়ে দেবে—এ কথনোই সম্ভব হতে পারে না—বলেছিলেন কমলাপুলির টিয়ে-সাহেব। তার ফলে কী বকুনিটাই না খেয়েছিলেন তিনি বুদ্ধিমন্ত খরগোশের কাছে—'তুমি এই বিংশ শতাব্দীর শুকপক্ষী হয়ে এমন কথা কি করে যে বললে, বুঝতে পারলুম না। আমাদের বাপ পিতামহরা কি কখনো বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ জটায়ুপক্ষীর মতো আকাশে উড়তে পারবে—সামান্য একটা কাঁচের ভিতর দিয়ে মাছিকে হাতির মতো বড় করে তার হাজার-হাজার চোখ দেখতে পাবে—আর সেই একই কাঁচে চন্দ্রসূর্যকে ঘরের কাছে এনে তার ভিতরে কি আছে দেখে কেতাবে লিখে রাখবে—আজকাল ঘরে বসে সকলেই তো আকাশে কান পেতে দেশ-বিদেশের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েদের গান শুনচে—সেদিন এক মহাপুরুষের বাড়ি গিয়ে দেখলুম, তাঁর বাগানের গাছপালারা ভুবো মাখানো কাঁচে তাদের জীবনচরিত লিখছে। অতএব কিসে কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?'

নিজের নামকে সার্থক করেছিল বুদ্ধিমন্ত তার এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায়। এমন কি হাতে কলমে দেখিয়েও দিয়েছিল, মাণিকের ফুলের জোর কতখানি। তারপর কেটে গেল অনেকদিন। এই আজব পৃথিবীতে আরো কত অসম্ভব সম্ভব হল। মানুষ পা রাখল চাঁদের মাটিতে, নিজেদের তৈরি গ্রহ-উপগ্রহ বেলুনের মতো আকাশে ওড়ালো, মরুভূমিতে ফসল ফলাল, আরো কত জঙ্গলে বসতি গড়ল, বাড়ি বসে শুধু গান শোনা নয়, 'ক্ষীরের পুতুল'-এর জ্যান্ত ছবি দেখা গেল। অনেক ঝড়-ঝাপটাও গেল বাংলাদেশটার উপর দিয়ে। কিন্তু জানা হল না, এত কিছুর পরে সেই তালপাতার সেপাইরা কতখানি বদলেছে? তাদের বশে আনবার উপায় কি এখন আরো সহজ? বাংলাদেশের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে হাঁসেরা কি এখনো বলে, 'সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাঙলাদেশ?' নাকি তাদের বুলি বদলে গেছে? বাংলাদেশটাকে কি এখনো আকাশ থেকে তেমনি পাঁচ-রঙা কাঁথার মতোই লাগে? নাকি তার সে উজ্জ্বল রঙে টান ধরেছে, কাঁথার গায়ে ধুলো জমেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? রূপকথা দিয়ে আরো রূপকথা বানানোর বাহাদুর সেই ছবি-লিখিয়েদের যুগ শেষ হয়ে গেছে বহুদিন। সব খোকা-বাবু খুকুমণিরাও তাল-বেতালসিদ্ধ লাঠি হারিয়ে ফেলে, আঁকাবাঁকা লাঠির পয়সা জোটাতে না পেরে, মাস্টারমশাই, বাবা অথবা মামাদের মারাত্মক প্রভাবে বড়

হওয়ার আগেই বুড়ো আর হোঁৎকা হয়ে যাচ্ছে। তবু এই দুঃস্বপ্নের জীবনেও নিঝুম নিশুতি রাতে ঘুমের গঙ্গায় গা ভাসিয়ে দিয়ে তাদেরই মধ্যে দু-একজন কি আজও হঠাৎ হঠাৎ শোনে না ভোঁদড়দাদার গলা, 'কি ভায়া, আমায় চিনতে পার ?' অথবা আকাশ জুড়ে চকার দলের 'কোথায়' 'কোথায়' হাঁকাহাঁকিতে সাড়া কি দেয় না তারা, 'হেথায় ?'

নাকি ঘুমের গঙ্গায় গা ভাসিয়ে কোনো নতুন দেশে পৌঁছানোর আগেই ফিরে আসতে হয় অন্য জীবনের প্রস্তুতিতে ? সাড়ে আটটা কি তার কিছু আগে পরে নর্মাল স্কুলের থেকে কম মারাত্মক নয়, এমন কিছু স্কুলের গাড়ি ভেঁপু বাজায় দরজার গোড়ায় কিংবা বড় রাস্তার মোড়ে। প্রাত্যহিক পরীক্ষা আর তার ফলাফল, রেশা-রেশি আর প্রতিযোগিতার যে জগতে তারা বাস করে, সেখানে ভোঁদড়দাদা বা চকা নিকোবর যেমন অচেনা, তেমনি অদরকারি। পরীক্ষা যে কী ভয়ানক জিনিস সে তো আমরা অনেকদিন আগে থেকেই জানি। চুটুপাল জঙ্গলে সিংহীর মামা ভোম্বল দাস-বেশী দু'মুখো রাক্ষসের সামনে তিনটি প্রাণীর তখন মরণবাঁচন সমস্যা! এক কাহন সোনা না হলে প্রাণ যায় কি থাকে তার নেই ঠিক। এক পাল রাজহাঁস বুক ফুলিয়ে, ঘাড় নেড়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কাছে সোনা চাইতে গেলে তারা প্যাক-প্যাক ক'রে বললে, 'আমাদের এখন বিরক্ত কর না, আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।' সেই অতদিন আগেই পরীক্ষা ব্যাপারটা এমন সাংঘাতিক ছিল যে সিংহীর মামা ভোম্বল দাসের হুমকি, তিন তিনটে প্রাণীর জীবন, এ সবই তার কাছে তুচ্ছ। এখন না জানি আরো কত মারাত্মক! আজকের দিনের কোনো পরীক্ষার্থীর সামনে পড়লে জোটেবুড়িমার প্রাসাদ পর্যন্ত যাওয়া যেত কিনা, বলা কঠিন।

অবন ঠাকুর কিন্তু চিরচাল খোকাখুকুদের জন্য স্বপ্ন গড়ে গেছেন। বলেছেন, 'স্বপ্ন দেখিস না ? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল্, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে।'[১১] গগন ঠাকুরের 'ভোঁদড়বাহাদুর'ও তৈরি হয়েছিল খোকাখুকুদের অনুরোধ রাখতে। আদরের নাতি মোহনলালের পরম উৎসাহে হাতে লেখা পত্রিকা, দাদামশায় অবন ঠাকুর তার নাম দিয়েছিলেন 'দেয়ালা'। আর সেই পত্রিকার জন্য বড় দাদামশায় গগন-ভায়া লিখেছিলেন 'দাদাভায়ের দেয়ালা'; যা পরে পাঠকের হাতে এল 'ভোঁদড়-বাহাদুর' নাম নিয়ে।

ঝুলিতে ক'রে স্বপ্নের অনুসন্ধান সময় মামার বাড়ি কিংবা মাসি-পিসির বাড়ি থেকে কবে বয়ে আনবে ছবি-লিখিয়েদের উত্তরপুরুষ ? স্বপ্নেভরা ছাদের প্রচুর্য না হয় তেমন সুলভ নয় আজ, কিন্তু জানলার মুক্তি অথবা জানলার বন্ধন তো আজও সমান সত্য। অপরিসর ঘরে, নিষ্প্রদীপের আঁধারে, মোমবাতির আলোতে আলমারি আর খাটের ফাঁকে ছোট্ট জায়গাটুকু, দরজার একটুখানি কোণ হয়ে ওঠে কি কোনো অপরিচিত জগৎ ? অথবা এমন কী সে প্রাত্যহিক জীবন, যা চকা নিকোবর, ভোঁদড়দাদার মতো আপনার জনকে ক'রে দেয় পর ? এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে যেসব

রূপকথা, তা কি অমুক্ত বা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে? অনেক নতুন সত্যি আর অনেক দরকারি মিথ্যের ছবি আর লেখা হবে না কোনোদিন?

—

১ জোড়াসাঁকোর ধারে, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ ১৯০-১৮১
১ আপন কথা, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ২২-২৩
৩ জোড়াসাঁকোর ধারে, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড' প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ১৮৭
৪ ঐ, পৃ ১৯৯-২০০
৫ পূর্ণিমা দেবী, 'ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯৮
৬ ঘরোয়া (গ্রন্থসূচনার ইতিহাস — রানী চন্দ) 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড' (গ্রন্থপরিচয়) প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৪০৯-৪১০
৭ জোড়াসাঁকোর ধারে, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৩১৯
৮ আপন কথা, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথমখণ্ড', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ১৬-১৭
৯ ঐ পৃ ১৭-১৮
১০ ঐ, পৃ ২৩
১১ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দক্ষিণের বারান্দা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৪
১২ ঐ, পৃ ৪৩

কবিতাগুচ্ছ

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

সানন্দে বিদায় নিচ্ছি

বছরের বাকী আর যে কয়টি মাস
পৃথিবীর বুক জুড়ে ঘাসের পর ঘাস
গজাবার জন্যে রেখে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি
ঘাস গজাতে থাকুক যেমন খুশী, সুশ্রী, বিশ্রী. বিতিকিচ্ছি

বছরের বাকী আর যে কয়টি মাস
সানন্দে সম্মতি দিয়ে পাঠাচ্ছি যেন খর হাহুতাস চালায় করাত
ছিঁড়ে খায় যা কিছু জোটে হাতের কাছে
বাকী মাসগুলো থাকছে, থেকে যাচ্ছে
সবখানে ভীষণ স্বাধীন। বছরের বাকী মাসগুলো, আমি
রেখে যাচ্ছি নিদারুণ কলেরা ও মহামারীর জন্যে জানেন অন্তর্যামি

দুর্ভিক্ষ বসাবে ক্রূর দাঁত গ্রামে ও নগরে
মৃত্যুর কলরোলে নিভে যাবে জীবনের ক্ষীণ শিখা ঘরে ঘরে, প্রহরে প্রহরে
বাকী মাসগুলো থাকছে এখন একেবারে নাগালের বাইরে, হাতছাড়া
বলতে কি আমারো কেমন লাগছে ভারী ভালো, হাতপা ঝাড়া

বছরের বাকী মাসগুলো, এসময়ে আর অতো ক'রে
আগের মতো বলবো না গলবস্ত্র হয়ে কিংবা করজোড়ে
কোনো গাছকেই যেন তার নিটোল সৌরভময় ফুলের প্রসাদ
পাই আরো হাজার জনের মতোই সকালে বিকেলে প্রতিদিন, যেন বাদ
না পড়ি কোনোক্রমেই গাছপালা আর
লতাগুল্মের অদ্ভুত দাক্ষিণ্য থেকে
যেন আমি টিকে থাকি আগের মতোই ফুলের রেণু গায়ে মেখে, মুখে মেখে

সুকণ্ঠ পাখিরা যেন না খোঁজে আমাকে আর ভোরের ছায়ায়
বছরের বাকী মাসগুলো, এসময়ে আর নতজানু প্রার্থনায়

নাওয়া খাওয়া ভুলে আমি আর থাকবো না অমন তন্ময়
বছরের বাকী মাসগুলো থাক পড়ে
- জানুক, বুঝুক তারা কাকে বলে সমূহ পরাজয়

বাকী মাসগুলো, সারাক্ষণ, আমি বিলকুল ফিরিয়ে রাখবো মুখ
এ আচরণ পাখিরাও চাইলে বুঝুক, না চাইলে না বুঝুক
সর্বস্ব দেবো না আর পাখিদের গানের জন্যে আগের কয়েক মাসের মতো
এ কথা জানাতে পারি খোলাখুলি এ মুহূর্তে জানি সুনিশ্চিত
যদি গান থেকে যায় একেবারে পখিদের চতুর্দিকে সবখানে
বাকী মাসগুলো, জানাবো কেবলি অভিবাদন হাত তুলে সসম্মানে
বারবার এই দিগন্তজোড়া হিম স্তব্ধতাকে
বছরের বাকী মাসগুলো। যেন ছোটবড়ো সকলেরি জানা থাকে

বাকী মাসগুলো, উন্মত্ত শেয়াল, কুকুর এবং ঘুঘুদের দখলে রেখে যাচ্ছি
মানুষের বাস্তুভিটে। রকমারি দুর্গন্ধ এসে সরাসরি চড়াও হচ্ছে
নাকের ওপর টের পাচ্ছি
অরণ্য এসে আগাগোড়া জন্তুজানোয়ার বসিয়ে দেবার জিগির তুলে
আমাদের চেনা এই পৃথিবীর একভাগ নগদ উশুলে
বড়ো তাড়াতাড়ি করবে লোপাট, তছনছ যেমন খুশী, বরবাদ বাকী মাসগুলো
দিনকানা, রাতকানা হয়ে থাকবো আমি, ভালো ক'রে এঁটে দেবো
দু'কানের ভেতরটায় পুরোপুরি, একগাদা তুলো

ইতিমধ্যে আকাশকে দিয়েছি পাঠিয়ে এক কড়া চিঠি নিটোল হস্তাক্ষরে
যেন চাঁদ তারা, সূর্য নক্ষত্র, সবাই একযোগে ওই গোল সুনীল গহ্বরে
তলিয়ে যেতে যেতে ডুবে মরে শীগগির, সাঁতার না-জানা
সব শিশুদের মতো
যেন কোনো সূর্যোদয়ে আর কোনো দিনের আগমন অন্তত
চকিত না করে এই দেশ নদী বন মাঠ কিংবা মানুষের মন
যেন আর কোনো জাগরণে এ পৃথিবী ভোরবেলায়
পড়বার মতন কোনো গ্রন্থই কোনোক্রমে আর খুঁজে না পায়
স্তম্ভিত না করে যেন কোনো মানুষকেই যাকে আমি ভালোবাসি এবং যে কারণে
বারবার ছুটে যাই প্রতিদিন কোনো না কোনো ভয়ংকর রণাঙ্গনে
যেন আর সন্ত্রান্ত বিকেলের আড়ালে নরম সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে
কোনো রাত চাঁদ নিয়ে, তারা নিয়ে
না থাকে মাথার ওপর রকমারি আলো, ছায়া আর স্বপ্নের পাহারা বসিয়ে

গ্যাছে ওই কড়া চিঠি, আমার নিজের হাতেই লেখা যদিও বেজায় সংক্ষিপ্ত
বাকী মাসগুলো
বাহিরে কোথাও এ বছর জানি চতুর, সুগোল বৃত্ত
এঁকেছে প্রায় একটানে
বেশ কয়েকটি এখানে সেখানে
দেশময়

বাকী মাসগুলো রেখে যাচ্ছি শ্মশানবাসী ভূতপ্রেতের জন্যে, তাদের নশ্বর
কবরার জায়গাটুকু মিলে যাবে সহজেই বৃত্তের ভেতরটায়
ত্রুটি নেই ছকে কোথাও আথাই যায়
হৃষ্টমনে বাকী মাসগুলো উৎসর্গ ক'রে যাচ্ছি ছোটবড়ো সব নরকের নামে
দুধকলা, ধান, সুখাদ্য ও মধু রেখে যাচ্ছি বিনম্র প্রণামে
ন্যাড়াটে, লোমশ, লম্বা শিং, দন্তহীন করালদাঁত যতো শয়তানের উদ্দেশ্যে
ওই তো বন্যার ধারালো জিব চুকচুক ক'রে অবশেষে
খাচ্ছে চেটেপুটে. এই তো এখনি চারদিকে আমাদের
কোটি বছরের মাটিটুকু
খাচ্ছে প্রাচীন অর্বাচীন গাছপালার শেকড়, ডালপালা
কচি পাতার খোকাখুকু
ডাঁটাসুদ্ধ, বোঁটাসুদ্ধ থচমচিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে
খাচ্ছে চেনা সব ফুল
ভূতপ্রেত আর শয়তানের অনেকগুলো পাঠশালা. ইশকুল
এরি মধ্যে জমে উঠেছে অনেকখানি নানা জায়গায় সাত তাড়াতাড়ি
আমার এই সন্তসুলভ ইচ্ছের খবর পেয়েই এইসব বাড়াবাড়ি
গ্যাছে শুরু হয়ে, বাকী মাসগুলোর মধ্যেই চেনাজানা সব সড়ক
ধসে পড়বে, বিধ্বস্ত হবে সবগুলো লোহার পুল, সাঁকো তুচ্ছজ্ঞানে
নরক, কেবল নরক
ছাড়া গন্তব্যস্থল চিনে নেবার উপায় থাকবে না মানুষের
তাই বলে আমার অন্তর। আমি সরে দাঁড়াচ্ছি
রেখে যাচ্ছি বাকী মাসগুলো বছরের
থাকলো মাসগুলো ভূতপ্রেতের জন্যে, কবর শ্মশান ও নরকের জন্যে
আমি বিদায় নিচ্ছি, যাচ্ছি কোথাও একেবারে বিনা নিমন্ত্রণে

আমার এই আদর কিংবা এই এই উলঙ্গ অভিশাপ
আমার এই দাহ, আমার তাপ

বছরের বাকী মাসগুলোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি
বছরের বাকী মাসগুলোর জন্যে সানন্দে আমি বিদায় নিচ্ছি

সানন্দে আমি বিদায় নিচ্ছি ; ভিজিটিং কার্ডে লিখেছিলেন
আর নিজের মাথায় নিজ হাতে তিনি গুলি ক'রে চলেও গেলেন
ঘনিষ্ঠ লোক, চেনা আমাদের অনেকেরি
কারু জন্যে আর দাঁড়ান নি এতোটুকু, করেন নি তিনি দেরি।

মোড়গুলো আমি উড়িয়ে দেবো

করেক গুজন তাজা বোমা আর
শ'দেড়েক ছিমছাম ডিনামাইটের কাঠি
বটতলা নামক বিখ্যাত রাস্তার মোড়ে
সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে এসেছি। আজ

বিকেলবেলায় সলতের মাথায় আগুন দেবো ঠিক করেছি

রাস্তার ও মোড়টিকে আমি উড়িয়ে দেবো
ইতিপূর্বে ঠিক একইভাবে উড়িয়েছি আরও জাঁদরেল
করেকটি রাস্তার মোড়। পৃথিবীতে যেখানে যতো
রাস্তার মোড় আছে সবকটিকেই আমি উড়িয়ে দিতে চাই

শুনেছি কোনো একটি রাস্তার মোড়েই
ওৎ পেতে আছে নিপুণ শিকারী
তাকে দেখবার বুঝবার জানবার দরকার নেই আদৌ আমার

শুনেছি সে ধরে যেকোনো লোককে অনায়াসে
হাত থেকে তার নিস্তার নেই কারো
লোহার চিমটে, ধারাল কুড়ুল, বিকট দা
শক্ত হাতে চালায় সে সবগুলো যখন যাকেই
সে পেয়ে যায় হাতের নাগালে, আসলে তাকে নাকি
স্থাথাও যায় না। কখন সে কোন পথের মোড়ে হুট ক'রে
শিকারের খোঁজে এসে পড়ে জানাও যায় না শত চেষ্টাতে

ধুকপুকুনি বুকের ভিতরে সর্বদাই
চলতে ফিরতে ভয়ে থাকি কাঠ হয়ে, গলা শুকোয় ঘনঘন
সন্দেহ করি রাস্তায় যেখানে যতো মোড় ছোট কিংবা বড়ো
এখনো রয়েছে বেমালুম টিকে চোখের সামনে
ইতিমধ্যে ধরেছে আমাকে সন্দেহ বাতিকে ভালো করেই

কোন মোড়ে আমি পড়বো ধরা কবে কোথায়
জানিনে তার হদিশ খবর
মোড়গুলো আমি উড়িয়ে দেবো যেখানেই দেখি
তাজা বোমা আর ডিনামাইট দিয়ে
শিকারীর হাতে দেবো না ধরা কিছুতেই আমি

যন্ত্রণাকর মৃত্যু আমার পোষাবে না, ভেবে দেখেছি অনেক

তার মানে ওই ঝোপঝাড় যতো অ্যামবুশের
আমার পথের ঝোপঝাড়গুলো ওড়াবো আমি
তাজা বোমা আর ডিনামাইট দিয়ে, দেবো না ধরা
অতোটা সহজে। সৈনিক সেজে সদাপ্রস্তুত রয়েছি আজ

খচমচিয়ে আমাকে কেউ একদিন কোনো পথের মোড়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে খাবে দু'পয়সার ওই চিনে বাদামের মতো
এবং তারপরেই আমার শেষ, আর কিছু নেই আমার জন্যে
এই এতো বড়ো পৃথিবীটার কোনোখানে
কেমন ক'রে মানবো বলো এমন একটা হৃদয়হীন বাজে ব্যাপার
দু'টি পাজী দাঁড়কাক হা হা ক'রে বলে গেলো
আমার হাতে বোমাবাজি আর ডিনামাইটের কাজ হচ্ছে ভালোই
তবু এ যুদ্ধে জিতবার উপায় নেই। বন্দুকহাতে কাকদু'টোর দিকে
ছুটে গিয়েছিলাম খুব রেগেমেগে তৎক্ষণাৎ

বৃথাই। কখন তারা উড়ে চলে গেছে নাগালের বাইরে।

আদায় ক'রে নেবো

কাদা কিংবা জঞ্জাল এসব আমি
একদম খাবো না, ছোঁব না

এসব খেয়ে কি আর মানুষ বাঁচে নাকি
নাকি বাঁচা সম্ভব ?

আমাকে এই অসম্ভব দারিদ্বটা দিয়ো না
আমাকে দিয়ে একাজ হবে না, আমি চাই
তুমি, তোমরা বরং তোমাদের কুমতলব ছাড়ো

না ছাড়লেও আমি হাতটা বাড়াবো অন্তত দুইবেলা
টৈটম্বুর খাবার থালাটির দিকে
এবং একটি থালা আমি দখলে রাখবো
নিয়মিত আমার জন্যে চিরদিন
মানুষের যোগ্য খাবার আমি এই পৃথিবী থেকে
আদায় ক'রে নেবো। তোমাদের বুজরুকি
উপদেশ, গোঁয়ার্তুমি আমার পথ আটকাবে
সে আমি ভাবতেই পারিনে, মানিনে।

মানবজন্ম আমারো। সেকথা যখন জানা আছে তোমাদের
তাহলে তো আমিও এক রাজপুত্তুর
এই পৃথিবীর
কবে কোন রাজপুত্তুর খেয়েছে কাদা জঞ্জাল ইত্যাদি এসব
আমি এক রাজপুত্তুর বা মানবসন্তানের যোগ্য সম্মান চাই
না দিতে চাইলে আদায় ক'রে নেবো জানিয়ে দিচ্ছি

ভালো ক'রে খাবার সাজিয়ে টেবিলটা লাগাও।

তটস্থ মানুষ এই ছোট দেশে

কি আশ্চর্য সব সরীসৃপ আর কি আশ্চর্য তাদের গায়ের রঙ
কতো উজ্জ্বল, কতো বাহারি কতো রকমারি
তাই দেখে দেখে আমাদের অনেকেরই দিনকাল, সময় তো
প্রায় কেটে গ্যালো ! কে ভেবেছে এমন একটা জীবন, পুরো জীবন
গড়িয়ে যাবে আয়ুর প্রশস্ত সড়ক ধরে শেষ অবদি এতোই করুণ।

জানা হয়ে গ্যাছে ভালো কৌশল ইতিমধ্যে আমাদের।

দেখেছি, সাপ কি গোসাপ কি গিরগিটির তলপেটগুলো খুব অট্টহাসিময়
ইগুয়ানার মতোই বেশ মসৃণ, নরম আর সে তল্লাট জুড়ে অনির্বাণ
সারাক্ষণই খেলা করে ভারী মৃদু, মায়াবী আলোর মতো শিশু
যার কোনো তুলনাই
পাওয়া ভার বিশাল এ পৃথিবীতে কোনোখানে হাজারবার খুঁজলেও। লেজের
দাপটে মরে লতাগুল্মতৃণ ছাড়াও সংখ্যাতীত ছোট বড়ো প্রাণী।
বেজায় শক্ত মাথাগুলো, বেজায় পুরু হাড়ের টুকরো দিব্যি পরিপাটি
কঠিন বা নরম চামড়ার নীচে জাগিয়ে রাখে বিপুল এক সংঘশক্তি।
চোখে ছোটে কেবলি আগুন, কারো চোখে
বকুল বনের শান্ত, শীতল, মিষ্টি ছায়া দিনশেষের।

কারো কারো জিবটা কাটা মাঝ বরাবর হিশেব ক'রে দুই জিব, সকলকে
তারা প্রায় সকলেই কারণে অকারণে চতুর্দিকে থুথুর মতোই কিছু একটা
ছিটিয়ে যায় অভ্যাসবশত অতি বিটকেল, তরল, যখন তখন
কারো কারো জিব আমাদেরি মতো অখণ্ডের চওড়া নিদর্শন, যেন
সবাই রটিয়ে বেড়ায় ভালোমন্দ বনজঙ্গলের খবরগুলো চতুর্দিকে, দেশে দেশে

আমরাও শিখে নিয়েছি কি ক'রে সুড়সুড়ি দিতে হয়, ঠিক কোন সময়
সরীসৃপগুলোর তলপেটে, কি ক'রে হাসালে ওরা মজা পায় অনেকক্ষণ ধরে
কাতুকুতু দিতে হয় কি ক'রে ওদের ওসব পিচ্ছিল বা কর্কশ শরীরের
খন্দ ও খোড়লে
এতোদিনে জেনে গেছি কখন ওরা ভাব করে মানুষের সাথে
আর কখন লেজ মাড়ালেও কামড়ে দ্যায় না একবারও
এতোদিনে জেনে গেছি কখন ওরা ঘুমিয়ে পড়ে শুদ্ধাচারী
সাধুসন্তদের মতো, আর কখন ঘুমের ভান ক'রে সদাসতর্ক

জেগে থাকে দিনরাত এবং খামোখাই জেগে ওঠার নাম ক'রে
অনর্থক চোখ কচলায় গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে অকস্মাৎ

এতোদিনে জেনে গেছি এদের ভেতরে কেউ কেউ নেহাত মনের জোরে বারবার
তলপেটে ঢেউ খেলিয়ে দ্যায় আর এভাবেই চলাফেরা করে মন্থর
বা বিদ্যুৎগতি। ঘাসের ওপর ফেলে যায় একআধটু দাগ। মাটি
ছুঁয়ে পড়ে থাকে এক আধটু সংকেতচিহ্ন, এদের সকল
যাওয়া আসার পথের ওপর দুর্বোধ্য সব নক্সার মতো।
এতোদিনে দেখেশুনে, নিশ্চয় পাঠক, আমরা তো এতোকিছু জেনে গেছি আজ

এতোদিনে, বলা চলে আমরা এখন চিনি নানান জাতের সরীসৃপ
জানি তাদের অভ্যেসগুলো, এমন কি যারা ছদ্মবেশী কিংবা লুকোচুরি
খেলায় নিপুণ তাদের মেজাজমর্জি, মনের খবর, হাঁড়ির খবর সব
আমরাও বেঁচে আছি সেই কবে থেকে ভয়ংকর কতকগুলো সরীসৃপের
পড়শী হিসেবে, ভীষণ রকম বিপদগ্রস্ত, তটস্থ মানুষ এই ছোট দেশে
আমাদেরি মতো আছে আরো অনেকেই শুনি নানা মহাদেশে। আশ্চর্য,
কি আশ্চর্য আমরা কখন চলে গেছি সরীসৃপ জগতের অভ্যন্তরে ; মনে হয়
আমরা বুঝি বেশ মানানসই অমনি এক জায়গায়। এদিকে আমাদের যতো
বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে একে একে, পাখিরা জানাচ্ছে বিদায়, চাঁদ থেকে ঝরছে
কেবলি বিষাদ। বুকে খুব ব্যথা নিয়ে আমরা ঘুমোচ্ছি রোজ, রাতে অসহায়।

ইচ্ছে হলে শোনো

আজকে আর হোলো না, বুঝেছি
কাজেই আস্তে ক'রে একসময় উঠে এসেছি
কোনো কথা. কোনো প্রশ্ন মোটেও তুলি নি
রাগারাগি কিংবা শোরগোল করি নি
স্রেফ উঠে গিয়ে ঘরমুখো একটা বাসে
গাদাগাদির ভেতর
কোনোরকমে একটুখানিক ঠাঁই ক'রে নিয়ে ভদ্রইতর
লোকজন, দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ওদিন বিকেল বেলায়
দীর্ঘ পথটুকু অনায়াসে পাড়ি দিয়েছিলাম।
কোনো অলৌকিক খেলায়

মন দিই নি, দেখি নি চোখ বুঁজে কোনো প্রকার ক্ষুদ্রবৃহৎ
সৎ কিংবা অসৎ
কোনোকিছু, কোনো স্বপ্ন, দিবা স্বপ্ন, মনে আছে
শুভ কিংবা অশুভ নিয়ে একবারও ভাবি নি
পিচ্ছিল মাথা, পিচ্ছিল শরীর ছোটবড়ো গাছে
যখন সোনালী রোদ, গম্ভীর ছায়া ওদিন বিকেলে
বারবার পড়ছিলো এসে একেবারে আহ্লাদী হেলেদুলে

মনটা তো ছিলো ওই যাকে বলে ভালা বন্ধ করা বাক্সের মতো
ভেতরটায় ঠাসা গুমোট, ভীষণ অনিচ্ছা, অন্ধকার
তাও আবার
কি কারণে বেজায় উটকো, অনর্থক বেজায় উদ্ধত

না হলেই বুঝি অনেক সময় ধরে এমনি করেই বুকে বাজে।

আমরা সবাই অভ্যস্ত মানুষ কাজে ও অকাজে
ঘরফেরার কালে কোনো কোনোদিন নিজেরাই হয়ে উঠি
নিজেদের কাজে দিব্যি ভারী রহস্যময়, সবার অগোচরে ফুটি
বাসের ভীড়ে, ঠেলাঠেলির মধ্যেও, অবিকল একটি
ফুলের মতো, বেশ বড়ো, জলজলে রঙ। ধরনটি
কিংবা জাতগোত্র তার যাই হোক, অবিকল একটি ফুল
পাপড়ি পাতায় নিখুঁত, বোঁটায় বাঁধুনিটাও চমৎকার, নির্ভুল

হইচই ওঠে বাড়ির ভেতর ফুলটাকে
যখনি বসাতে যাই ফুলদানিতে
সবাই বলে ভীষণ জংলী আর বিষাক্ত এই ফুল গ্রীষ্মে শীতে
কোনো সময়ে, কোনো ঋতুতে ঘরে রাখা মানা
হয়তো তাই, কথাটা নয় কোনোক্রমেই আমার অজানা
সবাই দেখিয়ে ছায় একসঙ্গে বাতিল কাগজের ঝুড়িটাকে
ফুলের এই সদ্গতির কথা বলবো আমি যাকে তাকে

মাথার দিব্যি দেয় নি কেউ, লিখিয়ে নেয় নি কেউ
দাসখত কোনো
ইচ্ছে না হলে, ভালো না লাগলে শুনো না ভাই
যার ইচ্ছে, শোনো।

রোজ তোমাকে বেরুতে হয়

জানোই তো রোজ তোমাকে বেরুতে হয় বাড়ির বাইরে
পথঘাট সব খেয়াল করবে ভালো ক'রে, বুঝলে ?
এতোদিনে নিশ্চয়ই শুনেছো প্রায় সব পথেই
ইবলিস নামক হারামজাদা একটা না একটা
প্যাঁচ মেরে রেখে দিয়েছে কোথাও, কঠিন একটা প্যাঁচ

অসাবধান হলেই কিন্তু যাবে সোজা জাহান্নামে
পারবে না কেউ তোমাকে বাঁচাতে, পারবে না
কেউ। পারবে না বাঁচাতে, পাবে না কারুকে হাত ধরবার
ইবলিশ মানে শয়তান প্যাঁচগুলো শিখেছে মোক্ষম
বস্তুত বিজ্ঞজনের মতে ঘুঘুৎসু প্যাঁচ
ঘুঘুৎসু ফুঘুৎসু কিছু নয়, আসল হচ্ছে
ওই শয়তানের প্যাঁচগুলোই।
আটকা পড়লে আর রক্ষে নেই

এতোদিন ধরে রয়েছো এদেশে
এখানে সেখানে কতো জায়গায় কতো কিছু দেখেছো
এখানে সেখানে কতো জায়গায় কতো কিছু শুনেছো
এখানে সেখানে কতো জায়গায় কতো কিছু জেনেছো
আশা রাখি আমার কথাও বুঝতে পারবে, আমি তেমন ভরসা রাখি

উপদেশ নয়, উপদেশ আমার সয় না ধাতে
খুবই জরুরী কথা, তুমি আমাদের ছেলে কিংবা মেয়ে
তাই এতো ক'রে বলা, অন্তত একবার প্রতিদিন।

সবখানেই সম্ভব

পৃথিবীতে কোথায় কি হয়ে গ্যাছে কে জানে
রাতের স্বপ্নগুলো আজকাল ভারী বিদঘুটে।

শোনো, দেখি নি একলা একদিন
দাঁড়িয়ে আছি পথের ধারে
কি ভেবে কে জানে ভারী চুপচাপ

আমাকে ভেতরে পুরে দিয়ে
খুব তাড়াহুড়ো ক'রে একটা দেওয়াল
হাতে হাতে তুলে ফেলো কোথাকার লোকজন
ইট, সিমেন্ট সুরকিতে এক নিমেষে দেওয়াল
গড়া হোলো আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে
মনে পড়ে হাতে আমার বই ছিলো, বাঁ-হাতে
ডান হাতে ছিলো একগুচ্ছ রক্তিম গোলাপ
সবসুদ্ধ আমাকে দেওয়ালে গেঁথে রেখে
হাত পা ধুয়েমুছে লোকজন সব চলে গ্যালো
আনন্দে উদ্বেল কোনো এক দিকে
দরাজ গলায় তারা বেশ গান ধরলো যাবার সময়
তারা গ্যালো গান গাইতে গাইতে

ভারী খাপছাড়া এক স্বপ্ন। তাইতো।
এমনি অনেক স্বপ্নের কথা আমি আজকাল
শোনাতে পারি যদি থাকে অতোখানি ধৈর্য কারো

রাক্ষস খোক্কসতুল্য স্বপ্ন এমনি ক'রে যদি
মানুষজন চিবিয়ে খায় যখন তখন তাহলে তো
দালানকোঠা, রাজপথ, দেওয়াল কোনো কিছুতেই
আস্থা রাখা অসম্ভব, মনে হবে সবকিছুই
সন্দেহজনক ব্যাপার, মনে হবে সবখানেই এখন
জ্যান্ত মানুষ পুঁতে রাখা সম্ভব, সবখানেই সম্ভব।

ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায়

ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায়
আমি কি আর সমুদ্র দেখি নি।
দেখি নি ভেবেছো কাঁটাঝোপের মতো ছোট ছোট গাছ
ভীষণ দীর্ঘ লতা, গুল্ম কিংবা জলজ ঘাস

আঁকাবাঁকা জটিল পথ, পাথুরে পাহাড় টিলা
উষ্ণ ঠাণ্ডা স্রোতের ভেতরে খেলার মত্ত
ঝাঁক বাঁধা মাছ বা মাছের ছড়াছড়ি।
আমিও এক সমুদ্র দেখেছি
ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায় কোনো না কোনো সময়

বাড়ির যতো পোশাক, শাড়ি, জামা
শার্ট, প্যাণ্টলুন, সোয়েটার, টাই, মোজা
দেখেছি ওসব কি ক'রে হঠাৎ কোনো কোনো দিন
চমৎকার মাছ হয়ে ছোটাছুটি করে
সবকিছু মিলেমিশে জমজমাট জলজ এক উপনিবেশ।
দেখেছি আমি ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায়

কয়েকটি শার্ট তো রীতিমতো ধ্যান মগ্ন হয়ে
অচেতন ঘুরে বেড়ায় দেখেছি গভীর তন্দ্রায় ভেজা
মোজাগুলো ধাঁই মেরে ছোট খাটো পাখনা নেড়ে
রঙ ছিটিয়ে খুব একচোট ওপর নীচ করে ব্রাউজগুলো
নিমজ্জিত শ্বেতপাথরের পাহাড়টার পাদদেশে
টাইগুলো ডোরাকাটা বানমাছের মতোই ঘুরে বেড়ায়
মাটি আর কাদা ছুঁয়ে কখনো বেশ ক্ষিপ্রগতি
সমুদ্রতলের এক বিশাল জগত আমি ঠিক তোমার মতোই
দেখেছি এই ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায় কোনো না কোনো সময়

সমুদ্রপারের কর্কশ হাওয়ায়, রোদে
দড়িতে ঝোলানো সারি সারি মৃত মাছ
যাচ্ছে কেমন দুমড়ে মুচড়ে, কুঁচকিয়ে তাও দেখেছি
ওয়ার্ডরোবের ভেতরটায় কোনো না কোনো সময়
সমুদ্রের তলদেশ আর সমুদ্রের পার
ওয়ার্ডরোবের ভেতরে এসে খেলা জমিয়ে তোলে
কখনো কেবলি জীবনের, কখনো কেবলি মৃত্যুর
পার্লামেণ্ট নিয়ে যে যাই বলুক এই খবরটাও
কম জরুরী নয় কোনো কোনো সম্পাদকের কাছে
না হলে কি আর ওয়ার্ডরোবের কথা ছাপা হোতো
কোনোদিন খবরের কাগজের অতোখানি জায়গা জুড়ে !

বেশ কিছু ছায়া

তরতর ক'রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যে লোক
উপরে উঠছিলো তাকে আমি
মাঝপথে থমকে দাঁড়াতে দেখেছি
কতোশতো দিন নানা জায়গাতে
কিছুক্ষণ পর, একটু পরেই আবার তাকেই
দেখেছি নেমে আসতে নীচের দিকে
আস্তে ধ'রে, মন্থর পায়ে আর তার মুখের ওপর
নানা কূট খেলার ব্যস্ত আঁধার এবং আলো
দেখেছি এমন লোক এতোদিনে অনেক, অনেক

জানিনে অমন ক'রে সিঁড়ির মাঝপথে
কে তাদের আটকেছিলো
জানিনে কে তাদের নামিয়ে আনলো
জানিনে ওসব আলো এসেছিলো
কোন দূর নক্ষত্র থেকে
জানিনে ওসব আঁধার আগে, এতোদিন
কোনদেশে টিকে ছিলো
অনুমানে বলা চলে কতোকিছু সরস রঙিন

সিঁড়ির মাঝখানে ওই চমকে ওঠা, থমকে থাকা
লোকগুলোকে মনে পড়ে প্রায়ই আমার
ক্লান্ত গায়ে তাদের সেই নেমে আসা নীচের দিকে
তাদের উচ্ছলতা আর অহংকার
কিভাবে যে হঠাৎ কেউ কেড়ে নিয়েছিলো ওসব আমার মনে পড়ে
এভাবেই আমার ভেতর বেশ কিছু ছায়া এসে জমা হয়ে আছে
কখনো কখনো তারা নড়াচড়া করে
অস্থিরতা নিয়ে আমি এ জানলা থেকে ও জানলায়
ছুটে যাই বার বার।

হাড়ভাঙা, পাঁজরভাঙা দিনরাত
বর্তমানে সঙ্গী যাদের
ছিলো তাদেরও বিশাল কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশাল স্বপ্ন

অস্থির হয়ে তাকাই এদিকে ওদিকে
মানুষ, কেবলি ওই ভাঙাচোরা দেশলাইয়ের কাঠির মতো
তারাই তো চোখে পড়ে বার বার।

অন্ধকারের জয়

অন্ধকার যখন অস্থির
ঠিক তখন কাছাকাছি
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কানামাছি খেলাপ্রিয় এক তরুণ
হাতের নিশানা পরীক্ষা করছিলো খুব তন্ময় হয়ে

ক্রোধ কি আক্রোশ তাকে দিয়েছিলো অনুপম
আর ঘনকৃষ্ণ, গভীর অন্ধকার
সেই অন্ধকার, যার খোঁজ মেলে না কোনোরকম
মানচিত্রেই এবং যেখানটায় দাঁড়ালে আর
যায় না কোনোকিছুই
অল্পদূরে এমনকি ওই দু'হাত দূরেও

একটুখানি শব্দ লক্ষ্য ক'রে, বুঝি কারো পায়ের শব্দ
সে তার শাণিত, লিকলিকে ছোরাটিকে
ছুঁড়ে দিলো এক রাতে সুতীব্র উল্লাসে

অস্ফুট একটুখানিক আর্তনাদ, পতনের ভোঁতা আওয়াজ
তাও একটুখানিক, জীবন সংক্ষিপ্ত। এলোপাতাড়ি শব্দ
হাঁকডাক, অনেক লোক আর নিমিষে এক জমজমাট কাণ্ড
গলির ভেতরটায়। শেষে অ্যাম্বুলেন্স, লাল আলোর অস্থির
সংকেত, হর্ন, হাসপাতাল

আমূল বিঁধেছে ছোরাটি তার পিতার বুকেই
সে কথাটি তার জানা নেই, আজো জানা নেই, জানে না সে
যদিও বেজায় চটপটে সে তরুণ এ শহরে অনেকের চেয়ে
কি অব্যর্থ হাত

তার কথা আজও সে জানে না, জানে না সে বালক
অবশ্যই সে জানে নিজের বয়স, তরুণ সে
এবং ওই তারুণ্যের গমগমে অহংকারে
সে পারে এমন অনেক কাজ, দুরূহ কাজ
সে পারে আজ অনায়াসে। মন টলে না একবারও
হাত কাঁপে না এতোটুকু দ্বিধায় কিংবা সংশয়ে
দিনরাত্রি অচেনা পথিক হেঁটে যায় নিয়মমাফিক
জানে কোথায় কোন তরুণ হারায় তার কোমলতা
জানে কখন নৃশংসতা কোলে তুলে নেয় তাকে আদর ক'রে
কুহক ডাকে মায়াবী কতো ইশারায় কতোশতো তরুণকে

আস্তে ধীরে রোজই কিছু রক্তক্ষরণ বুকের ওপর
ভিজিয়ে দিচ্ছে শার্ট তার প্রায় বৃদ্ধ জনকের
কিছুদিন থেকেই তিনি
মৃত্যুপথযাত্রী হাসপাতালের এক নোংরা বেডে
একটু একটু ক'রে রোজই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন
অনিবার্য অন্ধকারের দিকে
আরেক অন্ধকার ঘনাচ্ছে তার চোখের ওপর
নিথর, নিষ্কম্প, অন্তহীন
বড়ো অনিশ্চিত মৃত্যুর আঁধার, বড়ো কালো
ইতিমধ্যে তিনি বুঝে নিয়েছেন ব্যথায় কাতর

দিনে দিনে বড়ো হচ্ছে বুকের ক্ষত
রক্তশূন্যতায় আচ্ছন্ন তার দশদিক, ঘোলাটে ওই হাজার দিগন্ত
রক্তভেজা শার্ট তার
মুছে দিয়েছে চন্দ্রসূর্য পৃথিবী সব একে একে
হেমন্তের সরল বিশ্বাসে তিনি প্রস্তুত। জানেন নিরাময়
বৃথা তর্ক – ওষুধে, কাঁচিতে, ছুরিতে।
অভিযোগ করেন নি কারো কাছে কোনোদিন একবারও।
অমুচ্চ, চাপাস্বরে রোজ কথাবার্তা হয় তার শয্যার চারপাশে
আর এভাবেই তিনি জেনেছেন কোনো এক তরুণ
নিজের হাতের নিশানাটা বাজিয়ে গ্যাথার লোভে
লিকলিকে একটি ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলো তার কলজের মাঝখানে
হঠাৎ একসময় রাতের অন্ধকারে

নিশপিশ করছিলো তার হাত ভীষণ রকম, বুকের ভেতরে
ছিলো না কোনো ঝড়ের দাপাদাপি। উৎকণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন
এক তরুণ নিজেরও অজান্তে সেই থেকে পিতৃঘাতী

ঘাতকের পরিচয়টুকু না জেনেই এক পিতার বিদায় দৃশ্য
অন্ধকারের জয় ঘোষণা ক'রে সময় এখন পিছলে পড়ছে
দিন থেকে রাতে, রাত থেকে দিনে।

বইয়ের মতোই ওই তো

ভূত পিশাচের কানাকানি
তার তো কোনো শেষ নেই
আশেপাশে বাতাসও থাকে খুব ভারী হয়ে
মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যায়
ভরা যায় ঝুলিতে, থলিতে
এমনি এক বাতাস কেটে খুব মন্থরা
চলাফেরা করতে হয় যাদের প্রতিদিন
তাদের যা প্রয়োজন যেমন তার জীবনের জন্যে
জীবনধারণের জন্যে কিংবা ওই যাকে বলে
এক আধটু শখ নাড়িয়ে চাড়িয়ে স্বাধার জন্যে
যেন নির্জনতার একটুখানিক ভরসা থাকে
সময়মতো হাতের কাছে
তাদের কতো কি যে নানান অসুবিধে এখন এদেশে।
তালিকা বানিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে অনেকেই
বেশ দীর্ঘ একটি তালিকা

তালিকাটি আমিও পড়েছি অনেকটা সময় খরচ ক'রে
কেন না সবার মতোই অসুবিধে হচ্ছে আজকাল আমারও

ভূতগুলোর মতোই আমাদের বাঁচামরা, সত্যি তাই
এই যেমন বইয়ের ব্যাপারটাই ধরা যাক :
বইপত্তর যা চাই প্রায়শ তার স্বাধা পাইনে
প্রশ্নের উত্তর দিতেও নারাজ দোকানীরা
পাঠাগারের কর্তা ব্যস্ত জোর আড্ডায় এবং শস্তা

মহিলাদের ব্যাপারে উৎসাহী এতই বেশী যে
হতাশা বাড়ে পাঠকদের, তাছাড়া তার সংগ্রহশালায়
ইঁদুর আরশোলার দৌরাত্ম্য ভক্তদের দৌরাত্ম্য
সব মিলিয়ে কথাটা দাঁড়ায় : বই নেই, পত্রিকা নেই
যখনি যা আমার একান্ত দরকার। ওদিকে

আজ এ পাড়ায়, কাল ও পাড়ায় পাঠাগারগুলো
উঠে যাচ্ছে। জায়গা নিচ্ছে কখনো একটা গাঁজার দোকান
কখনো একটা আফিমের দোকান কখনো একটা পুলিশের ফাঁড়ি

অতঃপর পাঠ্যবস্তু
আসচে উপহার হয়ে কিংবা শাস্তির মতোই
বইয়ের মতোই ওইতো বাংলার পথঘাট আছে
গাছপালা, নদীনালা আছে
পশুপাখি, লতাগুল্ম, নারীপুরুষ আছে।

একটা বৃক্ষ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিখে নেবার কৌশল
জানা হয়ে গ্যাছে এর ভেতরে অনেকেরই
এবং এর একটা পদ্ধতি অনুসারে পাঠ করা চলে
চেনা অচেনা আমাদের সব রাস্তাঘাট, গ্রাম শহর
মানুষ, গাছপালা, আকাশ, পানি সবকিছু
এভাবেও মেটানো চলে পড়ার শখ
জীবন যাপন করা চলে বইপুস্তকের অভাব ঘটলে
আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে পড়লে
মানুষ কি আর অতো সহজেই হার মানে
বই না থাকলেও বেঁচেবর্তে থাকে মানুষের পড়ার অভ্যাসটি।

কোথায় এখন তিনি

শুনেছি বস্তুত একই কথা
শুনতে শুনতে, শুনতে শুনতে
কান ঝালাপালা
শুনেছি পেন্নাই সব সিংহ দরোজার কথা
শুনেছি বিরাট সব ফটকের কথা কতোদিন

ভেতরের খুঁটিনাটি গল্পোটা শুনি নি আগাগোড়া
তোমরা জানলে শুনিও আমাকে একদিন

মনে পড়ে কেউ একজন ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
বলছিলো খুব উত্তেজিত হয়ে
বলছিলো তার ভাগ্যের জোরে সেও একদিন
ভেতরে কোথাও দেখেছিলো এক রমণীকে যার
মাথার ওপর, ঠিক মাথার ওপরটায় বেশ বড়ো
এক রঙধনু ফুটেছিলো আর কালো এলোচুলে
জোয়ারের মতোই কি সব যেন খেলা করছিলো
দু'রেকটি রঙিন মাছের লাফঝাঁপ দেখেছিলো সেও।
তার মতো আরো অনেকেই কতোকিছু কতোদিন
দেখেছে নিশ্চিত। অত্যাশ্চর্য কতোকিছু নিয়মিত

প্রকাণ্ড ও বাড়িটায় ভেতরে প্রহরে প্রহরে প্রতিদিন
কি কি হয় তার কথা সব আমিও শুনবো
শোনাবে কি তোমরা কেউ ? হায় আপসোস
ভেবে পাইনে পথে হাঁটা ওই লোকটি, সেই ভদ্রলোক
কোথায় উধাও হলেন একেবারে

আততায়ীর হাতে নিহত এক ভদ্রলোকের
রক্তশূন্য করতলে আমি একদিন দেখেছিলাম
প্রকাণ্ড সূর্যটাকে। নিখুঁত, সুগোল, লাল
তিনিই তো বলেছিলেন গাঢ় স্বরে

এক কিশোরীর বুকে জলজলে দু'টি চাঁদ
লুকিয়েছিলো। তার শাড়ীর নীচেই, সে আমি দেখেছি
দেখি নি সে কিশোরীকে কোনোদিন আর কোনোখানে
সেও বুঝি গিয়েছিলো ও বাড়ির ভেতরে কোথাও
কিংবা ছিলো ও বাড়িরই ভীষণ লক্ষ্মী এক মেয়ে
তিনিই তো বলেছিলেন মনে পড়ে
কোথায় এখন তিনি, তিনি গেলেন কোথায় !

কি বলো ভাই তারি ইচ্ছে

কষ্ট ক'রে আর বলতে হবে না তোমাদের, বুঝেছি
ও আমি বুঝে নিয়েছি, মনে হয় বুঝে ফেলেছি

হৃদয় জুড়ে যখনি একটা দাঁত কিড়মিড় সিংহ মানে ভয়
দ্যাখা দিতেই পারে দিনে রাতে কোনো সময়, কিংবা
ছায়া, ঠাণ্ডা ছায়ার মতো কিছু একটা নাছোড়বান্দা
ছটফট করতে পারে হৃদয়ের ওপর, মানে সংশয়
কিছুতেই কিছু স্থির হয় না, মনে ধরে না মানে বিধা
আবার এমনও হতে পারে হৃদয় থেকে হঠাৎ ফুসমন্তর
ফিনকি দিয়ে ছুটলো রক্ত চার ধারে আর অমনি
আলোটালো সব নিভে যেতে থাকলো মানে দুঃখ, গভীর দুঃখ
রক্তের বদলে ওই হৃদয় থেকে উপচালো কেবলি দুধ মধু
অর্থাৎ তখন কেবলি আনন্দ, গান, কবিতা, নৃত্য, ভক্তি, সম্প্রীতি ইত্যাদি

ইচ্ছে হলে এইসব টুকরো জোড়া দিয়ে একটা পুরোপুরি কিছু
পাওয়া যায় হাতের নাগালে আবার তেমন সময় না থাকলে
কিংবা মর্জি না হলে আলাদা ক'রে টুকরোগুলোকে দ্যাখাও যায়।
প্রাণভরে দেখলেই হলো, ভালোবাসা থাকলেই হলো
এই তো কথাটা তোমাদের, সার কথা, মোদ্দাকথা ?

তোমাদের এবং আমাদের ঈশ্বর বিষয়ক সবকথা
ভেবে দেখো তো একবার, সবকথা আছে কি নেই ?

ঈশ্বর কোনো পাটনী নন সে আমি জেনেছি। পথিকের বেশে আমি
কতো জায়গায়, কতো দেশে আমার স্থাখা হয়েছে
মহামান্য ঈশ্বরের সঙ্গে। তার ক্লান্ত পায়ে মাথের শীতে
আমিও কি আর গরম সেঁক দিই নি ভেবেছো ? তৃষ্ণায় কাতর
তাকেও কি আমি ঠাণ্ডা জল আর দু'চারটে বাতাসা দিই নি ?
জগতের এতো বড়ো পোষ্যটাকে কি নামই না তোমরা
দিয়ে রেখেছো এতোকাল ধরে ! প্রশংসা করি মানুষের বুদ্ধির ও কল্পনার
নিজেকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই আর
ওই ভবঘুরেটাকে আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা আমি
বলেও দিয়েছি ইতিমধ্যে দু'চারবার। খোলাখুলি বলি নি। সেতো
হৃদয়ের সঙ্গী আমাদের সকলেরই কোনো না কোনো সময়, কাজেই

তার মাথায় ভাঙা চালানোর ইচ্ছে হয় না একেবারেই
অথচ এই পোস্টটাকে নিয়ে মাগ্যির দিনে বড়ো কষ্টে আছি
কারু ঘাড়ে গছিয়ে দিতেও মন নারাজ হয়তো বা লোকভয়, লোকলজ্জা
ঈশ্বরের নিঃসঙ্কুশ বিজয় ঠেকানোর উপায় নেই হে !
সে আমি বুঝেছি

ঈশ্বর চিনবো না ? আমি ঈশ্বর চিনেছি
খালি ভেবে দেখতে বলি তোমাদের অকর্মণ্য একটা
পোস্ট নিয়ে এই দুর্দিনে কি সুখেই আমি আছি !
সংসারসুদ্ধ নিজেরা খাই না খাই পোস্টটাকে খাইয়ে দাইয়ে
ঘুম পাড়িয়ে বিবি নাদুসনুদুস করেই রেখেছি, সে কি তোমরা
একটিবারও দেখতে পাও না কোনোক্রমেই ? কপাল আমার দিন ভিকিরির
সে তো ওই তারি ইচ্ছে, কি বলো ভাই, তারি ইচ্ছে।

তারি ইচ্ছে তিনি থাকবেন দিন ভিকিরির ঘাড়ে চেপে চিরদিন।

নেই আমার সংগ্রহশালায়

কখন কোনটা অসম্ভব হয়ে পড়ে সেকি আর হিশেবমাফিক
আগে থাকতে কিছু বোঝা যায়। আমার কেমন
একবার খুব লোভ হয়েছিলো, আর অনেক চেষ্টা করেও
পারি নি সে লোভটুকু সামলাতে কিছুতেই, মনে পড়ে

মনে পড়ে গুটি গুটি পায়ে একদিন বুকে ভীষণ রকম
নান বিদঘুটে শব্দের কোলাহল নিয়ে
গিয়েছিলাম মাইল দেড়েক দূরে এক বিকেল বেলায়
শুনেছিলাম সুখ্যাতি আগেই রকমারি অজস্র ফুলের
জমজমাটির কথা মুখে মুখে একটি প্রকাণ্ড বাগানের

গিয়েছিলাম মাইল দেড়েক দূরে সেই বাগানটি একবার
দ্যাখার লোভে একা একা। দেখেছিলাম দু'চোখ ভরে
অজস্র ফুল, তাদের গড়ন, তাদের রঙ, ঢঙ, নড়াচড়া
গুচ্ছের মৌমাছি চুপচাপ এ ফুলে সে ফুলে বসে নিশ্চুপ

আমি ঠিক উঠিয়ে নিচ্ছিলো মধুটুকু, হাতদু'টো পেছনে নিয়ে
গম্ভীর এক প্রৌঢ়, শাদামাটা এক মানবসন্তান যেন ধ্যানমগ্ন
হয়ে এ গাছ সে গাছ ক'রে এ ফুল সে ফুল দেখে একমনে
ঘুরছিলো। বাগানের গেটে দাঁড়িয়ে ওদব দেখে একসময় কখন
আমি ভুলে গিয়েছিলাম ফেরার কথা নিজের বাড়িতে। দেরিতে

বেশ কিছু দেরিতে ফিরেছিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে

দু'টি অপরাধ আমার বাবার চোখে দ্যাখ্যা দিয়েছিলো
ক্ষমার অযোগ্য বলে। বাড়ির সবাই দেখেছিলেন ক্রুদ্ধ
আমার পিতার হাতে একটি শক্ত ছড়ি কিভাবে আমার
পিঠের ওপর পড়ছিলো আর উঠছিলো বিদ্যুৎ বেগে
আমার আর্তনাদে রাত্রির প্রথম প্রহরটি ছিন্ন ভিন্ন হলো।
বাড়ির উঠোনে অসহায় সকলের চোখের সামনে ক্লান্ত
পিতা ভাঙা ছড়িটাকে ফেলে দিয়ে নিরুদ্বেগে ঘরের ভেতর
চলে গিয়েছিলেন ভারী ক্লান্ত আর অনেকখানি উদভ্রান্তের মতো

বাবার পায়ের ক্লান্ত শব্দ রয়ে গ্যাছে এখনো আমার কানে
উঠোন থেকে ঘর পর্যন্ত তাঁর পায়ের দাগগুলো আমার মনের
কোনো এক চিত্রশালায় আজো অম্লান রেমব্রান্ট কিংবা
শাগালের উজ্জ্বল কয়েকখানা ছবির মতোই, ঠিক তেমনি
বাড়ি ফেরার পথের ওপর আমার নিজের পায়ের দাগ, পদছাপ
নামধামহীন নিশিষ্ট চিত্রকরের কয়েকটি মূল্যবান ছবির মতো
আছে আমার চিত্রশালার সবচেয়ে ছোট কুঠুরির একটি দেয়ালে।

কিম্বদন্তীতুল্য ওই বাগানের কাছাকাছি শেষ কয়েকটি পদছাপ কি ক'রে
কোথায় হারিয়ে গ্যালো সে আমার জানা নেই : বাগানের
গেটের কাছেও পড়েছিলো দু'টি পদছাপ। ওই কয়েকটি, অল্প
কয়েকটি পদছাপ খুঁজে খুঁজে আমার দু'চোখ দিন দিন হারাচ্ছে
কেবলি দৃষ্টিশক্তি ওই পদছাপগুলো নেই আমার সংগ্রহশালায়
অথচ একদিন আমি সত্যি সত্যি গিয়েছিলাম বাগানটি দেখতে,
গিয়েছিলাম
বাবা দেখেছিলেন নিয়মশৃংখলার ত্রুটি আমি দেখেছিলাম
বাগান ও অসংখ্য ফুল।

এই দাঁড়ালো অবশেষে

আরে দূর ! দূর !
ভেবেছো কি ওসব কিছু
আমরা সবাই পেয়ে গেছি ?
পাই নি হে, পাই নি ।

পাই নি কোনো সুর
পাই নি কোনো কথা
পাই নি কোনো গান
হ্রস্বদীর্ঘ কোনো কথকতা

চেয়েছি সবাই মিলে
হাত কচলিয়ে করজোড়ে
চেয়েছি কতো ইনিয়ে বিনিয়ে
চেয়েছি জোর লাগিয়ে ধমক
ঝড় তুলেছি, খরা এনেছি
বানের জলে দেশটাকে
একনাগাড়ে বহুদিন ডুবিয়ে রেখেছি
মড়ক দিয়ে উজাড় করেছি শহরগ্রাম
আকাল দিয়ে বেঁধে রেখেছি সমগ্র জীবন
মরেছি খুব যখন তখন
এবং আমরা অনেক মেরেছি
তবু তো পাই নি ওসব কিছু আমরা এখনো

না সুর, না স্বর, না গান, না কথা, না গল্প

এক তরুণের দীর্ঘ চিঠি হাতের কাছে
কি ভেবে মর্মোদ্ধারও ক'রে নিয়েছি
এই দাঁড়ালো অবশেষে ।

তরুণ সে যেই হোক তার কষ্ট বোঝা যায় ।

লেখার বিষয়

কখনো তাকায় জানলা থেকে
বাইরের দিকে
কখনো দাঁড়ায় দুয়োর ধরে
একলা ঘরে
হাঁটে রাস্তা দিয়ে
বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে, পড়ায় কিছুক্ষণ
আপিসে বসে প্রায় সারাদিন

ক্ষতবিক্ষত, ক্ষতিগ্রস্ত এইতো আমি
এই হলো বর্তমান
এখন একালে

ঘুরে ফিরে বারবার দেখছি কেবলি ক্ষতস্থান
দেখছি আমার ক্ষতগুলো
টুকে রাখি বিশদ বৃত্তান্ত যতো ক্ষতির
পরিমাণ, আকার, আকৃতি এইসব
আত্মজীবনী ছাড়া লেখবার মতো
আর কিছু হয় না বলেও
কোথাও একটি বিরাট দুঃখ
রোদের মতোই জ্বলতে থাকে সত্তার গভীরে
স্থিরমান পড়ে থাকে সারাদেশ
অদূরে কোথাও
পড়ে থাকে চোখের আড়ালে
মুখ থুবড়ি নিয়ে নিসর্গ আর অসংখ্য মানুষ
বুঝি নড়েচড়ে ছায়ার মতোই প্রতিদিন লক্ষকোটি বার।

হায় চাঁদ তৃতীয়া কি চতুর্থীর

যে বাড়িটি সুন্দর, তিনতলা কি চারতলা
এবং চমৎকার একটি রাস্তার মোড়ে অবস্থিত
অর্থাৎ আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তার ওপর

দেখেছি ঝুলে আছে তৃতীয়া কি চতুর্থীর চাঁদ

এ দৃশ্য দেখে থাকবেন অনেকেই যাঁরা গতরাতে
প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়েছিলেন আমার মতোই
রাত সাড়ে ন'টার দিকে। আমি খুব হেসেছিলাম।

জানার ইচ্ছে অন্যেরা কে কি করেছিলেন
ওই কচি চাঁদ দেখে। মনে হয় তাঁরাও একচোট
হেসেছিলেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো
খানিকক্ষণ ধরে এবং শেষে একটা রিক্সায় চেপে
গিয়েছিলেন যে যার গন্তব্যস্থানে, বাড়িতে কিংবা
অন্যত্র বেজায় বেশী হাসতে হাসতে। হায় চাঁদ
তৃতীয়া কি চতুর্থীর চাঁদ তুই বড্ড হাসালি।

কলম্বোর বেল্টের সামনে পুরোহিতদল

এমন ছিলো যখন লোকে বলতো
ওই যে লোকটা কাঁটা ঝোপের মতো
কাজকর্ম ফেলে রোজ রোজ বয়ে আনে
কেবলি অন্ধকার এই দ্বীপটিতে তার কি কোনো মানে
কেউ কখনো খুঁজে পেয়েছে, নাকি তার মানে আছে
বিজ্ঞবিশারদ কি সাধারণ কারো কাছে

লোকের এ বিরক্তি জেনেও লোকটি রোজ ঘাড়ে ক'রে
মাথায় ক'রে, মুখে ক'রে ঘুরঘুটি অন্ধকার
সঙ্গে নিয়ে ফেরে

এখন কিন্তু সে আর একা নয়, জুটেছে আরো দু-চারজন
অন্ধকার নিয়ে তাদেরো যতোকিছু জটিল আয়োজন
একারণে দ্বীপটিতে আজ আর দুঃখের অভাব নেই
টর্চলাইট হাতে বাইরে থেকে আগের মতোই আসে অন্ত জন সেই

লোকটি কখনো একাকী, কখনো বা দলেবলে যায়
হাতে জরুরী কাজ দুঃখের একটি অভিধান লেখবার
বাইরের পণ্ডিত মশাই যায় ক'রে ছাড়ে, যায় ক'রে আনে অবশেষে
স্বদেশে ধিকৃত এই কয়জনকে অতিকষ্টে কায়ক্লেশে
নখদর্পণে যাদের কালকুটি অন্ধকার
তারা বলে আস্তেধীরে এই দুঃখ নামক ব্যাপারটি আসলে কি
কোথায় থাকে, তার আকার বিকার, ভেদাভেদ, প্রকার
দুঃখর এ অভিধান একদিন সত্যি সত্যি যেদিন বেরুবে
তখন কি বেকার হয়ে পড়বেন অন্ধকারের এই কজন পুরোহিত,
তাদের কাজ কি সত্যিই ফুরুবে
যে দ্বীপটি আজ দুঃখের এতোবড়ো মন্দির
সে পড়বে লুটিয়ে ধুলোয় গায়ে মাথায় ফেটে চৌচির
অন্ধকার ঘেঁটে যারা পুরোহিত একে একে তারা সবাই
দাঁড়াবে যেয়ে কনভেয়ার বেল্টের সামনে যেখানে অন্ধকার হচ্ছে জবাই

আজো বড়ো নাবালক

রাগ ক'রে বলি আর না। আর না।
তেমনি বলে দেশময়
অনেকেই
কেউ কেউ বলে সত্যি ভালো নয়
এ তো রাগ পুষতে নেই
এক কাঁড়ি উপদেশ, পয়সা ছাড়াই, মাগনা।

অনেক বড়ো গরগরানি বুকের কাছে
কেমন অটুট আজ অবদি টিকে আছে
বয়সা চাই, মনে হয় মাথা চাই

নিতে চাই প্রতিশোধ
তা না হলে কিছুতেই থামবে না এই ক্রোধ

ঘুনধারাবির ধারে কাছে আজতক
যাই নি কিন্তু একবারও
মাথাটাথা কাটি নি সত্যি কারও
তাও ক্রোধ বেঁচে আছে আজো বড়ো নাবালক

তীর্থের কাক

মায়ের জরায়ু ছেড়ে ভাষী অপরূপ
কেউ কেউ আসে তো বেরিয়ে
বড়ো বেশী পুণ্য লাগে
কিংবা ঘোর পাপ

উজ্জ্বল পবিত্র তীর্থ বৃহত্তমও বটে
যাকে বলি আমরা এই পৃথিবী অপার

তাই বলে এ কি দশা তোমার আমার
এ কি দশা বলো দেখি এতো মানুষের

রোদে জলে বারোমাস
আমরা শুধু বসে থাকি হতজ্যোতি তীর্থের কাক

কোথাও কোনো অঘটন ঘটেছে নিশ্চিত

অঘোর ধারায় মধ্যরাতে

একেবারে ভরাযৌবন আর তাছাড়া
ভদ্রমহিলা ছিলেন এই শহরের রূপসীদের
মধ্যেও একেবারে সেরা। তার মৃতদেহ
হঠাৎ চোখের সামনে, তিনি আজ যারা গ্যাছেন

কেউ যে কবিতা লিখবেন হৃদয় উজাড় ক'রে
তাতে কোনো ভুল নেই। যোগ্য কবিরাই সাধ্যমতো
একদিন দিগ্বিজয় করবেন জানা কথা
বস্তুত ইতিহাসে, প্রবাদে, পুরাণে আছে বিস্তর প্রমাণ।
কবিরা রূপসীদের দিয়ে গ্যাছে মান সম্মান বিস্তর সসম্ভ্রমে
কাব্যে গানে কথকতায়, অতএব এ নিয়ে ভুরু নাচিয়ে
কটাক্ষপাত সংগত নয়। সুন্দরীদের জয়জয়কার যদি সত্যিই
ঘোষণা করে তাদেরি ঠাণ্ডা মৃতদেহ আর কবির বিষয় হিশেবে
রূপসীর মৃতদেহ যদি পায় রাজ্যপাট, সিংহাসন কবিদের
হৃদয়ে কোথাও এদেশে সেদেশে নানা দেশে তবে তো আর
কথা থাকে না। সুন্দরীর মৃতদেহ পাবে ভালোবাসা কোনো না কোনো
যোগ্য কবির যেমন সুন্দরীগণ পেয়ে থাকেন জীবদ্দশায়
অজস্র তোয়াজ, আদর আর ভালোবাসা। সত্যি কথা
জীবিত কি মৃত সুন্দরীদের প্রেমিক সবাই কিন্তু কবি নন।

চেনা কোনো সুন্দরীর মৃত্যু হলেই বৃষ্টি নামে কবিদের
হাতের ইশারায়, বৃষ্টি হয়ে নামে তাদের হাত বেয়ে
একটি দু'টি বৃষ্টির কবিতা, নামে ঠিক
যেখানটাতে মাটি চৌচির নানা খরায় এবং ছোট বড়ো
নানা মরুভূমিতে অঝোর ধারায় মধ্যরাতে।

কারণ নেই

আমার অতোশতো ধৈর্য নেই
কোনোকালেই ছিলো না ও বস্তুটি

সেই আমাকেই শিখে নিতে হলো
বানান, ব্যাকরণ ও বুৎপত্তি

সেই আমাকেই ধারণ করতে হলো ধৈর্য
অসীম ধৈর্য তোমার কারণে জানি আর
তুমি তার একদম কিছুই জানো না

কানে তুলো
পিঠে কুলো
চোখে ঠুলি
দুর্ভেদ্য একটা মুখোশ
এলে গ্যালো সব চারদিকে ভেঙেচুরে
সব রপ্ত হয়েছিলো তোমার কারণে আস্তে ধীরে
কষ্ট হয়েছিলো প্রচুর, সময় লেগেছিলো

মেনে উঠে তুমি দূরে কোথাও দূর দেশে
শেষ পর্যন্ত যখন চলেই গেলে নির্বাসনে
তখন সুযোগ এলো অনেকদিন পর
কান্নাকাটি ক'রে একাকার করবার
আজ আর কারণ নেই
আগের মতোই আমি আবার।
আমার অতোশতো ধৈর্য নেই আর এখন
কারণ নেই কান্নাগুলো চেপে রাখবার। কারণ নেই।

তারাটির নাম হেমা

বুকে আমার সাহস ছিলো
ভালোবাসা ছিলো।

এভাবে একটা টান
ওভাবে একটা টান
মাঝ বরাবর আরও একটি
সাধ্য ছিলো না করি আর কিছু

কাগজের মাঝখানে একটি তারা
এসে থামলো
ঠিক আমার হাতটি বেয়ে।
একটি তারা আমি বসিয়ে দিলাম
কাগজের মাঝখানে

একটু হেসে তাকাতেই বেখি
জ্যোতিটুকু লেগে আছে সারা গায়ে
এমনটি হয়েছে গতকাল, মনে পড়ে

এক বাবা আর এক মা এসে
ভেবেচিন্তে একটি নাম, ছোট্ট একটি নাম
দিয়েছিলো তারাটিকে
আর তখন থেকেই হেমা। হেমা
নামে চিনি সবাই তারাটিকে

তারাটির নাম হেমা।

নীনা বা অমৃতা

আবুল বাশার

দেখতে নীনা ঠিক একই রকম। চোখ নাক থুতনি ঠোঁট সব ঠিক একই রকম। কানের দুলটা অবধি। খুব ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম, নীনা ঠিক একই রকম ছিল। মাথার চুল পর্যন্ত এক। ঘন কালো আর খুব ঘনিল লম্বা গোছায় বিস্তৃত। মুখের ডৌল যাকে বলে, চোখের ঠাণ্ডা চাউনির ভঙ্গি, গ্রীবার মুদ্রা সব একাকার। কোনো ভুল নেই, নীনারই দেহ, নীনারই সব, তবু নীনা নয়।

দেখতে দেখতে আমি যে বিভোর হয়ে গেছি, মেয়েটি তা বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে কোলের ওপর ফেলে রাখা হাতের নখ খুঁটতে লাগল। নীনা লজ্জা পেলে ঐ ধারা নখ খুঁটত। আবার মেয়েটা তল চোখে চেয়ে দেখল আমাকে। গালে লজ্জার আভা লাল হয়ে উঠল। ঠিক সেই রকম। খানিক বাদে মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর টানা লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে চলে গেল।

নীনা ছিল সঞ্জয় মিস্ত্রীর মেয়ে। রাজমিস্ত্রী সঞ্জয় শিমুলতলায় আমাদের পাড়ার একটি টালির খোপরায় মেয়ে বউ নিয়ে সংসার করত। সঞ্জয়ের নীনা ছাড়া আর কোনো সন্ততি সন্তান ছিল না। বউ ছাড়া আর কোনো আত্মীয় ছিল না। প্রতিবেশির সাথে তার প্রীতির সম্পর্ক মধুর ছিল। সঞ্জয় ছিল ভালো লোক। সঞ্জয় খুব মিষ্টি মানুষ ছিল। মিতক প্রকৃতি ছিল তার। সে কখনো বিবাদ বিসম্বাদ ভালোবাসত না। নীনা অল্প কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। নীনা ছিল সুন্দরী আর খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু নীনা কখনো সাঁতার শেখে নি। জলে নামতে নীনা খুব ভয় করত। সাঁতার না শিখে মানুষ কী ক'রে বেঁচে থাকে আমরা বুঝতাম না। নীনাকে আমরা ঠাট্টা করতাম, ধিক্কার দিতাম. নদীর দেশের ছেলে আমরা, খুব সাহসী। জলের সাথে আমাদের খুব বন্ধুত্ব। নদীর সখ্য আমাদের গর্বের বিষয়। আমরা সাঁতার দিয়ে নদী পারাপার করতাম। ঢেউ-এর মাথায় দুলতাম। জলের তলায় নাড়া দিয়ে ডুব দিয়ে চলে যেতাম কতদূর। তীরে দাঁড়িয়ে নীনা এইসব দেখত। নীনার কি আর জলে নামতে, ঢেউ-এর মাথায় দুলতে সাধ হতো না? তার নিশ্চয় খুবই ইচ্ছে হতো। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাঁতারু ছিল নবীন। এত দুরন্ত ছেলে হয়

না। রাতদিন জলেই পড়ে থাকত। বাড়ি ফিরতে তার কোনো ইচ্ছেই হতো না। জলের প্রতি তার ছিল গোপন আসক্তি। নদী ছিল তার প্রাণ। সাঁতার প্রতিযোগিতায় ক্লাবের সবাইকে সে হারিয়ে দিত। কেউ ওকে কখনো সাঁতারে পরাস্ত করেছে বলে শুনি নি। নীনা এই নবীনকে ভালোবাসত। নীনা যা মোটেও পারে না, নবীন তাই সবার চেয়ে ভালো পারত। নবীন ছিল সবার সেরা। নীনার ইচ্ছে হতো, সে-ও সাঁতার শেখে, জলে নামে। কিন্তু কিছুতেই সাহস হতো না। নবীন অবলীলায় নদীর জল তোলপাড় ক'রে ফিরত। এই নবীনকে তাই নীনা মনে মনে কামনা করত। চুপি চুপি চেয়ে চেয়ে দেখত নবীনের রূপ। নবীনের স্বাস্থ্য। নবীনের বুকের বলিষ্ঠতা। কব্জির শক্তি। সব কিছুকে মনে মনে পূজা করত নীনা। নবীন না জানলেও নীনা মনে মনে দিনে দিনে নবীনের ভালো-বাসার স্বপ্ন দেখত। সব সময় ঠাণ্ডা চোখে নবীনের একটা ছবিকে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখত। বাস্তবের নবীন যখন নীনার সামনে দিয়ে নদীর ঘাটে যেত, কল্পনার নবীন তখন নীনাকে রোমাঞ্চিত করত। নবীনের হাবভাব, কথা বলা, কণ্ঠস্বর, নীনার সব মুখস্থ হয়ে গেছিল। দূর থেকেও নবীনকে নীনা চিনতে পারত। পায়ের জুতো, ঘাড়ের গামছা, চিনতে পারত। কলম খাতা বই, সবই তার চেনা হয়ে গেছিল। ভালোবাসার সেই রূপ সংসারে সব সময় সবাই দেখে না। সবার চোখে ধরাও পড়ে না। কিন্তু সেই ভালোবাসা এই জগতেই চুপি চুপি শুরু হয়। ধীরে ধীরে ফোটে। আপন মনে সেই ভালোবাসা গান হয়ে বাতাসে ভাসে, ফুল হয়ে বাতাসে ভেসে যায়। তা, সেই নবীনকে ভালো-বাসত নীনা। বলতে পারত না। বোঝাতে পারত না। নীনার তখন কষ্ট হতো। দুঃখ হতো। নিজের ওপর রাগ হতো। ভালোবাসার কথা বলতে যে বুদ্ধি লাগে নীনার তা জানা ছিল না। কী ভাষায় বলতে হয়, সেই ভাষা সে বুদ্ধি ক'রে কোথা থেকে জোগাড় করবে বুঝে পেত না। কেউ তাকে সাহায্য করত না। আমরা ছাড়া তার কোনো বন্ধু ছিল না। আমরা ছেলেমানুষ, আমরা সবাই পুরুষ, আমরা তার মনের কথা বুঝতাম না। ফলে একা একা নীনার বড় দুঃখ হতো। তার ভার সইতে হতো নীনাকেই। সইতে পারত না, তবু।

একদিন নীনা কী ক'রে শুনতে পেল, যাকে ভালোবাসতে হয়, তাকে খুশি করতে হয়। এই কথা কোথা থেকে সংগ্রহ করল নীনা, সে এক রহস্য। কে তাকে এই কথা শোনাল কেউ জানে না। হঠাৎ নীনার মনে হল, নবীন খুশি হলেই নবীনের মন পাওয়া যাবে। তাই নীনা নবীনের মন পাওয়ার জন্য কত কি চিন্তা করল। ভেবেই পেল না, নবীন কিসে খুশি হবে। নবীনের মন কী চায়, কী পেলে খুশি হয়, নীনা তার হদিশ বার করতে পারল না। গাছ থেকে আঁটোসাঁটো পেয়ারা পেড়ে নিয়ে গেল নবীনের কাছে। নবীন পেয়ারা দেখে একটা পেয়ারা হাতে তুলে নিয়ে

খেতে লাগল। কিন্তু তার খুশি অখুশি কিছু বোঝা গেল না। তখন নীনার মনে হল, পেয়ারা দিয়ে কাউকে খুশি করা যায় না। একদিন সঞ্জয় মিস্ত্রী মেয়ের জন্য বাজার থেকে মতিচুর নাড়ু কিনে আনল। নীনা চুপ ক'রে সেই নাড়ু লুকিয়ে রাখল নবীনের জন্য। জলে নামবার আগে নবীন সেই নাড়ু খেল। তারপর হৈ হৈ ক'রে রোজকার মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীনা বুঝল, মোতিচুরের নাড়ুও কাউকে খুশি করে না।···একদিন নীনার মা পায়েস রেঁধে নীনাকে বলল—যা তো মা, নবীনকে এই বেলা নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে নিয়ে আয়। নীনা নবীনকে ডাকতে চলে গেল। নবীন হাপুস হুপুস ক'রে পায়েস আর লুচি খেল। খেয়ে দেয়ে বলল—বেশ রেঁধেছ মাসি। খাসা হয়েছে। গন্ধ সুবাস খুব হয়েছে।

মাসি খুশি হয়ে বলল—নীনা পায়েস রাঁধতে ভালোই পারে বাবা। ওই তো সব করল নিজে হাতে।

তাই নাকি? নবীন অবাক হওয়ার ভান করল। কিন্তু পায়েস রান্নার খাতিরে কাউকে কি খুশি করা যায়? নবীন খুশি হয়েছে মনে হল না। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে কেউ কখনো খুশি হয়? নবীন গান গাইতে গাইতে বাড়ি চলে গেল। নবীন যখন-তখনই গলা সাধে। তাই খেয়ে দেয়ে খুশি হয়ে গান ধরেছে, এ কথা মনে করার কারণ নেই।

অতএব খুশি করার আর কী উপায়? এই সব তুচ্ছ আয়োজন দিয়ে কারই বা মন ভরে? কোনো অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ঘটনা দরকার। খুব ঝলোমলো ব্যাপার দরকার। চোখে একদম অবাক-করা কিছু একটা চাই। সঞ্জয় মিস্ত্রী মেয়ের জন্য নতুন লাল শাড়ি আর ব্লাউজ কিনে আনল। লাল টকটকে রঙ! চোখ ধরে যায়। নদীর কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো নীনা। লাল শাড়ি আর ব্লাউজ পরে কপালে মস্ত বড় লাল টিপ এঁকে নীনা যে কী সুন্দর সাজল, কতখানি রূপসী হল কে বলবে! অনেক দূরের দেশ থেকে যৌবন কত কিনতুন খবর বহে এনেছে এই ছোট্ট মেয়েটির জন্যে, কেই বা তার সেই বার্তা শুনতে পেল! নবীন জল থেকে জল ছুঁড়ে মারতে পারত নীনার রোমকূপের রোমাঞ্চে। তা করল না। তাই যদি হতো, তবে নীনা কি জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলত—দাঁড়াও নবীন, আমিও জল-ঝাপটির খেলা খেলব তোমার সাথে। নীনা এইসব ভেবে মন খারাপ ক'রে ফেলল। পাড়ের ওপর চুপচাপ বসে বসে দুঃখ পেতে লাগল। নীনা যে জলকে ভয় পায়। সাঁতার জানে না।

নবীন একলা একলা বহুদূর সাঁতার দিয়ে গেল। উল্টোপাল্টি খেলা দিয়ে চলল জলের বিছানায়। এ যেন জলশয্যায় ভাসছে নীনার বর। বেহুলা এই জলকে ভয় পায় নি। তাই সে সতী সাধ্বী হতে পেরেছে। নীনার মনে হল, নবীনের এতটুকু যোগ্য সে নয়। কিছুতেই না। নীনার চোখে জল এল। নবীন ডাঙায় উঠে নীনার কাছে এসে কাছে দাঁড়িয়ে দেখল নীনাকে। নীনার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে।

এই চোখের জলের যে কী গভীর মানে, নবীন তা একটু খেয়াল করল না। নীনাকে রেখে সে কি এক কোঁটা মুগ্ধ হল না? দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে নীনাকে চেয়ে দেখল না কেন? গান গাইতে গাইতে নবীন চলে গেল। শিস্ দিতে দিতে নবীন চলে গেল।

একটার পর একটা সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে চলল। একটার পর একটা সব আয়োজন ফুরিয়ে যেতে চলল। নীনা নিঃস্ব হয়ে গেল। কতুর হয়ে গেল। তার আর কোনো জাদু জানা নেই। নীনা নিজে জাদুকর সেজে নিজেই কত খেলা দেখাল। একা একা খেলে গেল, একা একা দেখল। নিজেকেই নিজে খুশি করতে পারল না। মনে হল, কোনো একদল নীনার সামনে কোনো একটি নীনা জাদুকাঠি ঘুরিয়ে বলল—আর নেই। আর আমি জানি না। তখন সেইসব নীনারা একসাথে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠল। বলল—এই খেলাগুলো বড্ড পুরাতন। আমরা বহু দেখেছি। নতুন কোনো খেলা তুমি জানো? আধুনিক কিছু? তোমার খেলায় কোনো মনে রাখার মতো 'চমৎকার' নেই। এসব কোনো জাদুর খেলাই নয়।

নীনা হেরে গেল। সে জিততে পারল না। সে যে কেমন ক'রে হেরে যাচ্ছে, কেউ তা বুঝতেও পারল না। একদিন একজন কানে কানে বলল—নীনা তুই গুণীন ধর্ সে। সত্যিকার ফল পাবি। গুণীন তোকে মন্তর বলে দেবে। তাবিজকবচ বেঁধে দেবে। যা। চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি?

না। নীনা বলল—না। তা হয় না ভাই। তা হয় না।

কেন হয় না?

আমি তা কিছুতেই পারি না। যাকে নিজের ক্ষমতায় পারি না, তাকে অন্যের দেয়া মন্তর দিয়ে বশ করতে পারব না। অন্যের মন্তর অন্যেরই। আমার আপন সাধ্যের জিনিস তো নয়।

তোর ভারী গুমোর দেখছি। সেবে পস্তানী হবে, এই বলে রাখলাম।

তা হোক। তবু পারব না।

আহা মুখ পুড়ী। নিজের তোর কী আছে শুনি? কী দিয়ে তুই নবীনের মন জয়াতে পারিস দেখলি তো!

নীনা হু হু ক'রে কাঁদতে লাগল। তার আর কিছুই ভালো লাগত না। একদিন তার নিজের ভেতরটা ঝি ঝি ক'রে জ্বলে উঠল। তার চোখে একটা অপূর্ব আগুনের শিখা স্থির হয়ে প্রতিজ্ঞা হয়ে জ্বলতে লাগল।

সেদিন চাঁদ উঠল আকাশে। তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত। রাত্রি নির্জন। দাওয়ার শুয়ে চাঁদের মুখ দেখছিল নীনা। তার মনের সব সাধ ফুরিয়ে গেছে। তবু সে কোনো এক নির্মম প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ। তার ঘুম আসে না। চোখের পাতা এক হয় না। এক সময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসে। বাগান পেরিয়ে, ছায়া আর জোছনা মাড়িয়ে চলে আসে নদীর কিনারে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নদীর জল এখন শান্ত। চৈত্র মাসের শীর্ণ নদী। তবু কত ভরাবহ। জ্যোৎস্নায় নদী-

জল চিকচিক ঝিলমিল করছে। ওপারে বালুচর নদীর পাশে ঘুমিয়ে আছে। একটা রাত-জাগা পাখি একটানা শব্দ করছে দূরে। মনে হল, নদীর জলে নবীন সাঁতার দিচ্ছে। ওই তো নবীন জল তোলপাড় করছে। টুপটুপ ডুব দিচ্ছে আর উঠছে। নীনা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। আস্তে আস্তে পা টিপে জলের কাছে নেমে আসে। জলের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে শিউরে ওঠে নীনা। এই জল, তাই না নবীন? এই জল, তোমার বড় প্রিয়। আমি তাকে ছুঁতে এত ভয় পাচ্ছি কেন? নীনা হাত টেনে নেয়। সে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ ধারণ করল শরীরে। পা বাড়াল এবার। হাত নয়, পা। পা ডুবিয়ে দাঁড়াতেই সব দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। জলের বিন্দুরা স্রোতের শেকল নিয়ে এগিয়ে এল রূপসী নীনার কোমর অব্দি। বলল, আমরা তোমায় ছাড়ছি না কিছুতে। জলের অনেক গভীর ভালোবাসায় তোমায় নিয়ে যাব। নীনা গভীর আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় ভয় পেয়ে চর ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল চখাচখি দুইজন। তাদের পাখার ঝাপটা এসে যেন বা বাতাস দিয়ে নীনার বুকের কাপড় ছুঁয়ে গেল। নীনার আরো ভয় লেগে গেল। নীনা জল ছেড়ে আতংকে বিহ্বল হয়ে পাড়ে এক লাফে উঠে পড়ল। আমি পারছি না নবীন। তোমার ভালোবাসায় জলকে ভয় পাচ্ছি খুব।

নীনা বাগানের ওদিকে চেয়ে দেখল বারবার। কেউ আসে না। কেউ মানে নবীন। এত রাতে নবীন আসবে কেন? কেন এসে বলবে—নীনা তুই সাঁতার শিখবি? বেশ তো! আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ছাখ,, জল আমাদের বন্ধু, ভয় কি?

নবীন জানে না, নীনা এখন কী করছে। নীনার চেষ্টার কথা পৃথিবীর লোক কখনো জানবে না। নীনা পাড়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করল। সে আজ কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। এই জল কত সত্য তার কাছে। জলের বন্ধুত্ব কতখানি আকুল করেছে তাকে! সে ফিরবে না। এই জল নবীনের দেহের উত্তাপ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজি। সে ফিরবে কেন? তার চোখে প্রতিজ্ঞার অপূর্ব মোম পুড়ছে। এবার জোর ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল নীনা তার নিজেকে। মনে মনে বলল—নাও গ্রহণ করো।

নদী খুশিতে ছলচ্ছল ক'রে উঠল। নীনা বুঝতে পারল, নবীন যাতে খুশি, নদীও তাই চায়। নদী আর নবীন এক ধারা দুরন্ত। সবাই বলে, নদী নারী। আমি জানি, নদী এক পুরুষের দুরন্ত যৌবন। মনে মনে বলল নীনা। অনুভব করল। গলা অব্দি জল তাকে সোহাগ দিতে লাগল। হাত-পা ছেড়ে দিল নীনা। বিপুল বেগে নদীর সূক্ষ্ম জলের জাল চারদিকে ছড়িয়ে দিল নদী। বলল—তুমি আমাদের রানী।

তারপর নদী নীনাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলল। কথাটা যত সহজে বলা হল ঘটনা আদৌ তা নয়। নদী প্রথমে নীনাকে নিয়ে অনেকে ছিনমিন খেল। নীনা হাত-পা

ছুড়ল। জল খেল। তবু সে সাঁতার দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। সাঁতার যে কী, নীনা তার কৌশল আমৃত্যু বুঝতে পারল না। মনে হল, নবীন যা করে, তা এক মস্ত অলৌকিক ব্যাপার। আর নীনা যা করল, তা কি পৃথিবীর মানুষ করে?

সকালবেলা নীনার শরীরটা পাওয়া গেল নদীর ওপারের চড়ায়। এপার থেকে নদী নীনাকে টানতে টানতে ওপারে নিয়ে গেল নিশির টানে। অদ্ভুত এক ভালোবাসার ঘোর লেগেছিল মেয়েটার।

লাশটাকে নবীন ওপার থেকে ঘাড়ে ক'রে এপারে সাঁতার দিয়ে টেনে আনল। সবাই বলল—সাঁতার শিখতে মেয়েটা জলে নেমেছিল। কথা শুনে নবীন সবার মুখে চেয়ে চেয়ে দেখল। তার চোখমুখের চেহারা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—সাঁতার শিখবে, একথা নীনা বলতে পারত! আমরা কি শেখাতাম না? বল্ নবীন, তুই কি 'না' করতিস? নীনা আমাদের বন্ধুর মতো ছিল। বল্ তুই?

নবীন কোনো কথা বলল না। চুপচাপ উঠে বাড়ি চলে গেল। পরের দিন নবীন গামছা ঘাড়ে নদীর পাড়ে এসে বসল। আমরা তার মনের অবস্থা খারাপ দেখে কাছে এগিয়ে গেলাম। পাশে বসে ওর গা ছুঁয়ে বললাম—চল্ নামি চান করবি না?

নবীন কোনো কথা বলল না। তার চোখে চেয়ে দেখলাম, কেমন এক চাপা রাগ নিয়ে, হালকা অশ্রুর ছোঁয়া নিয়ে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে নবীন। নদীর ওপর তার সব বন্ধুত্ব কখন নষ্ট হয়ে গেছে আমরা বুঝতেই পারি নি। নবীন আর কোনোদিন নদীজলে সাঁতার দিল না।

এই এক চির বিচ্ছেদের গল্পটা এতক্ষণ ধরে আমায় আলোড়িত করছিল। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে মনে হল, সেই নীনা, সেই দেহ, সেই সব কিছু।

অবিকল সেই রকম একটি মেয়েকে আমি দেখছি।···

মন্ত্রীর চেম্বারে রোজ রোজই কি মেয়েটা (মেয়েটা বলা ভুল, বলতে হয় নীনা) এই রকম ধর্না দেয় চাকরির জন্যে। আমি ব্যবসার লাইসেন্স বার করবার তদ্বির করতে এখানে আসি। নবীন আর আমি একটা বাস তৈরির কারখানা সেক্টরে চালাব বলে স্থির করেছি। মন্ত্রী সহজে রাজি হচ্ছে না। ঘুস খাবে বলে মনে হচ্ছে। এখানে এসে নীনাকে দেখলাম।

নবীনকে ব্যাপারটা বলতেই নবীন প্রথমে হেসে উঠে কথাগুলো গল্পের মতো অবিশ্বাস করল। বলল—মেয়েটার নাম নীনা?

বললাম—নাম নিশ্চয় নীনা নয়। তবে ওটা নীনাই। একদিন তুই যাস্। তারপর যদি না মেলে, কথা যদি মিথ্যা হয়, তখন আমায় অভিশাপ দিবি।

নবীন মেয়েটিকে দেখল। কিছুক্ষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। বলল—নীনার তো কোনো বোন ছিল না। ওটা তবে ওর মাসির মেয়ে।

বললাম নীনার কোনো মাসিই ছিল না। ওটা নীনার কেউ না। আসলে ওটা

নীনাই। চোখ দু'টো নীনা। কানের দুলটাও নীনা। চোখ নাক কান আলাদা আলাদা ভাবে নীনা, একসাথে সাজিয়ে ছবি ক'রে দেখলেও নীনা। তাই তো?

নবীন বলল – হ্যাঁ। আমি ওকে সাঁতার শেখাব।

কথাটা শুনে আমি কেমন চমকে উঠলাম। নবীন আবার বলল – ওকে একদিন শুধিয়ে নে ও সাঁতার শিখতে রাজি তো?

আমি মেয়েটিকে ধরে পড়লাম – বললাম শোনো তো! তুমি এখানে চাকরির জন্য তদারক করতে···

হ্যাঁ। আমার একটা চাকরির খুব দরকার। আপনি আমার হয়ে মন্ত্রীকে একটু বলবেন? আমি বি. এ. পাশ। আমার মার্কস খুব ভালো। আমি ডিসটিংশান পেয়ে পাশ করেছি।

বললাম – মন্ত্রী আমার বন্ধু। চাকরির চিন্তা কোরো না। তোমার ঠিকানাটা দাও। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে তোমায় চিঠি দিয়ে জানাব।

ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আমি নীনার বাপ-মায়ের সাথে দেখা ক'রে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই ওঁরা রাজি হয়ে গেলেন। বললেন – ছেলেকে একদিন নিয়ে আসুন। আমরাও দেখব।

বেশ। তাই হবে। আমি কথা দিয়ে চলে এলাম।

নবীন বলল – সব কথা বলেছিস তো?

কোন কথা?

কেন ঐ সাঁতার শেখানোর কথাটা?

সেটা কি কোনো কথার মতো কথা হল নাকি? বিয়ের পর বউকে যত খুশি সাঁতার শেখাবি, কে বলতে আসবে!

নবীনকে দেখে ওরা এক বাক্যে বিয়ের জন্য কবুল হয়ে গেলেন। বললেন – ছেলের পছন্দের খবরটা আমরা এখনো শুনি নি।

নীনা সামনেই বসে ছিল। বললাম – দেখুন, নবীন আপনার মেয়ে নীনাকে পছন্দ না ক'রে পারে না। কারণ···

ভদ্রলোক সাথে সাথে বলে উঠলেন – আমার মেয়ের নাম নীনা নয়। ওর নাম অমৃতা।

কিন্তু ওকে যে নীনা হতে হবে। অমৃতা নীনার মতো। একেবারে নীনার আসল। সব কিছু নীনা।

ভদ্রলোক বললেন – তাই কি সম্ভব? নীনা যে কেমন, তা অমৃতা জানবে কেমন ক'রে? অমৃতাকে এমন ক'রে মানুষ করেছি, সে কখনো অন্যের মতো হতেই পারে না।

বললাম আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন না ঠিক। আপনি একে অমৃতা বলছেন। আমরা কিন্তু নীনা বলছি। এই জন্যেই আমরা বিয়েতে রাজি হয়েছি। তাই না, নবীন?

নবীন বলল – হ্যাঁ, তাই তো! বিয়ের পর আপনার মেয়ে সাঁতার শিখবে। আমি শেখাব।

বললাম – ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি আপনাদের।

অমৃতা আমার মুখে নীনার সব কথা শুনল। নবীন নীনার সব গল্প অমৃতাকে সেই দিনই শুনিয়ে দিতে চেয়েছিল। নবীন মনে করছিল, নীনা কেমন ক'রে মরল, সে কথা যেন শুনিয়ে শেষ হয় না। তবু সেই কথাগুলো বারবার গল্প ক'রে বলতে পারলে নবীন খুব আরাম পায়। দুঃখের ভারটা অনেক হালকা হয়। নীনা এখন গল্প হয়ে গেল অমৃতার সামনে, আর সেই গল্পটা ফুরায় না। চলতে থাকে। সেটা এক গোলাকার গল্প। তার আবর্তন থামে না। শেষ হয় না। একই গল্প, একই আবর্তন, তবু নবীন বলে চলে। নবীনের মনে হয়, এত বলছি, তবু ঠিক ঠিক নীনার ভালোবাসাকে স্পর্শ করা যাচ্ছে না। তার গভীরতার ভাষা আমরা জানি না।

তার এই কষ্ট দেখে অমৃতা অবাক হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে গেল। শুনতে শুনতে তার চোখে জল এসে পড়ল। নবীন বলল – নীনা এই নদীর এখানে দাঁড়াত। আমরা জল-বাজি করতাম। সাঁতার দিয়ে কতদূর চলে যেতাম। জলের মধ্যে আমাদের এক রকম উৎসব চলত। সে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তার খুব সাধ হতো জলে নামবার, সাঁতার দিয়ে বেড়ানোর, খুব কষ্ট হতো ওর। সে কিন্তু অসহায়। সেটা এক অসহায় মানুষের আশ্চর্য ছবি। খুব করুণ। খুব চমৎকার। কী বলব, তার কোনো তুলনা নেই। সেই যে ছবিটা, তুমি পারবে সেই ছবির মতো হতে? অসহায় হয়ে বসে থাকা, চেয়ে দেখা, সাধ জাগে, পারে না। অথচ কী রকম মুগ্ধ হয়ে থাকে সে।

একজন জ্যান্ত মানুষকে ছবি হতে হবে। অমৃতা শিউরে উঠল। অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল, সে সাঁতার জানে। জেলা প্রতিযোগিতায় অমৃতা ফার্স্ট হয়েছিল এক-বার। আর কতবার যে কত সাঁতার দিয়ে মেডেল জিতেছে, সেটার কোনো গুনতি নেই।

নবীন বা আমি একবারও সেদিন অমৃতাকে শুধিয়ে দেখিনি, অমৃতা সাঁতার জানে কি না।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, যে-মেয়ে দেখতে অবিকল নীনা, সে কখনোই সাঁতার দিতে পারে না। তার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, খুব ঠাণ্ডা দু'টি চোখ, অসহায়। অমৃতা সাঁতার জানবে, এটা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে? মনে হল, আমরা নবীনের জন্য যে-বস্তুটা খরিদ করছি সেটা একটা নীনার ছবি।

অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল, আমি ছবি নই। আমি অমৃতা। এই দেখুন, আমি অমৃতার কণ্ঠে কথা বলছি। অমৃতার চোখে দেখছি। অমৃতার কানে শুনছি। আমি যে শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করছি, গ্রহণ করছি, সবই আমার নিজস্ব। আমার বুকের স্পন্দন আমারই। আমি অমৃতা। এই কপালের টিপটা আমিই এঁকেছি। বলুন, আমি কী ক'রে ছবি হব?

অমৃতার এইসব কথা বলতে ইচ্ছে হল, অমৃতা পারল না। নবীন তখন অমৃতাকে বলল—আমি তোমাকে কিন্তু সাঁতার শেখাব। তুমি কখনো ডুবে মরবে না। সাঁতার শেখা জলের মতন সহজ ব্যাপার। হাত পা খেলাতে পারলেই দেখবে, তুমি ভেসে আছো, তুমি ডুবছ না।

শুনতে শুনতে অমৃতা খুশি হয়ে উঠল। বলল—এই নদীটা বেশ দেখতে। জল খুব সুন্দর। সব নদীই রূপসী হয় না। এরই নাম বুঝি রূপসা!

নবীন বলল—হ্যাঁ। এরই নাম রূপসা। এত ভালো নদী। তবু এই জলে কতকাল স্নান করি নি। নীনা মারা গেল, আমিও সেই থেকে এই নদীকে খুব দুঃখ ক'রে বললাম, আমি আর তোর কাছে আসব না। তুমিই আবার তার কাছে ফিরিয়ে আনলে নীনা।

অমৃতার বলতে ইচ্ছে করল—তুমি ভুল বললে নবীন। তুমি অন্যমনস্ক হয়ে আমায় নীনা বলছ। নবীন পাছে দুঃখ পায়, তাই সেকথা শুধরে দিতে ইচ্ছে হল না। অমৃতা চুপ ক'রে থাকল। বলল—এইখানে দাঁড়াত নীনা, এইখানে, তাই না?

আবার সেই গল্প। নবীন বেশ উৎসাহে শুরু করল—হ্যাঁ। এইখানে সে বসত। সেটা একটা ছবি। কখনো মুখ ভার ক'রে থাকত। কখনো খুব হাসিখুশি। জলে নামতে তার বড্ড আনুলি বিনুলি আর ভয় হতো। অসহায় সেই রূপটা আমি খুব উপভোগ করতাম। বেশ মজা, তাই না? একটা ছবি। এই ছবিটা এসে তোমার চোখেমুখে মিশে গেছে। দাঁড়াও, এবার আমি জলে নামব। তুমি দেখবে।

অমৃতা দাঁড়িয়ে পড়ল আর নবীন জলে নামল। জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতা। হাতপায়ের ঘায়ে নদীর জল নেচে উঠে উল্লাসে ছিটিয়ে ছিটকে এসে অমৃতার চোখে মুখে স্পর্শ ক'রে গেল। অমৃতা শিহরিত হয়ে চোখ বুঁজল। তার সব প্রত্যঙ্গ জলের প্রতি আশ্চর্য কামনায় কেঁদে উঠল। বুকের মধ্যে তৃষ্ণা জেগে উঠে মাথা কুটতে লাগল। চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। অথচ অমৃতা জলে নামতে পারল না। কারণ এখন সে নীনা হয়ে গেছে। সে নদীতীরে দাঁড়িয়ে নবীনের স্নান করা দেখতে লাগল। জল-মাটি আর নানা রকম কসরত দেখতে থাকল। অসহায় হয়ে অমৃতা

নীনা হয়ে গেল। একদিন সে নবীনকে বলতে চাইল, আমায় সাঁতার শেখাবে বলেছিলে তুমি। কৈ তার কি হল? অমৃতা বলতে চাইল এইসব। কিন্তু পারল না। কারণ, নীনা কখনো নবীনকে সাঁতার শেখাও বলে আব্দার করে নি। এই সব বললে অমৃতার কষ্ট ক'রে গড়ে তোলা নীনার ছবিটা পাছে নষ্ট হয়ে ভেঙে যায়, এই ভয়ে সে নবীনকে কিছুই বলতে পারল না। নবীনও অমৃতাকে সাঁতার শেখাতে এতটুকু উৎসাহ দেখাল না। এমনকি সেকথা তুললও না কোনোদিন। শুধু একদিন একটুখানি ইংগিতে শোনাল—সাঁতার শেখা কাজটা আবার কঠিনও বটে, তোমার ভয় করে, তাই না?

অমৃতা কী বলবে? চোখে তার জল এসে গেল। মাথা নিচু ক'রে মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ। নবীন সাথে সাথে বলল—নীনাও সাঁতারের কথা তুললে, তোমার মতো লজ্জা পেত। আর আমার তখন কী যে ভালো লাগত! গর্বে বুকখানা পাঁচ ইঞ্চি বেড়ে যেত। একটা ছবি।

অমৃতা বলল—সেই ছবিটা আমার মুখের আদলে এসে মিশে গেছে, তাই না?

নবীন হাসতে হাসতে বলল—ঠিক বলেছ। আমি ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম।...

অমৃতা একলা আড়ালে এসে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে ভেবেই পেল না, ঐ বিস্তৃত গোখ দু'টি তার নয়। ঐ নাক, কপাল, ভুরু, ঠোঁট, গলা, তার নয়। এটা অমৃতা নয়। সুইমিং-এর সার্টিফিকেটটা বাকস থেকে চুপি চুপি বার করল। চেয়ে চেয়ে দেখল। ঝরঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। নদীটাকে দেখল অমৃতা। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় সে নদী তাকে কামনা করত। রাত্রির জোছনায় সে নদী তাকে আকুল হয়ে ডাকত। কতদিন সে একলা নদীর ধারে গেল। জলে নামতে সাধ হল। জল তোলপাড় ক'রে তুলতে ইচ্ছে হল। সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যেতে মন তাকে লুব্ধ করতে থাকল। অমৃতা পারল না। অমৃতা নীনার কথা ভাবল। একটা অসহায় ছবির কথা ভাবল। নবীনের প্রেমমুগ্ধ তন্ময় নিশ্চিন্ত জীবনের কথা ভাবল। নবীনের এই ঘোর-লাগা আত্মতৃপ্তির সুন্দর অভিব্যক্তি সে মিথ্যে করতে পারল না। সব সাধ ফুরিয়ে গেল। সব উদ্যম ফুরিয়ে গেল। সব হাসি চলে গেল। অমৃতা শীর্ণ হয়ে পাংশু হয়ে কেমন যেন হয়ে গেল।

নবীন অমৃতাকে চেয়ে চেয়ে দেখল। অমৃতার কী হচ্ছে, নবীন বুঝতে চাইল। পারল না। নবীনের মনে হল, অমৃতা একটা ছবি। একই ছবি এক একসময় এক এক-রকম লাগে। রঙ বদলায়। চোখের ভুল হয়। আবার একসময় ছবিটা সুন্দর দেখাবে। নবীন চলে গেল। নবীন গান গাইল। শিস্ দিল। আনন্দ করল। অমৃতা সেই গান শুনল। কিন্তু গানের কথা, গান যে কী বলছে, তা সে বুঝতে পারল না। সে একলা একলা ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে আবার আয়নায়

সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে চেয়ে দেখল নিজেকে। অমৃতা আর নিজেকে চিনতে পারল না। তার মনে হল, অমৃতা বলে কেউ নেই। কখনো ছিল না কোনোদিন। বসে থাকতে থাকতে মনে হল, সে একটা মূর্তি। পাথরের তৈরি মানুষ। তার প্রাণ নেই। চোখ আছে। দৃষ্টি নাই। কানটি আঁকা। সে কিছুই শোনে না। ভাবতে ভাবতে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেল। তার রক্তপ্রবাহ থেমে গেল। নিশ্বাস থেমে গেল। অমৃতা সত্যিকার একটি ছবি হয়ে গেল। যেভাবে ছবি তৈরি হয় অমৃতার আঁকা-জোখা সেইভাবে সম্পূর্ণ হল। প্রথমে দু'টি চোখ আঁকা হল। যে চোখ তাকায় না। কিন্তু চেয়ে থাকে। এইভাবে দু'টি পা আঁকা হয়ে গেল। যে-দু'টি পা একদম স্থির। কখনো হেঁটে হেঁটে কোথাও যায় না। অমৃতার সব ছবিটা এখন আয়নার সামনে স্থির। কোনো কম্পন নেই। মৃদু একটু শিহরন নেই। জমাট একটি মূর্তি।

নবীন ঘরে ঢুকে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সেই ছবি। একেবারে নিখুঁত। ঘাড়ে হাত রাখল নবীন। সেই স্পর্শে একবার চোখ খুলল অমৃতা। অমৃতা প্রতিবিম্বকে একবার ডেকে উঠল – 'নীনা!' নবীন তা শুনতে পেল না। চোখ বুঁজল অমৃতা। আর সামান্য ধাক্কা লেগে অমৃতা এবার কাঠের মূর্তির মতো মেঝেয় পড়ে গেল। নবীন হতভম্বের মতো ঝুঁকে নামল মেঝেতে। দেখল অমৃতা মরে যাচ্ছে। বাইরে একটি কোকিল নিঃসীম আনন্দে ডেকে উঠল।

পৃথিবীতে বসন্ত এসেছে। অমৃতা মরে যেতে চায়। কিন্তু মরে যাওয়ার উপায় সে জানে না। একটি পরিপূর্ণ ছবি সে হতে পেরেছে। জীবন নেই। প্রাণ নেই। সাধ এবং স্বপ্ন নেই। ভালোবাসা নেই। ছবি বলতে এই যদি হয়, তবে অমৃতা ছবি। কিন্তু অমৃতার তখনো প্রাণ ছিল। নবীনের মনে হল, অমৃতা এখনো বেঁচে আছে। একটি পাথরের মূর্তির মধ্যে এখনো জীবন রয়েছে। স্থির চোখের গভীরে স্বপ্ন আর ভালোবাসার সূক্ষ্ম আলোড়ন থেমে আছে, স্তব্ধ হয়ে আছে। আর জীবনের এই নির্বাপিত-প্রায় একটি অদ্ভুত মায়া ছড়িয়ে আছে চোখে মুখে।

সেদিন চাঁদ উঠল আকাশে। একদিন পৃথিবীতে এই রকমই চাঁদ উঠেছিল। তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত। রাত্রি নির্জন। দাওয়ায় শুয়ে চাঁদ দেখছিল অমৃতা। নীনা একদিন এমি ধারা চাঁদের মুখ চেয়ে দেখে কেঁদে ফেলেছিল। অমৃতারও সব সাধ ফুরিয়ে গেছে। তবু সে কোনো এক নির্মম প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ। তার ঘুম আসে না। চোখের পাতা এক হয় না। এক সময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসে। বাগান পেরিয়ে, ছায়া-জোছনা মাড়িয়ে চলে আসে নদীর কিনারে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। নদীর জল এখন শান্ত। অবিশ্রান্ত কোকিল ডাকছে বাগানের অন্তরাল থেকে। চৈত্র মাসের শীর্ণ নদী। তবু কত ভরাবহ। জ্যোৎস্নায় নদীজল

চিকচিক ঝিলমিল করছে। ওপারে বালুচর নদীর পাশে ঘুমিয়ে আছে। অমৃতার হাতে দড়ি। কাঁখে কলসী।

অমৃতা বালি দিয়ে কলসিটা পূর্ণ করল। তারপর দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধল। পা দু'খানি জড়ো ক'রে আরো একটি দড়ি দিয়ে কষে নিল। তারপর দুই চোখ বুঁজে চিন্তা করল, নীনা সাঁতার জানত না। নীনা নবীনের এই প্রিয় নদীকে ভালোবেসেছিল। মরবার আগে সে কেমন আনন্দে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সবই অমৃতা অনুভব করবার চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে অমৃতা জলের কাছে নেমে এল। জলের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে শিউরে উঠল অমৃতা। নীনার মতোই অমৃতা বলে উঠল—এই জল, তাই না নবীন? এই জল, তোমার বড় প্রিয়! আমি তাকে ছুঁতে এত ভয় পাচ্ছি কেন? কথাটা আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য রকম ক'রে আবৃত্তি করল অমৃতা। এই জল, তাই না নীনা? এই জল, তোমার বড় প্রিয়! আমি ছুঁতে গিয়ে এতখানি ভয় পাচ্ছি কেন? সভয়ে হাত টেনে নেয় অমৃতা। সে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ ধারণ করল শরীরে। কোমরে দড়ি বাধা। বালিপূর্ণ কলসী। জলের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। পা ডুবিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সব দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। জলের বিন্দুরা স্রোতের শেকল নিয়ে এগিয়ে এল রূপসী অমৃতার কোমর অব্দি। বলল, তুমি আমাদের রানী। তোমাকে আমরা জলের অনেক গভীর ভালোবাসায় নিয়ে যাব। ছাড়ব না। জলের প্রতিটি বিন্দু যেন আহ্লাদে চিৎকার ক'রে উঠল। ছাড়ব না। ছাড়ব না। নদীর এই গোপন আর্তভাষা অমৃতাকে বিভোর ক'রে তুলল। জলের স্পর্শ করল উত্তেজিত। অমৃতা পাগল হয়ে গেল। গভীর সানন্দ আর্ত বিহ্বলতা অমৃতাকে উন্মাদ ক'রে দিল। অমৃতা শুনতে পেল, কোকিলটা থেমে গেছে। এক খণ্ড মেঘ এসে লাগল চাঁদের মুখে। নদীর ওপর দিয়ে কালো ছায়া ভেসে গেল। অদ্ভুত কর্কশ স্বর ছড়িয়ে চরের চখাচখি উড়ে গেল দূর দিগন্তের দিকে। অমৃতা হঠাৎ ভয় পেল। আরো বেশি আনন্দ পেল। আতংক-চালিত অমৃতা এক টানে কোমরের দড়ি খুলে ফেলল। পায়ের দড়ি আলগা ক'রে দিল। মনে মনে বলল—আমি পারছি না। নবীন। তোমার ভালোবাসার জলকে আমি খুব ভয় পাচ্ছি নীনা!···অমৃতা বাগানের ওদিকে চেয়ে দেখল বারবার। কেউ আসে না। কেউ মানে নবীন। এত রাতে নবীন কি আসতে পারে?

অমৃতা এবার উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি খুলে ফেলে জলে ঝাঁপ দিল। পাগলের মতো, দস্যি মেয়ের মতো, দুরন্ত অঙ্গ চালনায় অমৃতা কিসের যেন বাঁধন ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনকে তোলপাড় ক'রে চলল। সাঁতার কেটে কেটে কিছুতেই তার সাধ মেটে না।···সব ভয় ধীরে ধীরে দূর হয়ে যেতে থাকল। এত দিনের একটা ছবি

কয়েক মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে সহসা তাবৎ পৃথিবীকে জলের ভিতর আন্দোলিত স্পন্দিত ক'রে চলল। এই সময় নবীন অমৃতাকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল। দেখল, পূর্বজন্মের নীনা অমৃতার শরীরে সাঁতার খেলে ফিরছে। এত দিনে একটি ভালোবাসা মুক্তি পেল। এই জ্যোৎস্নায়। এই বসন্তে···

নীনা ঠিক অমৃতার মতোই ছিল। ঠিক সেই রকম। সেই চোখ। সেই নাক। সেই চুল। সব ঠিক একই প্রকার। জল থেকে উঠে এল অমৃতা। চোখে মুখে জলের ফোঁটায় জ্যোৎস্না লেগে ঝিলমিল করতে লাগল। অপূর্ব এই ছবি চেয়ে চেয়ে দেখে নবীন মুগ্ধ হয়ে গেল।

কলসিটা সাবধি মেয়ে জলে ফেলে দিল নবীন। অমৃতাকে জড়িয়ে নিয়ে বাঁ হাতের বেষ্টনে পাশাপাশি বালির ওপর পা ফেলে, পায়ের ছাপ ফেলে, এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। চলতে চলতে একবার ঘুরে দাঁড়াল অমৃতা। নবীনও ঘুরে দাঁড়াল নদীর দিকে চেয়ে। অমৃতা মনে মনে বলল—আমায় তুমি ক্ষমা ক'রে দিও। আমি পারি নি নীনা। আমরা পারি না।

মনে হল, এই জ্যোৎস্না রাতে নীনা ভীষণ একলা ঐ নদীর জলের তলায় শুয়ে আছে। ভালোবেসে যারা এই রকম ডুবে যায়, তারা সবচেয়ে একা। তার কোনো বন্ধু নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ নেই।

আর তখন দূর কোনো অচেনা জগৎ থেকে নবীনের অন্ধ দুই চোখে তাজা এক অনির্বচনীয় আলো এসে লাগল। সে কথা এখন থাক। এখন থাক। সেটা আর একদিন বলা যাবে। গোলাকার সে গল্পের কি কোনো শেষ আছে?

জার্মানির গল্প

ভোলফ্‌গাঙ বোর্খার্ট

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ : সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী

বোর্খার্ট (Wolfgang Borchert). মাত্র ২৬ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি ছিলেন এক প্রবঞ্চিত প্রজন্মের লেখক, যারা যান ২০ নভেম্বর ১৯৪৭-এ সুইৎজারল্যাণ্ড-এর বাজেল শহরে। আর তার পরদিনই তাঁর লেখা একমাত্র নাটক "বাইরে, দরজার সামনে" (Draussen vor der Tuer) হামবুর্গ-এ প্রথম অভিনীত হয়। এই শহরেই তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২১-এর ২০ মে। বই-এর দোকানে শিক্ষানবিশি থেকে শুরু ক'রে অভিনেতার কাজও করেন। ১৯৪১-এ তাঁকে যুদ্ধে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হন পীতজ্বর ও ডিফথেরিয়া রোগে। এমন সময় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল, তাঁর লেখা চিঠিতে হিটলার সম্বন্ধে বক্রোক্তি আছে। এর জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য সেবারের মতো তিনি ছাড়া পান, কিন্তু তাঁকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে। এবার শারীরিক অসুস্থতার ফলে তাঁকে অক্ষম বিবেচনা ক'রে সেনাবাহিনী থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। তিনি হামবুর্গ-এ ফিরে আসেন। কিন্তু চুপ ক'রে থাকতে পারেন নি। ক্যাবারের আসরে নিজস্ব কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবারও তাঁকে জেলে যেতে হয়। কারণ তাঁর কিছু উক্তি তৎকালীন কর্তাব্যক্তিরা পছন্দ ক'রে উঠতে পারে নি। ১৯৪৫-এ তিনি ফিরে এলেন হামবুর্গ-এ, সন্নিপাত জ্বরগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায়। "এর মধ্যে একদল লোক, যারা ঘরে ফিরে এল কিন্তু ফিরল না, ওদের যে আর ঘর বলে কিছু নেই। ওদের ঘর তখন বাইরে, বৃষ্টির রাতে, রাস্তায়। সেটাই তাদের জর্মনি" (বাইরে, দরজার সামনে)। বন্ধুরা তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় সুইৎজারল্যাণ্ড-এর এক স্বাস্থ্যনিবাসে ভর্তি ক'রে দেন। তবে খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল। বোর্খার্ট-এর হাতে তখন লেখার সময় ছিল মাত্র দু'বছর এবং সত্যি সত্যি মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি লিখে গেছেন। যাবতীয় অমানুষিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন আর তেমনি ভালোবাসতেন বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত মানুষদের।

বোর্খার্ট-এর একটি সংকলনের 'ভূমিকা' না লিখে হাইনরিখ বোল (Heinrich Boell) লিখেছেন 'উত্তরকথা'। বলেছেন, "কুড়ি বছর বয়স, ছ-সপ্তাহ ধরে একটা

সেল-এ অপেক্ষা করা আর জানা, মরতে হবে কয়েটা চিঠির জন্য, বেণ্ডলোভে হিটলার আর যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা হয়েছিল! আজ যাদের কুড়ি বছর বয়স, তারা যখন এই ছোট্ট বইটা হাতে নেবে, তখন তাদের জানতে হবে ব্যক্তিগত মতের মূল্য কী হতে পারে, তার জন্য কত দাম দিতে হয়।···তাদের খেয়াল রাখতে হবে হিটলারের আমলে মালগাড়ির ওয়াগন-এর গায়ে লেখা থাকত : ৬টি ঘোড়া অথবা ৪০ জন মানুষ। সেটা ছিল যুদ্ধের সময়কার হিসেব, কিন্তু মাত্র কয়েক টন রং এবং একটা স্টেন্সিল-এর সাহায্যে আবার লেখা যেতে পারে : ৬টি ঘোড়া অথবা ৪০ জন মানুষ।"

বোল আরো বলেছেন, "সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তফাত আছে। এক্স-রে ফটো আর সাহিত্যে সেই তফাত। এক্স-রে ফটো বলতে পারে পায়ের ভাঙা হাড় বা সরে যাওয়া কলার-বোনের কথা, সাহিত্যিক সেই সঙ্গে আহত ব্যক্তির পরিণতিও দেখতে পায়। এই এক্স-রে দৃষ্টি ছিল বোর্খার্ট-এর।"

নিচে অনূদিত বোর্খার্ট-এর গল্পগুলো নেওয়া হয়েছে 'বাইরে, দরজার সামনে' (Draussen vor der Tuer) নামক তাঁর নির্বাচিত রচনা সংকলন থেকে (রোভোল্ট ট্যাশেনবুখ ফ্যেরলাগ, হামবুর্গ, এপ্রিল, ১৯৭৪)। এতে আছে তাঁর একটি নাটক (সেটির নামেই সংকলনটির নাম) ও চোদ্দটি গল্প। সংকলনটি প্রথম প্রকাশের সময় (জানুয়ারি, ১৯৪৬) ছাপা হয়েছিল ১২ হাজার কপি। এপ্রিল ১৯৭৪ সংস্করণে দেখা যায় সেই সংখ্যা ১২ লক্ষ ১০ হাজার-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর লেখার অনুবাদ বেরিয়েছে অন্তত ১২টি ভাষায়।—অনুবাদক।

[ইংরেজি অনুবাদে বোর্খার্টের একটি ছোটগল্প হাতের কাছেই পাওয়া যায়। Penguin Parallel Text গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত *German Short Stories I* বইটিতে (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪)। গল্পের নাম : 'Thithyphuth or My Uncle's Waiter'। এই পেংগুইন গল্প-সংকলনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বোর্খার্টের ১৪টি গল্প বেরিয়েছিল *Das Gesamtwerk* (১৯৪৯; এবং আরো কিছু গল্প *Die traurigen Geranien* (১৯৬২) সংকলনদ্বয়ে।—স. এ.।]

কথামালার গল্প

সকলেরই একটা ক'রে সেলাই কল, রেডিও, ফ্রিজ আর টেলিফোন আছে।

এখন আমরা কী বানাবো? প্রশ্ন করে কারখানার মালিক।

বোম, বলে গবেষক।

যুদ্ধ, বলে জেনারেল।

কিছুই যখন আর করার নেই, অগত্যা, বলে কারখানার মালিক।

সাদা এপ্রন পরা লোকটি কাগজের উপর সংখ্যা বসাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছোট্ট কোমল সব অক্ষর।

তারপর সাদা এপ্রনটা খুলে ফেলে জানলার উপর রাখা ফুলের পরিচর্যা করল—একঘণ্টা ধরে। যখন দেখল একটা ফুল শুকিয়ে গেছে, তখন ভীষণ দুঃখ পেল এবং কাঁদল।

আর কাগজের উপর লেখা সেই সংখ্যাগুলো—ঐগুলোর আধগ্রাম দিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে হাজার লোক মেরে ফেলা যায়।

রোদ্দুর এসে পড়েছে ফুলগুলোর উপর।

আর কাগজের উপর।

দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

কত পড়বে?

টালি দিয়ে?

অবশ্যই, সবুজ টালি দিয়ে।

চল্লিশ হাজার।

চল্লিশ হাজার? বেশ, তাই হবে ধন, তবে আমি যদি ঠিক সময়ে চকলেট-এর ব্যবসা ছেড়ে বাঙ্কারের ব্যবসায় না নামতাম, তাহলে আপনাকে চল্লিশ হাজার দিতে পারতাম না।

আর আমিও আপনার বাঙ্কার বানাতে পারতাম না।

সবুজ টালি দিয়ে।

সবুজ টালি দিয়ে।

দু'জন লোক দু-দিকে চলে গেল।

ওদের একজন কারখানার মালিক, আরেকজন বাড়ি তৈরির ঠিকেদার।

তখন যুদ্ধ।

বোলিং-এর আসর। দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

কি ব্যাপার, মাস্টারমশাই, কালো পোশাকে! খারাপ খবর নাকি?

না, না। উৎসব ছিল। জোয়ান ছেলেরা যুদ্ধে যাচ্ছে। ছোটখাট বক্তৃতা দিলাম। স্পার্টার কথা মনে করানো হল। ক্লাউসভিৎস্ থেকে বলা হল। কতকগুলো কথা বলে দেওয়া হল—শ্রদ্ধা, জন্মভূমি। হোলডারলিন পড়া হল। লাঙ্গেমার্ক-এর কথা ভাবা হল। জমজমাট ব্যাপার। খুবই জমজমাট। জোয়ান ছেলেরা

গান গাইল – ঈশ্বর, লোহা তোমারই সৃষ্টি। সব চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জমজমাট। খুবই জমজমাট।

ঈশ্বরের দোহাই, মাস্টারমশাই, যথেষ্ট হয়েছে। বীভৎস। মাস্টারমশাই হতাশ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন অন্যজনের দিকে। কথা বলার সময় তিনি ছোট ছোট ক্রশ এঁকেছিলেন কাগজের উপর। প্রচুর ছোট ছোট ক্রশ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন। একটা নতুন বল তুলে নিলেন আর গড়িয়ে দিলেন লাইন বরাবর। চাপা গুরুগুরু শব্দে বল গড়িয়ে গেল। তারপর পিছনের খুঁটিগুলোতে গিয়ে ধাক্কা মারল। মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন ছোট ছোট মানুষ সব।

দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।
এই যে কী খবর?
বেশ খারাপ।
কত হবে আপনার কাছে এখনো?
যদি ঠিকঠাক থাকে : চার হাজার
আমাকে কত দিতে পারবেন?
বড় জোর আটশো।
ওরা একটা রফা করতে ব্যস্ত হল।
তাহলে হাজার।
ধন্যবাদ।
দু'জন দু'দিকে চলে গেল।
ওরা মানুষ নিয়ে কথা বলছিল।
ওরা জেনারাল।
তখন যুদ্ধ।

দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।
স্বেচ্ছায় এসেছ?
নিশ্চয়।
বয়স কত?
আঠারো। আর তোমার?
আমারও তাই।
দু'জন দু'দিকে চলে গেল।
ওরা দু'জন সৈনিক।
একজন মুখ থুবড়ে পড়ল। সে মারা গেছে
তখন যুদ্ধ।

যুদ্ধ যখন শেষ হল, সৈনিকটি বাড়ি এল। কিন্তু তার রুটি ছিল না। সে একজনকে দেখল যার রুটি আছে। তাকে সে খুন করল।

বিচারক বলল, তুমি মানুষ খুন করতে পারো না।

কেন নয়, প্রশ্ন করল সেই সৈনিকটি।

শান্তি বৈঠক শেষ হবার পর, মন্ত্রীরা শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তারা একটা গুলি ছোঁড়ার স্টল-এর কাছে এল: লিপস্টিক লাগানো মেয়েরা ডাকল—একবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন স্যার? তখন সকলে একটা ক'রে বন্দুক হাতে নিল আর কার্ডবোর্ড-এর তৈরি ছোট্ট মানুষগুলো লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ল।

গুলিছোঁড়া চলছে এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন এবং ওদের কাছ থেকে রাইফেলগুলো কেড়ে নিলেন। যখন একজন মন্ত্রী আবার সেটা নিতে চাইল বৃদ্ধা তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন।

তিনি একজন মা।

দু'টি লোক ছিল। যখন তাদের দু'বছর বয়স, তারা হাতাহাতি করত। যখন তাদের বারো বছর বয়স, তারা লাঠি নিয়ে মারামারি করত আর পাথর ছুঁড়ত।

যখন তাদের বাইশ বছর বয়স, একে অপরকে তাক ক'রে বন্দুক ছুঁড়ত।

যখন তাদের চব্বিশ বছর বয়স, তারা বোম ছুঁড়ত।

যখন তাদের ছাব্বিশ বছর বয়স, তারা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে লাগল।

যখন তাদের আঠাশ বছর বয়স, তারা মারা গেল। তাদের পাশাপাশি কবর দেওয়া হল।

যখন একশো বছর পরে একটা কেঁচো ওদের কবরের মাটি কুরে খাচ্ছিল, সে নজরই করল না, এখানে দু'জন আলাদা লোককে কবর দেওয়া হয়েছে। সেই একই মাটি। সবই এক মাটি।

২০০০ সালে একটা ছুঁচো মাটির তলা থেকে মুখ বের ক'রে এই সিদ্ধান্তে এল:

গাছগুলো এখনো গাছই আছে।
কাকগুলো এখনো কা-কা করে।
আর কুকুরগুলো এখনো পা তোলে।
মাছ আর তারা,
শ্যাওলা আর সমুদ্র
আর মশা:
এরা সব একই আছে।
আর কদাচিৎ—

কদাচিৎ দেখা মেলে একজন মানুষের।

[মূল জর্মন রচনা JESEDUOLIGESCHICHTEN থেকে।]

রুটি

হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। তখন আড়াইটে। ভাবতে লাগল, কেন ঘুম ভাঙল। ও! রান্নাঘরে কে যেন একটা স্টুলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। কান খাড়া ক'রে রান্না-ঘরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। নিস্তব্ধ, খুবই নিস্তব্ধ। আর যখন হাত দিয়ে বিছানার পাশটা হাতড়ালো, দেখলো ফাঁকা। সেই জন্যই এখানে কোনো শব্দ নেই— তার নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ও উঠে দাঁড়ালো আর হাতড়াতে হাতড়াতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরে দেখা হল ওদের। আড়াইটে বাজে। ও দেখল রান্নাঘরের আলমারির সামনে সাদা মতো কিছু দাঁড়িয়ে। ও আলো জ্বালল। ওরা মুখোমুখি রাতের পোশাকে। রাত্রে। আড়াইটেয়। রান্নাঘরে।

রান্নাঘরের টেবিলের উপর রুটির প্লেট পড়ে আছে ও দেখল, সে রুটি কেটে নিয়েছে। ছুরিটা পড়ে রয়েছে প্লেট-এর পাশে। আর টেবিলের ঢাকার উপর ছড়িয়ে আছে রুটির গুঁড়ো। রাতে শুতে যাবার আগে ও রোজ টেবিল পরিষ্কার ক'রে রাখে। রোজ। কিন্তু এখন রুটির গুঁড়ো পড়ে রয়েছে। আর ছুরিটা ওখানে রয়েছে। ও অনুভব করল, মেঝের ঠাণ্ডা শরীরের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে কেমন উপরে উঠেছে। ও প্লেট থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

"আমি ভাবলাম এখানে বুঝি কিছু হয়েছে", বলে সে রান্নাঘরের এদিক ওদিক তাকালো।

"আমিও কি একটা শুনেছি" ও বলল, আর তারপরই দেখল রাতের পোশাকে তাকে রীতিমতো বুড়ো দেখাচ্ছে। যেমন বয়স তেমনই দেখাচ্ছে। তেষট্টি দিনের বেলায় অনেক সময় কম বয়স মনে হয়। সেও ভাবলো, ওকে বেশ বয়স্ক লাগছে, রাতের পোশাকের জন্যই বেশ বয়স্ক লাগছে। কিন্তু ওটা বোধহয় চুলের জন্য। রাতে মেয়েদের চুলের জন্যই এমন লাগে। চুলগুলোর জন্যই এমন বয়স্ক মনে হচ্ছে।

"তোমার চটি পায়ে আসা উচিত ছিল। খালি পায়ে এমন ঠাণ্ডা মেঝের উপর। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

ও তার দিকে তাকালো না, সে মিথ্যা কথা বলছে সেটা ও সহ্য করতে পারছে না। বিয়ের উনচল্লিশ বছর পরেও, সে মিথ্যা কথা বলছে।

"আমার মনে হল, এখানে বুঝি কিছু হয়েছে", আবার বলে কেমন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সে এক কোণ থেকে আরেক কোণার দিকে চেয়ে দেখল, "মনে হল কি একটা শুনলাম। তাই ভাবলাম, এখানে কিছু হয়েছে।"

"আমিও কি একটা শুনেছি। বোধহয় কিছু না।" ও টেবিল থেকে প্লেট সরিয়ে নিল আর টেবিলের ঢাকা থেকে গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলল।

"না ওটা বোধহয় কিছু না, সেও বলল অনিশ্চিত ভাবে।"

ও তখন তাকে বাঁচালো "চলে এসো। বোধহয় বাইরে কিছু হবে। চলো শোবে চলো। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ঠাণ্ডা মেঝের উপর।"

সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল। "হ্যাঁ, বাইরেই হবে নিশ্চয়। আমি ভাবলাম, এখানে বুঝি কিছু হয়েছে।"

ও আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়ালো। ভাবল, এখুনি আলোটা নিভিয়ে দেওয়া উচিত, নয়ত আমার চোখ প্লেটের উপর পড়বে। প্লেট-এর দিকে আমার তাকানোটা ঠিক নয়। "চলে এসো", বলে ও আলোটা নিভিয়ে দিলে, "ওটা নিশ্চয় বাইরেই হবে। ছাদের জলের নলটা বাতাসে দেওয়ালের সঙ্গে সবসময় বাড়ি খায়। ওটা নিশ্চয় নলটাই হবে। বাতাসে ওটা সবসময় শব্দ করে।"

অন্ধকার করিডোরে হাতড়াতে হাতড়াতে ওরা দু'জনে এগিয়ে চলে শোবার ঘরের দিকে। ওদের খালি পা মেঝেতে শব্দ করে।

"বাতাসই হবে", সে বলল। "সারারাত ধরেই বাতাস বইছে।"

ওরা বিছানায় শোবার পর, ও বলল—"হ্যাঁ, সারারাত ধরেই বাতাস বইছে। ওটা ছাদের নলটাই হবে।"

"হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি ওটা রান্নাঘরে। নলটাই হবে।" এমনভাবে বলল, যেন ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে।

ও লক্ষ করল, মিথ্যে কথা বলার সময় তার গলাটা কেমন অন্য রকম শোনায়। "বেশ ঠাণ্ডা", ও বলল আর হালকা হাই তুলল, "আমি লেপের তলায় ঢুকছি। শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি", উত্তর দিয়ে সে বলল—"বেশ ভালোই ঠাণ্ডা পড়েছে।"

তারপর সব নিস্তব্ধ। বেশ কিছুক্ষণ পর ও শুনল, সে নিঃশব্দে সাবধানে চিবোচ্ছে। ও ইচ্ছে ক'রে জোরে আর একইভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিল, যাতে সে বুঝতে না পারে যে ও এখনো জেগে আছে। কিন্তু তার চিবানো এমন সমান তালে যে ও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফেরার পর ও তার দিকে চার টুকরো রুটি এগিয়ে দিল। এর আগে সে কেবলমাত্র তিন টুকরো খেতে পেত।

ও বলল, "তুমি অনায়াসে চারটে খেতে পার", আর আলোর কাছ থেকে সরে গেল। "এই রুটি আমি তেমন সহ্য করতে পারি না। তুমি খাও না একটা

বেশি। আমি তেমন সহ্য করতে পারি না।"

ও দেখল, সে কি রকম প্লেট-এর উপর ঝুঁকে পড়েছে। সে চোখই তুলছে না। এই দৃশ্য দেখে ওর দুঃখ হল।

প্লেট-এর উপর ঝুঁকে থেকেই সে বলল, "তাই বলে তুমি মাত্র দু-টুকরো খাবে, এ হয় না।"

"হ্যাঁ, রাত্রে আমার রুটি সহ্য হয় না। খেয়ে নাও না, খেয়ে নাও।"

বেশ কিছু সময় পার ক'রে ও টেবিলে আলোর নিচে এসে বসল।

[মূল জর্মন রচনা DAS BROT থেকে অনুবাদ।]

আঁধারের তিন রাজা

লোকটি শহরতলির অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলছিল। খোলা আকাশের নিচে ভাঙাচোরা বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। আকাশে চাঁদ ছিল না। গভীর রাতে পা-ফেলায় পথটা আঁৎকে উঠছিল। হঠাৎই সে খুঁজে পেল একটা পুরানো তক্তা। বেঁকিয়ে ভেঙে না পড়া অবধি তক্তাটার উপর সে পা দিতে থাকল। খুবই সোঁদা আর মিষ্টি মনে হয় কাঠটাকে। লোকটি গভীর অন্ধকারে শহরতলীর পথে পায়ে পায়ে ফেরে। আকাশে তারা ছিল না।

কপাটটা খুলতেই ' কেঁদে ওঠে কপাটটা), তার স্ত্রীর ক্যাকাশে নীল দৃষ্টি তার উপর পড়ে। এক ক্লান্ত মুখ থেকে এল সে দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে বৌটির নিশ্বাস জমাট সাদা। এত ঠাণ্ডা। হাড়-জিরজিরে হাঁটু ভাঁজ ক'রে কাঠখানি ভেঙে ফেলে লোকটি। কাঠটি কেঁকিয়ে ওঠে আর নাকে আসে সোঁদা আর মিষ্টি গন্ধ। সেটার একটুকরো নাকের সামনে আনে লোকটি। প্রায় কেক-এর মতোই গন্ধ। হালকা হাসে সে, না, বলে বৌটির দৃষ্টি, হেসো না। ও ঘুমোচ্ছে।

ছোট্ট টিনের চুল্লির মধ্যে মিষ্টি নরম কাঠটা রাখতে সেটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এক মুঠো উষ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল আলো পড়ল একটা ছোট্ট নিটোল মুখের উপর। সবে এক ঘণ্টা বয়স হবে মুখটার, তবু যা থাকবার কথা সবই আছে তাতে—কান, নাক, ঠোঁট আর চোখ। চোখদু'টো নিঃসন্দেহে বড়—যদিও এখন বোজা। মুখটা কিন্তু খোলা. নিশ্বাস ফেলছে আস্তে আস্তে। নাক আর কান লাল। বেঁচে আছে, ভাবে তার মা। সেই ছোট্ট মুখটা ঘুমোচ্ছে।

খুদ-কুঁড়ো এখনো আছে, বলে লোকটি। হ্যাঁ, উত্তর দেয় তার স্ত্রী, ভালো কথা। বেশ ঠাণ্ডা। মিষ্টি নরম কাঠের আরেকটু নেয় লোকটি। ভাবতে থাকে, বৌটার বাচ্চা হয়েছে, আর ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে তাকে। কিন্তু সামনে এমন কেউ নেই, যার মুখের উপর সেজন্য একটা ঘুঁসি মারতে পারে। চুল্লির পাল্লাটা খুলতেই ঘুমন্ত মুখের উপর একমুঠো আলো আবার এসে পড়ে। বৌটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে — দেখ, যেন আভা দেখছো? আভাই বটে, ভাবে লোকটি। কিন্তু তার সামনে এমন একটা মুখ নেই যার উপর সে একটা ঘুঁসি মারতে পারে।

তখন দরজায় কারা এল। আমরা আলো দেখেছি, ওরা বলল, জানলায়। মাত্র দশ মিনিট বসতে চাই। ঘরে যে একটা শিশু আছে, ওদের উদ্দেশে বলে লোকটি। তখন আর কথা না বলেই ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল — নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়াতে, আর পা-গুলো তুলে দিল (চুল্লির দিকে)। আমরা একদম শব্দ করব না, ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল ওরা আর পা-গুলো তুলে দিল। তখন আলোটা ওদের উপর এসে পড়ল।

ওরা তিনজন। পরনে পুরনো সামরিক পোশাক। একজনের হাতে একটা কাগজের বাক্স ছিল, আরেক-জনের একটা থলে। আর তৃতীয়জনের হাতই ছিল না। জমে গেছে, কাটা অঙ্গ দু'টি তুলে সে বলল। নিজের ওভার কোটের পকেটটা এগিয়ে দিল লোকটিকে। তামাক আর পাতলা কাগজ পাওয়া গেল। ওরা সিগারেট পাকালো। কিন্তু বৌটি বলল: না বাচ্চা আছে।

দরজার কাছে সরে যায় চারজনে, ওদের সিগারেটগুলো অন্ধকারে চারটে আলোর বিন্দু। ওদের একজনের দু'পায়েই মোটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। একটা থলে থেকে সে একটা কাঠের টুকরো বের করল। একটা গাধা, বলল, সাতমাস ধরে খোদাই করেছি। বাচ্চাটাকে দিলাম। এই বলে ওটা দিল লোকটার হাতে। পায়ে কী হয়েছে, প্রশ্ন করল লোকটি। জল জমেছে, উত্তর দিল সেই খোদাইকার, খেতে না পেয়ে। আর অন্যজন, তৃতীয় জনের? প্রশ্ন করল লোকটি অন্ধকারে কাঠের গাধার হাত বুলোতে বুলোতে। তৃতীয় জন কাঁপছে তার পোশাকের মধ্যে: ও কিছু না, ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, ও স্নেফ স্নায়ুর ব্যাপার। যা আতংকের মধ্যে কেটেছে! তারপর পা দিয়ে সিগারেটগুলো নিভিয়ে ওরা আবার ঘরের ভেতর গেল।

ওরা পা উঁচু ক'রে ছোট্ট ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকালো। যে লোকটা সব সময় কাঁপছিল সে তার কাগজের বাক্স থেকে দু'টো হলদে লজেন্স বের ক'রে বলল, এগুলো বৌ-এর জন্য।

আঁধারে তিনজন লোককে বাচ্চার উপর ঝুঁকে পড়তে দেখে বৌটির ফ্যাকাশে নীল চোখ বড় হয়ে উঠল। বৌটি ভয় পেল। আর ঠিক সেই সময় বাচ্চাটি পা-দু'টোকে মায়ের বুকে ঠেলা দিয়ে এমন চিৎকার ক'রে উঠল যে আঁধারের লোক-গুলো পা তুলে দরজার দিকে নিঃশব্দে সরে গেল। সেখানে তারা আর একবার

মাথা ঝুঁকিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

ওদের যাওয়ার দিকে লোকটি তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত দেবদূত, লোকটি বলল তার স্ত্রীকে। তারপর দরজা বন্ধ করল। খুদ-কুঁড়োর দিকে তাকিয়ে সে বলল, চমৎকার সব দেবদূতই বটে। কিন্তু ঘুঁসি মারার মতো একটা মুখ তার সামনে নেই।

বাচ্চাটা কি রকম চেঁচিয়ে উঠেছিল, খাটো গলার বৌটি বলল। বেশ জোর গলায় চেঁচিয়েছিল। তখন ওরা চলে গেল। কেমন চঞ্চল, দেখ! বলল বৌটি বেশ গর্বভরে। ছোট্ট মুখটা হাঁ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠল।

কাঁদছে না কি, লোকটি প্রশ্ন করল।

না, আমার মনে হয় হাসছে, বলল বৌটি।

একদম কেক-এর মতো, কাঠের টুকরোটা শুঁকে, লোকটি বলল। কেক-এর মতো। বেশ মিষ্টি।

আরে আজ তো বড়দিন, বৌটি বলল।

হ্যাঁ বড়দিন, গজগজ ক'রে উঠল লোকটি, আর চুল্লি থেকে একমুঠো উজ্জ্বল আলো এসে ছড়িয়ে পড়ল ছোট্ট ঘুমন্ত মুখটির উপর।

[মূল জর্মন রচনা DIE DREI DUNKLEN KOENIGE থেকে অনুবাদ।]

কবিতা

মালিনী ভট্টাচার্য

প্রাগৈতিহাসিক

বেলা সাড়ে-ন'টা, মখমল-ভোরা রৌদ্রে
লৌহ নিষেধ ঘিরে ছিল রাজতক্ত
গুলির ফোয়ারা ছুটল ঘেরার মধ্যে
গড়িয়ে আসল রক্ত — আসল রক্ত।

বেলা বারোটায় করোটি-কিরীট মৃত্যু
গুজবের পিঠে সওয়ার শহরে চলল
ঘুণঘুসে ক্রমে জমাট বাঁধছে সৈন্য
পথ-ধমনীতে থমকায় গতকল্য।

কেঁপে ওঠে কোথা প্রলুব্ধ ক্ষেপণাস্ত্র,
একচুল ঝুঁকে পড়ল কি দাঁড়িপাল্লা?
মোড়ের মাথায় ছুটে এল ইট আস্ত
পাশের গলিতে হঠাৎ উঠল হাল্লা!

বেলা আড়াইটে, নামাবলী তারই আস্তে
ঢাকে সে মুখের মুমূর্ষু মানুষত্ব,
নামের ডগায় মশাল জ্বালিয়ে ব্যস্ত
নরকের প্রাণী দখল করল মর্ত্য।

দাউদাউ জ্বলে গণতন্ত্রের চামড়া
মৃত প্রহরীরা খাড়া আছে অনাসক্ত,
ধোঁয়ায় ধর্ম রাজধানীগামী কামরায়
নালা দিয়ে আসে রক্ত — আসল রক্ত।

রাত আটটায় সোজা অভিষেকে চলল
উত্তরসূরী, দূরদর্শনে বিশ্ব
দেখে সে উঠছে, নিচে অপঘাতী কল্লোল
পিঠে তাক্ করা স্টেনগান অদৃশ্য।

রাত বারোটার সোডার শহর রাস্তায়
স্বপ্নের চাপে. ঘাড়ের কাঁটায় ভ্রান্তি
ফিরে খোঁজে একছত্র শাসনে আস্থা
কুড়ি বছরের এক থেকে আর প্রান্তে।

একটিবার হাত রাখেন যেই তিনি তিনটি সিংহের হাতলে
আদব মেনে সন্ত থামায় গজরানি বিমানে জলে আর স্থলে।
অথবা বৈকালী চায়ের অবসরে শিকলে-বাঁধা তিন সঙ্গী
সমেত মথমলি ঘাসের চত্বরে কী তার বেড়াবার ভঙ্গী !
দু'দিকে কামানের গুরু আওয়াজ
সামনে সংহত কুচকাওয়াজ—
অথচ নারী সেও : এই খবর,
যে দেশে নারী মানে নিরক্ষর,
কিম্বাণী কামিনের প্রতিভূ, আদিবাসী নারীরও আত্মীয় সে পরম,
বৃহত্তম গণতন্ত্রে তাই সুখে রোমাঞ্চিত গণমাধ্যম !
সে নাকি চেয়েছিল গর্ভে ফিরে যেতে, কানাচে খুঁজেছিল স্বস্তি,
অথচ দ্বারে তার কালের অংকুশে নোয়ায় মাথা পাটহস্তী।
সমর্থন করে তার নিয়োগ
সাগর ঘাঁটি থেকে শনির চোখ :
বাণিজ্যিক বাহু অবধি যতদিন জন্মরাশি রবে তুঙ্গে,
সে জানে জিভ ছাড়া উপায় নেই তার পাশায় পুঙ্খানুপুঙ্খে।
পোহায় সেই তাপ প্রাগ্-ইতিহাস
বিদেশী পণ্যের ভ্রম-বিলাস
প্রাচীন ডিম থেকে বিকৃত সন্ততি কোটায় জমি গ্রাস করতে,
সিংহবাহিনীর আসন সে জমিতে তাদেরই পুষ্টির শর্তে।
আখের খেত সারে রসালো হয়ে ওঠে, সোনালী গম ভানে যন্ত্র
অন্নপূর্ণার হাতায় তবু বিষ নিশানে উচাটন-মন্ত্র।
টোপায় ঘন বিষ হাতা থেকে
অমোঘ মিত্রতা পাতাতে কে
সাগরপার থেকে জোগায় চিক্কণ প্রযুক্তির গূঢ়তন্ত্র ?
ঘুলিয়ে ওঠে বিষ হাতায় তাড়নায় ভাঙে সে রুক্ষ আবর্তে
সুখ ও শান্তির মূর্খ কল্পনা নতুন গড়তে না গড়তে।

তেরঙা ক্রান্তির জয়তোরণ
টুকরো ক'রে দেয় বিস্ফোরণ
কুয়োর গায়ে হরিজনের রক্ত চাতালে ধর্মের গন্ধ
খড়্গ হাতে ধায় কাহার ইশারায় আত্মঘাতী সে কবন্ধ !
আবার হাত তিনি রাখেন সে হাতলে সামলে নিতে ভারসাম্য
আছড়ে পড়ে ভূঁয়ে তৃপ্ত জল্লাদ মৃত্যু ছিল যার কাম্য ।
নিয়ন্তার যদি এই নিয়ম
হবেন নিজে কেন ব্যতিক্রম ?
সময় হলে তাঁকে হবেই বলি হতে আপন রক্ষীর খড়্গে,
পরম্পরা একছত্র শাসনের রবে অশান্ত নিসর্গে ।

সাকুলেমা, তোর প্রদীপ জ্বলল না,
অশান্ত নিসর্গ বড় আজ,
শহর গাঁয়ে মিলছে না তোর কাজ—
সাকুলেমা, তুই ঘরের ভেতর যা !

মরদ-মেয়ের থম্‌কে-যাওয়া মুখ
কালের চাকায় ভাঙছে চুর চুর
মিলায় জমি চাষীর চোখ থেকে
হাঁকছে ফিরি বেকার মজদুর !

সাকুলেমা, তুই গাইতে পাবি না—
ঘরের দাওয়ায় জোটবাঁধা নিষেধ,
টুকরো টুকরো থাকুক ভেদাভেদ ;
সাকুলেমা, তুই ঘরের ভেতর যা !

ফেনিয়ে ওঠে বিষাক্ত আশ্বাস,
হাজার চোখ ম্লান অপেক্ষায়
হাল ছাড়ে না, হয় না পেছু-পা ।
ওদের আজ বেঁচে থাকাই দায় ।

বিষের কলে মাজছে থালাবাটি,
ওরাই তোর আপনজন খাঁটি—

ওরাই ফিসফিসিয়ে বলে : না !
সাকলেমা, তুই ঘরের ভেতর যা।

রাজধানীতে বদল হয় পালা—
পুড়তে পারে তোর চাঁচের ঘর,
সাকলেমা, তুই হোস না তৎপর
বাঁচিয়ে আজ থাকতে হবে গা।

অসংহত আবেগে কাঁপে দেশ,
মাটির তলে জটিল সে ঘৃণা
কোথায় ঘর, না পেলে নির্দেশ
সাকলেমা, তুই গাইতে পারি না !

ঘুমাও শহর, মৃত্যুনিথর দৃষ্টি,
কোটি কোটি টাকা হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ছে,
আবর্তে তার নতুন আকাশ সৃষ্টি,
শকুনির পাল চঞ্চু শানায় উচ্চে।

ঘুমাও শহর, রক্তমোচনে ক্লান্ত,
কিন্তু তোমার বুকে বসে দুঃস্বপ্ন :
আকাশে জটিল আগামী কালের প্রান্ত,
কি হবে, যখন এ নিদ্রা হবে ভঙ্গ ?

এক্ষণ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পত্রিকার গ্রাহক করা হয় না। অগ্রিম গ্রাহক-চাঁদা নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই। যাঁরা ডাকে সরাসরি পত্রিকা পেতে চান তাঁরা নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে আমাদের ভি. পি.-গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে পারেন। ডাক-খরচ ভি. পি.-গ্রাহককে বহন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভি. পি.-তে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি পৃথক সংখ্যা এভাবে তাঁদের পাঠানো যাবে। ঠিকানার বদল হলে আগে থেকে জানান।

লাইব্রেরি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যও একই নিয়ম — অগ্রিম গ্রাহক করা বা বিল পাঠিয়ে মূল্য দাবি করার কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই। পত্রিকা পেতে হলে স্থানীয় পত্রিকা-এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, অথবা আমাদের জানালে ভি. পি.-ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এজেন্টরাও ভি. পি.-তে পত্রিকা পাবেন — এজেন্সি কমিশন ২৫%, ডাক-খরচ পত্রিকা বহন করবে।

ভি. পি.-গ্রাহক ও এজেন্টদের পত্রিকা প্রকাশ ও প্রেরণের খবর পোস্টকার্ড মারফত আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

পত্রালাপের জন্যে কোনো ক্ষেত্রেই ডাক-টিকিট, খাম ইত্যাদি পাঠাবেন না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমাদের নিজ খরচেই পত্রালাপ করা হবে।

শ্রী প্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত

মহাশ্বেতা দেবীর

অনন্য গ্রন্থ

অরণ্যের অধিকার

১৬·০০

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

নৈঋর্তে মেঘ ২০·০০ গণেশ মহিমা ১৬·০০ রূপরাধা ৫·০০

ধানের শীষে শিশির ২০·০০ হাজার চুরাশীর মা ৮·০০

অগ্নিগর্ভ ১৬·০০ কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু ১২·০০

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর ২০·০০

ইটের পরে ইট ১২·০০ শালগিরার ডাকে ১৬·০০

গ্রামবাংলা (১ম) ১৬·০০ গ্রামবাংলা (২য়) ১৬·০০

প্রফুল্ল রায়ের

সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস

ভাতের গন্ধ

১৪·০০

মানুষের যুদ্ধ

১৬·০০

সীমারেখা মুছে যায় ১০·০০

কেয়াপাতার নৌকা (১ম) ৩০·০০

কেয়াপাতার নৌকা (২য়) ৩০·০০

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ টেমার লেন ॥ কলকাতা ৯

টেলিফোন : ৩৪-৬২৬৮

ঋদ্ধি-প্রকাশিত বাংলা বই

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রূপ, রস ও সুন্দর ৪৫·০০
[নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা]

ল্যাডলিমোহন রায়চৌধুরী
পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন ২৫·০০

মন্মথনাথ ঘোষ
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৫·০০

অতুলকৃষ্ণ রায়
কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩০·০০
অনুবাদ : শুদ্ধোদন সেন

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য ৪০·০০

অজিতকৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব]
যাদু কাহিনী ২৫·০০

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪০·০০

মন্মথনাথ ঘোষ
সেকালের কৃতী বাঙ্গালী ২০·০০
[আবদুল লতিফ এবং অন্যান্য]

ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া

২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

★ ★ আধুনিক ফ্যাশানে বলতেই ★ ★

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

আকর্ষণীয় রূপ, মসৃণ বুনন, উজ্জ্বল রঙ, সঠিক পরিমাপ
আর সবার উপর নতুন নতুন নতুন
চটকদার ডিজাইন ও ন্যায্য দাম।

• • • • • • • •

শাড়ী, ছাপা শাড়ী (সুতী এবং সিল্ক (, ধুতী, বিছানার
চাদর, বিছানার ঢাকা ও গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি

• এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ •

পলিয়েস্টার সুটিং এবং শার্টিং ইত্যাদি

• •;জনতা শাড়ী, ধুতী ও লুঙি তন্তুজ বিপণীতে পাওয়া যায় • •

দি ওয়েষ্ট বেংগল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৪৫, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭২

॥ সুবর্ণরেখার বই ॥

অসীম চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত

গ্রাম বাংলার ইতিকথা

হাণ্টার-প্রণীত Annals of Rural Bengal গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ৪৫·০০

অলোক মুখোপাধ্যায়

বিবর্তনের কথা

জীবসৃষ্টির সুদীর্ঘ ইতিহাস সহজ ভাষায় অসংখ্য চিত্র সহযোগে লিপিবদ্ধ করেছেন অভিজ্ঞ লেখক। ২৫·০০

অন্যান্য গ্রন্থ

অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ॥ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২·০০
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ॥ নিখিল সুর ৭·০০
বাংলাভাষায় আইন চর্চার ধারা ॥ ডাঃ পূর্ণেন্দু নাথ ২০·০০
স্বর ও শ্রুতি (প্রতিবন্ধী সমস্যা ও শিক্ষা) ॥ ডাঃ অমরনাথ মল্লিক ১৫·০০
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (শেষ পর্ব) ॥ প্রমোদ সেনগুপ্ত ৩০·০০
পরবের আঙ্গিনায় (লোকসংস্কৃতি) ॥ সবিতা ভৌমিক ১২·০০
ভারতবর্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কয়েকটি জরুরী সমস্যা ॥ সুব্রত বল ২০·০০

—

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

। সুবর্ণরেখার বই ।

এই দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অভিজিৎ সেন-প্রণীত

রহু চণ্ডালের হাড়

উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের কাহিনী। ৩০·০০

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস

অন্তর্জলী যাত্রা ১২·০০

সুশীল জানার ছোটগল্প

নগরে প্রান্তরে ২০·০০

জয়ন্ত জোয়ারদার। কল্লোলিনী তিলোত্তমা (ছোটগল্প) ১২·০০
রণজিৎ সিংহ। নিজের মাটিতে আপনজনের মধ্যে (কবিতা) ১২·০০

ফণিভূষণ রায়-প্রণীত

শরৎ-কণিকা

বাংলাভাষায় এই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোটেশানের বই। ১৮·০০

কল্যাণ চৌধুরী-অনূদিত

মহাচীনের পথিক

নর্মান বেথুনের অমর জীবনকাহিনী। ৩০·০০

সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা ৭০০০০৯

With best compliments from

STEEL PLANT SERVICES

P-15 INDIA EXCHANGE PLACE EXTN.
CALCUTTA 700 073

With best compliments from

Ganeshnarayan Brijlal Limited

TODI MANSION
P-15 India Exchange Place Extn.
CALCUTTA 700 073

Gram HECHPICLE
Telex Todi In 21 3233

Phones 27 6111
(3 Lines)

Containerise your cargo with Scindia. It's bound to reach its destination. In shipshape condition!

SCINDIA

THE SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY LIMITED

Scindia House, Narottam Morarjee Marg,
Ballard Estate, Bombay 400 038.
Phone: 268161. Telex: 011-2205

Sista's-SSN-570/81B

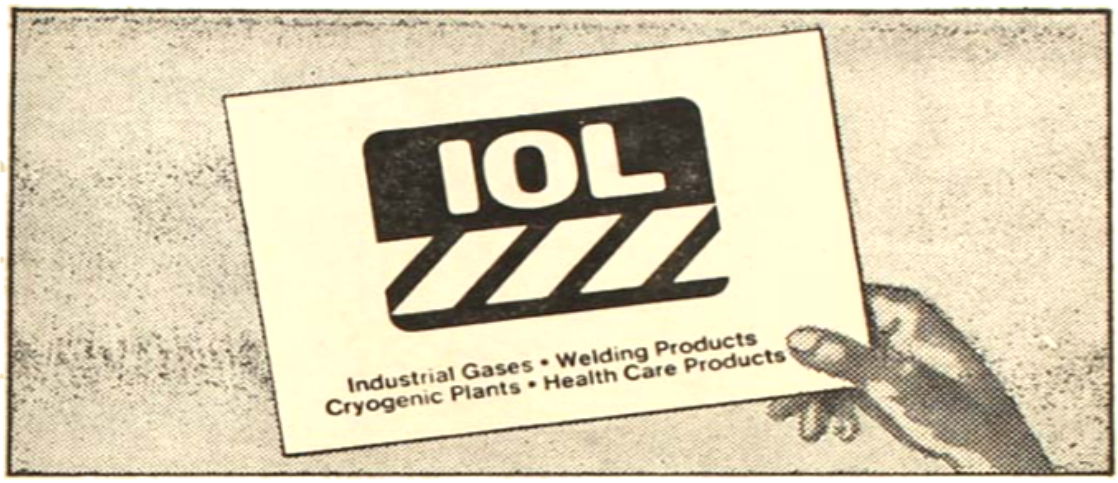

When people in highly diverse fields look for "the IOL mark," what do you think it implies?

Simply that Indian Oxygen Limited (IOL) has acquired an enviable reputation for the quality of its products and service. In areas far beyond only oxygen.

Industrial gases : applications to spur development in vital industries

IOL pioneered the manufacture of oxygen, nitrogen, argon and dissolved acetylene in India. Today IOL's gases have varied applications. From wayside welding to shipbuilding to INSAT, from transportation and telecommunication to power and mining. The Company not only manufactures these gases but is unique in providing technologies associated with their different applications. Further, IOL manufactures special gases which play a vital role in sophisticated industries and research.

A new dimension to metal fabrication

IOL offers a comprehensive range of welding equipment, consumables and accessories for customers. All this, along with advisory services, comprises a total welding package. IOL also offers cutting machines to suit every industry. From automobile manufacture to shipbuilding.

Cryogenic technology for building infrastructure

IOL's cryogenic plant and associated equipment manufacturing activity has helped build the infrastructure for planned development. The Company offers complete cryogenic plants and engineering, distribution and handling systems on a turnkey basis. IOL was the first to manufacture and supply air separation units in India.

Health care : a priority concern

The Company continues to contribute to the medical profession with an assured supply of medical gases, anaesthetic equipment and equipment for lung functions. As well as centralised distribution systems through pipelines for medical gases and vacuum to medical establishments.

Indian Oxygen Limited
A member of The BOC Group

OBM 9547F

EKSHAN Annual Number 1985 Rs. 16.00
Regn. No. 6308/61 Vol. XVII : No. 3-4